উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৫৯তম বর্ষ

(১৩৬৩-মাঘ হইতে ১৩৬৪-পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী নিরাময়ানন্দ

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা — প্রতি সংখ্যা আট আনা

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

মাঘ-১৩৬৩ হইতে পৌষ-১৩৬৪

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা



উদ্বোধন

জীবনযুদ্ধে জয়ের উপায়

যাবন্ন্ কায়-রথমাত্মবশোপকল্পং
ধত্তে গরিষ্ঠচরণার্চনয়া নিশাতম্।
জ্ঞানাসিমচ্যুতবলো দধদস্তশত্রুঃ
স্বানন্দতুষ্ট উপশান্ত ইদং বিজহ্যাৎ॥
নোচেৎ প্রমত্তমসদিন্দ্রিয়বাজিসূতা
নীত্বোৎপথং বিষয়দস্যুষু নিক্ষিপন্তি।
তে দস্যবঃ সহয়সূতমমুং তমোঽন্ধে
সংসারকূপ উরুমৃত্যুভয়ে ক্ষিপন্তি॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।১৫।৪৫, ৪৬

জীবন যুদ্ধে মানুষের দেহ যেন রথ, আর আত্মবশবর্তী ইন্দ্রিয়গণ তাহার উপকরণ। যতদিন দেহ ধারণ করিতে হয় ততদিন শ্রেষ্ঠ গুরুগণের চরণসেবা দ্বারা শাণিত জ্ঞানরূপ অসি ধারণপূর্বক ভগবান অচ্যুতের শক্তি আশ্রয় করিলেই ত্রিগুণাত্মক রাগদ্বেষ শোক মোহ হিংসা ভয় প্রভৃতি শত্রুগণ পরাজিত হইবে, তখন নিরুদ্বিগ্নচিত্তে আত্মানন্দে অবস্থান করিয়া ঐ রথাদিকে উপেক্ষা করা যাইবে।

ভগবানকে আশ্রয় করিতে পারিলেই শান্তি, যে পর্যন্ত তাঁহার চরণকমলে মতি সে পর্যন্ত কোন ভয়ই নাই। নতুবা, বহির্মুখ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ ও বুদ্ধিরূপ সারথি সেই প্রমত্ত ব্যক্তিকে বিপথে প্রবৃত্তিমার্গে পরিচালিত করিয়া রূপরসাদি বিষয়রূপ দস্যুদলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে; এবং সেই দস্যুগণ অশ্ব ও সারথির সহিত ঐ ব্যক্তিকে অন্ধকারময় জন্মমৃত্যুরূপ সংসারকূপে ফেলিয়া দিবে—যেখানে আছে বারংবার গুরুতর মৃত্যুভয়।

কথাপ্রসঙ্গে

আমাদের বর্ষারম্ভ

এই সংখ্যায় উদ্বোধনের ৫৯তম বর্ষের শুভারম্ভ। আমরা জগদীশ্বরের আশীর্বাদ এবং সুধী পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের আন্তরিক প্রীতি ও সহযোগিতা কামনা করিয়া নূতন বৎসরের কার্যে ব্রতী হইলাম। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ৫৮ বৎসর আগে এই লোককল্যাণব্রতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। সুদীর্ঘকাল আমরা তাঁহারই আদর্শ সর্বদা স্মৃতিপথে রাখিয়া মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত উন্নতির জন্য সত্য, শুচিতা, সংযম, আত্মত্যাগ, মৈত্রী, সেবা, শান্তি ও ধর্মসমন্বয়ের কথা আলোচনা করিয়া আসিতেছি। দেশে ও বিদেশে, সমাজে ও রাষ্ট্রে কত বিপ্লব আসিয়াছে ও গিয়াছে, কিন্তু আমাদের ব্রত ও কর্মধারার পরিবর্তন বা বিরতি ঘটিবার কোন ক্ষেত্র উপস্থিত হয় নাই, কারণ আমাদের কাজ—বাহিরের নানা পরিবেশ ও অবস্থার মধ্যে মানুষের অন্তরে যে চিরন্তন ধর্মবোধ রহিয়াছে—তাহারই জাগরণ ও বিকাশকে লইয়া। আমাদের আবেদন মানুষের শাশ্বত সত্যের নিকট—যে সত্যকে কেহ কখনও প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, যে সত্য সাময়িকভাবে আবরিত থাকিলেও একদিন না একদিন প্রকাশিত হইতে বাধ্য। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু অভিব্যক্তি ও সুসংহত সংরক্ষণ নির্ভর করে এই সত্যেরই উদ্বোধনের উপর। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব ও বিভেদ—মানুষের আসল কথা নয়, পূর্ণতা-পথযাত্রী মানুষের উহা একটা সাময়িক বিভ্রম। মানুষকে ঐ বিভ্রম কাটাইয়া উঠিতে হইবে, তাহার নিজের এবং জগতের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির দিকে মনঃসংযোগ করিতে হইবে। তবেই তাহার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের গোঁজামিলগুলি দূর করিয়া সে দাঁড়াইতে পারিবে সর্বাবগাহী সত্য ও কল্যাণের উপর। মানুষ বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় চলুক ক্ষতি নাই, কিন্তু ঐ ব্যবস্থাগুলি যেন এই সত্য ও কল্যাণকে ব্যাহত না করে।

স্বামীজীর যুগ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জগৎসভায় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব—নবসৃষ্টির প্রতিশ্রুতি-সমন্বিত এক প্রলয়-ঝঞ্ঝার মতো! আটলান্টিকের উভয় তীর আলোড়িত করিয়া ভারতে উহা বহিয়া আনিল প্রলয় প্লাবন—যাহার স্রোতে ভাসিয়া গেল যুগযুগান্ত-সঞ্চিত ধূলিজঞ্জাল—যাহার তরঙ্গাভিঘাতে জাগিয়া উঠিল সহস্রবৎসর-নিদ্রিত এক বিরাট জাতি। মানুষের ধর্মবোধে ও চিন্তাধারায় সংকীর্ণতায় যে অচল প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছিল, গত দুই শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুক্তির আক্রমণে যাহার গাঁথনি শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, বিবেকানন্দের বজ্র-নির্ঘোষে তাহা ধসিয়া পড়িল নূতনতর সর্বজন-মনোগ্রাহী ধর্মভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে।

রাত্রিশেষের আচ্ছন্ন বদ্ধতা ভেদ করিয়া তিনি আসিলেন উচ্ছ্বসিত সূর্যালোকের মতো মুক্তি ও জাগরণের বার্তাবহরূপে—নূতন দিনের আশা ও সমারোহ লইয়া—নবজীবনধারার আশ্বাস ও শক্তি লইয়া! প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে তাঁহার কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল অপূর্ব ঝঙ্কার। মহাসঙ্গীতের সেই সুর দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া রচনা করিয়াছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতী মাঙ্গলিক!

ভারতকৃষ্টির উদয়-উষায় ঋষি-অনুভূত ঔপনিষদ সত্য অন্তরের অন্তরে উপলব্ধির পর বিশ্ববাসীর প্রতি নরঋষি বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান,—শোন শোন অমৃতের পুত্রগণ, অন্ধ তমসার পারে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমি জানিয়াছি, তাঁহাকে জানিলেই

মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, আর অন্য পথ নাই!—অদ্বৈত-বেদান্তের ব্যাখ্যামুখে আচার্য বিবেকানন্দ আধুনিক কালের ও এ যুগের মনের উপযোগী, যুক্তি ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, পুরুষকার ও আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল—নূতন এক বিশ্বজনীন ধর্মের সূচনা করিলেন—যেখানে আবার মানবের শাশ্বত মহিমা বিঘোষিত হইল নূতন ভাবে—নূতন ভাষায়। 'মানুষ দুষ্ট হউক, পাপী হউক—মানুষ মানুষ। মানুষকে পাপী বলাই মহাপাপ! মানুষ অমৃতের সন্তান, অনন্তের অধিকারী!' এই পরম স্বীকৃতি অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

'সবার উপরে মানুষ সত্য—তাহার উপরে নাই' সাধক কবির এই গভীর অনুভূতি—চরম সার্থকতা, পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে স্বামীজীর নবধর্মে—যাহার মর্মবাণী—'মানুষই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠমন্দির, মানবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানুষের অভাব দূরীকরণই মানুষের প্রথম কর্তব্য—পরম পবিত্র উপাসনা। অভাব ক্রমশঃ দূরীভূত হইলেই মানুষ শারীরিক স্তর হইতে শুরু করিয়া মানসিক স্তর ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়। প্রাথমিক অভাব দূরীকরণ হইতে, সর্বশেষ—জ্ঞানের অভাব দূর করা পর্যন্ত ক্রমবিকাশ জীবনসংগ্রাম। বিবেকানন্দের অভিধানে এই সংগ্রামে জয়ী হওয়ার সাধনাই মানুষের ধর্ম।

যাহা কিছু মানুষকে এই ক্রমবিকাশের পথে, জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার পথে, বহিরন্তঃ-প্রকৃতিকে জয় করিতে সহায়তা করিয়াছে তাহাই ধর্ম; আর যাহা কিছু মানুষকে অমানুষ করিয়াছে, দুর্বল করিয়াছে, ভীরু করিয়াছে, ক্রমসংকুচিত, সংকীর্ণ ও স্বার্থপর করিয়াছে, জীবন সংগ্রামে পরাজিত মনোভাব আনিয়া দিয়াছে তাহাই অধর্ম।

স্বামীজীর অভিধানে নাস্তিক সেই, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না। আত্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার নব-ধর্ম। তাই ত তাঁহার বাণী সংগ্রামশীল মানুষের মনে আনে আশা, আনে উৎসাহ; তাই ত তাঁহার আহ্বান এত অমোঘ, এত ব্যাপক।

স্বামীজীর বাণী প্রেরণা দিয়াছে ব্যক্তির মুক্তি-সাধনায়,—মহাজাতির জীবনজাগরণে, বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বস্থাপনে। যেখানেই মানুষের কোন শুভ প্রচেষ্টা, যেখানেই মানুষের উন্নতির আয়োজন, যেখানেই মানুষ সংকীর্ণতার, স্বার্থপরতার শৃঙ্খল ভাঙিতে সচেষ্ট, সেইখানেই স্বামীজীর আবেদন! সত্যই, স্বামীজীর মধ্যে এ যুগের 'বিবেকবাণী' ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

অবনত, পদদলিত, নিপীড়িত, সর্বপ্রকার দুঃস্থ-দুর্গত মানবের জন্য বিবেকানন্দ-হৃদয়ের বেদনা পাষাণকেও বিগলিত করে, তাই ত তাঁহার আহ্বান দেশে দেশে কত হৃদয়কে স্পন্দিত করিয়া জাগ্রত করিয়াছে সংসারের সুখনিদ্রা হইতে,—নিয়োজিত করিয়াছে, করিতেছে নানাবিধ সেবাপ্রচেষ্টায়, শৃঙ্খলমুক্তির সাধনায়, নররূপী নারায়ণের উপাসনায়!

অল্পবুদ্ধি মানব সন্দেহ করে, স্বল্পস্মৃতি মানব ভুলিয়া গিয়াছে—তাই নানা প্রশ্ন করে, তাহার উত্তরে শুধু বলা যায় বিবেকানন্দের এই ধর্ম—নূতন ভাষায় পুরাতন ভাব—সত্য চির-নূতন, চির-পুরাতন—তাই ত সে চিরন্তন। এ যেন, রাত্রিশেষে সনাতন সূর্যের পুনরুদয়! এ যেন 'নূতন পাত্রে পুরাতন সুরা'। স্বামীজী দুর্বলচিত্তের সন্দেহ দূর করিবার জন্য আসন্ন যুগপরিবর্তন ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন 'অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না।'—'এই নব যুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই যুগধর্মপ্রবর্তক শ্রীভগবান পূর্বগ শ্রীযুগধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস ও ধারণা কর।'

'এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব—

যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল—তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।'

অতীতে, যুগে যুগে দেশে দেশে নানা ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে—ভবিষ্যতেও দেশকালের প্রয়োজনে যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষগণ আরও কত নূতন নূতন ভাব লইয়া আসিবেন; অতীত ও অনাগতের সন্ধিক্ষণে, বর্তমানের মহামুহূর্তে আমরা সর্বভাব-সমন্বয়ের যে মহাভাবটি পাইয়াছি—তাহা যেন হৃদয় দিয়া বরণ করি, জীবন দিয়া আচরণ করি। এখানে গ্রহণ আছে—বর্জন নাই, বোধন আছে—বিসর্জন নাই, আবাহন আছে—বিদায় নাই।

মানবের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী কেহ জ্ঞানের, কেহ ভক্তির, কেহ ধ্যানের, কেহ কর্মের অনুরাগী,—যে কোন একটি ভাব অবলম্বনে অথবা একাধিক বা সর্বভাবসমন্বয়ে মানব অন্তর্বহিঃপ্রকৃতি জয় করিয়া মুক্ত হইতে পারে—অনন্তের অনুভূতি, অমৃতত্বের আস্বাদ পাইতে পারে, ইহাই ধর্মের সার কথা। ইহাই স্বামী বিবেকানন্দ-ঘোষিত সর্বমনের উপযোগী ধর্মের নূতন সনদ। ইহারই সহায়ে সর্বাঙ্গসুন্দর মানবসমাজ গঠিত হইবে, জগৎ এখনও তাহারই জন্য প্রতীক্ষারত।

বিবেকানন্দের ঋষিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত—শুধু ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—যাহা জ্ঞানে গরীয়ান্, ধর্মে মহীয়ান্। অধ্যাত্মশক্তি-সম্পন্ন উন্নততর এক উদার মানবজাতির অভ্যুদয়—ইহাই স্বামীজীর স্বপ্ন—ইহাকে বাস্তবে পরিণত করাই ভারতের বিধিনির্দিষ্ট মহাব্রত। স্বামীজীর এই স্বপ্ন দিবাস্বপ্ন নয়, কবিকল্পনা বা নিছক শুভেচ্ছাও নয়—ইহা শুদ্ধচিত্তে প্রতিভাত সত্য, বিরাট মনের দিব্য অনুভূতি, স্বামীজীর সমাগত জন্মদিনে আমরা যেন বুঝিতে পারি, বিশ্বাস করি—স্বামীজীর যুগ পশ্চাতে নয়, সম্মুখে।

বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম

কথা উঠিয়াছে বিজ্ঞান, তথা বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধের রক্তপিচ্ছল পথ দিয়া মানুষ আজ ধ্বংসের পথেই অবরোহণ করিতেছে; দুই যুদ্ধের মাঝে শ্বাসরুদ্ধ আতঙ্ক আরো অনিশ্চিত, আরো দুঃসহ। কে জানে মানুষ আবার আলো-বাতাসহীন আদিম অন্ধ গহ্বরে ফিরিয়া চলিয়াছে কিনা; বুঝিবা গুলিবিদ্ধ বোমারু বিমানের মত তাহার এত সাধের, এত সাধনার বর্তমান সভ্যতা জ্বলিয়া পুড়িয়া নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে—শুধুমাত্র ভস্মরাশি উড়িয়া ছড়াইয়া পড়িবে পৃথিবীর গাত্রে তাহার শেষ নিদর্শনস্বরূপ! হয়ত বা এই জীবধাত্রী বসুন্ধরা, সুনীলসাগরাম্বরা বনকুন্তলা জননী পৃথিবীও নিস্তার পাইবেন না তাঁহার দুরন্ত সন্তানদের পারমাণবিক বিস্ফোরণের হাত হইতে! বিজ্ঞান-সহায়ে ক্রমশঃ উৎকর্ষশীল মারণাস্ত্রসমূহের যে তালিকা মাঝে মাঝে বিভিন্ন রাষ্ট্রকর্তৃক সগৌরবে প্রকাশিত হয়—আস্ফালনের মত—তাহাতে সাধারণ মানুষের মনে ঐ প্রকার ভয় উৎপন্ন হওয়া বিচিত্র নয়, বরং স্বাভাবিক।

কিন্তু আশ্চর্য রহস্য—যে মনে এই মরণভীতি, তাহাতেই আবার লুক্কায়িত মরণজয়ের সংকল্প ও প্রচেষ্টা। এই মানুষের মনই একদিন সংকীর্ণ ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সত্যের সন্ধানে জয়যাত্রা শুরু করিয়াছিল। নবলব্ধ বিজ্ঞানের বলে মানুষ জলে স্থলে আকাশে বাতাসে সর্বত্র তাহার বিজয় নিশান উড়াইয়াছে। পৃথিবীর গর্ভে, সমুদ্রের তলদেশে, পর্বতের উচ্চতম শিখরে, কোথায় সে যায় নাই? নদীর উৎস-সন্ধানে শ্বাপদসংকুল ঘনবনে, বিপদসংকুল হিমবাহে—সর্বত্র তাহার গতি অপ্রতিহত। মেরু ও মরুর নির্জনতা ভাঙিয়া সে শহর বন্দর পত্তন করিয়াছে, আবার শান্তরাত্রির নীরব অন্ধকারে মুখর নক্ষত্র-নীহারিকার

তাহায় সে পড়িয়াছে বিশ্বসৃষ্টির অলিখিত ইতিহাস, জীবাশ্মে শিলারেখায় সে বুঝিয়াছে লক্ষবর্ষব্যাপী প্রাণিজীবনের ক্রমবিকাশের অফুরন্ত সাধনা ও সংগ্রাম,—মানবশরীরের সমগ্র রহস্য অবগত হইয়া সে আজ জন্মমৃত্যু-নিয়ন্ত্রণপ্রয়াসী।

তবু কেন এত ভয়, এত সংশয়—এত দ্বন্দ্ব? কিসের অভাবে আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজ্ঞান ছিন্নমস্তার মত নিজের ধ্বংস নিজেই করিতে উদ্যত? এই প্রশ্নই আজ আবার নূতন করিয়া উঠিয়াছে—মানুষের মনে, যেখানে বিজ্ঞানেরও জন্মভূমি!

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে,—পদার্থ ও শক্তির ধর্ম পর্যবেক্ষণ করিয়া, তাহাকে আয়ত্তে আনিয়া, জল বায়ু বাষ্প তড়িৎ প্রভৃতি শক্তিকে কাজে লাগাইয়া বিজ্ঞান শিল্পে, বাণিজ্যে, রাষ্ট্রে, সমাজে যুগান্তর আনিয়াছে, তৎসহ আনিয়াছে নব ও অভিনব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ যাহার সমাধান করিতে বিজ্ঞান অক্ষম; পরন্তু, বিজ্ঞান আজ রাজনীতির আজ্ঞাধীনা দাসীর মত।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান—অগ্নি বা বিদ্যুতের মত একটি শক্তি,—মহাশক্তি; ব্যবহারের উপরই তাহার ইষ্টানিষ্ট ফল। সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস প্রকৃতির স্বভাব—চক্রবৎ ঋতুপর্যায়ের মত পর পর ইহারা আসে যায়—ইহার কোনটির উপর প্রকৃতির আসক্তি বা বিরক্তি নাই,—সৃষ্টিস্থিতিলয় মহাশক্তিরই প্রকৃতি, বা প্রকৃতিরই মহাশক্তির বিকাশ ও বিলয়! ইহাতে প্রকৃতির সুখ বা দুঃখ নাই। মানুষই প্রকৃতির নিয়ম জানিয়া স্বার্থে তাহাকে নিয়োগ করে, কিন্তু সুখের সঙ্গে দুঃখও পায়, ইহাই অনুভূত সত্য। মানুষকে আজ বুঝিতে হইবে সুখ ও কল্যাণ এক জিনিস নয়। কল্যাণার্থে প্রকৃতিকে নিয়োজন—শিবশক্তিমিলনের মর্মকথা। শিবহীন শক্তির আরাধনাই আজ মানুষকে অকল্যাণের পথে টানিয়া আনিয়াছে; মৃত্যুর আতঙ্কে জীবনেই তাহাকে অর্ধমৃত করিয়াছে।

তাই আজ প্রয়োজন—বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম তত নয়—যত মানুষেরই নবজন্ম। 'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্‌দ্বিজ উচ্যতে', 'Unless ye be born again, ye cannot enter the kingdom of Heaven'—এই সকল শাস্ত্রবাণী, মহাপুরুষবাণী নূতন করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে। চাই মানুষের মনের পরিবর্তন—যে মন বিজ্ঞানকে শুধু নিজের সুখের জন্য, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ব্যবহার করিবে না,—ব্যবহার করিবে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়।

আশার কথা—বিজ্ঞানের অন্তস্তলেই, বৈজ্ঞানিকের মনের মধ্যেই, এই প্রশ্ন জাগিয়াছে। পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই আজ সত্যের সীমা নয়, অন্তরিন্দ্রিয় মনের অনুভূতিও আজ বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। দৃশ্যমান জগতের প্রাতিভাসিকত্ব তাহার চোখে ধরা পড়িয়াছে। স্থূল হইতে সূক্ষ্মের প্রতি বিজ্ঞানের এই অভিযান আধুনিক মানবমনের নবতম উদ্‌গতিই সূচনা করিতেছে। শুধুমাত্র 'কি? কেন? এবং কেমন করিয়া?' এই প্রশ্নত্রয়ের সমাধানে সন্তুষ্ট না হওয়ায় বিজ্ঞানের মনে উপনিষদের সেই প্রশ্ন জাগিতেছে 'কাসৌ পুরুষঃ' 'সেই পুরুষ কে, কোথায়?' বিজ্ঞান আজ বস্তু হইতে ব্যক্তির অভিমুখে চলিয়াছে। 'কেন মানুষ চিন্তা করে, কি ভাবে চিন্তা করে—মানুষের মনে বসিয়া কে চিন্তা করে'—বিজ্ঞান আজ তাহাও চিন্তা করিতে শিখিতেছে।

জড়বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ হইতে প্রাণবিজ্ঞানের গবেষণা—প্রাণবিজ্ঞান হইতে মনোবিজ্ঞানের সাধনা আজ বিজ্ঞানকে দর্শনের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিতেছে। এই মনোময় সাধনা হইতে চৈতন্যময় জীবনের প্রতি অভিযান—সোপানমাত্র ব্যবধান। এই ঊর্ধ্বমুখী পথ বড়ই কঠিন ও সংকীর্ণ, ক্ষুরধার ও দুর্গম। কিন্তু এই পথ অমৃতের পথ, কল্যাণের পথ,—মৃত্যুভয়শূন্য জ্ঞানের পথ। ইহারই সন্ধানে মানুষ বাহির

হইয়াছে—তাহার জ্ঞানোন্মেষের প্রথম প্রভাতে। এই পথ অতিক্রম করাই মানুষের সাধনা এই পথের প্রান্তে উপনীত হওয়াই মানবজীবনের লক্ষ্য। ইহাই মানুষের ধর্ম!

বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম পরস্পরবিরোধী নয়—একই মানবমনের ক্রমবিকাশ! সত্য শিব ও সুন্দরের সাধনাই মানুষ চিরকাল করিয়া আসিতেছে ও করিয়া চলিবে। স্বামী বিবেকানন্দ অতি অল্প-কথায় এই মহাভাবরাশিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, 'Art, Science and Religion are three readings of the same Truth—একই সত্যকে মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থা হইতে বিভিন্ন মন দিয়া দেখিয়াছে; তাহারই ফলে আমরা পাইয়াছি সাহিত্যকলা, দর্শনবিজ্ঞান ও ধর্ম। কলা ও সাহিত্যের দৃষ্টিতে মানুষ দেখিয়াছে প্রেমময় আনন্দ-স্বরূপ সুন্দরকে, দর্শন ও বিজ্ঞান ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে বিশ্বময় সত্তাস্বরূপ সত্যকে, আর ধর্ম অনুভব করিয়াছে কল্যাণময় চৈতন্যস্বরূপ শিবকে; সত্য শিব সুন্দর এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই নামান্তর।

গ্রাম-উন্নয়ন

সমাজ-কল্যাণ ও গ্রাম-উন্নয়নকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক কালে দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে। জনসাধারণ উহাতে কতটুকু অংশগ্রহণ করিতেছে বা করিতে পারিতেছে এবং উহা দেশকালপাত্রের কতটা উপযোগী হইয়াছে—পরিকল্পনার রূপায়ণকালেই—তাহা বিচার্য। প্রয়োজন হইলে কার্যক্রম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অবশ্য কর্তব্য; নতুবা শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের কল্যাণ অপেক্ষা পরিকল্পনাকারীদের আত্মপ্রসাদের অঙ্কটাই বেশি হইবে।

পরিকল্পনাগুলি যোগ করিলে তাহার মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যায়—আদর্শগ্রামের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ, সুন্দর পথ ঘাট, সুপেয় জল, অধিক খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা, কুটির শিল্পের যোজনা, শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার, চিকিৎসার জন্য ডিস্পেন্সারি ও হাসপাতাল,—ডাকঘর ও সমবায় সমিতি! সঙ্গে সঙ্গে একথাও সর্বজনবিদিত যে দেশের মাত্র শতকরা ২০ জন অধ্যুষিত শহরগুলির জন্য যে মনোযোগ দেওয়া হয় ও অর্থ বিনিয়োগ করা হয়—শতকরা ৮০ জন অধ্যুষিত সাত লাখ গ্রামের জন্য তাহার অর্ধেকও হয় না।

একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, বর্তমান শিল্প বিজ্ঞান ও যন্ত্রের যুগে গ্রামের উন্নতি বহুলাংশে শহরের উন্নতির উপর নির্ভর করে; অতএব শহরের উন্নতি প্রকারান্তরে গ্রামের উন্নতিকে সাহায্য করে,—কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, খাদ্য ও কাঁচামালের জন্য শহরকে চিরদিনই পল্লীর উপর নির্ভর করিতে হইবে। অতএব গ্রামের স্বার্থ বলি দিয়া—বা গ্রামকে ধ্বংস করিয়া আমরা যেন শহর পত্তন না করি। বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে শিল্পবিপ্লবের পর হইতে যেখানেই এরূপ হইয়াছে—সেখানে শেষপর্যন্ত তাহা সুখের হয় নাই—ইতিহাসের এ ইঙ্গিত আমরা যেন বুঝিতে পারি। গ্রাম্য কৃষকের সামাজিক ও পারিবারিক সুখশান্তি এবং কারখানার শ্রমিকের অশান্তি ও অসন্তোষের মূলে কি মনোভাব, পরিবেশের কতটা প্রভাব, তাহা সময়মত না বুঝিলে আমরাও পাশ্চাত্ত্যদেশগুলির মত শিল্পযুগের অমৃত বিন্দুমাত্র পান করিয়া উহার গরল তাপে দগ্ধ হইব। কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় করিয়া, গ্রাম ও শহরের সামঞ্জস্য রাখিয়া আমাদের পরিকল্পনা রচিত হওয়া প্রয়োজন। পরিকল্পনার স্রোতে ভাসিয়া আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, গ্রাম প্রকৃতির সৃষ্টি—সহজ, সরল, সুন্দর—চিরদিনের; আর শহর নগর বন্দর মানুষের প্রয়োজনে দুদিনের সৃষ্টি; তাহার জীবনধারা কৃত্রিম, কুটিল এবং বহুস্থলে কুৎসিত! আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রামের উন্নয়ন বলিতে আমরা যেন উপনগর বা শহরের সম্প্রসারণ না বুঝি,

উন্নতগ্রাম শহরের অনুকরণও হইবে না। গ্রামের নিজস্ব প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো বজায় রাখিয়া আধুনিক কালের শিক্ষা, সুখসুবিধাগুলি যদি স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে সেখানে সংযোজিত হয় তবেই গ্রামের উন্নতি একটা স্থায়ী কল্যাণমূলক রূপ পরিগ্রহ করিবে, নতুবা অন্তরের আকাঙ্ক্ষার অভাবে শুধুমাত্র বাহিরের প্রেরণায় তাড়াহুড়া করিয়া যাহা গড়িয়া উঠিবে, বাহিরের সরবরাহ বন্ধ বা সংকুচিত হইলেই তাহা সহসা ভাঙিয়া পড়িবে।

শহরে বসিয়া গ্রামসংগঠনের পরিকল্পনা কখনও সঠিক ও সম্পূর্ণ হয় না, হইতে পারে না। গ্রামের উন্নয়ন সম্বন্ধে কিছু করিতে হইলে গ্রামের লোকের অভাব জানিতে হইবে, তাহাদের অভিযোগ শুনিতে হইবে। নতুবা দেখা যায়—শহরের লোক গ্রামে গিয়া যে সকল অভাব অনুভব করে আমাদের পরিকল্পনায় সাধারণত সেইগুলি দূরীকরণেরই প্রয়াস, তাহাও আংশিকভাবে। কুটিরে কুটিরে বৈদ্যুতিক আলো অপেক্ষা জলনিকাশের ব্যবস্থা, গ্রামের মধ্যে বারোমাস চলাচলের পথ এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বা শহরে বন্দরে যাইবার 'জাতীয় সড়ক' বেশি প্রয়োজন, সকলের আগে প্রয়োজন! শেষের এই একটি হইলেই অন্য অনেকগুলি পরিকল্পনা সার্থক হইবে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও নিরাপত্তার অনেক উন্নতি হইবে। উপযুক্ত পথের অভাবে বৎসরের চারমাস—বিদ্যালয় খোলা থাকা সত্ত্বেও বহু ছাত্র আসিতে পারে না, হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও দূরের রোগী আসিতে পারে না, থানা থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হয়, প্রয়োজন সত্ত্বেও শিল্প-বাণিজ্য স্থগিত থাকে। সেজন্য চাষের পর উপযুক্ত কর্মাভাবে একরূপ নিরুপায় হইয়াই চাষীকে নিরন্ন হইয়া কাল কাটাইতে হয়। কুটিরশিল্পের সহিত সমবায়-সমিতি এবং বারোমাসের চলার পথ এই বিকট অভাব দূর করিতে পারে।

পথঘাটের মত আর একটি মৌলিক অভাব শিক্ষার অভাব, এই একটি অভাব দূরীভূত হইলেই সমাজশরীরে নূতন রক্ত নূতন ভাব সঞ্চারিত হইবে এবং তাহারই সহায়ে অন্য সকল অভাব দূর করিবার ইচ্ছা ও শক্তি গ্রামবাসীদের মধ্যেই জাগিয়া উঠিবে, ইহাই যথার্থ জনজাগরণ, ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে গ্রামের উন্নতি, তথা জাতির উন্নতি। ভুলিলে চলিবে না জাতি বাস করে গ্রামে, জাতীয় জীবনের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে হইবে সেখানেই।

ভারতের বুদ্ধ

গত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে পৃথিবীর প্রায় কুড়িটি দেশের বৌদ্ধধর্মের ৬২ জন প্রতিনিধি ভারতের অতিথি হইয়া ভগবান্ তথাগতের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিতেছিলেন। দিল্লীতে সম্বর্ধনার পর সারনাথ নেপাল বুদ্ধগয়া রাজগৃহ নালন্দা দর্শনান্তে বিদায়ের পথে তাঁহারা কলিকাতায় পদার্পণ করেন। মহাবোধি সোসাইটিতে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বলেন, বৌদ্ধধর্ম সমগ্র মানবজাতিকে প্রেমের বাণী শুনাইয়াছে এবং এখনও শান্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। বর্তমান পৃথিবীতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব-স্থাপনে ইহা এক মহাশক্তি।

রাজগৃহে বুদ্ধপরিনির্বাণ-সমিতির অভ্যর্থনার উত্তরে প্রতিনিধিদলের পক্ষ হইতে সিংহলের মাননীয় থেরো ভাবাবেগে বলিয়াছেন,—"বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে উদ্ভূত শাখা (off-shoot) একথা বলা ভুল, পরন্তু বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ পীড়িত হিন্দুধর্মের প্রতি একটা 'চ্যালেঞ্জ'। জাতিধর্মনির্বিশেষে বুদ্ধ সকলের জন্য তাঁহার ধর্মের দ্বার খুলিয়া দেন।" সম্প্রতি স্বর্গত বৌদ্ধধর্মে নবদীক্ষিত ডক্টর আম্বেদকরও কিছুদিন আগে বলিয়াছিলেন, 'হিন্দুরা যে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে—ইহা ভুল।' শ্রেষ্ঠ হিন্দুমনীষা বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন—তাহার প্রতি

মনোনিবেশ করিলেই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

১৮৯৩ খৃঃ চিকাগো ধর্মমহাসভায় 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান বক্তৃতার সপ্তাহ পরে ঐ সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ 'বৌদ্ধধর্ম' সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন—তাঁহার বক্তব্যের মর্মার্থ—'বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই পূর্ণ পরিণতি'। বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া ঐ বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হইল। "আপনারা শুনিয়াছেন আমি বৌদ্ধ নই, তবু আমি বৌদ্ধ। চীন জাপান বা সিংহল যদি সেই মহাগুরুর বাণী অনুসরণ করে, ভারত তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া উপাসনা করে। .... (বেদজাত) হিন্দুধর্মের সহিত অধুনাকথিত 'বৌদ্ধধর্মের' সম্পর্ক অনেকটা ইহুদীধর্মের সহিত খ্রীষ্টধর্মের সম্পর্কের মত। যীশুখ্রীষ্ট ইহুদী ছিলেন, শাক্যমুনি ছিলেন হিন্দু। তবে ইহুদীরা যীশুকে প্রত্যাখ্যান করে—উপরন্তু ক্রুশবিদ্ধ করে,—আর হিন্দুরা শাক্যমুনিকে গ্রহণ করে, ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। বর্তমান বৌদ্ধধর্ম ও প্রভু বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে যে পার্থক্য আমরা দেখাইতে চাই—তাহা মোটামুটি এই—শাক্যমুনি নূতন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই। যীশুর মত তিনিও আসিয়াছিলেন ধ্বংস করিতে নয়, পূর্ণ করিতে। তবে তফাৎ এই যে—যীশুর ক্ষেত্রে প্রাচীনরা, ইহুদীরা তাঁহাকে বোঝে নাই, আর বুদ্ধের ক্ষেত্রে তাঁহার নিজ শিষ্যেরাই তাঁহার শিক্ষার মর্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহুদীরা বুঝে নাই 'পুরাতন প্রতিশ্রুতি'র পূর্ণতা—আর বৌদ্ধেরা বুঝে নাই হিন্দুধর্মের সত্যগুলির পরিপূর্ণতা। আবার বলি—শাক্যমুনি ধ্বংস করিতে আসেন নাই—তিনি ছিলেন হিন্দুদিগের ধর্মের যুক্তিগত সিদ্ধান্ত, ক্রমবিকাশ, পরিপূর্ণরূপ।

"হিন্দুধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত—ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সন্ন্যাসীরাই বিশেষভাবে অধ্যাত্ম অংশটি অধ্যয়ন করেন। সেখানে কোন জাতিবিচার নাই। .... ধর্মাচরণে কোন জাতিবিচার নাই, জাতিবিচার সামাজিক অনুষ্ঠানমাত্র। শাক্যমুনি সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহার গৌরব এই যে, লুক্কায়িত বেদের সত্যকে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিবার মত বিশাল হৃদয় তাঁহার ছিল।...হিন্দুধর্ম বৌদ্ধভাব ছাড়া বাঁচিতে পারে না, আবার বৌদ্ধধর্ম হিন্দুভাব ছাড়া বাঁচিতে পারে না। অতএব উপলব্ধি করুন, উভয়ের বিচ্ছেদ প্রমাণ করিয়াছে যে, বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক ও দর্শন ছাড়া দাঁড়াইতে পারে না; আবার ব্রাহ্মণ্যধর্মে অভাব বুদ্ধের মত হৃদয়। বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই বিচ্ছেদই ভারতের অধঃপতনের কারণ। এই জন্যই ভারতে ত্রিশকোটি ভিক্ষুক; এই জন্যই ভারতবাসী সহস্রবৎসর বিজেতাদের ক্রীতদাস। অতএব আসুন—ব্রাহ্মণের অপূর্ব মেধার সহিত বুদ্ধের মহান্ হৃদয়—অদ্ভুত মানবিকতা আমরা সংযুক্ত করিয়া দিই।"

"এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর, জগতের ধন মান ঐশ্বর্য—এ সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাঁহারাই যথার্থ জীবিত, যাঁহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করেন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

দোষ কারো নয়"

স্বামী বিবেকানন্দ

[মূল ইংরেজী কবিতাটি "No one is to blame" শিরোনামে 'Prabuddha Bharat' (March, 1955) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত; অনুবাদক—স্বামী জীবানন্দ। স্বামীজী কবিতাটি নিউইয়র্কে বসিয়া লেখেন; তারিখ—১৬ই মে, ১৮৯৫; সম্ভবতঃ ভগবান বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কোন বন্ধুকে তিনি ইহা উপহার দিয়াছিলেন।]

দিনমণি ডুবে অস্তাচলে,
    রেখে যায় রক্তরাঙা কর,
আলোকিতে ক্ষীণ দিনমানে
    এই যেন শেষ অবসর!
রাখি আঁখি দেখি সচকিতে
    বিজয়ের বাঁশি পিছে রয়,
জয়ে গণি হীন লাজ ব'লে
    আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়।

জীবনেরে গড়ি দিন দিন
    কিংবা উহা ক'রে চলি ক্ষয়,
যথাকর্ম সেইরূপ ফল—
    শুভে শুভ মন্দে মন্দ হয়।
স্রোত যদি একবার ধায়
    রোধ কিংবা নিয়ন্ত্রণ তার
সাধ্য নহে কভু আর কারো
    আমা ছাড়া দোষ তবে কার?

আমি হই রূপধারী সেই
    ছিল যাহা অতীত আমার,
সৃষ্টিবীজ সুপ্ত সেখানেই
    বিকশিতে ভুবনে আবার।
ইচ্ছা, চিন্তা—সে অতীত ধরি
    মনোমাঝে সদা ব্যক্ত হয়,
বাহিরের আকৃতিও তাই
    আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়।

প্রেমরূপে ফিরে আসে প্রেম
    ঘৃণা আনে ঘৃণা তীব্রতর,
পরিমাপ নিজে তারা করে
    রেখে যায় ছাপ মোর 'পর।
জীবনের শেষে মরণেও
    তাহাদের দাবি জমা রয়,
এই ভোগ—দায় আমারি তো
    আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়।

ত্যজিলাম মিছে ভয়রাশি
    বৃথা যত পরিতাপ আর
বুঝিয়াছি গূঢ় অনুভবে
    স্বকর্মের কিবা অধিকার।
হর্ষ-ব্যথা অপমান-যশ —
    মোর কর্মে জাত প্রেতচয়,
ইহাদের সম্মুখে দাঁড়ানু
    আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়।

ভালমন্দ প্রেম আর ঘৃণা
    সুখ তথা দুঃখ যাহা বলি
একে ছাড়ি অন্য নাহি থাকে
    যুগ্মভাবে বাঁধা তো সকলি।
দুঃখ ছাড়া সুখস্বপ্ন দেখি
    ভ্রান্তি শুধু! সত্য নাহি হয়,
আসিল না, আসিবে না কভু
    আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়।

অতএব ত্যজিলাম ঘৃণা
ত্যজিলাম তুচ্ছ ভালবাসা,
দূর করি দ্বন্দ্বের সংঘাত
মিটিয়াছে জীবনের তৃষা।
চিরমৃত্যু—ইহাই তো চাই
—নির্বাণ এ জীবন-শিখার,
—ঘুচে-যাওয়া কর্মের আশ্রয়
রহিবে না দোষী কেহ আর।

একমাত্র নববর, এক সেই প্রভু
একমাত্র সিদ্ধ আত্মা যিনি
কুহেলী-সন্দেহ ঘেরা যত পথ ছিল
ঘৃণাভরে ত্যজিলেন তিনি,
অসীম সাহসভরে করিয়া মনন,
অসঙ্কোচে উদ্দেশ্য দেখান,—
"মৃত্যু মহা-অভিশাপ, জীবনও তাহাই
শ্রেষ্ঠ বস্তু জানিও নির্বাণ।"

ওঁ নমো ভগবতে সম্বুদ্ধায়
ওঁ নতি মোর ভগবান বুদ্ধ যিনি তাঁয়।

যুগপুরুষ বিবেকানন্দ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌স্‌ জীবনের নানা সমস্যা সম্পর্কে নূতন নূতন আলোকপাত করেছেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বর্তমান যুগের অন্যতম মনীষী হোয়াইট্‌হেড (Whitehead) বলেছেন: that adorable genius এ মন্তব্য খুবই লাগসই হয়েছে। সমাজ উন্নয়নের ব্যাপারে জেম্‌স্‌ এর অভিমত হচ্ছে: The community stagnates without the impulse of the individual. সমাজের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য আনবার জন্যে ব্যক্তির প্রেরণার প্রয়োজন আছে। মশালের শিখার সংস্পর্শে না এলে কাঠের স্তূপ কিছুতেই জ্বলবে না—তা সে যতই শুকনো হোক্‌। বঙ্কিমচন্দ্র যদি আমাদের কানে 'বন্দে মাতরম্‌' মন্ত্র না দিতেন কতদিনে আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা আসত—কে জানে? নিরস্ত্র নিপীড়িত জাতির হাতে সত্যাগ্রহের অনুপম অস্ত্র দিলেন গান্ধী। নইলে কত দিন লাগত সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলকে চূর্ণ করতে! যুগধর্মের আহ্বানে আমরা যাতে সাড়া দিতে পারি—আমাদের মধ্যে সেই প্রেরণা জাগানোর জন্যে বিবেকানন্দকেও জাতির প্রয়োজন ছিল। প্রত্যেক যুগেরই একটি বিশেষ ধর্ম আছে। আমরা যে যুগে জন্মেছি সে যুগের ধর্ম হচ্ছে যারা সর্বহারা, যারা সকলের পিছে সকলের নীচে, তাদের নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করা। বঙ্কিম যেমন জাতির কর্ণে ঘোষণা করলেন 'বন্দে মাতরম্‌' মহামন্ত্র, বিবেকানন্দ তেমনি ঘোষণা করলেন মহামন্ত্র 'দরিদ্র-নারায়ণ'। এই যুগান্তকারী মন্ত্রের আলোয় দিশাহারা ভারতবর্ষ তার গতিপথের সন্ধান পেল। শিক্ষিত ভারতবর্ষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল: ভগবান বহুরূপে সম্মুখেই রয়েছেন। তাঁকে খুঁজবার জন্যে রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে আসন পাতবার কোনই প্রয়োজন নেই, হিমালয় পাহাড়ের গুহায় যাবারও কোন দরকার নেই। যারা দরিদ্র, যারা মূর্খ, যারা ধূল্যবলুণ্ঠিত তাদের ভালবাসলেই ঈশ্বরের যথার্থ সেবা করা হবে। ভারতবর্ষ ঘুমিয়ে ছিল। কতকগুলো অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানকে

সে ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিল। ধর্মসম্পর্কে যে ধারণা আমাদের মগজের মধ্যে শিকড় গেড়েছিল তাকে বিবেকানন্দ দিলেন নিষ্ঠুর আঘাত। সেই আঘাতের বেদনায় আমাদের মধ্যে এল চেতনা। নূতনতর চৈতন্যের আলোয় আমরা চিনলাম ধর্মের স্বরূপকে। *ঈশ্বর মানুষের মধ্যে। মানুষকে সম্মান* দিলে তবেই ঈশ্বর প্রসন্ন হন। মহাপ্রভু ঠিকই বলেছিলেন: অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' জীবের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। মানুষকে সম্মান দিতে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। বিবেকানন্দের অগ্নিবচনের কশাঘাতে আমাদের সংবিৎ ফিরে এল। মনীষী রোমা রোলাঁ বিবেকানন্দের জীবনীতে ঠিকই লিখেছেন:

But the Master's rough scourge made her turn for the first time in her sleep, and for the first time the heroic trumpet sounded in the midst of her dream the forward of march India, conscious of her God.

ঘুমের মধ্যে ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের কণ্ঠে সেই *প্রথম শুনল যুগান্তকারী তূর্যধ্বনি 'চরৈবেতি';* চলো, সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে চলো। তার পর থেকে ভারতবর্ষ আর ঘুমায় নি। বিবেকানন্দের তিরোধানের পরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে গণবিপ্লবের গরিমাময় প্রকাশ আমরা দেখেছি—তার মূলে বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠের তূর্যধ্বনি 'চরৈবেতি'। গান্ধীর পরিকল্পিত স্বরাজে রাজমুকুট দরিদ্র কিষাণের, দরিদ্র মজদুরের মাথায়।

গান্ধীর অহিংস গণআন্দোলনের মধ্যে আত্মিক শক্তিরই মহিমময় প্রকাশ। সত্যের জন্যে চরম দুঃখকে বরণ করার শক্তি তখনই আসে যখন মানুষ আপনাকে জানে রক্তমাংসের দেহ বলে নয়, অপরাজেয় আত্মা বলে। আত্মার লাগে না—সে যে আলোর শিখা। রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখ দিয়ে বলেছেন: 'আসল মানুষটি যে, তার লাগেনা, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে।' কর্মবিমুখ নির্বীর্য জাতিকে সাহসে এবং শক্তিতে অপরাজেয় করে তুলবার জন্যে *স্বামীজী তাই বেদান্তের আশ্রয় নিলেন। বেদান্তের* মধ্যে আত্মার বাণী। স্বামি-শিষ্যসংবাদে স্বামীজীর সেই অবিস্মরণীয় কথাগুলি আজও আমাদের কানে বাজছে:

'ভিতরে আত্মা সর্বদা জ্বল্‌জ্বল্ করছে—সেদিকে না চেয়ে হাড়মাসের কিম্ভূতকিমাকার খাঁচা, এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে 'আমি' 'আমি' করছে। ঐটেই হচ্ছে সকল প্রকার দুর্বলতার গোড়া।'

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন জাতিকে সমস্ত প্রকারের ভীরুতা এবং দুর্বলতা থেকে মুক্ত করতে। দেহাত্মবুদ্ধিই সমস্ত ভীরুতার মূলে। তাই তো আত্মার উপরে এতখানি জোর। গান্ধীও চাইলেন জাতিকে ভীরুতা থেকে মুক্ত করতে। অত্যাচারের কাছে বশ্যতা স্বীকারের মূলে তো ভয়। নিরস্ত্র জনসাধারণ তখনই ভয়কে বর্জন ক'রে গণবিপ্লবের পথে আগিয়ে *আসবে যখন তারা জানবে: আলোর শিখায়* তারা, শুধু রক্তমাংসের পিণ্ড নয়। বিবেকানন্দের পথকে অনুসরণ করেছেন গান্ধী। জাতিকে বন্ধনমুক্ত করবার জন্যে গান্ধী আত্মার শক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বেদান্তের মাধ্যমে আত্মার বীজমন্ত্র স্বামীজী দিলেন। একটা বিরাট জাতির রাজনৈতিক সংগ্রামে সেই বীজমন্ত্রকে বাঁধন ছেঁড়ার অস্ত্রহিসাবে ব্যবহার করলেন গান্ধীজী।

গান্ধী আর বিবেকানন্দ—দু'জনের কণ্ঠেই সংগ্রামগান। বিবেকানন্দ Struggle-এর কথা বারে বারে বলেছেন। 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার।' বলেছেন:

'যেখানে Struggle, যেখানে Rebellion সেখানেই জীবনের চিহ্ন, সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ।'

পত্রাবলীতে আছে :

'বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব, এখানে মেয়েমানুষের মত বসে থাকা কি আমার কাজ ?'

তাঁর নিজের জীবনও কি একটা প্রকাণ্ড সংগ্রাম ছিল না ? রঁলা (Romain Rolland) তাঁর সম্পর্কে ঠিকই লিখেছেন : Battle and life for him were synonimous. শান্তি তো তিনিই চান নি ; তিনি চেয়েছিলেন জীবন—মুক্ত, দীপ্ত, মহাজীবন যার মধ্যে সমগ্র সত্যের স্বীকৃতি। বর্তমান এবং অতীত, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, কল্পনা এবং কর্ম—এদের কাকে তিনি গ্রহণ এবং কাকেই বা তিনি বর্জন করবেন ? সত্যের এই পরস্পর-বিরোধী বিভিন্নমুখী দিকগুলিকে নিজের জীবনে মেলাবার জন্যে ভিতরে ভিতরে কী দারুণ সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়েছে। ঠাকুরের মৃত্যুর পর স্বামীজী মাত্র ষোলো বৎসর বেঁচেছিলেন ; পৃথিবী থেকে যখন তিনি ছুটি নিলেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নি। বিবেকানন্দের জীবনের এই সমর-ভরা, আগুনভরা ষোলটি বৎসরকে রলাঁ বলেছেন : Years of conflagration.

হাঁ, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতোই তিনি মরেছিলেন আর শত বাধাবিঘ্নের সঙ্গে অকুতোভয়ে লড়াই করতে করতে বীরের মতো মরবার জন্যেই দেশবাসীকে তিনি ডাক দিয়েছিলেন। যাতে আমরা জীবনকে একটা অন্তহীন সংগ্রাম ব'লে গ্রহণ করতে পারি এবং সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য দুঃখের পথকে সানন্দে বরণ করি, সেই জন্যেই তিনি আমাদের সামনে রেখেছিলেন গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় আদর্শ।

"বৃন্দাবন লীলাফীলা এখন রেখে দে। গীতা-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।"

অন্তরের এবং বাহিরের বাধাবিঘ্নের কাছে পরাজয় স্বীকার করা মানেই আমার চরম মৃত্যুকে ডেকে আনা, জীবনকে অগৌরবের মধ্যে অবগুণ্ঠিত করে রাখা। স্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ জোরের সঙ্গে বাঁচুক, দেহে মনে সে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করুক, কারণ ইতিহাসে তার কাজ আজও ফুরোয় নি ; পৃথিবী তার বাণীর জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। কিন্তু নির্বীর্য, দুর্বল ভারতবর্ষের কথা কে শুনবে ? রলাঁ ঠিকই বলেছেন, গান্ধী সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের উপসংহারে :

We do not fight violence so much as weakness. Nothing is worth while unless it is strong, neither good nor evil Absolute evil is better than emasculated goodness.

স্বামীজীর কথার সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল : 'The stones and trees ne'er break the laws but stones and trees remain. সে-সাধুতার মূল্য কি যা শান্তির দোহাই দিয়ে অন্যায়কে নীরবে সহ্য করে ? যার মধ্যে বীর্যের আগুন নেই ? পাথর এবং গাছ মিথ্যা কথা বলে না, চুরি করে না—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা গাছ এবং পাথরই থেকে যায়। 'শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে, দাও সবে গৃহ-ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে'—কম দুঃখে বাঙালীকে রবীন্দ্রনাথ এই কথা শোনান নি। 'ভালোমানুষ নইরে মোরা. ভালোমানুষ নই ; গুণের মধ্যে ঐ, আমাদের গুণের মধ্যে ঐ'—'ফাল্গুনী'র এই গানে একই সুর।

স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল, ভারতবর্ষ কণ্ঠে বেদান্তের বাণী নিয়ে দিগ্বিজয়ের পথে বাহির হয়েছে, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী শ্রদ্ধায় উদ্ধত মাথা নত করেছে তার পদপ্রান্তে। পরানুকরণপ্রিয়তা সত্য সত্যই আত্মঘাতী। ভারতবর্ষ অন্য জাতির অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে আত্মহত্যা করবে—ইতিহাসে এর চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি আর কী হ'তে পারে ? তাই তো কণ্ঠে তাঁর শক্তিমন্ত্র। শক্তিমান সবল ভারতবর্ষই জগৎকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবে।

এই শক্তি যাতে ভারতবর্ষ অর্জন করতে পারে তার জন্যে স্বামীজী একদিকে শুনিয়েছেন বেদান্তের বাণী, শুনিয়েছেন দেহাত্মবুদ্ধির মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র, আর একদিকে শুনিয়েছেন গীতার কর্মবাদ। বলেছেন :

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। শরীরে মনে বল না থাকলে এই আত্মা লাভ করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হবে। তবে তো মনে বল হবে।'

ঠাকুরের সেই কথার প্রতিধ্বনি : "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" জনসাধারণের মনে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ তখনই সম্ভব যখন তাদের পুষ্টিকর আহার জুটবে, তার আগে নয়। ঠাকুরের সুরে সুর মিলিয়ে বিবেকানন্দ বললেন :

'ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই, পেট হচ্ছে সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না।'

অনেক দিন পরে গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় রামকৃষ্ণের এবং বিবেকানন্দের কথাটাই আবার নূতন ক'রে বললেন :

To a people famishing and idle the only acceptable form in which God can dare appear is work and promise of food as wages.

গান্ধী ক্ষুধার্ত ভারতবর্ষকে শোনালেন অন্নের কথা এবং একই সঙ্গে কর্মের কথা। কাজ না থাকলে মজুরি মিলবে কোথা থেকে আর অন্ন কিনতে হ'লে মজুরি তো চাই। বিবেকানন্দও অন্নের কথা বলে ক্ষান্ত থাকলেন না। দেশবাসীকে শেখাতে হবে অন্ন কি ক'রে সংগ্রহ করা যাবে এবং আরও শেখাতে হবে অন্ন সংগ্রহ করতে হ'লে নিজেরা কাজ করা চাই। স্বামীজীর সেই কথাগুলি এতকাল পরে আজও কত সত্য!

"একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্যে কি হাহাকার উঠছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি? কখনও নয়। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা—অন্নের সংস্থান কর। চাকুরী গুখুরী ক'রে নয়—নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানসহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার ক'রে।"

গান্ধীর বুনিয়াদীশিক্ষার মধ্যেও এই মাটি খোঁড়ার কথা। স্বামীজী কত আগে দেখেছিলেন, যে শিক্ষা ইংরেজ প্রবর্তিত করেছে তাতে বড়জোর কেরানীগিরি, ডেপুটিগিরি চলতে পারে, কিন্তু ঐ শিক্ষার দ্বারা জাতির অন্নের অভাব কখনোই পূর্ণ হবার নয়। তার জন্যে চাই নূতনতর শিক্ষাপদ্ধতি যার কেন্দ্রে থাকবে কায়িক শ্রম এবং যে শিক্ষা ছাত্রছাত্রীকে জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত জীবনের সকলক্ষেত্রে পাকা ক'রে তুলবে। বিবেকানন্দ যে শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন গান্ধী সেই শিক্ষারই স্বপ্ন দেখে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা দিলেন।

বিবেকানন্দ আমাদিগকে শোনালেন কর্মের মন্ত্র। বললেন, মাটি খুঁড়তে লেগে যা। ঠিক একই মন্ত্র শোনালেন রবীন্দ্রনাথ :

"রাখোরে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলা বালি,
কর্মযোগে এক হ'য়ে তাঁর সাথে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে'।" (গীতাঞ্জলি)

গান্ধী যখন নিরন্ন জাতির হাতে সত্যাগ্রহের অনুপম অস্ত্রের সঙ্গে চরকাকেও তুলে দিলেন তখন কর্মবিমুখ পেট-রোগা জাতিকে তিনি কর্মমন্ত্রেই দীক্ষা দিলেন। বিবেকানন্দের জীবনীর এক জায়গায় রোমা রঁল্যা লিখেছেন : অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী have grown, flowered and borne fruit under the double constellation of the Swan and the Eagle—a fact publicly acknowledged by Aurobindo and Gandhi পরমহংস এবং বিবেকানন্দের প্রেরণায় অরবিন্দের, রবীন্দ্রনাথের এবং গান্ধীর প্রতিভার উন্মেষ এবং বিকাশ। রলাঁর সঙ্গে আমরা কি এই ব্যাপারে এক মত নই?

বিবেকানন্দ সত্যই চিরনূতন। তিনি আমাদিগকে শুনিয়েছেন শক্তির কথা, মহাবীর্যের কথা। বঙ্কিমও কৃষ্ণচরিত্র লিখলেন শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে অবনত ভারতবর্ষকে। আনন্দমঠে সন্তানের বিষ্ণু শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় বিষ্ণু নন, তিনি সুদর্শনচক্রধারী শক্তিময় বিষ্ণু। বঙ্কিম নব্য ভারতের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন যাত্রাদলের শিখিপুচ্ছধারী কৃষ্ণকে নয়, কুরুক্ষেত্রের গীতাসিংহনাদকারী কৃষ্ণকে। খোলকরতালে বঙ্কিমের বিতৃষ্ণা। সত্যানন্দ আনন্দমঠে মহেন্দ্রকে নূতন ক'রে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন। খোলকরতালে বিবেকানন্দেরও অনুরূপ বিতৃষ্ণা: খোলকরতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্প ক'রে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। ভাবাবেগে উন্মত্ত জাতি রসচর্চায় ডুবে থাকবে; ত্যাগের পথে, বীর্যের পথে পা বাড়াবে না—এ জিনিস রবীন্দ্রনাথও চান নি।

"ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে ক'রে দাও সক্ষম স্বাধীন।" (নৈবেদ্য)

একটা বিপুল সত্য আমাদের আজ উপলব্ধি করবার প্রয়োজন আছে। কথাটা মার্কিন পণ্ডিত উইলিয়াম জেম্‌সের ভাষাতেই বলি:

Sporadic great men come everywhere but for a community to get vibrating through and through with intensely active life, many geniuses coming together and in rapid succession are required * * Blow must follow blow so fast that no cooling can occur in the intervals.

সব দেশেই কখনোসখনো মহাপুরুষ এসে থাকেন। কিন্তু একটা কর্মকীর্তিহীন নির্বীর্য জাতিকে কর্মসাগরে ঝাঁপ দেওয়াবার জন্যে দরকার হয় সেই জাতির মধ্যে একই সঙ্গে বহু প্রতিভার অভ্যুদয়। উত্তপ্ত লোহাকে ঠাণ্ডা হ'তে দিতে নেই। ঘায়ের পর উপর্যুপরি ঘা মারতে হয়। জাতকে গড়ে তুলবার বেলাতেও একই কথা। প্রতিভার পর প্রতিভার আবির্ভাব চাই দ্রুততালে। তবেই জাতির জড়তা কাটে, তার শিরায় শিরায় বৈদ্যুতিক প্রবাহের তরঙ্গ খেলে যায়। তার মধ্যে মহা উদ্যম প্রকাশ পায়।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভারতবর্ষ জাগছে, ভারতবর্ষ উঠছে, ভারতবর্ষ সত্য ও প্রেমের মন্ত্র নিয়ে দিগ্বিজয় করবে। এরই জন্যে তিনি এদেশে উপর্যুপরি প্রেরণ করলেন মহাপুরুষের পর মহাপুরুষ। সবাই এসে শোনালেন মানবাত্মার মহিমার কথা; শোনালেন মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাবীর্য, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুভ-বুদ্ধি সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশের কথা; শোনালেন পরানুকরণপ্রিয়তার মোহ পরিত্যাগ করে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির পথকে অকুতোভয়ে অনুসরণ করবার কথা। আমাদের যদি কান থাকে এঁদের কণ্ঠস্বর হৃদয়ের মধ্যে ঠিকই শুনতে পাব; যদি স্বচ্ছ বুদ্ধি থাকে এঁদের যুগান্তকারী বাণীর তাৎপর্য ঠিকই উপলব্ধি করবো; যদি দুর্জয় সংকল্প থাকে এঁদের প্রদর্শিত পথে মহাবীর্যের সঙ্গে ঠিকই এগিয়ে যাব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

ঈশোপনিষদ্

অনুবাদক—শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী, এম্-এ

(সন্ন্যাসীর কর্তব্য)

চরাচর মাঝে ক্ষণিক যা কিছু
ঢাকো সব ঈশ-আচ্ছাদনে,
ত্যাগেতে মুক্ত করিও আত্মা
লোভ করিও না কাহারও ধনে। ১।

(গৃহীর কর্তব্য)

যদি কেহ চাও বাঁচিতে ধরায়
সুখেতে শতেক বর্ষ ধরি',
কামনা তোমার করিও পূর্ণ
শাস্ত্রবিহিত কর্ম করি'।

শতায়ু-ইচ্ছু দেহাভিমানিন্,
অন্য ধর্ম তোমার তরে,
নাহিক কিছুই যাহা না তোমায়
অশুভ কর্মে লিপ্ত করে। ২।

(আত্মজ্ঞানহীনের গতি)

অন্ধ-আঁধারে আবৃত যে লোক—
অসুরদিগের বাসস্থান,
আত্মহন্তা মানব যাঁহারা
মৃত্যুর পরে সেখানে যান। ৩।

(আত্মার স্বরূপ)

আত্মা একক, অচল অথচ
মনের গতিও ছাড়ায়ে যান,
অগ্রগামী এ-আত্মতত্ত্বে
ইন্দ্রিয়গণ কভু না পান।
স্থির থাকিয়াও তিনি দ্রুতগামী
অতিক্রমণ করেন সবে,
সত্তায় তাঁর বিশ্ববিধাতা
সকল কর্ম করান ভবে। ৪।
স্বতঃ গতিহীন হয়েও চলেন
অচল তবুও চলন আছে,
অবিদ্বানের অতিদূরে তিনি
আত্মস্বরূপ জ্ঞানীর কাছে।
সারা জগতের অন্তরে তিনি
মহাকাশ সম অনুস্যূত,
সারা জগতের বাহিরেও তিনি
সর্বব্যাপী ও সূক্ষ্মভূত। ৫।

(আত্মজ্ঞানীর লক্ষণ)

আত্মার মাঝে সকল বস্তু,
সবেতে আত্মা যে জন হেরে
সেই দর্শন-বলেতে সে জন
কাহাকেও ঘৃণা করিতে নারে। ৬।

সকল বস্তু যে কালে জ্ঞানীর
আত্মাতে এক হইয়া যায়,
ঐক্যদর্শী সে লোক তখন
শোক তাপ-মোহ কভু না পায়। ৭।

(আত্মার স্বরূপ)

অকায়, অব্রণ, শিরাহীন তিনি
অপাপবিদ্ধ, জ্যোতির্ময়,
শুদ্ধ, মনীষী, স্বয়ম্ভু, কবি,
সর্বোত্তম, সর্বময়।
কল্পায়ুজীবী, প্রজাপতিদের—
—সংবৎসর-অধিপ—যাঁরা,
বিধান করেন যথাযথ তিনি
করণীয় যত কর্মধারা। ৮।

(কর্ম ও উপাসনা)

উপাসনাহীন কেবল কর্মী
প্রবেশ করেন অন্ধতমে,
কর্মবিহীন, দেব-উপাসক
তার চেয়ে গাঢ় আঁধারে ভ্রমে।
উপাসনা আর কর্মের কথা
ব্যাখ্যা করিয়া ধীমান্‌গণ,
'উভয়ের ফল ভিন্ন ভিন্ন'—
শুনিয়াছি তাঁরা এ-কথা কন। ১০।
উপাসনা আর কর্মকে যিনি
একই সঙ্গে করিয়া যান,
কর্ম-সহায়ে লঙ্ঘি' মৃত্যু
উপাসনাফলে অমৃত পান। ১১।

(প্রকৃতি ও ব্রহ্মের সমন্বয়)

শুধু কারণের উপাসকদল
নিবিড় আঁধারে প্রবেশ করে,
শুধু কার্যের পূজক আবার
তার চেয়ে গাঢ় আঁধারে চরে। ১২।

কারণ-ব্রহ্ম কার্য-ব্রহ্ম
ব্যাখ্যা করিয়া ধীমান্‌গণ,
'উপাসনা ফল দুয়েরই ভিন্ন'—
শুনিয়াছি তাঁরা এ-কথা কন। ১৩।
কারণ-ব্রহ্মে কার্য-ব্রহ্মে
একই সঙ্গে পূজেন যিনি,
কার্য-সহায়ে লঙ্ঘি' মৃত্যু
কারণপ্রসাদে অমর তিনি। ১৪।

(মার্গ-প্রার্থনা)

সোনার পাত্রে রেখেছে ঢাকিয়া,
সত্যের মুখ গোপন করে
পূষন্‌, সে পথ করো হে মুক্ত
সত্যস্বরূপ দেখাও মোরে। ১৫।
পূষন্‌, সূর্য, একাকী সাক্ষী
প্রজাপতিসুত, হৃদয়যামী
রশ্মিসমূহ সংহৃত কর
কল্যাণরূপ দেখিব স্বামী।
তোমার মাঝারে ঐযে পুরুষ
সেই ত স্বরূপ, সেই ত আমি। ১৬।
এখন আমার প্রাণবায়ু যাক,
মহাবায়ু সাথে বিলীন হয়ে,
এ-দেহ আমার অগ্নিতে পড়ি'
ভস্মের মাঝে যাক তো ক্ষয়ে।
ওংকাররূপী মানস অগ্নি,
স্মরণীয় সব আমার স্মর,
যাহা কিছু আমি করেছি জীবনে
তাহাও তুমি হে স্মরণ কর। ১৭।
তুমি হে অগ্নি, ফলভোগ লাগি
সুপথে মোদের বহিয়া আনো।
সর্বপ্রাণীর কর্ম ও জ্ঞান
হে দেব, তুমিই সকল জানো।
দূর করি' পাপ কুটিল যতেক
নিষ্পাপ কর মোদের তুমি,
প্রণাম তোমায় বারবার করি,
মনে মনে তব চরণ চুমি। ১৮।

(শান্তিপাঠ)

ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম যা-কিছু
ব্রহ্মের দ্বারা পূর্ণ হয়,
ইন্দ্রিয় মাঝে যা-কিছু গোচর
তাহাও ব্রহ্মে পূর্ণ রয়।
পূর্ণ হইতে ব্যক্ত পূর্ণ
ব্রহ্ম ব্যক্ত জগৎ-বেশে,
পূর্ণতা হতে পূর্ণটি নিলে
পূর্ণই পড়ে থাকেন শেষে।

ব্রহ্মানন্দ-শিবানন্দপ্রসঙ্গ

শ্রীকালীসদয় পশ্চিমা

ইংরেজী ১৯২১ সালের ফেব্রুআরি মাস হইতে আমি পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত পত্রব্যবহার আরম্ভ করি। ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুআরি তারিখে বাগবাজার ৫৭, রমাকান্ত বসু ষ্ট্রীট (বলরাম মন্দির) হইতে তিনি আমাকে যে পত্রখানি লিখেন তাহাতে স্পষ্ট নিষেধ নাই—মনে করিয়া ফেব্রুআরি মাস শেষ হইবার পূর্বেই বেলুড় মঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণেশ্বরের রাস্তায় কুটিঘাটের খেয়ায় গঙ্গা পার হইয়া যখন মঠে পৌঁছিলাম, তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। জনৈক সাধু আমাকে অতিথিশালায় পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর (স্বামী শিবানন্দ) সকাশে পাঠাইলেন। মহাপুরুষজী কামরার ভিতরে গভীর মনোযোগ সহকারে পত্র লিখিতেছিলেন, অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা প্রবেশ

করিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন—কি চাই? বিনীতভাবে বলিলাম,—আমি মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) চিঠি পেয়ে এসেছি।

—মহারাজ পত্র দিয়েছেন, তাঁর কাছে যাও। এখানে কি? আমি ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। মনে মনে ভাবিলাম, তাই ত, বলরাম-মন্দিরেই আমার প্রথমে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে, আর তৎক্ষণাৎ বলরাম-মন্দিরে ছুটিয়া যাইবার উপায়ও নাই। অপরাধীর ন্যায় আস্তে আস্তে কহিলাম,—কিন্তু এখন যে দুপুর বেলা।

—ও, প্রসাদ পেতে চাও? বেশ ত, ভাণ্ডারীর কাছে যাও।

পূর্বোক্ত সাধুটি অদূরে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। তিনি আমাকে চলিয়া আসিতে ইঙ্গিত করাতে আমি বাহির হইয়া আসিলাম। শুধু দুপুরে নয়, রাত্রিতেও মঠে অবস্থান করিয়া দু'বেলা প্রসাদ পাইলাম।

পরদিন সকালবেলা আমাকে বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে জনৈক সন্ন্যাসী একটি চলতি নৌকা ডাকিয়া মঠের ঘাটে ভিড়াইলেন। কিন্তু কলিকাতায় আমার এই প্রথম আগমন, পথঘাট কিছুই জানা নাই, একাকী কেমন করিয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত হইব—মনে মনে এরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক সেবক-সঙ্গে ঘাটে আসিয়া সেই নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। পূর্বরাত্রিতে তাঁহার অনুমতি না লইয়াই মঠে অবস্থান করিয়াছি—উহাতে অবশ্যই অপরাধ হইয়াছে, এবং তিনিই বা কি মনে করিতেছেন—ভাবিয়া মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলাম। তাঁহার সম্মুখে যাইতেই যেন সঙ্কোচবোধ হইল। কিন্তু বাগবাজারে ত আমাকে যাইতেই হইবে। সুতরাং নিরুপায়ভাবে নৌকায় উঠিলাম এবং নিজেকে লুকাইবার উদ্দেশ্যে অপরিচিতের ন্যায় মঠের দিকে মুখ ফিরাইয়া এক কোণে বসিয়া রহিলাম। কিন্তু যেখানে ভয়, সেখানেই বিপদ। মহাপুরুষজী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া এবং ঠিক আমাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন—তোমার বাড়ী না সিলেট? তুমি রাত্রিতে মঠে ছিলে?

—হাঁ মহারাজ।

—মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চলেছ? তা হ'তে পারে না। তাঁর শরীর অসুস্থ—জ্বর। তোমার সঙ্গে মহারাজের দেখা হ'তে পারে না; বুঝেছ?

আমি নীরব থাকিয়া মনে মনে ভাবিলাম কি আর করব। দীক্ষাদির আকাঙ্ক্ষা করে কি আর হবে। সামনে মঠ দেখছি, আর গঙ্গার উপরে একই নৌকায় মহাপুরুষজীর সান্নিধ্যে বসে রয়েছি; এতেই সব হ'য়ে গেছে। এর বেশী আমার ভাগ্যে নেই। জয় ঠাকুর!

উপরিলিখিত কথাগুলি একবার মাত্র বলিয়াই মহাপুরুষজী ক্ষান্ত রহিলেন না। কমপক্ষে পাঁচ ছয় বার আমাকে বলিলেন,—বুঝেছ, মহারাজের সঙ্গে তোমার দেখা হতে পারে না।

যথা সময়ে নৌকা কুমারটুলীর ঘাটে পৌঁছিলে, মহাপুরুষজীর সেবক ব্যাগটি আমার হাতে দিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন, আর আমি মহাপুরুষজীর অনুসরণ করিলাম। তিনি হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন এবং এক এক বার পশ্চাৎ ফিরিয়া, আমার দিকে তাকাইয়া সেই একই কথা খুব জোরের সহিত বলিতেছেন। পথিমধ্যে একবার শুধু জনৈক ভক্তের বাড়ীতে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং একটি কালীবাড়ীতে বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। তদ্ভিন্ন আর কোথাও না থামিয়া সোজা বলরাম-মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নিষেধাত্মক বাক্য কানে বর্ষিত হইলেও এমন পথপ্রদর্শক পাইয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম বিধি হয়ত বাম নহেন। দোতলায় উঠিয়া মহাপুরুষজী আমার হাত হইতে ব্যাগটি লইলেন, এবং মহারাজের প্রকোষ্ঠে

প্রবেশপূর্বক আমাকে কোন কিছু না বলিয়াই দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

জুতা, ছাতা ও বিছানাপত্র এক কোণে রাখিয়া নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণভাবে পাশের হলঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। তথায় কয়েকজনকে দেখিয়া মনে হইল তাঁহারাও যেন কাহার আগমনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই বুঝিতে বাকী রহিল না, ইঁহারা মহারাজের দর্শনাকাঙ্ক্ষী এবং অবিলম্বে মহারাজ তথায় দর্শন দিবেন। আমার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। দরজার কাছে একটুখানি সুবিধাজনক স্থান বাছিয়া লইতে না লইতেই দেখি বারান্দার উপর দিয়া তেজঃপুঞ্জ-কলেবর স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ—নেত্রযুগল কখনও অর্ধনিমীলিত, কখনও বা প্রসারিত করিয়া—ভাবাবেশে ধীর মন্থর গতিতে হলঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমার নিকটে আসিতেই আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। এই আমার প্রথম দর্শন। তিনি কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিলেন,—যাও বাবা! মহাপুরুষের কাছে যাও, আমার শরীর অসুস্থ।

আমি ত শুনিয়াই অবাক্। তবে কি ইতিমধ্যেই আমার সম্পর্কে উভয়ের কথাবার্তা হইয়াছে! ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমি মহারাজের ঘরের দিকে যাইয়া দেখিলাম প্রবেশপথে মহাপুরুষজী একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট। অতি সহজে তাঁহাকে পাইয়া মহা আনন্দে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন,—এই যে, তোমায় আবার দেখছি এখানে।

—মহারাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—মহারাজ পাঠিয়েছেন? কেন? তোমার কি চাই?

—দীক্ষা চাই।

—দীক্ষা চাই! সে আবার কি? তোমার নাম জানি না, ধাম জানি না, কিছুই জানি না,—দীক্ষা কি করে হয়! একি বাজারের মাছ পান বিক্রি, যে পয়সা ফেলে দিলে, আর নিয়ে গেলে।

আমি তখন তাঁহাকে আমার নাম-ধাম বলিলাম, মিউনিসিপ্যাল আফিসে চাকুরি দ্বারা জীবিকার্জনের এবং করিমগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাসমিতির সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা যথাসম্ভব বিবৃত করিলাম। ঐ সমস্ত শুনিয়া তিনি কহিলেন,—ঐ যা করছ—ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ—তৃষ্ণার্তকে জলদান, ক্ষুধার্তকে অন্নদান—ঐ আমাদের দীক্ষা। ক্রীং ক্রৌং, ঐ সব ভট্‌চাযদের কাছে, আমাদের কাছে নয়।

দীক্ষা সম্পর্কে আমি কিছু কিছু শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলাম। আমার ঐ বুদ্ধিতে আঘাত করা হইতেছে ভাবিয়া নীরব রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি কহিলেন,—তুমি দীক্ষা চাও? আমি তোমায়…এই মন্ত্র দেব। তুমি নেবে?

হাত জোড় করিয়া উত্তর করিলাম,—হাঁ মহারাজ! তাই নেব।

তখন নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন,—শুধু ঐটি দেবো, আর কিছুই দেবো না। তুমি নেবে?

আমি পূর্ববৎ উত্তর করিলাম—হাঁ মহারাজ! তাই নেব।

তখন কহিলেন,—তবে দীক্ষা কি, আমায় বল।

আমি মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। এই সংকট মুহূর্তে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) তথায় আসিয়া উপস্থিত। আমার মুখের ভাব দেখিয়াই সম্ভবতঃ বুঝিলেন যে আমি বিপন্ন, তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ! ও কি চায়?

মহাপুরুষজী কহিলেন,—দীক্ষা চায়।

তখন কৃষ্ণলাল মহারাজ সানুনয়ে বলিলেন,—দিন্ না মহারাজ, দিন্।

মহাপুরুষজী উত্তর করিলেন,—হাঁ, তাই দিতে বসে আছি আর কি!

কৃষ্ণলাল মহারাজ এর পর চলিয়া গেলেন; কিংকর্তব্যবিমূঢ়বৎ আমি মেজের উপর বসিয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে সৌম্যদর্শন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ধীরপাদবিক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া শয্যার উপর স্থিরাসনে উপবেশন করিলেন। তখন মহাপুরুষজী আমাকে দেখাইয়া বলিলেন,—মহারাজ, ও ত দীক্ষা চায়। একথা শুনিয়া মহারাজ যেন একটু শ্লেষভরে এবং বেশ জোরে জোরে কহিতে লাগিলেন,—এই ত নাম জাহির করতে এসেছে: রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি। আমি ভিতরে ভিতরে যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি আমার দিকে বিস্ফারিতনেত্রে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন,—বাবা! তোমাদের পূর্ববঙ্গের লোক—সব আমার জানা আছে, দীক্ষার সময়ে খুবই আগ্রহ দেখায়, শেষে আর কিছু করতে চায় না; তাদের দল বাড়াতে এসেছ?

প্রতিবাদের সুরে আমি উত্তর করিলাম,—না মহারাজ! ওদের দল কেন বাড়াব? বিপরীত দলই বাড়াব। তখন আবার একটু শান্তরূপ ধারণপূর্বক কহিলেন,—উপযুক্ত হলে আমরা ডেকে এনে দীক্ষা দিই। আমি বলিলাম,—আমি কি এমন উপযুক্ত হব মহারাজ, যে আমায় ডেকে এনে দীক্ষা দেবেন? উহাতে তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—বল্‌ছি হবে, বল্‌ছি হবে। তখন মহাপুরুষজী একবার আমার দিকে একবার মহারাজের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ! ওকে আশীর্বাদ করুন, ও করিমগঞ্জে ঠাকুর স্বামীজীর কাজ করছে, ওকে আশীর্বাদ করুন। মহারাজ অতিশয় শান্ত ও সমাহিতভাবে আশ্বাসভরে বলিলেন,—হাঁ হাঁ, আশীর্বাদ ত করাই রয়েছে। তখন মহাপুরুষজী আমাকে অভয় দিয়া বলিলেন,—এই ত তোমার দীক্ষা হয়ে গেল! আর formal (আনুষ্ঠানিক) তা হয়ে যাবে। ক্ষণকাল পরে মহারাজ করুণাপূর্ণ স্বরে আমাকে বলিতে লাগিলেন,—বাবা, সমস্ত বিশ্ব-জগৎ থেকে মনটাকে গুটিয়ে কূটের উপর নিয়ে রাখা, সে কি একটুখানি কথা, সে কি একটুখানি কথা!

বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। "কূটস্থমচলং ধ্রুবং" গীতার শ্লোকটি মনে পড়িল, কেবলি ভাবিতে লাগিলাম 'দীক্ষা' 'দীক্ষা' করিয়াছি, কিন্তু উহার আসল তাৎপর্য কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছি? ঐ চিন্তাধারায় আমি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া দেখিলাম ঘরে আমি একাকী বসিয়া রহিয়াছি, মহারাজ কিংবা মহাপুরুষ কেহই তথায় নাই।

ঘরের বাহিরে আসিয়া আমি বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ যাইতে না যাইতে শুনি, পাশের একটি কক্ষ হইতে মহাপুরুষজী আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, ওহে! শুনে যাও, মহারাজকে বল, তিনি যদি অনুমতি করেন তো আমি ঢাকায় গিয়ে তোমায় দীক্ষা দেব। অপর-দিকের বারান্দায় মহারাজ পায়চারি করিতেছিলেন; তাঁহাকে যাইয়া বলিতেই তিনি উত্তর দিলেন,—হাঁ হাঁ, অনুমতি ত করাই রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঐদিন রাত্রির ট্রেনে মহাপুরুষজী স্বামী অভেদানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া কিছুদিনের জন্য ঢাকা যাইতেছিলেন। মহারাজের উত্তর মহাপুরুষজীকে জানাইলে তিনি আমাকে সুবিধামত ঢাকায় যাইতে বলিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া আমি তাঁহার সঙ্গেই যাইতে চাহিলাম। উহাতে মহাপুরুষজী খুব হাসিতে হাসিতে কহিলেন, কি, আমায় পাকড়াও করে নিয়ে যাবে, আমায় পাকড়াও করে নিয়ে যাবে! এই সময়ে মহারাজ আমাকে ডাকিয়া কহিলেন,—ওহে, মহাপুরুষ তোমায় ঢাকায় নিয়ে গিয়ে দীক্ষা দেন, সে ইচ্ছা

আমার নয়। বুঝেছ? এ কথা মহাপুরুষজীকে নিবেদন করিতেই তিনি কহিলেন,—তবে আমি কি করতে পারি বল। দীক্ষার ব্যাপার ওখানেই আপাততঃ চাপা পড়িল। মহাপুরুষজীর সঙ্গে আমার আর ঢাকা যাওয়া হইল না।

মহারাজ আমাকে বারংবার খাওয়া-দাওয়ার জন্য তাগিদ দেওয়াতে মহাপুরুষজীর নির্দেশানুযায়ী আমি বেলুড় মঠে ফিরিয়া গেলাম। পরদিন ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ স্বয়ং আমাকে লইয়া গিয়া বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাসে কয়েক দিন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তথা হইতে বলরাম-মন্দিরে যাতায়াত খুব সহজ, সুতরাং নিত্য মহারাজের দর্শন ও সঙ্গ লাভের অতি উত্তম সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া গেল। আট দশ দিন আমি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে কাটাইলাম। কখনও শিশুর ন্যায় সরল চপল, আবার কখনও অতিশয় গুরুগম্ভীর, কত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছি। একদিন দক্ষিণ হস্তের তর্জনী উপরে তুলিয়া লীলায়িত ভঙ্গীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বলি কেমন আছ? আবার পরমুহূর্তেই দীক্ষা-সম্পর্কে আমার মনের ভিতরে যে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহা বুঝিয়া অতি কঠোর ভাব অবলম্বনপূর্বক কহিলেন,—আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। পরস্পরের মধ্যে আমরা সচরাচর যেমন করিয়া থাকি, তেমনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কি খেয়েছ?

আমার উত্তর শুনিয়া খুশী হইয়া বলিলেন—বাঃ, তবে ত বেশ খেয়েছ।

অপর একদিন থাকিয়া থাকিয়া তিনবার আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার সঙ্গে ত দেখা হয়ে গেছে—আর কেন, এখন ওকে চলে যেতে বল। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। আমার উত্তর শুনিয়া পরে চুপ করিয়া রহিলেন। আমার নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ সম্পর্কে একদিন পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন—তাতে কি হয়েছে, অত তাড়াতাড়ি কেন রে বাপ! বিদায়ের পূর্বরাত্রে এ বিষয় আমি আবার উত্থাপন করিলে উত্তর পাইলাম,—মহাপুরুষ ফিরে না এলে ত কিছু হবার নয়, বাবা। দিন কয়েক মাত্র মহারাজের সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাই আমাকে জীবনে অপূর্ব শিক্ষা ও প্রেরণা দিয়াছে।

আমার বেলুড় আসার মূল উদ্দেশ্য আপাততঃ সিদ্ধ না হইলেও মনে প্রভূত আনন্দ লইয়া কর্মস্থলে ফিরিলাম এবং পৌঁছানোর সংবাদ মহারাজকে পাঠাইলাম। তদুত্তরে তিনি তাঁহার স্নেহাশীর্বাদ আমাকে জানাইলেন। উহার কিছু কাল মধ্যেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

মহারাজের তিরোধানের পর স্বামী শিবানন্দের সহিত আমি পত্রব্যবহার আরম্ভ করি। ১৯২২ ইংরেজীর ১২ই মে তারিখের একখানি চিঠিতে তিনি লিখেন যে, যথার্থই মহারাজ আমায় কৃপা করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, মহারাজের অন্তর্ধানের ফলে তাঁহার তখন দীক্ষাদানাদি ব্যাপারে উদ্যম কিংবা উৎসাহ নাই, কিন্তু আমি যেন নিরুৎসাহ না হইয়া মহারাজের উপদেশানুযায়ী জীবনযাপন করি ইত্যাদি।

২১. ৬. ১৯২২ তারিখের পত্রে তিনি আমাকে লিখিলেন—"..... আমার দীক্ষাদান আর কিছুই নহে: কেবল সেই জগন্নাথ, জগৎপতি, কলিকলুষ-নাশক, যুগধর্মসংস্থাপক, যুগাচার্য, যুগগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি এখন পূর্বোক্তরূপে ঐ নাম ভক্তি-প্রীতির সহিত জপ করিবে।......"

১৩. ৭. ২২ তারিখের পত্রে তিনি আমায় জানাইলেন যে ৩রা আগস্ট একটি দীক্ষার দিন আছে, তবে ঐ দিনটিতে আমার সুবিধা হইবে কি না, এবং তিনিও মঠে থাকিবেন কি না নিশ্চয় বলিতে পারেন না। যাহা হউক, চিঠিপত্রে ও

তারযোগে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া নির্দিষ্ট দিনে আমি মঠে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গাতে অবগাহনপূর্বক মন্দিরে যাইয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, এবার যেন প্রত্যাখ্যাত না হই। কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ মহারাজের সেবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি কালীসদয় বাবু? আপনি মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চান? তবে আসুন।

তাঁহাকে অনুসরণপূর্বক মহাপুরুষ মহারাজের কক্ষে উপনীত হইলাম। মহাপুরুষজী একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই প্রহৃষ্টভাবে হাতমুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন,—তোমায় ত আমি খুব জানি, তোমায় ত আমি খুব চিনি, তোমায় ত আমি অনেক দেখেছি! তাঁহার এরূপ প্রফুল্লভাব দর্শনে আমি মহা আনন্দিত হইয়া বলিলাম, মহারাজ! গত ফেব্রুআরি মাসে বলরাম মন্দিরে মহারাজ ও আপনার সহিত আমার অনেক আলাপ হয়েছিল। একথা শুনিবামাত্র তিনি অত্যন্ত বিষাদগ্রস্তভাবে কহিলেন,—সে কথা কি আর বলতে! মহারাজ আজ স্থূল শরীরে নেই, আমরা সব কি আর বেঁচে আছি, এখন আর কথা বলব কার সঙ্গে।

আমার অবিমৃশ্যকারিতার জন্য মনে মনে অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া পুনরপি শান্তভাব ধারণকরত তিনি আমাকে আশ্বাসদানপূর্বক বলিলেন—এসেছ, বেশ হয়েছে, এখন মঠে থাক, দীক্ষা হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট দিনে দীক্ষা হইয়া গেল। বিদায় লইবার কালে বলিয়া দিলেন যেন চিঠিপত্র লিখি। তদবধি নিয়মিতভাবে আমি তাঁহাকে পত্র লিখিতাম, তিনিও উত্তর দিতেন।

১২. ৮. ২৬ তারিখের একখানি পত্রে তিনি লিখেন—"তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। সংসারে থাকিয়া সহস্র সম্পদের ভিতরে যে মনে করে আমি বেশ আনন্দে ও শান্তিতে আছি সে বড় ভ্রান্ত। ক্ষণিকের জন্য হয়ত কেহ ওরূপ মনে করিতে পারে, কিংবা একেবারে যার দূরদৃষ্টি নাই সেও হয়ত ওরূপ মনে করিতে পারে; কিন্তু ভগবৎকৃপায় বা বহুজন্মের সুকৃতির ফলে যার উপর গুরুকৃপা হইয়াছে, সে কখনই যে কোন অবস্থাতেই হউক সংসারকে সুখময়, শান্তিময় স্থান মনে করিতে পারে না এবং সেজন্য সে সততই মোহের পারে ভগবৎনিকেতনে আশ্রয় লইতে চেষ্টা করে। তোমার পত্রগুলি যখনই আমি পাই ও পড়ি, আমার খুব আনন্দ হয়—কারণ তোমার মন সংসারে কখনও শান্তিসুখ অনুভব করে না,—ইহাই মুমুক্ষুর লক্ষণ। · ···"

মহাপুরুষ মহারাজের মহাসমাধির পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরেই আমি মঠে দু'একবার যাতায়াত করিতাম, এবং তথায় অবস্থানকালে সাধু মহারাজদিগের সহিত যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার চেষ্টা করিতাম। কখনও কখনও দু' তিন মাস একটানা থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছে,—যদিও শেষের দিকে, কি জানি কেন, মহাপুরুষজী আমার দীর্ঘকাল মঠে থাকা অনুমোদন করিতেন না, করিমগঞ্জে ফিরিয়া যাইবার জন্য কেবলি তাড়া দিতেন। আমার সহিত তাঁহার সদয় ব্যবহারের অনেক মধুময় স্মৃতি চিত্তভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। সামান্য দু' একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, যদ্দারা পাঠকবর্গ মহাপুরুষজীর দিব্যজীবনের গম্ভীরতা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

একদা আমি মঠে পৌঁছিয়া সঙ্গের টাকাকড়ি আফিসঘরে জমা রাখিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। ঐ দিন সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে জপধ্যান সারিয়া যখন নীচে নামিয়া আসিতেছি তখন (আগেকার দিনে চা-পানের স্থানরূপে ব্যবহৃত) পুরাতন মঠের ভিতর দিকের বারান্দায় হেলান-দেওয়া বেঞ্চের উপর মহাপুরুষ মহারাজ ক্ষীণ

আলোকে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়াই চলিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে বেশ চিনিতে পারিয়া ডাকিয়া কহিলেন,—কালীসদয়, তোমার সঙ্গে যা টাকা পয়সা আছে, আফিসে রেখে দিও। আমি বলিলাম,—হাঁ মহারাজ! রেখে দিয়েছি। উত্তর শুনিয়া তিনি কহিলেন, রেখে দিয়েছ! তবে ত তুমি ভারী চালাক! আরও বলিলেন, আমি যখন তোমার চিঠি পাই ও পড়ি, আমার খুব আনন্দ হয়, বুঝেছ? কিন্তু আমি ত তোমায় সব দিয়ে দিতে পারি না। Religion must come from within (ধর্ম-ভাব ভেতর থেকে আসবে) এ ত বাজারের মাছ পান নয় যে পয়সা ফেলে দিলে, আর কিনে নিয়ে গেলে। স্বামীজীর বই পড় নাই? তাতে লেখা রয়েছে—Religion must come from within, and not from without. বুঝেছ? আমি মাথা নাড়িলাম। তিনি আবার বলিলেন, স্বামীজীর বই পড় নাই? তাতে লেখা রয়েছে—Religion must come from within, and not from without.—পড় নাই? আমি উত্তর দিলাম—হাঁ মহারাজ, পড়েছি। কিন্তু তিনি আমার কথায় যেন একেবারেই কর্ণপাত না করিয়া ভাবের ঘোরে হেলান ছাড়িয়া আমার দিকে ঝুঁকিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন,—পড় নাই? পড় নাই?

তখন স্বামীজীর 'মদীয় আচার্যদেব' অবলম্বনে উত্তর দিলাম,—মহারাজ! আপনি যা বলেছেন তা অবশ্যই পড়েছি, আবার এও পড়েছি, 'that a great soul can transmit religion to others either by a touch or by a look' (মহাপুরুষগণ স্পর্শ বা দৃষ্টি দ্বারা অন্যের ভিতর ধর্মভাব সঞ্চারিত করতে পারেন)। আমার মুখ হইতে একথা শুনিয়াই তিনি পুনরায় বেঞ্চে হেলান দিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন, তারপর সোজা হইয়া উত্তর করিলেন,—না, আমি তা পারি না। একটু থামিয়া থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—না, আমি তা পারি না, পারলেও তোমায় দিব না, দিলেও তুমি রাখতে পারবে না।

পর পর এই তিনটি বাক্য আমার অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া আমাকে সন্দেহাতীতরূপে বুঝাইয়া দিল—আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আত্মগোপনের প্রয়াস,—আর চরম সত্যের উপলব্ধির নিমিত্ত আমাদেরও পক্ষে আত্মপ্রস্তুতি প্রয়োজন।

একে একে তথায় আরও জনকয়েক আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়া অন্যদিকে কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়া গেল। 'Religion must come from within' এই মহাবাক্য হৃদয়ে অনুধ্যান করিতে করিতে আমি আস্তে আস্তে তথা হইতে সরিয়া পড়িলাম।

বারান্তরের কথা। মঠে কিছুদিন যাবৎ বাস করিতেছি। প্রত্যহ যেমন করিয়া থাকি, সেদিনও তেমনি সকালে ৮।৯ ঘটিকার সময়ে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কক্ষে গিয়াছি। আপনাতে নিমগ্ন অবস্থায় তিনি চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি প্রণাম করিয়া উঠিলে পর আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কালীসদয়, তুমি কবে করিমগঞ্জে যাচ্ছ? মহাপুরুষজীর শরীর তখন রোগক্লিষ্ট, অতিশয় দুর্বল। মঠ ছাড়িয়া শীঘ্র চলিয়া যাইবার ইচ্ছা আমার এতটুকুও ছিল না। তাই উত্তর দিলাম,—মহারাজ! আপনার শরীরের যে রকম অবস্থা, তা'তে ছেড়ে যেতে মন চায় না,—আমার একান্ত ইচ্ছা আরও কিছুদিন এখানে থাকি। একথা শুনিয়া নিজের শরীর দেখাইয়া কহিলেন,—এই পাঞ্চভৌতিক দেহ, এটা ত যাবেই, এটাতে কি দেখছ, ভিতরে দেখ। আমার মনে বিষম ধাক্কা লাগিল, বলিলাম—না মহারাজ, ভিতরে ত কিছুই দেখতে পাই না। উত্তর শুনিয়া তিনি

কহিলেন, দেখবে আবার কি? এই চোখ দিয়ে গাছপালা দেখছ, তাই ত দেখবে। তবে কিনা ঠাকুর দয়া করে আমাদের লাইফ (জীবন) তৈরী করে দিয়েছেন। তোদেরও হয়ে যাবে, ভাবনা কি? পুনরপি কহিলাম, মহারাজ! শাস্ত্রে ত দিব্যদর্শনের কথাও রয়েছে। তখন উত্তর করিলেন—হাঁ, তাও রয়েছে, তাও রয়েছে। এই কথাগুলি বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন; আমিও প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম।

একবার আমি মহাপুরুষ মহারাজকে কাতরভাবে প্রার্থনা জানাই যে, যদি তিনি দয়া করিয়া অনুমতি দেন তবে কয়েকদিন তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিয়া কৃতার্থ হই। উহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, ওটা আবার কি! তাঁর নাম করা, তাঁর ধ্যান চিন্তা করা ঐটিই আসল।

আমি নীরব রহিলাম এবং ঐ কথার গভীরতা চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু পরে তিনি স্নেহার্দ্রস্বরে কহিলেন,—বেশ ত, তোমার যখন ইচ্ছা হয়েছে, সন্ধ্যার পর এস।

সন্ধ্যারতির পর তাঁহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দেখিলাম তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন, আর সুবিখ্যাত মৃদঙ্গ-বাদক ভগবানচন্দ্র সেন তাঁহার দক্ষিণপদে, এবং সেবক তাঁহার বামপদে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। ঘরে আগন্তুকের সাড়া পাইয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? নিজের নাম বলিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। খানিক পরে সেবককে তিনি কহিলেন—ওকে ঐ পা'টা ছেড়ে দাও ত! নিজের অনভিজ্ঞতা ও অপটুত্বের কথা চিন্তা করিয়া আমার মনে দারুণ ভয় হইল। মনে হইল মহাপুরুষ মহারাজ যেন নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। আমি এখন কি করি তৎসম্পর্কে ভাবনায় পড়িয়া গেলাম। আমাকে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় দেখিয়া ভগবানবাবুর দয়া হইল। তিনি খুব ভরসা দিলেন এবং কি করণীয় তাহা বুঝাইয়া দিলেন। সতর্কতার সহিত আমি কাজে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রায় অর্ধঘণ্টা পদসেবায় অতিবাহিত হইলে মহাপুরুষজী আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—কালীসদয়! তুমি আর কতদিন মঠে আছ?

উত্তর করিলাম,—মহারাজ! আর মাসখানেক মঠে থাকার ইচ্ছা। উহা শুনিয়াই তিনি তর্জনী খাটের উপর ঠুকিয়া ঠুকিয়া কহিতে লাগিলেন,—এই আজ থেকে মাস খানেক? আমি বলিলাম,—হাঁ মহারাজ! তদুত্তরে তিনি কহিলেন,—না, সে ইচ্ছা ত আমাদের নয়, আজ থেকে তুমি মাস-খানেক এখানে থাক, সে ইচ্ছা ত আমার নয়, তুমি ওদিকে (অর্থাৎ করিমগঞ্জে) চলে যাও, এদিকে তোমার বেশী ঘোরাঘুরি করার দরকার নেই।

সহসা এই কঠোর আদেশে আমার মনে প্রবল ঝড় উঠিল। কতক বিচলিতভাবে বলিলাম,—মহারাজ! অনুমতি করেন ত, না হয় আমি কলকাতায় কিছুদিন থেকে যাই। তিনি দৃঢ়তার সহিত কহিলেন,—না, তুমি কলকাতায়ও থাকতে পাবে না,—ওদিকে চলে যাও। এর পরেও নানা যুক্তির অবতারণা-পূর্বক মঠে কিছুদিন থাকিবার নিমিত্ত আমি কাতরভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলাম। আমার বোধ হইল যেন তিনি সম্মত হইয়াছেন।

পরদিন রাত্রিতে মহাপুরুষ মহারাজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া মনে হইল তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। আমি অতি সন্তর্পণে পদসেবা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর তিনি বলিয়া উঠিলেন,—কালীসদয়! আমার কথা শুনছ না কেন? আমি উত্তর করিলাম,—শুনছি ত মহারাজ! তিনি কহিলেন,—কোথায় শুনছ, ওদিকে চলে যাও।

—এখানে ক'টা দিন থেকে আমার চোখের চিকিৎসা করিয়ে যাবার অনুমতি দিন।

—তবে বল, তুমি চোখের চিকিৎসা করাতে এসেছ ?

—মঠেও থাকা, আর চোখেরও চিকিৎসা দুই-ই।

—Do you know your future? (তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জান ?)

—না, মহারাজ !

—তবে আমার কথা শুনছ না কেন ? একথা মনে করো না যে তোমাকে মঠে থাকতে দেওয়া হ'ল না ; but for your good, (তোমার ভালর জন্য)—but for your good… কথাটি দু'বার বলিয়া এবং অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি গাত্রোত্থানপূর্বক শয্যার উপরে ধ্যানস্তিমিতলোচনে বসিয়া রহিলেন, আর আমি নিজেকে মনে মনে অপরাধী গণ্য করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাকে কহিলেন,—তুমি গান পছন্দ কর না ? যাও সাধুদের গান শোন গে। মাঝে মাঝে এলে, প্রণাম করলে, সেই ত ভাল।

অতঃপর বাহিরে আসিয়া গানের আসরে যাইয়া বসিলাম বটে, কিন্তু মন সঙ্গীতে নিবিষ্ট হইল না। পরদিন প্রাতে বাগবাজারে গমনপূর্বক একটা থাকিবার জায়গা ঠিক করিয়া মঠে ফিরিলাম।

কলিকাতায় কয়েকদিন থাকাকালে মাঝে মাঝে বেলুড় মঠে আসিয়া মহাপুরুষজীর পূত-সঙ্গলাভে প্রভূত আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম। এখন ভাবি, মহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছার স্রোতে আমার ইচ্ছা কোথায় বা ভাসিয়া গেল ! তিনিই হাত ধরিয়া আছেন, তাই নির্ভাবনায় আছি, আর পুরাতন ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া

হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।

মনের মানুষ কেঁদে ওঠে কেন ?

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কে জানে কোথায় অকূলের কূল, আকাশের কোথা শেষ !
রূপের অতীত আনন্দ কেহ পেয়েছি কি পথ খুঁজে
মৃত্যু-অভেদ প্রেমে ?
চির অনন্ত চিৎপ্রকর্ষে আছে কি সুরের রেশ ?
যার মীড় টেনে গান গাওয়া হোলো ব্যথার অশ্রু মুছে
পার্থিবলোকে নেমে !

অনাদি প্রেমের পীযুষ-পুষ্ট পৃথিবী প্রমোদে রহে
মিলনে মিলনে হৃদি মন্থনে বন্ধন সংসারে
উর্ণনাভের জালে।
নিগূঢ় গোপন আত্মারে লয়ে রসের সাগর বহে,
ভোগের ভিতরে ভগবানে পেতে প্রাণ চায় বারে বারে,
ধ্যানের অন্তরালে।
কামনা কামের কুহকে তন্দ্রাতে তন্দ্রর উদ্ভব
তারি জাল রচি অতনুসেবায় জড়ায়েছি মোরা সব।

মায়ার মধুপ করে গুঞ্জন জীবনের মধু লোভে,
মাধবী রাতের শশধরসুধা অধরে তুলিয়া পান
করিতে চকোর আসে।
মনের মানুষ কেঁদে ওঠে কেন ক্ষোভে আর বিক্ষোভে ?
মুক্তিপাগল আপনার মনে গেয়ে যায় তার গান
প্রকৃতিপুরুষ পাশে।
সূর্যের পানে সূর্যমুখীর সুন্দর আঁখি দুটি,
প্রভাতবেলায় প্রার্থনা সম কেন ওঠে ধীরে ফুটি ?
সব নদী আর সব জলধারা ছুটিতেছে অবিরত—
সিন্ধু যেথায় উছলিয়া সদা করিতেছে ক্রন্দন
অসীম বার্তা বয়ে।
কঠিন পৃথ্বী ভেদ ক'রে বীজ-অঙ্কুর জাগে যত
তরুবীথিকার রূপ ধরে ওরা করে ঋতু আবাহন
কিশলয় কোলে লয়ে।
মহা আকাশের প্রতিবিম্বিত ঢেউয়ের চতুর্দোলে
দুলিয়া দুলিয়া কোন্ জন নিতি কার কথা যায় বলে ?

সত্যের সাধনা

শ্রীমতী নলিনী ঘোষ, এম্‌-এ

'সত্যং শিবম্‌ সুন্দরম্‌'—এই হ'ল ভগবানের আসল রূপ। 'সত্য' ভগবানের আর একটি নাম। সত্যের সাধনাই ভগবৎসাধনা—সত্যের প্রতিষ্ঠাই জীবনে ভগবদনুভূতির আস্বাদলাভ। উপনিষদের মন্ত্রে সত্য ও ভগবান এক। বুদ্ধদেব বলেছেন,—'যিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনিই সুখী। সত্য মহান্‌ ও সুন্দর। সত্য ভিন্ন জগতে অন্য ত্রাণকর্তা নাই।', কায়, মন, বাক্য ও ভাব এই চার রকম উপায়ে সত্যকে পালন করতে পারলে তবেই সত্যের সাধন সম্ভব ও তখন সত্য ধীরে ধীরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে একটি ধর্মরাজ্য গড়ে তোলে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীপরমহংসদেব একে একে মায়ের চরণে সবই নিবেদন করলেন, বললেন, 'এই নে মা তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম; এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য'; কিন্তু বলতে পারলেন না, 'এই নে তোর সত্য'।' সব দিলেন কেবল নিজের জন্য রইল সত্য। সত্য দিলে কি নিয়ে থাকবেন? সামান্য মানুষের তো দূরের কথা, যিনি ভগবানের অবতার তাঁরও সত্য ছাড়া অবলম্বন নেই। সত্য এমনি জিনিস যে তা ভগবানকেও দেওয়া যায় না, ভগবানও একে পরিত্যাগ করতে পারেন না। ঠাকুরের কি আঁট ছিল সত্যের উপর! যে কথা মুখ দিয়ে একবার বেরিয়েছে, তা পালন করতেই হবে প্রাণপণে, তা না হলে যে সত্য রক্ষা হয় না। বাড়ীর ভিতর একখানি পা গলিয়ে দিয়েও 'যাব' উচ্চারিত শব্দের সত্যকে রক্ষা করতে হয়েছে। একি সাধারণের কাজ?

মানুষ যখনই এই সত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই যুগে যুগে মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে সত্যের বাণী প্রচার করেছেন। গীতায় শ্রীভগবান নিজে বলেছেন,—"দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" এই আশ্বাসবাণী স্মরণে থাকলে মানুষের হতাশ হবার কোন কারণ নেই। হয়ত জীবনে বারে বারে সত্যচ্যুতি ঘটবে, তবুও একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করেই তাকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এই সাধনার ভিতর দিয়েই জীবনে ব্রহ্মের রসাস্বাদ ঘটবে। সত্যকে আশ্রয় করলে জীবনে হয়ত দুঃখ বিপদ শতগুণে বেড়ে যাবে, সত্য সব সময় আপাত-সুখ দিতে পারে না, কিন্তু দুঃখের দরজা দিয়েই তো মঙ্গলময়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সত্যকে আমরা খণ্ডিতভাবে দেখি বলেই আমাদের সংসারকে দুঃখময় মনে হয়। যদি কোন রকমে একবার বুঝতে পারা যায় যে আমাদের যা কিছু অভাব ও দুঃখ, সবই কেবল সত্যের অভাবের জন্য তা হলে দুঃখের চেহারা একেবারে সম্পূর্ণ বদলে যায়। তাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা "অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়।" 'অসৎ হতে আমাকে সত্যে লয়ে যাও'; সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই ভগবান লাভ হল, আর তখন সর্বত্রই আনন্দ। যেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যায় সর্বত্রই সেই আনন্দময় রূপজ্যোতি, জগৎময় আনন্দ-লহরী বয়ে যায়। সর্বত্রই দেখা যায়—"আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি" কারণ তিনি যে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্‌'; তিনি সত্য, জ্ঞান, তিনিই অনন্ত আনন্দ। এই আনন্দময় আপনাতে আপনি এমনি পরিব্যাপ্ত যে তাঁকে ধারণা করা যায় না—শাস্ত্র বলেছেন, তিনি 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌', তিনি বাক্য ও মনের অতীত। সংসারের মাপকাঠিতে তাঁকে

পাওয়ার বিচার চলে না, তবুও তিনি ধরা দেন। ঋষি বলেছেন—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য-মনসা সহ', মনের সহিত যাহাকে না পাইয়া বাক্য যাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। সেই অনন্ত আনন্দ যিনি পাইয়াছেন, তাহার কোন ভয় থাকে না। এই আদর্শই ভারতের আদর্শ। দুঃখের ভিতর দিয়েই যদি তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তাতেই বা ভয় পাবার কি আছে? দুঃখের আগুনেই তো সত্যের প্রকাশ, এর ভিতর দিয়েই মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে প্রার্থনা উত্থিত হয়—'আবিরাবীর্ম এধি'—তুমি প্রকাশিত হও, আবির্ভূত হও।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইতেছ, সেই যে উদ্ধারের পথ, সে তো আরামের পথ নয়। সে যে পরম দুঃখের পথ।' এই দুঃখরূপ স্তর অতিক্রম করেই তো যেতে হবে পরম সত্যের সান্নিধ্যে। সেখানে একবার গেলে সব আনন্দ, কেবল আনন্দ।

সত্য নির্বিশেষ। কিন্তু কালের, সময়ের ও অবস্থা বিশেষে একই সত্যের বহু পরিবর্তন দেখা যায়, কাজেই মনে হতে পারে সত্য আংশিক ও পারস্পরিক। কিন্তু যে কালের যা সত্য তাই মেনে চলাই ধর্ম। সত্য যে চরম ও নির্বিশেষ তার বহু প্রমাণও আমরা মহাপুরুষদের বাণী ও জীবনাদর্শে দেখতে পাই। একজন খ্রীষ্টধর্ম-সংস্কারক বলেছেন—"Peace if possible, but truth at any rate." শান্তি সম্ভব হলে ভালই, কিন্তু যে করেই হোক সত্য চাই-ই। সত্য হচ্ছে সমাজ ও মানব জীবনের ধারক। যে পরম ও চরম সুন্দর ভিত্তির উপর মানুষ দাঁড়াতে ও বাঁচতে পারে, তা হচ্ছে সত্য। সত্য কল্পিত নয়। সত্যের পরিচয় বাস্তবের সঙ্গে বাস্তবের। গান্ধীজীর মতেও সত্যই ভগবান, ভগবানই সত্য। ভগবান যেমন বিশ্বের ধারক, তেমনি সত্য জীবনের ধারক। "Truth is the treasure of all men." সত্য মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ। তাই ভগবৎ সাধন ও উপলব্ধির সহজ উপায় সত্যের সাধনা।

প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

শ্রীনীরদবরণ বসু

একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। তারই বিভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন দিনের টুকরো টুকরো সবাক্ ছবি। ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপার, কিন্তু অনেক বড় বড় ব্যাপারের চেয়ে এইগুলিই মনে যেন বেশী দাগ রেখে যায়। এ যেন মল্লিকাফুল—ছোট্ট, কিন্তু অনেক অভাব মেটাতে পারে।

৩৬এর একটি দিন। শ্রেণীতে তখন পড়া ধরার পালা চলছিল। ইস্কুল থেকে 'পড়া' নিয়ে যাওয়া, বাড়ীতে 'পড়া করা' এবং সেই 'পড়া' পরদিন (বা পর পর কিছু দিন) মাষ্টারমশাইকে ধরতে দেওয়া—এই তিনটি ক্রিয়া একত্র হয়ে ছাত্রদের মনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটাতে থাকে। আজ ছাত্রেরা পড়া দেওয়ার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এতেই বুঝতে হয় যে, তারা আজ ভাল পড়া করে এনেছে। এটা তারাও বুঝতে পারে। শুধু মাষ্টার মশাইএর 'বল' বলার অপেক্ষা,—মাষ্টারমশাই বলা মাত্রেই ছাত্রেরা পর পর গড় গড় করে পড়া মুখস্থ বলে গেল :—

বড় ভাল লাগে আমার পাড়া-গাঁয়ে বাস,
কতই সুখে সেথায় লোকে কাটায় বারমাস।

সেথায় গগন সুনীল বরণ, বিমল সেথায় হাওয়া,
হীরের মত তারায় সেথা রাত্তে আকাশ ছাওয়া।

বহুপঠিত পদ্য, নাম 'পাড়া-গাঁ'। প্রথম চার চরণই আজকের পড়া। পড়া-বলা থামল। বলতে ভুলও দু-একজন করল; কিন্তু মাষ্টারমশাই কাউকে তা জানতে দিলেন না। সবাই জানল—আমার ভাল পড়া হয়েছে। ক্ষণকাল মৌন থেকে মাষ্টার-মশাই শ্রেণীকে প্রশ্ন করলেন, 'পাড়া-গাঁ দেখেছ ?'

শ্রেণী স্তব্ধ হয়ে গেল। অবস্থা দেখে মাষ্টার-মশাই নিজেকে একটু বদলে নিলেন। বললেন, 'কে কে পাড়া-গাঁ দেখেছ—হাত তোলো।'

দ্বিতীয় শ্রেণী। উপস্থিত ছাত্রসংখ্যা ১৫। গড় বয়স প্রায় ৯। ১৫ জনের মধ্যে ৩ জন হাত তুলল। শিবু, চঞ্চল ও দীপা।

শিক্ষক—হাত নামাও। (শিবুকে) তুমি কোথায় দেখেছ ?

শিবু—মামার বাড়ীতে।

শিক্ষক—কোথায় তোমার মামার বাড়ী—?

শিবু—ভাঙামোড়া-বৈকুণ্ঠপুর।

শিক্ষক—আচ্ছা, পাড়া-গাঁ দেখতে কেমন ?

শিবু—(নিরুত্তর)।

শিক্ষক—(চঞ্চলকে) তুমি কোথায় দেখেছ ?

চঞ্চল—আমাদের ওখানে।

শিক্ষক—তোমাদের ওখানে—কোন্‌খানে ?

চঞ্চল—আমাদের পাড়ায়।

শিক্ষক—তোমাদের পাড়ার কোন্‌খানে ?

চঞ্চল—আমাদের বাড়ীর পাশে।

শিক্ষক—তোমাদের বাড়ীর কোন্‌পাশে ?

চঞ্চল—আমাদের বাড়ীর দক্ষিণদিকে, যেখানে অশথ গাছটা আছে।

শিক্ষক চঞ্চলকে এইখানে ছেড়ে দিলেন। দীপাকে জিজ্ঞাসা করলেন। দীপা উত্তর দিল, আমাদের এই গ্রামটা।

এখানে বলে রাখি যে, চঞ্চল ও দীপার দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় বছর চলছে। চঞ্চলের বয়স ৮, দীপার ১০ আর শিবুর ৯।

শিক্ষকটি চিন্তাশীল, ধীর, সংযতবাক্‌। একদিন বলছেন,—দেখুন অভাব আছে, হাজার ঝামেলা আছে, বহু বাধাবিপত্তি আছে—সব সত্যি, কিন্তু যখন শ্রেণীতে ঢুকি তখন আর কিছু মনে থাকে না—সব ভুলে যাই।

আদর্শ শিক্ষকের উপযুক্ত কথা। কিন্তু দুঃখ এই, এ দেশে এই সমাজে এই রকম শিক্ষকদের একটু স্বীকৃতি, একটু সমর্থন, তাঁদের প্রতি একটু শ্রদ্ধার নিবেদন, তাঁদের উন্নতির কোন পথ চোখে পড়ে না। এঁরা এখনও স্বকীয় ধারায় কাজ করে চলেছেন; কিন্তু আর কতদিন যে মনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন, কে জানে!

বইএর জগৎ থেকে নিজের পরিবেশকে পৃথক্‌ করে অগণিত ছাত্র বছর বছর পাস করে হাসিমুখে ক্লাসে উঠছে। কত চকচকে লেবেল পাচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে জীবনের প্রথম সাত-আটটা বছর কাটিয়ে দেওয়ার পরও যে 'পাড়াগাঁ কী ও কেমন' এ বিষয় অজানা থেকে যেতে পারে, শিশুর জগতের সঙ্গে শিশুর পুস্তক জগতের একটা দুস্তর ব্যবধান ক্রম-বর্ধমান হয়ে যেতে থাকে, 'পাড়াগাঁ দেখেছ' বাক্যটিও যে প্রশ্ন হতে পারে এবং হওয়া উচিত, এ আমরা কয়জনে ভাবি ?

আর এক টুকুরো ছবি দেখাই।

তৃতীয় শ্রেণী। আর একজন শিক্ষক। আজ তিনি 'পুরীর মন্দির' নামে একটি অংশ পড়াবেন। গতকাল এই অংশটি ভাল করে টানা পড়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সবাই পড়ে এসেছে। শিক্ষক সকলকে পর পর টানা পড়ে যেতে বললেন। সবাই পড়ল। এবার মর্মগ্রহণ। অংশটি ছোট। কয়েকজনের তো প্রায় জল হয়ে গেছে। শিক্ষক কিন্তু প্রথমে সে-জলে নামলেন না; তিনি অংশটুকুর নাম থেকে প্রশ্ন করলেন: আজ তাহলে পুরীর

মন্দির সম্বন্ধে পড়া হচ্ছে, কেমন? আচ্ছা আগে বল—পুরীর মন্দির কোথায়?

শ্রেণী ম্লান হয়ে গেল। সবাই নীরব।

—এ আবার কেমন কথা! পুরীর মন্দির তো একটা মন্দিরের নাম, তা, সেটা যে কোথায় তা বলে না দিলে আমরা বলব কেমন করে? আচ্ছা দেখি বইটা আর একবার ভাল করে।···

বই তো খোলা, সামনেই প্রসারিত। সবাই বইএর মধ্যে খুঁজতে লাগল।

শিক্ষক অবস্থাটা বুঝলেন এবং চিন্তিত হয়ে পড়লেন: কী করে এটা ওদের নাগালের মধ্যে এনে দেওয়া যায়? ··এমন একটা উপলক্ষ্য চাই, যা থেকে ওরা নিজেরাই লুকোচুরি খেলার এই খেলুড়েটিকে খুঁজে নিতে পারবে। 'পুরী একটা জায়গার নাম' এইরকম করে কথার সাহায্যেই বোঝাতে হবে নাকি শেষ পর্যন্ত! ··

শিক্ষক প্রস্তুত হলেন। ছাত্রেরা তখনও ছাপালেখার অলিতে গলিতে 'খুঁজি খুঁজি নারি' করে বেড়াচ্ছে। তিনি তাদের ডেকে বললেন, বইএ খোঁজা এখন থাক; আগে আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর দাও: বল, হাঁসনানের পুল কোথায়?

এ তো জানা কথা, কেননা দেখা বস্তু। শ্রেণীর অধিকাংশই সানন্দে বলে উঠল, হাঁসনানে; এবং এই শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই দু' একজনের সামনে থেকে কালো পর্দাটা সরে গেল।

শিক্ষক যেই বলতে গেলেন, তাহলে পুরীর মন্দির?—

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়েই তিনজন সমস্বরে বলে উঠল, পুরীতে, মাষ্টারমশাই, পুরীতে।

সব তখন সত্যিই জল হয়ে গেছে।

এর পর মানচিত্র এল, দেখা হল পুরী কোথায় অবস্থিত, কি করে যেতে হয়, কখন যেতে হয়—সব আলোচনা হল।

বিভিন্ন ছাত্র সম্পর্কে শিক্ষকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা থাকে, যাকে তাঁর পূর্বজ্ঞান বলা যায়। নাড়াচাড়া করতে করতে একটা ধারণা গড়ে ওঠেই। অন্যের মুখে কোন ছাত্র সম্পর্কে শুনে এক রকম ধারণা জন্মায়। কিন্তু এই পূর্বজ্ঞানকে ধরে থাকা সব ক্ষেত্রে সমীচীন নয়।

আচ্ছা, আরও একটা ছবি দেখা যাক।

চতুর্থ শ্রেণী। নদী নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। সহসা একটি ছাত্র প্রশ্ন করল,—মাষ্টারমশাই, নদীতে বারো মাস জল থাকে কী করে?

আমাদের এই শিক্ষক প্রশ্নটি শুনে বললেন: ভাল কথা, নদী কাকে বলে—বল।

ছাত্র বলল, যে নদী পাহাড় থেকে বেরিয়ে সাগরে পড়ে তাকে বলে নদী।

ধারণাবিহীন মনের ছবি ফুটে উঠল এই অপরিচ্ছন্ন প্রকাশে।

শিক্ষক—প্রশ্নটা, যেটা তোমায় এখন জিগ্যেস করলাম, সেটা বল দেখি।

ছাত্র—আপনি তো বললেন, 'নদী কাকে বলে?'

শিক্ষক—হ্যাঁ। এবার বল, ঐ 'নদী কাকে বলে' বলতে হলে কথাটা 'যে নদী' দিয়ে শুরু করলে ঠিক হয় কি?

ছাত্র—(চিন্তিত অবস্থায়) না, ওখানে 'নদী' হবে না। (একটু থেমে) তাহলে কী হবে মাষ্টার মশাই?

শিক্ষক—বলছি। আচ্ছা, (বাকী সকলকে) তোমরা পর পর বলে যাও তো।

কিন্তু সকলেরই সূচনায় বিভ্রাট বেঁধেছে। ভাষা মিলছে না। শিক্ষক বললেন, বল, 'যে জলের স্রোত' বা 'যে জলধারা'—তারপর মাঠের মাঝ দিয়ে গ্রামের পাশ দিয়ে নদীর বয়ে যাওয়া শিক্ষক বোঝালেন।

এখন শিক্ষক বললেন—আচ্ছা, এবার বলি শোনো। পাহাড় থেকে নদীর এই যে বেরিয়ে

আসা বলতে কে কি বোঝো—পর পর বলে যাও, আমি শুনব। যার যা মনে হয়, সে তাই বলবে।

শ্রেণী নির্বাক্। শিক্ষক তখন অন্যভাবে প্রশ্নটি প্রকাশের প্রয়াস পেলেন। যেন টেনে এনে নাগালের মধ্যে ফেলতে চাইলেন: 'নদীর পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা' আর 'আমার এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া' এই দুটি কি এক?

ছাত্র—হ্যাঁ।

শিক্ষক—আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে এই ঘরে আমার আর কিছু থাকে কি?

ছাত্রটি—না।

শিক্ষক—নদী পাহাড় থেকে বেরিয়ে এলে পাহাড়ে নদীর আর কিছু থাকে কি?

ছাত্রটি—না। সে তো বেরিয়ে এল, আবার কী থাকবে?

শিক্ষক পর পর সকলকেই জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, এ বিষয়ে সবাই একমত।

—ঘোরতর কাণ্ড বাধাল নদী: সে পাহাড় থেকে বেরিয়ে চলে এল, পিছনটা তো তার খালি হয়ে যাবে। নইলে সে যে পাহাড় ছেড়ে চলে এল, এটা ধরে নিই কোন্ যুক্তিতে?··· ভাল কথা। যেমন খুশি সে চলে যাক, আমাদের তাতে কিছু বলবার নেই, কিন্তু পিছনে তার জল থেকে যাচ্ছে কেন? এ আবার কেমন তরো চলে যাওয়া?—

এখন মাটি ও পাথরের পাহাড় তৈরী করে জল ঢেলে নদীর উৎপত্তি, নদীর চলে যাওয়া প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করালে তবে হয়।

স্কুলে রিলিফ ম্যাপ নেই। দরকার মত উপকরণ কেনার অধিকার ও অর্থ শিক্ষকদের নেই। বেতনভোগী প্রাইমারী মাষ্টারের দায়িত্ব আছে, কর্তৃত্ব নেই। খুচরা খরচ বাবদ স্কুল মাসে যা পায় তাই দিয়ে অফিস খরচ, কৃষি-শিল্পের ব্যয়, মায় মাসিক পত্রিকা বাঁধানো পর্যন্ত সকলই সমাধা করতে হয়।

কিছু না থাক, প্রধান উপকরণ আছে; শ্রেণী পিছু একটি করে বোর্ড ও খড়ি। শিক্ষক খড়ি দিয়ে সাধ্যমত পাহাড় নদী এঁকে ছাত্রদের ধারণা গড়ে তোলায় সাহায্য করলেন; তৃপ্তি পেলেন না।

আমরা অভিজ্ঞতার কথা বলি। ঢাল-তলোয়ার-বিহীন নিধিরাম কী করে অভিজ্ঞ যোদ্ধা হতে পারে? অনুরাগী অধ্যবসায়ী শিক্ষক—দেশে আছেন, দারিদ্র্যে অশ্রদ্ধায় অসুবিধায় তাঁরা ক্রমক্ষীয়মাণ; আমরা তাঁদের কোন খোঁজ রাখি না!

বয়স বাড়লেই জ্ঞান বাড়ে, অনেকদিন মাষ্টারি করলেই অভিজ্ঞ শিক্ষক হওয়া যায়, এ সিদ্ধান্ত বিশেষ ক্ষেত্র ও পাত্র ছাড়া মানি না। সবার মূলে শুদ্ধ প্রাণ, ব্রতবুদ্ধি। শুদ্ধ প্রাণে প্রশান্তি থাকে, জ্ঞানমুখী চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়। এই চিন্তাশীলতার পথে আসে উপলব্ধি, আর অভিজ্ঞতা আসে উপলব্ধির পথ ধরে।

পারস্পরিক অভিজ্ঞতা-বিনিময়, মনোবিজ্ঞানীর সংস্পর্শ, পর্যাপ্ত পুস্তকপাঠ প্রভৃতিই প্রকৃত শিক্ষক-শিক্ষণ। আঞ্চলিক বৈঠক এক প্রধান দিক। তারপর পত্রিকা। কয়েকটি শিক্ষামাসিক দেখেছি বটে, কিন্তু তাতে প্রয়োজন মেটে কি?

বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবেশে শিক্ষকের চিন্তাশীল হয়ে ব্রতবুদ্ধি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ক্রমোন্নতির সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কি?

আমরা শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথা, ছেলেকে মানুষ করার কথা বলি; তার সর্বপ্রকার দায় ও দায়িত্ব স্কুলের উপর ছেড়ে দিয়ে সংসার করি, রাজনীতি করি, সমাজনীতি করে বেড়াই। অথচ প্রতিদিন পিতামাতার কাছে বাড়ীতে—যেখানে ছাত্র উনিশ ঘণ্টা থাকে সেখানে—তার জীবনগঠনের কোন চিন্তা বা ব্যবস্থা করি না।

স্কুলে কি হয়? পড়াটা পড়ার কথাই বলি। মুখস্থ ধরা ও শব্দ দেখে দু'একটা বানান জিগ্যেস করা বা লিখতে বলা। আর ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন

নামে এক জাতীয় প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্নই পরীক্ষায় আসে, তার থেকে দু'একটা ধরা ; তাও সব দিন নয়, সর্বত্র নয়, সবাইকে নয়।

নদী কাকে বলে—এ তো সংজ্ঞাটা মুখস্থ বলতে পারলেই সব ঠিক আছে, ধরে নিই। আর গ্রামের পাশের নদীটার সঙ্গে পরীক্ষার কোন সম্পর্ক রাখি না।

কিন্তু এতে হয় কি ? ছাত্র বছর বছর বা দু'তিন বছর অন্তর পাস করে ক্লাসে ওঠে; স্কুলে ও বাড়ীতে আনন্দের হাট বসে যায়।

একটি নামকরা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম স্থানীয় ছাত্রের 'কিশলয়' পড়ার খাতা দেখছিলাম। সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তরে খাতাটি ঠাসা। ছেলে স্কুল থেকে রাফ-খাতায় লিখে লিখে এনেছে, বাড়ীতে পিতা সযত্নে পাকা খাতা করে দিয়েছেন। ছেলের জন্য সার্থক শ্রমের গর্বভরে খাতাটি পিতাই আমায় দেখিয়েছিলেন। ছেলে দুই বেলা বাড়ীতে ও এক বেলা স্কুলে সেই খাতা মুখস্থ করে, প্রয়োজন স্থলে বমন করে। বইটা আর দরকার হয় না। আর বইই কি সব ভাল ? বিশেষ করে শিশু শ্রেণীর বইগুলি কি শিশুপাঠ্য ?

প্রশ্নোত্তরের খাতা বই আকারে ছাপা হয়ে বাজারে বিক্রয় হয়। রূপায় তার দাম তেমন না হলেও, তার গুণ অনেক, আদরও খুব। এর দাম যেন মুদ্রায় নয়—মুদ্রাদোষে। এই ভাবেই দেশের 'জনগণমন' তৈরী হচ্ছে।

জীবনানন্দ

শ্রীমতী বিভা সরকার

জীবন মধ্যাহ্ন হ'ল চেয়ে দেখি প্রভু,
ক্ষতি নাই, ক্ষোভ নাই, কোনো ব্যথা নাই।
সুখ দুঃখ অভিমান অন্তর বেদনা,
মিছে সে ত, সে ত শুধু ভুলের বালাই।
সকল শূন্যতা ছাড়ি প্রাণ আজ পূর্ণ শক্তিময়,
জীবনের পদে পদে পাই তার সত্য পরিচয় !
বিলাইয়া দিনু আজ আনন্দের দানে
আমার যা কিছু ছিল প্রভাতের গানে।
সকলের মাঝখানে আপনারে হেরিলাম আমি,
আনন্দ আনন্দময় সর্বব্যাপী মোর অন্তর্যামী।
হ'ল মোর নব জন্ম তমসার পারে—
হৃদয় উদ্বেল হ'ল অমৃত পাথারে।

মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্তমান তাহারই প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা ; সুতরাং শিক্ষকের কর্তব্য কেবল পথ হইতে বাধাবিঘ্নগুলি সরাইয়া দেওয়া।

* * * *

ছেলে নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে। তবে তোমরা তাহাকে তাহার নিজের ভাবে উন্নতি করিতে সাহায্য করিতে পার।···জ্ঞান স্বয়ংই তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

'আমি' ও 'আত্মা'*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

স্বামীজী নিজের 'আমি' ভগবানের পায়ে সঁপে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য জগৎটাকে মুগ্ধ করে এলেন, কেমন করে? কিসের জোরে? ঠাকুরের ভাব নিয়ে, ঠাকুরের আশীর্বাদে। এত করে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল, দেশে ফিরে এলেন; একজন শিষ্য বললেন,—স্বামীজী, আপনি অনেক করেছেন, বড় পরিশ্রান্ত হয়েছেন, এবারে একটু বিশ্রাম নিন। স্বামীজী বললেন,—বিশ্রাম নেওয়ার কি আর জো আছে? দেখনা ঠাকুরের ঐ কালী যে আমার ঘাড়ে চড়ে বসেছেন, ঘোরাচ্ছেন খালি আমায়।

স্বামীজী নিজেকে, তাঁর অহংকে ঠাকুরের যন্ত্র-স্বরূপ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে যন্ত্রস্বরূপ হ'তে বলেছেন। শুধু কি সন্ন্যাসীকেই যন্ত্র হ'তে হবে? তা নয়, গৃহীদেরও হ'তে হবে, সকলকেই তাঁর যন্ত্র হ'তে হবে। 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্' নিমিত্তমাত্র হ'য়ে তাঁর কর্ম করে যেতে হবে সকলকে। যতই আমিটাকে ডুবিয়ে মারতে পারবে ততই তাঁর দিকে এগোবে।

ঠাকুর বলতেন,—দুটো আমি, কাঁচা আমি আর পাকা আমি; মোক্ষের পথে যে শত্রু সেই কাঁচা আমি। একে মারতে পারলে তবে পাকা আমি আসবে; এই আমিই মানুষের বন্ধন মুক্ত করে। ভক্তির ভিতর দিয়ে, জ্ঞানের ভিতর দিয়ে, যোগের ভিতর দিয়ে আমিটাকে মারতে হবে। কাঁচা আমিতে রাগ, দ্বেষ, হিংসা; আর পাকা আমিতে মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া, তাঁর আমি হয়ে তাঁকে আস্বাদন করা। অর্জুন এই কাঁচা আমি নিয়েই বলেছিলেন—'আমি যুদ্ধ করব না।' শ্রীকৃষ্ণ দেখালেন,—তিনি পূর্বেই সব মেরে রেখেছেন। অর্জুন নিমিত্তমাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বার চরণে সব দিয়ে দিয়েছিলেন, নিজে কিছুই করেন নি; তাঁর কালীই সব করছেন, করাচ্ছেন। তিনি বলতেন—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী—আমি রথ, তুমি রথী—আমি ঘর, তুমি ঘরনী।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনেও দেখি আমিত্বের পূর্ণ বিসর্জন। দেখনা যীশু কেমন বলছেন—আমি স্বর্গীয় পিতার সন্তান, রামপ্রসাদ বলছেন, কালীর বেটা রামপ্রসাদ। কি অহংকার! ঠাকুর বলতেন—এ অহং কার? ঠাকুর যন্ত্রস্বরূপ হ'য়েছিলেন বলেই ভগবানের আবির্ভাব হয়ে ছিল তাঁর মধ্যে—তাই সকলে তাঁকে ভালোবাসতেন। সব রকম লোকেই তাঁর কাছে এসে আনন্দ পেত, ব্রাহ্মসমাজে তাঁকে নিয়ে যেত।

বেণীপাল বলেন,—আপনার কাছে এসে আপনার কথা শুনে কি গভীর আনন্দ যে পেলুম! ঠাকুর বললেন,—আমি ও সব জানি না বাবু, মা যা বলিয়েছেন তাই বলেছি, আমার আবার কি? বাস্তবিক তিনি তো সকলের ভেতরেই আছেন কিন্তু যার মধ্যে তাঁর বিশেষ প্রকাশ তিনি বালকের মতো হ'য়ে যান।

ঠাকুর জগন্মাতার যন্ত্র, স্বামীজী ঠাকুরের যন্ত্র। আধার প্রস্তুত করতে হবে, ধর্মকে পেতে হবে ভেতরে, তখনই পরিবর্তন আসবে জীবনে। কাঁচা আমি মরে গিয়ে পাকা আমি আসবে।

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন—পতির জন্য

---

* গত ২৬. ৩. ৫৫ তারিখে কুমিল্লায় পূজ্যপাদ মহারাজজীর একটি ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীমতী সুধা সেন, এম্-এ কর্তৃক সঙ্কলিত।

পতি প্রিয় হন না, প্রিয় হন আত্মার জন্ত। পত্নী বা সন্তানও প্রিয় হন আত্মারই জন্ত। এই আত্মার জন্তই লোক ছুটছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, এই একটিই বস্তু আছেন—তিনি আত্মা—তাঁকেই শ্রবণ মনন করতে হবে।

অম্ভৃণ ঋষির কন্তা বাক্ দেবীসূক্তে বলেছেন—'যা কিছু দেখছ, দেবদেবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—সব কিছুরই মূলে রয়েছি আমি।' তাঁর শক্তিই সব, কিন্তু আমরা সে শক্তির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে অবিস্তাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হই বলেই কাঁচা আমির উদ্ভব হয়।

কেনোপনিষদে আছে: একবার দেবতা আর অসুরে যুদ্ধ হয়। দেবতাদের জয় হল। দেবগণ আনন্দে অহংকারে মত্ত হয়ে জয়ের উৎসব আরম্ভ করলেন। অসুরদের কে পরাজিত করেছেন তাই নিয়ে খুব অহংকারের—আমিত্বের প্রকাশ চলছে। ইন্দ্র বলছেন, আমিই মেরেছি। অগ্নি বলছেন তাঁর শক্তিতেই দেবতাদের জয় হয়েছে। এমনি প্রত্যেকে নিজের গৌরব খুব প্রকাশ করছেন। ঈশ্বর ভাবলেন, দেবতাদের শিক্ষা দিতে হবে। তিনি অত্যদ্ভুত জ্যোতির রূপে আবির্ভূত হলেন। দেবতারা কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন না, শেষে ইন্দ্র উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন সেখানে সেই পুরুষ নেই,—আছেন এক অপরূপ দেবী! ইন্দ্র সভয়ে শ্রদ্ধায় দেবীর পদে প্রণত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে ঐ পুরুষ মা? দেবী তখন বলেন, আমিই সেই, আমিই সব। আমার শক্তিতেই তোমরা জয়লাভ করেছ। তোমাদের শক্তির মূলেও আমিই—আমি ছাড়া তোমরা শক্তিহীন—শূন্ত। বৃথা অহঙ্কারে আর মত্ত হয়ো না—তোমরা নিজের শক্তিতে শক্তিমান্ নও, আমার শক্তিতেই শক্তিমান্। দেবতাদের কাঁচা আমি দূর হয়ে গেল।

ভগবান সব সহ্য করতে পারেন—কিন্তু অহংকে নয়। কাজেই আত্মসমর্পণ কর, কাঁচা আমিটাকে ডুবিয়ে ডুবিয়ে মারো। গুরু হওয়া কি সহজ কথা? গুরু কে হন? ঠাকুর বলতেন—গুরু হচ্ছেন ঘটক, যিনি বর ক'নেকে মিলিয়ে দেন। আত্মার সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দেন পরমাত্মার। কাঁচা আমিকে নিয়ে যান—পাকা আমির মধ্যে। এই যে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এই যোগসূত্রটি ধরে চলতে হবে। সেইটের জন্তই গুরুশক্তি সহায় হবেন। আত্মকৃপা কর আগে—না হলে গুরুকৃপা মিলবে না। আত্মকৃপা হলে গুরুকৃপা মিলবে, গুরুকৃপা হলে পরে তবে তাঁর কৃপা। তখন তাঁর প্রকাশ হবে।

মা আর ঠাকুর সবই ঈশ্বরকে দিয়েছিলেন। যত তাঁকে দেবে তত তাঁকে পাবে। তাঁর থেকে আর দূরে থেকো না। মা সকলকেই ভালোবাসতেন। তিনি ঈশ্বরকে সব দিতে পেরেছিলেন, তাঁর হতে পেরেছিলেন বলেই—জগতে সকলের মধ্যে নিজেকে তিনি দেখতে পেতেন; তাঁর এই আত্মবিকাশ সকলের মধ্যে তিনি দেখতেন, তাই সকলের মধ্যেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

চণ্ডীতে আছে 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'—যে দেবী সর্বভূতে মা রূপে আছেন তাঁকে নমস্কার। মা বহু নন—একই মা সর্বভূতে আছেন। আমাদের মা সেটি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই অনায়াসে তিনি গণ্ডী ভেঙে দিয়েছিলেন; বহু নয়, বহুর মধ্যেই এককে, নিজেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

সাধারণ মা-ও নিজেকে বিলিয়ে দেন, কিন্তু সে ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডীর মধ্যে, আপন সন্তানদের মধ্যে। কিন্তু মা এই রকম আবেষ্টনীর মধ্যে থাকেন নি—তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গণ্ডীর বাইরে সকলের মধ্যে। সংসারী মা যেমন নিজের ছেলের মধ্যে নিজের সত্তা দেখেন—মা তেমনি সকলের মধ্যেই আপন সত্তা বিকশিত দেখতেন। আমাদের গণ্ডী-ভাঙা মা, সকলের মা।

আমরা খালি নিজেকে ভালোবাসি। কাঁচা

আমিটাকেই ভোগ করব বলে, আস্বাদন করবো বলে বেঁচে আছি। কিন্তু মায়ের 'আমি' কি বৃহৎ 'আমি'! তাই তাঁর কাছে আমজাদে আর শরতে কোনও প্রভেদ ছিল না।

সেই যাজ্ঞবল্ক্যের কথা—আত্মাকে তোমার মধ্যে দেখি বলেই তুমি আমার প্রিয়। সেই আত্মা এক, সর্বভূতেই এক। 'ক্ষুদ্র আমি'র গণ্ডী যখন ভেঙে যায়, 'বিরাট আমি'র প্রসার হয়, তখন কি আনন্দ! এক ঈশ্বর কেন বহু হলেন? নিজেকে আস্বাদন করবার জন্য।

মা-ও তেমনি ভাব নিয়েছিলেন। শক্তি তো একটা রূপ নিয়ে আসেন। মা ঠিক মাতৃ-রূপেই এসেছিলেন। চণ্ডীতে আছে যদিও তিনিই সারা জগতে আছেন,—সবই তাঁরই প্রতিমা, তবুও তিনি দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য শরীর নিয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকেন। তিনি নিত্য, কিন্তু লীলায় তিনি আবির্ভূত হন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরেও মা ৩৪ বৎসর ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন—দৃষ্টান্তের জন্য। বাস্তবিক, স্থূল ভাবে না প্রকাশ হ'লে—আমাদের মধ্যে নেমে না এলে আমরা তাঁকে বুঝি না। তিনি আমাদের মতো নীচে নেমে আসেন—আমাদের তুলে নেবার জন্য। তুলে নেন, শাসন দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।

বুদ্ধ আর চৈতন্যের কি গভীর প্রেমে ভরা হৃদয়! চৈতন্য নিজে কেঁদে জগৎকে কাঁদালেন। জীব উদ্ধার ক্রোধের দ্বারা নয়, প্রেমে। গরম লোহা দিয়ে গরম লোহা কাটে না, কাটে ঠাণ্ডা লোহা দিয়ে।

রামপ্রসাদ বলেন—

'সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, এ কথা বিদিত সব,
কুপুত্র হইলে জননী কি ফেলে একথা কি করে কব।'

কুপুত্রের মধ্যেও মা নিজেকে দেখেন।

শ্রীশ্রীমা যখন দক্ষিণদেশে গিয়েছিলেন তখন দেখেছি—ঘর ভর্তি লোক বসে আছেন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। মাও বসে রয়েছেন চেয়ারে নির্বাক্ স্নেহ-কোমল চোখে। কেউ কারো ভাষা জানে না; তাই কথা নেই কারো মুখে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে দক্ষিণ দেশের সেই লোকেরা বলতেন—নাই বা শুনলুম কথা! তবুও তো হৃদয় ভরে গেছে। পূর্ণ আনন্দ পাচ্ছি তো। মা নিজেকে বিস্তার করতে পেরেছিলেন সকলের মধ্যে, তাই তাঁর মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেয়েছিল সকলে। শুধু দর্শনেই এ আনন্দ! ডাকাত বাবাকে একবার মাত্র ছেলে বলে সম্বোধন করলেন, ডাকাত ভুলে গেল। কেন? মূলে কি ছিল! প্রেম। আমাদের কেবল স্বার্থ, চারদিকেই স্বার্থের ছড়াছড়ি। মায়ে ছেলেতে পর্যন্ত স্বার্থ!

ঠাকুরের কাছে অশ্বিনীবাবু এসেছেন একদিন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, গিরিশবাবুকে জানো? অশ্বিনীবাবু বললেন,—কোন্ গিরিশবাবু? থিয়েটার করে? মদ খায় যে, সে? ঠাকুর অমনি বলে উঠলেন,—আহা খাক না, কত দিন খাবে?

জীবনে এই শিক্ষাটিই নিতে হবে, দোষ না দেখা—অহৈতুকী ভালোবাসা। শুধু শুনে কি হবে যদি মনটাকে ঠিক করতে না পারি? শুধুই শোনা, ও তো একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্মরণ মনন ধ্যান করতে হবে। সর্বদা মায়ের জীবন, ঠাকুরের জীবন সামনে রেখে চলতে হবে। যা ফুটে উঠেছে ওঁদের জীবনে সেটি ধরতে হবে। আমরা চলছি উল্টো পথে, মায়া বা অজ্ঞানের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আমাদের জীবন কেটে যাচ্ছে। বিরাটের প্রকাশ হচ্ছে না, তাই এঁরা আসেন; ডেকে বলেন—না, এ পথ নয়।

শাস্ত্র পড়ে কাঁচা আমির নাশ হয় না; মহাজনদের জীবন সামনে রাখলে তবে কাঁচা আমিটা যায়। মায়ের কথা কি বলব, চোখে ভাসছে শুধু তাঁর চেহারাটি; তাঁর মুখখানি মনে পড়ে, কি প্রেম—কি নিঃস্বার্থ ত্যাগ! বহুর মধ্যে আপনাকে দেখাই

আত্মার বিস্তার ; তাই তো মায়ের মধ্যে এত প্রেম, এত ত্যাগ। একটির সঙ্গে আর একটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত। এই প্রেম, এই অহৈতুকী ভালোবাসার কথা শুধু শুনলেই হবে না—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

খালি শুনে এ প্রেম পাওয়া যাবে না। এঁকে গ্রহণ করতে হবে নিজের মধ্যে। নিজেকে বিস্তার করতে হবে বহুর মধ্যে, সকলের মধ্যে।

শ্যামদেশের শ্যামলিমায়

(ভ্রমণ-কথা)

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ, এম্‌-এ

১৯৫৪, ১৭ই আগস্ট মঙ্গলবার, ভোর ৫-২০ মিনিটে কে. এল. এমের বাস এল। আমি তৈরী ছিলাম—গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। নীরব নির্জন পথে অন্ধকার ও আলোর মাঝে চলল বাস রেঙ্গুনের মিংলাডন এয়ার পোর্ট, ১০।১২ মাইল দূর। ঠিক ছয়টায় পৌঁছে গেলাম। ওরা খেতে দিল লেমন-স্কোয়াস। শুল্কপরীক্ষায় কোন হাঙ্গামাই হ'ল না—ঠিক সাতটায় বিমান ছাড়ল।

বনরাজিনীলা সমুদ্রবেলা—পাহাড় ও প্রান্তর পার হয়ে উড়ো জাহাজ ব্যাঙ্ককে নামল ঠিক বেলা নয়টায়। থাই-ভারত লজে যাওয়ার জন্য কে. এল. এমের বাসকে বললাম। তারা নিয়ে চলল পুরাতন ঠিকানায়—সেখানে দৈবাৎ এক ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হল। স্বামী স্বয়ম্প্রভানন্দ রেঙ্গুনে যে ঠিকানা দিয়েছিলেন—সেটিই ঠিক ; তখন বাস চলল সেখানে। পৌঁছাতে সাড়ে দশটা বাজল।

এখানে আই. এন. এ'র দেবনাথ দাশ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমাদরে সংবর্ধনা করলেন ; দূতাবাসের রায় চৌধুরীকে আমার আগমনবার্তা ফোনে জানিয়ে দিলেন—তারপর শেঠ জগৎরামের ওখানে দুপুরের খাওয়া খেতে নিয়ে চললেন। শেঠজী এখানকার ধনী ব্যবসায়ী। ওখান থেকে পণ্ডিত রঘুবীর শর্মার দোকানে এলাম। পণ্ডিতজী থাই-ভারত লজের পরিচালক। মানুষটি চমৎকার।

বিকালে এলেন কে. করুণা এবং রায়চৌধুরী। তাঁরা দুজনেই দূতাবাসে কাজ করেন। তাঁরা কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজন করলেন। সন্ধ্যায় রঘুবীর শর্মার বাড়ীতে পরিপাটী ভোজ হল।

বুধবার ১৮ই আগস্ট। রাজেন্দ্র পাণ্ডা থাই-ভারত লজের কাজকর্ম করে। মানুষটি ভাল। সকালে আমাকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে চলল। প্রথমে আমরা দেখলাম ওয়াট-পো—ওয়াট হল মঠ। এখানে ঘুমন্ত বুদ্ধের প্রতিমূর্তি রয়েছে। তথাগত এনেছিলেন যে সদাচরণ এবং সৎজীবনের বাণী, দেশের ও কালের ব্যবধান ভেঙে তা সর্বকালের এবং সর্বদেশের হয়ে উঠেছিল, শ্যামদেশে তার বিপুল পরিচয় পাওয়া যায়।

তারপর খেয়া-ঘাটে গেলাম। ঘাটের দুধারে বাজার, বাজারে নানা অচেনা ফল দেখলাম—ওপারে ওয়াট অরুণ—'অরুণ মঠ'—কলনাদিনী তটিনীর তীরে প্রভাতের আলোকে শান্ত ও সমাহিত মঠ—খুবই ভাল লাগল। সেখান থেকে মেমোরিয়াল ব্রিজের উপর দিয়ে বাসে বাসায় এলাম। ১১টায় রঘুবীরজীর দোকান হয়ে তার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম সানন্দ তৃপ্তিতে। ওভার সীজ,

ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙিয়ে বি. ও. এ. সি. এয়ার লাইনে যাওয়ার ব্যবস্থা করে বাসায় এলাম আড়াইটায়। থাই-ভারত লজের গ্রন্থাগারটি মোটামুটি ভাল। তাদের অনেক বই এনে জড় করেছি বিছানায়—বসে বসে সেগুলি পড়লাম।

বিকালে শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাশ ও আমি একটি বৌদ্ধ বিহারে গেলাম। সমাধি শেখাবার আয়োজনটি ভাল করে দেখলাম। এই সমাধি লাভের প্রচেষ্টার মধ্যে যেন এক শুষ্কতার ও পরাজয়ের ভাব রয়েছে—আমার কাছে এটা তত ভাল লাগল না। সন্ন্যাস ও ত্যাগ ভাল, কিন্তু সেটা যদি জোর করে হয়, তবে সেটা মানুষকে করে নির্জীব এবং মৃতকল্প। যিনি মঠের অধিনায়ক তাঁর নাম ভিক্ষু বিমলধর্ম, তিনি আলাপী এবং উদার। বললেন—ভারতবর্ষ ও শ্যামের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা একান্তভাবে কর্তব্য। তিনি আরও জানালেন যে ভারতবর্ষ থেকে যদি শিক্ষার্থী আসে, তবে তাঁরা তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেবেন। আলাপের সময় বন্ধুবর করুণা দোভাষীর কাজ করলেন।

বৃহস্পতিবার। আজ সকালে একাই চললাম। থাই-ভারত লজে আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে, তারই নিমন্ত্রণের ভার রাজেন্দ্রের উপর। প্রথমে গেলাম স্বাধীনতা-তোরণ দেখতে। স্বাধীনতার যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের স্মৃতির জন্য এই আয়োজন। বিস্তৃত স্থানে সুন্দর মনুমেণ্ট—সেখান থেকে বোভরনিবেশ মঠ ও স্বর্ণ মন্দির দেখে বাসায় ফিরলাম। স্বর্ণ মন্দিরকে ওরা বলে ওয়াট সাকেত।

শুক্রবার সকালে উঠে মর্মর মঠে গেলাম—একে ওরা বলে ওয়াট বেনচামা বোপিত্তর। একটি ছেলে বাসের নাম ও নম্বর বলে দিল। তারই সহায়তায় যাত্রা সুগম হল। সেখানে গিয়ে ভিক্ষু আনন্দের সঙ্গে দেখা। ভিক্ষু সব তন্ন তন্ন করে দেখালেন। তারপর গেলাম Institute of National Culture, থাই সংস্কৃতি প্রচারের কেন্দ্র।

বিকালে ৫॥টায় বক্তৃতা দিলাম—ফিয়া অনুমান রাজধন সভাপতি হলেন। ইনি ডি. লিট। সরকারি নানা কাজের শেষে বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করছেন। আমার বক্তৃতাটি জনপ্রিয় হয়েছিল।

শনিবার সকালে উঠে গেলাম ওয়াট রাজবোপিত্তর ও ওয়াট রাজপ্রদিস্থ দেখতে। প্রথমটিতে রয়েছে মুক্তা খচিত দরজা—দ্বিতীয়টি খের জাতির তৈরী। পথে চলবার পূর্বে একটি চীনার দোকানে টিকিট কিনে চিঠি পাঠালাম দেশে এবং জাপানে। তারপর দেখলাম—রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন মঠে পান্নার তৈরী বুদ্ধমূর্তি, এখানে রামায়ণের সুন্দর চিত্রাবলী আছে। তারপর রাজপ্রাসাদ দেখার জন্য গেলাম। সেখানকার দ্বারীরা বলল—পাবলিক রিলেশনস্ বিভাগ থেকে অনুমতি আনতে হবে। সেখানে দৌড়ালাম, তারা বলল, ৩০ টিকল দক্ষিণা লাগবে—তাই ফিরে এলাম। এসে শুনলাম আজ ভারতীয় দূতাবাস থেকে লোকজন প্রাসাদ দেখতে আসবে, আমি যদি তাদের সঙ্গে যাই তাহলে অসুবিধা হবে না। বসবার ঘরে তাদের অপেক্ষায় রইলাম। দূতাবাস থেকে এল দেশাই, তার পরিবার ও কয়েকজন ভারতবাসী। একজন ছিল বোম্বেওয়ালা——সে এসেছে Transport কোম্পানীর পক্ষ থেকে। ওদের সঙ্গে ভিতরে গিয়ে রাজপ্রাসাদের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দেখে নিলাম।

বেলা দুইটায় বৌদ্ধ বিহারে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল—আমি ইংরেজীতে বলে গেলাম আর দূতাবাসের করুণা তার অনুবাদ করে চলল। করুণার এ বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা। এই বিহারের অধ্যক্ষ সংঘের পক্ষ থেকে বই উপহার দিলেন।

থাই-ভারত-লজের সঙ্গেই ভারত-বিদ্যালয়,

সেখানে আজ জন্মাষ্টমী উৎসবের বিরাট আয়োজন। শ্যামপ্রবাসী বহু ভারতীয় সমবেত হলেন এবং বৈচিত্র্যময় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসব সমাপ্ত হল। তারপর নিকটের এক বিষ্ণুমন্দিরে গেলাম—সেখানকার পূজারী ব্রাহ্মণ।

রবিবার ২২শে আগষ্ট। আজ সকালে ঘরে বসে রাধাকৃষ্ণনের ভারতীয় দর্শন পড়লাম। সাড়ে দশটায় এলেন আসাম থেকে ভুলেশ্বর কোঙার—ভদ্রলোক এম্‌-এ, বি-টি Unesco থেকে বৃত্তি পেয়ে এখানে গবেষণা করতে এসেছেন। ১১টায় এলেন সংঘবাসী, প্রথমে ন্যাশনাল লাইব্রেরী দেখাতে নিয়ে গেলেন—তারপর বৃদ্ধা রাজকুমারী পুণা দিস্‌কুলের ওখানে গেলাম—তিনি নিজের চেষ্টায় পাণ্ডিত্য লাভ করেছেন। আমি আমেরিকায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে চলেছি রাজকুমারী সেখানে ছিলেন, সেখানকার দু'চারটি গল্প বললেন। বিকালে খুব বৃষ্টি হল। সন্ধ্যায় দূতাবাসের রায় চৌধুরীর বাসায় নিমন্ত্রণ ছিল। অমরনাথজী তাঁর গাড়ী করে দাশগুপ্ত, দেবনাথ দাশ এবং আমাকে নিয়ে চললেন। আহারের বেশ চমৎকার আয়োজন হয়েছিল। বিদেশে একদিন দেশের মত করে খাওয়া গেল স্ফূর্তিতে এবং হাস্যমুখর আলাপ আলোচনার সাথে। বাসায় ফিরতে রাত হল।

সোমবার পুরাতন রাজধানী অযোধ্যায় যাওয়া স্থির ছিল। রঘুবীরজীর ভাইপো বিজয় যাবে আমার সাথে। খুব ভোরেই এল ছেলেটি, তার সাথে সামলো (মোটর রিকসা) করে বড় ষ্টেশনে গেলাম। সাতটায় গাড়ী ছাড়ল। থাইজাতি প্রথমে ইয়াংসী নদীর অববাহিকায় বাস করত—তারপর শত্রুর প্রতিবন্ধকতায় ওরা নেমে আসে তাদের প্রতিষ্ঠিত নান-চাও রাজ্য ছেড়ে শ্যামদেশে—চাও ফিয়া নদীর ধারে ধারে ওরা নেমে আসে এবং একাদশ শতাব্দীতে সুকথাই নগরে ওদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এক শতাব্দীর পরে ফ্রা চাও উথং এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বর্মারাজের অত্যাচারে এখানকার রাজা পলায়ন করেন এবং তার এক অনুচর ব্যাঙ্ককে রাজধানী স্থাপন করেন।

গাড়ী চলল—দুধারে দিগন্তবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র; শ্যাম শোভা দেখে এদেশের শ্যাম নাম সার্থক বলে মনে হল। চলতে চলতে মনে হল এই সবুজ মায়া যেন দক্ষিণ বাংলার প্রতিচ্ছবি।

বেলা নয়টায় অযোধ্যা পৌঁছে গেলাম। ষ্টেশনের পাশেই নদী—খেয়ায় সে নদী পার হয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে গেলাম রঘুবীরের পরিচিত ভগবান দাসের ওখানে—ওরা চা খাওয়াল। তারপর আমরা প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে রওনা হলাম—কিছুই নেই—শুধু ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত পাথরের ভাঙ্গা ভাঙ্গা টুকরা অতীতের ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য বহন করছে। একটি মাত্র মন্দিরের মাঝে বুদ্ধমূর্তি আছে—এ মন্দিরটিও আস্ত নেই।

বাসায় ফিরে সন্ধ্যা ছয়টায় এখানকার অভিজাত প্রতিষ্ঠান শ্যাম-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে গেলাম—লোকজন বেশী হয় নি; জন কুড়ি পঁচিশ, তবে তারা শহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি।

মঙ্গলবার সকালে ভারতীয় দূতাবাসে গেলাম—তখন দূতাবাসে রাষ্ট্রদূতের পদে কেউ ছিলেন না, শেঠী বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী,—বেশ আলাপী; কোকাকোলা খাওয়ালেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক সেট বই দিলেন। সে বইগুলি থাই-ভারত লজে দিয়ে এলাম, এতে প্রচারের কাজ হবে।

ওখান থেকে রঘুবীরের দোকানে গিয়ে কিনলাম ঝাঁপি, পুতুল ও কুরুনি। শ্রীযুক্ত দাশ দেশে ফিরবেন, তিনিই সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। দেবনাথবাবুর সৌজন্যে এখানকার স্মৃতিচিহ্ন কিছু দেশে পাঠানো সম্ভব হল।

সংঘবাসী এলেন ৪-১৫ মিনিটে—এদের একটি বৌদ্ধসভা আছে, তিনি তার সহ-সভাপতি; সেখানে বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন। আমি অমিতাভের অমের প্রভাবের কথা বললাম। ফিরে এলাম লজে। রাত্রে রঘুবীর খুব খাওয়ালেন। ওদের যাত্রী-প্রশস্তির খাতায় লিখলাম একটি বাংলা কবিতা, অবশ্য তার ইংরেজী অনুবাদও সঙ্গে সঙ্গে করে দিলাম। রঘুবীর খুব খুশী হয়ে বললেন—আবার যেন আসি। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা এ জীবনে ঘটবে কিনা জানিনা, কিন্তু শ্যামদেশে ফিরবার ইচ্ছা বারবার মনে জাগে, কারণ ব্রহ্মদেশের ব্যবধানে শ্যামে রয়েছে সংস্কৃতভাষার এবং ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন। *শ্যামদেশের রাজাদের নাম—প্রথম* রাম, দ্বিতীয় রাম; অযোধ্যা, লবপুরী, রামায়ণের চিত্রাবলী বুঝিয়ে দেয় যে এখানে একদিন রামায়ণ আপন অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

বুধবার খুব সকালেই উঠলাম; স্নান ও প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে চা খেয়ে মোটরে বি. ও. এ. সি. অফিসে এলাম—শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাশ বা ভুলেশ্বর কোঙার কেউই সঙ্গে আসতে পারলেন না। অফিসে পৌছালাম ৭-১৫ মিনিটে—অফিস খুলবে ৮টায়; কাজেই পাশের দোকানে বসে রইলাম। এখান থেকে বাসে করে এরোড্রোমে পৌছলাম ৯-১৫ মিনিটে।

বিমান ছাড়ল ১০-২৫ মিনিটে। বিমান থেকে দেখলাম শ্যামের শ্যামল কান্তি। মনে জাগল এই দেশের মানুষের প্রেমময়, মধুময় ব্যবহার; সংঘবাসী এবং করুণা কি সজ্জন এবং অমায়িক! আমার কয়েকদিনের প্রবাসজীবনকে তাঁরা আনন্দে, শিক্ষায় পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন। তাদের সেই মৈত্রী স্মরণ করে হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগল শ্যামে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বীর সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মীদের বীরত্ব ও ত্যাগের কথা। শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাশের সংস্পর্শে সেই অতীত মহাগৌরবের কাহিনী কিছু কিছু শুনেছিলাম, বিমানে সেই সব কথা ভাবতে ভাবতে কি যেন এক স্বপ্নে মগ্ন হয়ে পড়লাম!

তোমার কৃপা*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কেমন ক'রে মিলল কৃপা—জনে জনে আজ শুধায়।
জানি চরণচিহ্ন শুধু, চরণদিশা কেউ কি পায়?
কেমন ক'রে চোখের জলে
ভয় ভাবনা যায় যে গ'লে,
অভিমানের ছলাকলা লাজ পেয়ে নাথ, মুখ লুকায়—
দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা শুধু সরল প্রার্থনায়।

---

* জন্মাষ্টমীর দিন রচিত

স্বজন কারা—নিত্য সাথী—তীর্থপথে ধরে হাত,
কার নাম উষার সাধন—দেখায় কৃপার সুপ্রভাত।
মনের মানুষ আসে কাছে
কেমন ক'রে মনেব মাঝে,
মিথ্যা মিতা কারা ভাবের ঘরে চুরি করতে চায়—
দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা শুধু সরল প্রার্থনায়।

সত্য ভেবে অসত্য যেই করি ঘোষণ রোখ ক'রে
দুঃখ আসে আকাশ ছেয়ে—কৃপার আলো যায় স'রে।
কুতর্কে হায় হারিয়েছি কী—
অনুতাপে দেখতে শিখি,
দূরে গিয়েও কেমন ক'রে আবো কাছে পাই তোমায়—
দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা শুধু সবল প্রার্থনায়।

তোমার কৃপার মহাপ্রসাদ—যে পেয়েছে সেই জানে,
হাসির আলোয় কান্না কালোয় তাবি অভয় পাই প্রাণে।
তোমার জন্মদিনে প্রিয়,
ডাকি—তুমিই চিনিয়ে দিও
কৃপার স্বরূপ—যার বরে আজ চাই শুধু ঠাঁই চরণছায়,
বাঁশির সুরে বৃন্দাবনের পাই ঠিকানা নিদিশায়॥

স্বামীজীর দান

'পথিক'

স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী কোন পণ্ডিত একদিন হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, স্বামীজীর বিশেষ দান কি? আমি বলিলাম, জগতের উপর তাঁহার কি প্রভাব তাহা বলা আমার অসাধ্য: এজন্য আমার জীবনে স্বামীজীর কি দান, তাহাই মাত্র কথঞ্চিৎ বলিতে পারি। তবে সেই বর্ণনায় দেশের ইতিহাসে তাঁহার দান কি, তাহারও সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

ভাব-বিনিময়

স্বদেশী যুগের পূর্বে (১৯০৩-১৯০৪) ইংরেজের নিকট সংকুচিত হওয়া, নত হওয়া, ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ববিষয়ে অধিনায়কত্ব মানিয়া লওয়া আমার মত অনেকের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

স্বদেশী যুগের সূচনায়, স্রোত, একেবারে উল্টা বহিতে লাগিল—অর্থাৎ যাহা কিছু আমার দেশের তাহাই সমগ্রভাবে ভাল এবং যাহা কিছু ইংরেজের

তাহাই মন্দ—এই ধারণা জন্মিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এই ভাব নিছক ভাবপ্রবণতা। আমাদের দেশের বিশেষত্ব কি, শ্রেষ্ঠতাই বা কি, দোষ ত্রুটি কোথায়—বিদেশীর শ্রেষ্ঠতা কোথায়, ন্যূনতাই বা কিসে, তদ্বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকায়, উক্ত দ্বিবিধ অপসিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

স্বামীজীর রচিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' 'পরিব্রাজক' ও 'বর্তমান ভারত' নামক গ্রন্থত্রয়, এই কালে পাঠের সুযোগ হওয়ায় পাশ্চাত্যের বহু সদ্‌গুণ আমাদের নিজস্ব করা আবশ্যক বুঝিলাম। অপরপক্ষে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া পরিষ্কার অনুভব করা সম্ভব হইল যে সংকুচিত হওয়া, নত হওয়া, সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়া, পাশ্চাত্যের অনুসরণ করিবারও হেতু নাই। পাশ্চাত্যকে দিবার মত এক অতি আবশ্যকীয় অমূল্য বস্তু আমাদের আছে, অধিকন্তু অনেক বিষয়ে আমরাও দাতা হইতে পারি।

আদান-প্রদানের ব্যাপার সঠিক ধরিতে বুঝিতে পারিলেই, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও মেলামেশা সহজ হইবে, এবং বহু অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। পরস্পরকে ভুল বুঝিয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক মনোমালিন্য ঘটে। অতএব যিনি ভুল বুঝিবার মহাবিপদ হইতে নিষ্কৃতিদানের সহায়ক তিনি মহাত্মা। যেমন জাতিগতভাবে, তেমনি ব্যক্তিগতভাবেও, যাহাদের সহিত মেলামেশা করিতে হয় তাহাদের চিন্তাধারার সহিত সম্যক্ পরিচয় হইলেই অনেক অনর্থ হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

এই উভয় ক্ষেত্রে স্বামীজীর দান অমূল্য।

শাস্ত্রানুশীলনে দিগ্‌দর্শন

শিক্ষকবিহীন অবস্থায় যোগসূত্র বা পাতঞ্জল দর্শন পড়িতে গিয়া আমার মত অনেকেই স্বামীজীর রচিত "রাজ-যোগ" গ্রন্থকে শিক্ষকরূপে পাইয়াছেন। এত বড় সুদক্ষ শিক্ষক পাওয়া মহাভাগ্য! জটিল বিষয় সরল করিতে উপলব্ধিমান্ স্বামীজী তাঁহার গুরুদেবের ন্যায় সুদক্ষ।

উপনিষদ্ পাঠকালেও আচার্যবিহীন অবস্থায় ভাগ্যবলে স্বামীজীর "বেদান্ত চিন্তা" (Thought on Vedanta) নামক পুস্তক হাতে আসিল। এই গ্রন্থ পাঠে জীবনের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইল। কিছুকাল পরেই তাঁহার "ধর্মবিজ্ঞান" (Science Philosophy of Religion) পাঠের সুবিধা হয়। এই দুই গ্রন্থ আমার "বেদান্ত" পাঠের শিক্ষক; গ্রন্থদ্বয়ের প্রাঞ্জলতা, গাম্ভীর্য্য ও প্রাণবত্তা শিক্ষা-ব্যাপার সহজ ও নির্ভুল পথে চালিত করে।

বস্তুতঃ স্বামীজীর রচিত পুস্তকাদির সহায়তা না পাইলে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম অনেকেই ঠিক ঠিক ধরিতে বুঝিতে পারিবেন না। উদার ও উপলব্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিই শাস্ত্রাধ্যাপক হইবার যোগ্য, কিন্তু এবংবিধ আচার্য সুদুর্লভ।

শাস্ত্রাধ্যয়ন জীবনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া উহাকে সুন্দর শোভন এবং অতীব আনন্দময় করিয়া তোলে। এখানে স্বামীজীর নিকট ঋণ অপরিশোধ্য।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় দর্শনে সুপণ্ডিত কোনও সাধুকে এক সভায় বলিতে শুনিলাম, "স্বামীজীর গ্রন্থ পাঠের সুবিধা না পাইলে আমি শাস্ত্রমর্ম বুঝিতে পারিতাম না।"

বাংলা ভাষার অনুশীলন

মনোভাব প্রাঞ্জল ও পরিষ্কাররূপে প্রকাশার্থ বাংলাভাষার কিঞ্চিৎ অনুশীলনকালে স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' 'পরিব্রাজক' 'বর্তমান ভারত', কয়েকটি কবিতা এবং কয়েকখানি পত্র -পাঠের সৌভাগ্য হইয়াছিল। পড়িয়া বুঝিলাম, এ সাধারণ ভাষা নয়—এ যেন কেহ আবেগপূর্ণভাবে ছন্দে কথা কহিতেছে! এমন রচনাভঙ্গী প্রাণে আঘাত করিয়া উন্মাদনা আনয়ন করে! গভীর ভাব, অকপট ও প্রাঞ্জল প্রকাশ—যেন বাধাহীন নির্ঝরের

প্রবাহ! ফলে, অকপটভাবে আত্মপ্রকাশের একটি বিশেষ প্রণালী খুঁজিয়া পাইলাম।

চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা! মতবাদ বা পূজাপদ্ধতি গৌণ

চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা—ইহা স্বামীজীর জীবনালোচনায় এবং তাঁহার বক্তৃতাদি পাঠে প্রথম সুস্পষ্ট হইল। এমন কি, যে ব্যক্তি আদৌ মিথ্যা ব্যবহার করে না, অহংকারী নহে, সর্বদা সংযমী—সেই প্রকৃত ধার্মিক—তা সে সাধনভজন জপতপ করুক বা না করুক—ইহা বিশ্বাস হইল।

কে কী কার্য করিতেছে—এ প্রশ্ন অবান্তর, কে ভাবশুদ্ধ, তাহাই মাত্র সারকথা। এই মহৎ ও উদার তত্ত্ব স্বামীজী শুনাইলেন।

স্বামীজীর জীবনে, প্রচারে ও রচনায়—চরিত্রবলই যে আধ্যাত্মিকতা তাহা বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শাস্ত্রবর্ণিত সিদ্ধের লক্ষণসকল, জীবনে আচরণ করিয়া নিজস্ব করাই আধ্যাত্মিক সাধনা; ইহা তিনিই প্রথম ধরাইয়া দিলেন। ধর্মচর্চা—পোষাকী কাপড়ের ন্যায়—কখনও, কদাচিৎ ব্যবহার্য ব্যাপার নহে, অত্যন্ত আটপৌরে ব্যাপার। সকল চিন্তায় ও কার্যে ইহার নিরন্তর অনুশীলন আবশ্যক। এই ভাব তাঁহার জীবনালোচনায় ও গ্রন্থাদি পাঠে বুঝিতে পারিলাম।

সৎসাহস, পবিত্রতা, সংযম, স্বার্থত্যাগ, কর্তৃত্বাভিমান-শূন্যতা চরিত্রবান্ ব্যক্তির লক্ষণ। স্বামীজীর সৎসাহস দুর্জয়, পবিত্রতা অনন্যসাধারণ, সংযম ও স্বার্থত্যাগ এবং বিশেষভাবে কর্তৃত্বাভিমান-শূন্যতা অতুলনীয়!

ধর্মযাজক, ধর্মপ্রচারক এবং ধর্মজীবন গঠনকল্পে উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে উক্ত গুণাবলী কিছুটা বিকশিত থাকিলে সামাজিক জীবনের তিক্ততা ও ঈর্ষাদ্বেষ অনেক হ্রাস পাইত।

সর্বজীবে দেবত্ব

শাস্ত্রে পড়িয়াছি "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যাহা কিছু আছে সকলই ব্রহ্ম; কিন্তু—প্রত্যেক জীবের মধ্যেই যে সমভাবে "দেবত্ব" (ব্রহ্মভাব) বিদ্যমান—এই তত্ত্ব আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া উজ্জ্বল করিয়াছেন স্বামীজী। তাঁহার পূর্বে কেহই এই তত্ত্ব এত প্রবলভাবে এবং অকুণ্ঠিত মনে খুলিয়া বলিতে পারেন নাই। "বনের বেদান্ত"কে তিনি বিচিত্র ও বহু বিবদমান সমাজে আনিবার বিপুল প্রয়াস করিয়াছেন। নানাভাবে, চতুর্দিকে লোকসেবার ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার প্রচার ক্রমশঃ সফল হইতেছে।

আমরা অল্লাধিক সকলেই আত্মবিস্মৃত। নিজ নিজ দেবভাবে বিশ্বাস নাই। আত্মপ্রত্যয় জন্মান মহৎ কার্য। আত্মবিস্মৃত জীবকে ও আত্মবিস্মৃত জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ী করিবার সুমহৎ দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করিয়াছেন তিনি দেব-মানব। স্বামীজীর এই অবদান শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞান দানই সর্বোত্তম।

লোকসেবা ও সৎকার্যের মধ্যে যে বহুবিধ ফাঁকি থাকিতে পারে, তাহা স্বামীজী বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে সাধক, কর্মী ও সেবকগণ সতর্ক হইতে পারেন!

প্রকৃত লোকসেবকের মনোভাব কীদৃশ, তাহা তিনি নিজ জীবনে আচরণ করিয়া পরিস্ফুট করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। দেশবাসীর প্রতি কি দরদ তাঁহার ছিল সে সম্বন্ধে একটি মাত্র ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করিলেই তাহা স্পষ্ট হইবে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন কালে এডেন বন্দরে জাহাজ থামিলে, স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশের শিষ্য ও শিষ্যাসহ ভ্রমণকালে, উহাদিগের সহিত কথোপকথনের মধ্যে, উহাদিগকে কিছুই না বলিয়া, হঠাৎ সমীপস্থ একটি দোকানে প্রবেশ পূর্বক ভারতীয় দোকানীদিগের সহিত মহা আনন্দে নানা বিষয়ক আলাপ করিতে

লাগিলেন—উহাদের ধূলিধূসরিত চাটাইয়ের উপরই বসিয়া উহাদেরই খেলো হুঁকায় তামাকু সেবন করিতেছেন! অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত করিয়া শিষ্যদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা অবাক্ হইয়া পূর্বস্থানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। উহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক স্বামীজী বলিলেন, "দেখ বাপু, দেশের লোক দেখিলে আমি আত্মহারা হইয়া যাই: রীতিনীতি, ভদ্রতা ও আদব-কায়দার দিকে খেয়াল থাকে না।" স্বদেশবাসীর প্রতি প্রবল অনুরাগ ঢাকিয়া চাপিয়া চলা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক।

নারীজাতি ও সাধারণজন

মাতৃজাতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর প্রতি দরদ যদি আজ যৎকিঞ্চিৎ আমাদের হইয়া থাকে, তাহা স্বামীজীর প্রভাবে। উক্ত দুই ভাবের পুষ্টিসাধনে অনেক মনীষী সহায়ক হইলেও, পত্তন স্বামীজীই করিয়াছেন। বিশিষ্ট নেতারাও ঐ বিষয়ে তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। স্বামীজীর গুরুভাই এবং সহকর্মী পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দজী একদিন রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁহারা নেতৃস্থানীয় তাঁহাদের কিছু প্রশংসা করিয়া অবশেষে কহিয়াছিলেন, আমরা বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, তাহার ফল হইতেছে এই জাতীয় জাগরণ।

নারীর ন্যায্য অধিকার-প্রাপ্তি এবং পতিত ও অপমানিত জাতির মঙ্গলসাধনের বিপুল প্রয়াস দেখিয়া স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ বলিতেন—"নেতারা স্বামীজীর আরব্ধ কার্যই করিতেছেন।"

বস্তুতঃ স্বামীজী যাহা সূত্রাকারে বলিয়া এবং সবেমাত্র সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরবর্তিগণ সেই সকলেরই বহুবিস্তার করিতেছেন।

মাতৃজাতি ও জনসাধারণ, এতদুভয়ের উন্নতির জন্য স্বামীজীর ব্যাকুলতা অতীব অসাধারণ। সারা-জগতেই ইঁহাদের প্রতি অবহেলা অত্যধিক। তাই কি তিনি নারীজাতি এবং জনসাধারণের মূর্তিমান্ দরদী হইয়া আসিয়াছিলেন?

ব্যথিতের দুঃখে তাঁহার হৃদয় মথিত হইয়াছিল। শূদ্র-সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং মাতৃ-জাতিকে স্বাভাবিক মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, তিনি ব্যাকুল হইয়া দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন—গিরিগহ্বরে তপস্যা করিতে যাইয়াও স্থির থাকিতে পারেন নাই।

স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে, জনসাধারণ ও মাতৃজাতির দুঃখময় অবস্থার উন্নতি-প্রচেষ্টা এক অপরিহার্য বিধি। বিদেশে থাকাকালে যতবার তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, ততবারই তাঁহার শিষ্য ও সেবকগণকে বলিয়াছেন, "কখনও ভুলিও না, নারী ও জনসাধারণ।"

আমেরিকা হইতে ক্ষেত্রীর রাজার নিকট, ফনোগ্রাফ সহায়ে স্বামীজী যে বাণী প্রদান করিয়া-ছিলেন, তাহাতেও ঐ একই কথা। ঐ সময় তাঁহাকে নূতন করিয়া ভাবনা চিন্তা করিতে হয় নাই। যাহা হৃদয়ে পূর্ব হইতেই দৃঢ়মুদ্রিত ছিল, স্বতই তাহা বাণীরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল।

কিভাবে মাতৃজাতির নূতন শিক্ষা-দীক্ষা হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি সূত্রাকারে তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক কথায়, আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে সকল নৈসর্গিক ও আরোপিত প্রতিবন্ধক বিদ্যমান, সে সকলের সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যই শিক্ষা আবশ্যক। ইহাই ছিল তাঁহার সিদ্ধান্ত। তাঁহার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী, উদার এবং অগ্রগামী। প্রাচীন হইলেও যাহা কল্যাণকর তাহা রক্ষণীয়, তাহা রাখিতে তিনি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন এবং অতীতের সহিত যাহাতে বর্তমানের যোগধারা অবিচ্ছিন্ন থাকে, সে দিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। দুই একটি উদাহরণ দিলে এই ভাব পরিষ্কার হইবে। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও শিক্ষার বহুল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধারা অনুযায়ী

পতির প্রতি একনিষ্ঠ সৌহার্দ্য ও পতির পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার রীতি পরিত্যক্ত না হইয়া যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। নির্জনে আত্মচিন্তারতা কিংবা পরহিতপরায়ণা নারী তাঁহার নিকট ত্যাগ, পবিত্রতা ও সরলতার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হইতেন।

আধুনিক পদার্থবিদ্যা (Science) প্রভৃতি স্ত্রী-শিক্ষায় অত্যাবশ্যক, কিন্তু প্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্যাও আয়ত্ত করিতে হইবে। অধ্যাত্মবিদ্যা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিজ্ঞানাদি অবশ্য পঠনীয়, ইহাই ছিল স্বামীজীর অভিমত। শারীরিক শক্তিবৃদ্ধি, আত্মরক্ষায় সুপটু হওয়ার জন্য যথোচিত বিধান, বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগেরও সমভাবে আবশ্যক। কিন্তু তাহাদের কোমলতা যেন কদাপি নষ্ট না হয়, ইহা অবশ্য দ্রষ্টব্য; বীরের দৃঢ়তার সহিত মাতৃহৃদয়ের স্নেহশীলতার একত্র অবস্থিতি—তিনি অতীব বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন।

এ বিষয়ে স্বামীজীর শেষ অভিপ্রায় ছিল, নারী-শিক্ষা ঠিক কিরূপ হইবে, নারীই তাহা নির্ধারণ করিবে। এখানে পুরুষের অধিকার নাই।

জনসাধারণকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে তাহারও বিস্তারিত ইঙ্গিত স্বামীজী দিয়াছেন পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে।

সাধু

কাজী মোঃ হাশমৎউল্লাহ এম্-এ, বি-এল্

স্বল্পাহার, স্বল্পনিদ্রা, স্বল্পভাষা আর
সাধু—যে সংকল্প করে অভ্যাস সাধা'র।
চিত্ত হয় শক্তিশালী হেন সাধনায়
বিত্ত তারা জগতের, নমস্য ধরায়।

অন্তর একাগ্র রাখে প্রভুর চরণে—
কল্যাণ-প্রেরণা জাগে শত রূপায়ণে—
স্বতই সাধনধারা বহে অবিরত
মজিয়া মজায় ধরা দেবতার মত।

ক্ষণেকের সাধুসঙ্গ জীবনে সম্পদ—
বন্দনা অর্চনা হ'তে শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি

শ্রীপ্রণব ঘোষ, এম্-এ

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভারতবাসীর সাধারণজীবনেও অধ্যাত্মচেতনার সঞ্চার এত গভীরভাবে ঘটেছে যে, দৈনন্দিন জীবনের অজস্র দৈন্য সত্ত্বেও তাদের ঐতিহ্য ঐশ্বর্যময়। তাই 'পশ্চিমের দরিদ্র জনসাধারণের তুলনায় ভারতবর্ষের দরিদ্ররা তো দেবশিশু' স্বামীজীর এই উক্তিটির যথার্থতা সম্বন্ধে অরবিন্দবাবু যতই সন্দিহান হোন কথাটি অতি সত্য। তবে এই দেবশিশুরা যখন অধ্যাত্ম-সম্পদটুকুও হারাবে তখন কি হয় বলা কঠিন। এই দরিদ্র জনসাধারণকে বিদ্যাবুদ্ধিতে সমুন্নত করে পরম সত্যের অভিমুখী করে তোলাই ছিল স্বামীজীর আদর্শ। অরবিন্দবাবু লিখেছেন—"স্বামী বিবেকানন্দ নিজস্ব মতের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছিলেন এই বলে যে, তাঁদের (পাশ্চাত্ত্যের) ধর্মের ইতিহাস রয়েছে এবং থাকবেই, কারণ মানুষ

তার স্রষ্টা, কিন্তু হিন্দুধর্মের ইতিহাস নেই, থাকতেও পারে না, কারণ তা ঈশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত।" একথা তিনি কোথায় পেয়েছেন তা জানাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অপৌরুষেয় বেদ সম্বন্ধে স্বামীজীর স্পষ্ট উক্তি, "The Hindus have received their religion through revelation, the Vedas. They hold that the Vedas are without beginning and without end. *But by the Vedas no books are meant. They mean the accumulated treasury of spiritual laws discovered by different persons in different times.*"

সুতরাং বেদ অর্থে অনন্ত অধ্যাত্ম-জ্ঞান, যা যুগে যুগে সাধকহৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। বেশির ভাগ ধর্মই কোন বিশিষ্ট দেবমানবকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের মূল উৎস, কোন ব্যক্তি নয়, অনন্তজ্ঞান বেদ। বেদ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করেই সকল দেশের সকল কালের সাধকদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি। এই মনোভাবের উপরেই বহু শাখাবিশিষ্ট হিন্দুধর্মের ও ভারতসংস্কৃতির ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠিত।

স্বামীজী উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনগুলিকে খুব বেশী মর্যাদা দেন নি। তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক মনে করেছেন—"তাঁর (স্বামীজীর) মতে ধর্মই ভারতের সমাজ জীবনের মূল উৎস। এইজন্যই পূর্বগামীদের সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনকে তিনি সমর্থন তো করতে পারেনই নি, সুনজরেও দেখেন নি।" প্রথমেই বিবেচ্য স্বামীজী কোথাও ধর্ম ও সমাজকে এক করে দেখেছেন কি না এবং সমাজসংস্কারকদের প্রতি তাঁর 'সুনজর' না থাকার হেতু কি। এ বিষয়ে স্বামীজীর মতামত পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি—

"Beginning from Buddha down to Rammohun Roy, everyone made the mistake of holding caste to be a religious institution and tried to pull down religion and caste all together, and failed."

উনবিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ সংস্কার-আন্দোলন (সহমরণ-নিবারণ, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা) —এ সবের উপযোগিতা স্বীকার করে নিয়েও স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন, এ সমস্তই তো উচ্চবর্ণের সমস্যা। দেশের শতকরা ৯০ জন সাধারণ মানুষের জীবনকে এই সমস্যা স্পর্শ করেছে কি? নিম্নবর্ণের মানুষের ওই সব আন্দোলনের দ্বারা কী উপকার হয়েছে? তাই স্বামীজীর প্রশ্ন—" .....Where are those who want reform? where are the people? .. ..First educate the nation, create your legislative body, and the law will be forth coming".

শিক্ষার বিস্তার না হ'লে সমাজের সংস্কার উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে—জাতির অন্তরে তা প্রবেশ করতে পারবে না।

সুতরাং ধর্ম এবং সমাজকে স্বামীজী কোথাও এক করে দেখেন নি, সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করেন নি। কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দুসমাজেই গলদ রয়েছে এমন অশ্রদ্ধেয় অত্যুক্তিকে অস্বীকার করেছেন। অতীতের এবং বর্তমানের ভারতবর্ষের যে দুটি ছবি আমাদের চোখে ভাসে, স্বামীজী ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনার আলোকে তার মধ্যে প্রাণের যোগ দেখতে পেয়েছিলেন। ভারতের সর্বপ্রকার অধঃপতন সত্ত্বেও ধর্মের মধ্যেই তিনি জাতির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। অবশ্য ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায় ঐহিক জীবনের উন্নতি চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু,

কেশবচন্দ্র প্রমুখ পূর্বগামী সকলেরই লক্ষ্য এক। তবে কর্মপ্রচেষ্টার সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে স্বামীজীর মধ্যে। অরবিন্দবাবু বলতে চান—যে স্বামী বিবেকানন্দের মানস-পরিমণ্ডল এবং রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মানস-পরিমণ্ডল "সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের"—কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য—ওই পূর্ববর্তী যুগের অভ্যন্তরেই স্বামীজীর সম্ভাবনা নিহিত ছিল। ইউরোপকে যারা সর্বাংশে গ্রহণ করেছিল, তারা মুষ্টিমেয় অনুকরণকারী। আমাদের কোন জাতীয় নেতাই ইউরোপের সব কিছুকে গ্রহণ করেন নি। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সঙ্গে ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমন্বয়-সাধনই ছিল তাঁদের আদর্শ। এই সমন্বয়-সাধনাই সে যুগের সঙ্কেত।

কিন্তু অরবিন্দবাবুর চোখে পড়েছে শুধু "ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শন থেকে পাওয়া সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, সামাজিক আদর্শ, ব্যবহারিক জীবনাচরণের সার্বভৌম অঙ্গীকার ····" তাঁর মতে স্বামীজীর মানস-পরিমণ্ডলে এদের আর কোন মূল্য নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে "ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা এবং ন্যায়শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা থেকে যে বুদ্ধিবাদী যুক্তিবাদী মানস গড়ে উঠেছিল" তাকে স্বামীজী নাকি অস্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক স্বামীজীর নিম্নোদ্ধৃত লেখার বাঁকা অক্ষরের অংশটুকু উদ্ধৃত করে দেখাতে চেয়েছেন যে, যুক্তি বা বুদ্ধির চর্চাকে তিনি এড়িয়েই গেছেন। স্বামীজী দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশে বলছেন: ভালবাসার প্রেরণাই দেশপ্রেমের প্রথম কথা। বুদ্ধি বা যুক্তির চেয়ে প্রেমই বিশ্বরহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান দেয়।

"I believe in patriotism, and I also have my own ideal of patriotism. Three things are necessary for great achievements. First feel from the heart. *What is in intellect or reason? It goes a few steps and there it stops. But through the heart comes inspiration. Love opens the most impossible gates; love is the gate to all the secrets of the universe.* Feel, therefore, my would-be reformers, would-be patriots! Do you feel that millions and millions of the descendents of gods and of sages have become next-door neighbour to brutes."

এই উদ্ধৃতি সম্পূর্ণভাবে পড়লে এই মনে হয় যে দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে স্বামীজী হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রথম স্থান দিয়েছেন। এই জ্বলন্ত দেশপ্রেমও তো মানুষের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার যুক্তির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। স্বামীজী বলেছেন, বুদ্ধি বা যুক্তির দৌড় বেশীদূর নয়, হৃদয়ের পথেই অনুপ্রেরণা আসে। একটি অনুচ্ছেদের সামান্য অংশ তুলে দিয়েই অরবিন্দবাবু স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করেছেন যা সত্যবোধকে পীড়া দেয়।

যুক্তিবাদী মনন সম্বন্ধেও স্বামীজীর চিন্তাধারার পরিচয় তাঁর রচনাবলীর নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। যদি দেখতে না পাই তাহলে লজ্জার কারণ ঘটে। একটি মাত্র উদাহরণ তুলে দিচ্ছি—

"For it is better that mankind should become atheist by following reason than blindly believe in two hundred millions of gods on the authority of anybody."

স্বামী বিবেকানন্দ এই যুক্তির পন্থা অনুসরণ করেই দুর্গত মানুষকে প্রথমে অন্ন, তারপরে শিক্ষা, এবং তারপরে জ্ঞান দান করতে বলেছেন। কিন্তু একথাও স্মরণীয়, প্রচলিত শিক্ষার অভাবেই অধ্যাত্মজ্ঞানের অভাব ঘটে না। যুগ যুগ ধরে এ দেশের নিঃসম্বল সাধারণ মানুষের মধ্যে অধ্যাত্ম সাধনার ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। মধ্যযুগের

বেশির ভাগ মরমিয়া কবিই এই নিরক্ষর সাধারণ মানবসমাজ থেকে উদ্ভূত। বাংলাদেশের বাউল গানও কোন পণ্ডিতের রচনা নয়।

ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা কি বুঝতে না পেরেই অরবিন্দবাবু লিখেছেন—"রাজা রামমোহন প্রভৃতির মধ্যে যে কালসচেতন দূরদৃষ্টি এবং প্রবাহিত হতে-থাকা ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে নির্ভুল উপলব্ধি আমরা লক্ষ্য করেছি, বিবেকানন্দে তার কোনরূপ স্বাক্ষর নেই।" কোন মন্তব্য পেশ করার আগে আমরা 'ব্যবহারিক' জীবনের ক্ষেত্রে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি—তিনি চিঠিতে লিখছেন—

"শশী* তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্যে পরিণত করিতে পারিস তবে জানব তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। ····· গোটা কতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু Chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরীব গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' উপদেশ কর—কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে তাই চেষ্টা কর পুঁথি-পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও।" (পত্রাবলী প্রথম ভাগ পৃঃ ১৯৭) উদ্ধৃতাংশটুকুর মধ্যে লক্ষণীয়, স্বামীজী ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় ধরণের শিক্ষার কথাই বলেছেন।

'পরিব্রাজক' বইটিতে স্বামীজী যে ভবিষ্যৎ ভারতের ছবি এঁকেছেন, আজকের দিনের ব্যবহারিক জীবনবোধসঞ্জাত গণ-আন্দোলনের তাই তো প্রকৃত রূপ—"তোমরা (ভারতের উচ্চবর্ণেরা) শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে; জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে,—তাতে পেয়েচে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে—তাতে পেয়েচে অটল জীবনীশক্তি।" উনবিংশ শতাব্দীর শেষ মুহূর্তে এই দর্শন কি 'কাল সচেতন দূরদৃষ্টি'র স্পষ্ট স্বাক্ষর নয়?

স্বামীজীর 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'পত্রাবলী' পড়বার পরে কেউ যদি অরবিন্দ বাবুর মন্তব্যটি পড়েন—"ধর্মসম্পর্কহীন ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর (স্বামীজীর) অনুসন্ধিৎসা খুবই সামান্য, নেই বললেই চলে—" তিনি অনায়াসেই বুঝবেন এ মন্তব্যের মূল্য কি। বহু বিচিত্র ব্যবহারিক জীবনকে স্বীকার করেও অধ্যাত্ম আদর্শেই তিনি ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি দর্শন করেছেন। ভারতের ইতিহাসের এই অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যা শুধু স্বামীজী নয়, ভারতের প্রত্যেক মনীষী ও মহাপুরুষ করে গেছেন। এ ব্যাখ্যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন, তা স্বীকার করি। কিন্তু একটা প্রশ্ন তবু থেকে যাবে, অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যা যদি অচল হয়, বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকেই বা চিরসচল মনে করার কারণটা কি? অধ্যাত্মবাদের অনুরক্তি অনেক সময় গোঁড়ামি আনে বটে, কিন্তু যে বস্তুবাদী দর্শন জীবনের গভীরতম প্রশ্ন ও বেদনার কোন উত্তরই দিতে পারে না, তার প্রতি অন্ধবিশ্বাসও সমান গোঁড়ামি। বস্তুবাদই একমাত্র সত্য দর্শন এমন কথা আজও প্রমাণিত হয় নি। ভারত যে চিরন্তন চরম সত্যকে উপলব্ধি করেছিল, অরবিন্দবাবু তাকে বস্তুজগতের নিয়ত পরিবর্তনশীল সত্যগুলির সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। "Truth is one, truths are many" স্বামীজীর এই

* স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

সংজ্ঞাটিই ব্যবহারিক জগতের পরিবর্তনশীল সত্যের সঙ্গে অপরিবর্তনীয় মূল সত্যটির পার্থক্য সূত্রাকারে বুঝিয়ে দেয়। অরবিন্দবাবুর মতে স্বামী বিবেকানন্দ "ধর্ম এবং অধ্যাত্ম মুক্তিচিন্তাকে অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়, পরম জাতীয় প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন।" এবং তার সঙ্গে নাকি "কালের গরজের সম্পর্ক খুব কমই ছিল।" আমাদের দেশের জাতীয় জীবনের প্রেরণা যে আধ্যাত্মিক এ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন এখানে নেই, কারণ সেটা দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। কিন্তু ধর্ম আর মুক্তিচিন্তা ঠিক এক জিনিস নয়। ভারতবর্ষে জীবনের উদ্দেশ্যকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মোক্ষের স্থান সর্বশেষে এবং সবার উপরে। ধর্ম আর মোক্ষ এক জিনিস নয়। ধর্ম ক্রিয়ামূল; ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে; আর মোক্ষমার্গ শেখায় সুখের জন্য কর্ম করাও দুঃখ, দাসত্ব, বন্ধন। মোক্ষ নিয়ে যায় প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ইহ-পরলোকের সুখ দুঃখের পারে। ভারতের ইতিহাস থেকে স্বামীজী বুঝেছেন "এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। বৌদ্ধধর্মের পর হতে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হ'ল, খালি মোক্ষমার্গই প্রধান হ'ল। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষ অনুশীলন করে সে ত ভালই; কিন্তু ভোগ না হ'লে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর—তবে ত্যাগ হ'বে।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে ধর্ম এবং মোক্ষসাধনা এক নয়। ভোগেই ভোগের সমাপ্তি নয়—ত্যাগের মধ্যে ভোগের পরম অবসান। ভোগে অতৃপ্ত মানুষই চিরদিন ত্যাগের মধ্য দিয়ে সত্যলাভের আদর্শকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়েছে। আধ্যাত্মিকতার এই চেতনা কোন এক বিশেষ কালে উদ্ভূত হয় নি, এই চেতনা তো চিরদিনই মানুষের মনে জেগেছে, জাগছে, ভবিষ্যতেও জাগবে। এইজন্যই এ চেতনাকে স্বামীজী "অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়, পরম জাতীয় প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন।" এই প্রেরণার বশেই বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপীয় বস্তুবাদ সত্ত্বেও আমাদের এই অন্তরের পরম প্রয়োজনের দিকটি শূন্য ছিল বলেই আমরা আমাদের অতীত ইতিহাসে সত্যকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। এই আত্মানুসন্ধানই বিশেষভাবে উনিশ শতকের শেষার্ধের "কালের গরজ"—নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দেওয়াটা অথবা ইউরোপের বস্তুবাদকে সর্বাংশে স্বীকার করাটা তখনকার কালের গরজ নয়। এই আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ফিরে পেয়ে 'ভারতীয়' হয়ে থাকতে পেরেছি। নইলে ইংরেজী শিক্ষার ফলে মেকলের স্বপ্নই আমাদের পরিচয় হয়ে দাঁড়াত—"a class of persons Indian in blood and colour; but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect." উনিশ শতকের গোড়া থেকে আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্মমতকে জানবার জন্যে এদেশে এবং ইউরোপে আগ্রহ প্রকাশ পেতে থাকে। ভারতবাসী এবং বিশ্ববাসীর এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার দায়িত্ব স্বামীজী অতি সুষ্ঠুভাবে পালন করে গেছেন। বাইরের সভ্যতার যত চাকচিক্যই থাক অন্তরের ত্যাগ ও শান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হলে যে আমরাও আগ্নেয়-গিরির উপরেই নব সভ্যতার নগরী প্রতিষ্ঠা করে বসবো—এমন আশঙ্কা তাঁর ছিল। সেইজন্যই অধ্যাত্মসত্যকে ভিত্তি করেই তিনি নূতন ভারত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্য তিনি হিন্দুধর্মকে একমাত্র ভিত্তি করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এমন কথা মনে করা ভুল, অথচ লেখক এই ভুলই করে বসেছেন। স্বামীজীর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে তিনি কত খানি ভুল চোখে দেখেছেন তার প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃতি

দিই—"তিনি (স্বামীজী) সম্ভবতঃ একথা কখনও উপলব্ধি করেন নি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ভারত শুধুমাত্র হিন্দু-ভারত নয় ; বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান এবং বহু অগণিত জাতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম-সম্প্রদায়ের আবাস-স্থল এই ভারতবর্ষ। এ পরিবেশের হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে 'জাতীয় ঐক্য' প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম তাই হিন্দু ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়কে ক্ষুণ্ণ না করে এবং দূরে না সরিয়ে রেখে পারে না। তত্ত্ববিচারে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা সম্ভব হলেও সমগ্র ভারতকে তার নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসার কার্যক্রম একটা অবাঞ্ছনীয় সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ এবং ঐক্যের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না করে পারে না, মানুষের মানবতার স্বীকৃতি সে ধর্মে যতই থাক না কেন।" স্বামীজী ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কোন্ আদর্শের কথা বলেছেন তাঁর নিজের কথায় দেখা যাক—

Whether we call it Vedantism or any ism, the truth is that Advaitism is the last word of religion and thought and the only position from which one can look upon all religions and sects with love... Yet practical Advaitism, which looks upon and behaves all mankind as one's own soul, is yet to be developed among the Hindus universally.

On the other hand, our experience is that if ever the followers of any religion approached this equality in an appreciable degree in the plane of practical work-a-day life—it may be quite unconscious generally of the deeper meaning and the underlying principle of such conduct, which the Hindus, as a rule, so clearly perceive—it is those of Islam and Islam alone.. ..For our motherland a junction of the two great systems, Hinduism and Islam ; Vedanta brain and Islam body—is the only hope. (Vol VII)

হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা স্বামীজী কোথাও বলেন নি বরং তিনি সকল মতের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমন্বয় করতেই বলেছিলেন। তাঁর গুরুও বলেছেন "যত মত তত পথ," তিনি তার ব্যাখ্যা করেছেন,—"Sects are not *signs of decay, they are a sign of life.* Let sects multiply, till the time comes when everyone of us is a sect, each individual." (Vol VIII) তিনি বুঝেছিলেন, সব ধর্মই মূলতঃ এক অদ্বৈত ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই ঐক্যবুদ্ধিকে তিনি সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রচারিত সমন্বয়-ধর্ম আচরণ না করাতেই সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয় ; আর এই সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতি-সঞ্জাত। আদর্শ বিশ্বধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তি স্মরণীয়—"If there is ever to be a universal religion, it must be one which will have no location in place or time ; which will be infinite, like the God it will preach, and whose sun will shine upon the followers of Krishna and of Christ, on saints and sinners alike ; which will not be Brahmanical or Buddhist, Christian or Mohammedan, but the sum total of all these, and still have infinite space for development."

রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যেই স্বামীজী কেন ভারতবর্ষের উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পান নি—এ নিয়ে অভিযোগ করে লেখক বলছেন—"তাঁর নিকট রাজনীতির অর্থই হলো, বস্তুবাদী জীবনদর্শনের উপর জাতির জীবন ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস যে, বস্তুভিত্তিক সভ্যতা কখনো বাঁচে

না।” ইউরোপীয় পলিটিক্যাল উন্নতি যেখানে অপর দেশকে শোষণ করেই সমৃদ্ধ হচ্ছে, সেখানে রাজনীতিকেই উন্নতির সোপান বলে আঁকড়ে ধরার সার্থকতাটা কী? আর বস্তুভিত্তিক সভ্যতার চেয়ে অধ্যাত্মভিত্তিক সভ্যতা যে বেশী টেঁকে, সে কথ তো গ্রীস আর ভারতকে দিয়েই ইতিহাস প্রমাণ করেছে। ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি স্বীকার করেও আধ্যাত্মিক উন্নতিব পথে আগিয়ে যাওয়াই ভারতের আদর্শ। এ আদর্শ উপলব্ধি করতে না পেরেই অরবিন্দবাবু মন্তব্য করেছেন—“এই তত্ত্ব-জ্ঞান চলমান জীবনের বোধ থেকে আসে নি, অথবা সঠিক সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণের পথেও নয়। এবং আসেনি বলেই জাতীয় জাগরণের বিবেকানন্দীয় পরিকল্পনার ব্যবহারিক উপযোগিতা বিন্দুমাত্রও নেই।··· তাই বিশ্ববিজয়ের তাঁর অধ্যাত্ম পরিকল্পনা এবং রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের জাতীয় জীবনের মূলপ্রবাহ থেকে দূরে গেল, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগসূত্রও আর কিছু রইল না।”

চলমান জীবনের বোধ থেকে যে একমাত্র বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত হয়, একথা বেশীর ভাগ ভারতীয় দার্শনিক চিরকালই অস্বীকার করে এসেছেন, বরং তাঁরা বলেছেন বস্তুই বুঝিয়ে দেয় যে বস্তুর দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। আর “সঠিক সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ” বলতেই বা কী বোঝায়? সমাজের বিশেষ একটা অবস্থাতেই ধর্ম-চেতনার উদ্ভব হয় এবং পরবর্তীকালে ধর্মের আর উপযোগিতা থাকে না—এমন কোনো যুক্তি? তাহলে বলতে হয়, সে যুক্তিও মানব-অভিজ্ঞতার দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যন্ত্রের জটিলতা যতই বাড়ুক, সভ্যতার জয়ঢাক যতই নিনাদিত হোক, বস্তুবাদী এই যন্ত্র-সভ্যতা মানুষের অন্তরের শান্তি-পিপাসা মেটাতে পেরেছে কি? তার জন্য প্রয়োজন—আত্মোপলব্ধি। এদিক থেকে ভেবে দেখলে নিষ্কাম সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে মোক্ষ-সাধনার যে আদর্শ স্বামীজী প্রচার করেছেন সে আদর্শ সঠিক সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণের পথেই দেখা দিয়েছে। মুক্তির পরম আদর্শকে মনে রেখেই আমাদের সেবাধর্মকে গ্রহণ করে বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। “Do you not remember what the Bible says,—If you cannot love your brother whom you have seen, how can you love God whom you have not seen? If you cannot see God in the human face, how can you see him in the clouds, or in images made of dull, dead matter, or in mere fictitious stories of your brain?” (Vol II, Page 324) এইটিই ভারতীয় জীবনের মূলপ্রবাহ। সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি সে তুলনায় বহিরঙ্গ এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল। ঐ সব আন্দোলনে জড়িয়ে না পড়ে রামকৃষ্ণ মিশন জাতীয় জীবনের এই মূল প্রবাহকেই সমৃদ্ধ করে চলেছেন। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির জগাখিচুড়ির বিষাক্ত পরিণাম সবদেশের ইতিহাসেই পাওয়া যাবে। ব্যবহারিক জীবনেও স্বামীজীর সেবাধর্মকে গ্রহণ করতে পারলে ভারতের বর্তমান জীবনধারা বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। ইউরোপীয় রাজনৈতিক শিক্ষা তো মানুষকে দলগত স্বার্থে বিভক্ত করে চলেছে।

স্বামীজীর চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এর পর অরবিন্দবাবু আর একটি মারাত্মক ভুল করেছেন—“স্বামী বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথ দত্তর নির্বিকল্প সমাধিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাতির সম্মুখে অনুসরণীয় আদর্শরূপে তুলে ধরলেন। ···ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে শুধু নয়, জাতীয় ক্ষেত্রেও জীবন-সাধনার লক্ষ্য যেখানে এই, সেখানে ভারত স্বাধীন কি পরাধীন, ইংরেজ দেশ শাসন করবে, কি করবে না, অথবা তাদের এ দেশে থাকাটা বাঞ্ছনীয় কিনা

—এসব সমস্তা মূল্যহীন। স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ উচ্ছ্বাসে অস্থির হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কখনো বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখায় নি।" এই ধরণের মন্তব্য যেখানে বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আসে, সেখানে এই মন্তব্যের সারবত্তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ নির্বিকল্প সমাধি ভারতের অধ্যাত্ম জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ; সুতরাং জাতির সামনে সে আদর্শ তুলে ধরে স্বামীজী কিছুমাত্র ভুল করেন নি। কিন্তু এই আদর্শ যে সকলের জন্যে, এমন কথা তিনি বলেন নি। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে—কি ভাবে তাঁর গুরুদেব তাঁকে শিখিয়েছিলেন—ঐ শ্রেষ্ঠ সুখও ত্যাগ করে বহুজনহিতায় জীবন সমর্পণ করা আরও উচ্চ আদর্শ।

তবে উচ্চ আদর্শের ধুয়া ধরে ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে নিমজ্জিত হতে চলেছে, এ কথা তিনিই ভালোভাবে বুঝেছিলেন। তবু ভারত-বাসীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন—"ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে?" অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। ইউরোপের এত উন্নতি সত্ত্বেও তার ব্যর্থতার স্বরূপটি স্বামীজী ভোলেন নি—"Social life in the west is like a peal of laughter, but underneath, it is a wail. It ends in a sob. The fun and frivolity are all on the surface: really, it is full of tragic intensity." আজকের ইউরোপের বস্তুবাদী চেতনার মর্মান্তিক বিয়োগনাট্যের এমন সত্য পরিচয় খুব কম লেখকই দিতে পেরেছেন। ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের এই বেদনা ও ব্যর্থতাকে উপলব্ধি করেই স্বামীজী ভারতবাসীকে অধ্যাত্ম-চেতনাসঞ্জাত শান্তির আদর্শে বিশ্বকল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করতে বলেছেন। এইখানেই তাঁর বিশ্ব-বিজয়ের পরিকল্পনার সার্থকতা। ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর যেমন নির্মোহ দৃষ্টি, তেমনি সত্যদৃষ্টি ছিল ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে—"British rule in modern India has only one redeeming feature, though uncons-cious It has brought India out once more on the stage of the outside world; it has forced upon it the contact of the outside world.

"A few hundred modernized, half-educated, and denationalized men are all that modern English India has to show—nothing else. Indian labour and produce, can support five times as many people as there are now in India, with comfort, if the whole thing is not taken off from them."

এই জন্যই স্বামীজীর নির্দেশ ছিল—"For the next fifty years this alone shall be our key-note—this our great Mother India. Let all other vain gods dis-appear for that time from our mind." বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরে ভারতের ইতিহাসে সেই সাধনাই হয়ে এসেছে। স্বদেশীযুগ থেকে আরম্ভ করে এ দেশের নেতৃবৃন্দ স্বামীজীর কাছেই বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন—ইতিহাস সে কথা ভোলে নি। স্বাধীনতা এবং স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা যে স্বামীজীর অন্তরের সুর, এ কথা কে না জানে? তিনিই কি বলেন নি, 'Freedom is the song of the Soul'! তিনিই কি গেয়ে ওঠেন নি, ৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে—"Oh Sun, to-day thou sheddest liberty!" ধর্মসমন্বয়েরও মূল ভাব ধর্মের স্বাধীনতা। সকল ধর্মের মূল সত্যে পৌঁছেই সব মানুষকে একতাবদ্ধ করা সম্ভব। বৈচিত্র্যকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই,

অন্তর্নিহিত ঐক্যে পৌঁছুতে হবে। অধ্যাত্মবাদের চিরন্তন সত্যে এই প্রতিষ্ঠাই তাঁর কণ্ঠে অমিত তেজ ও চিন্তায় অমিত বীর্য এনে দিয়েছে। অরবিন্দবাবুর মতে—"অধ্যাত্মবাদ তার সে শক্তি, বীর্য ও উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে।" যে অধ্যাত্মবাদের দ্বারা বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ অবধি এত মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব হ'ল তার শক্তি, বীর্য ও উপযোগিতায় বিশ্বাস করবো, না, ভগ্নস্তূপে পরিকীর্ণ মৃতপ্রায় ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিশ্বাস করবো? ভোগসাম্যকে অন্তরের আলোকে উপলব্ধি না করে বাইরে থেকে জোর করে চাপালে কী দশা ঘটতে পারে, তা সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির একনায়কত্বের পরিণাম দেখেই বুঝতে পারা যায়। প্রাচ্যের এই অধ্যাত্ম-অনুভূতি নিয়েই নূতন সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে।

ভারতের ব্যবহারিক রাষ্ট্রিক জীবনধারাকে কোন্ পথে পরিচালিত করতে হবে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। স্বামীজী ভারতবাসীকে তার আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে বলেছেন—তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনে তারই সাধনা। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে নিজের পন্থায় প্রতিষ্ঠিত থেকেই যে অপরাপর পন্থার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়া চলে—রামকৃষ্ণ মিশনে তারই প্রকাশ। সমাজনীতি বা রাজনীতি যে পথেই চলুক জীবনের মূলসত্যকে ধরে থাকতে হবে; স্বামীজীর কাজই ছিল ভারতের প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে দেওয়া, তারপর অন্যান্য আবর্জনা আপনি সাফ হয়ে যাবে। অরবিন্দবাবু মন্তব্য করেছেন—"বিবেকানন্দ যে আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন, তা ভারতের ব্যবহারিক রাষ্ট্রিক জীবনধারার মূল প্রবাহের বাইরে।" কিন্তু ভারতীয় জীবনধারার মূলপ্রবাহ তো কেবলমাত্র রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়। অথচ এই সীমাবদ্ধতাকেই ভারতীয় জীবনসাধনার সার্থকতা ধরে নিয়ে তিনি আরো বলেছেন—"সম্ভবতঃ প্রথমবারের বিদেশ-প্রবাসের সময়টাতেই বিবেকানন্দ তাঁর ভাবী কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৮৯৫ সালের একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, 'I have no ambitions beyond training individuals' বিশ্ববিজয়ের সংকল্পের পাশাপাশি এ কথাগুলো নিতান্তই বেমানান।" কেন বেমানান? বিশ্ববিজয় সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা আগেই আলোচনা করেছি। বস্তুবাদের অত্যাচারে উদ্বাস্ত প্রতীচ্যের জন্য অধ্যাত্ম শান্তির বাণী প্রচারই স্বামীজীর বিশ্ববিজয়। পারমার্থিক ক্ষেত্রে, একজনকেও সেই শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারাও বড় রকমের সার্থকতা। একটি 'পল' থেকেই সমগ্র ইয়োরোপ খ্রীষ্টের বাণী শুনেছে।

ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে যে আমাদের অনেক কিছুই নতুন করে শিখতে হবে সে বিষয়ে স্বামীজীর সন্দেহ ছিল না। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যকেও গ্রহণ করতে হবে ত্যাগ ও শান্তির বাণী। স্বামীজীর দৃষ্টিতে এমনি করেই ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবনের সংযোগ ঘটেছে। তিনি চেয়েছিলেন একদল আদর্শ যুবক যাদের দ্বারা তিনি স্বদেশে ও সারা বিশ্বে নবজাগরণ এনে দিতে পারবেন। তাঁর বিশ্ব-বিজয় আধ্যাত্মিক অর্থেই গ্রহণীয়। ব্যক্তিকে গড়ে তোলার যে সঙ্কল্প তিনি করেছিলেন, তার দ্বারা তিনি বিশ্বকেই উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। "উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পটভূমি" প্রবন্ধটিতে অরবিন্দবাবু সুন্দরভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের মানস-দ্বিধাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের শুভবুদ্ধির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস কেমন করে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে দোলায়িত করেছিল, সে কথা তিনি নানা উদাহরণ সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ঐতিহ্য থেকে কোন কিছু যে নেবার আছে একথা তাঁর একবারও মনে হয় নি। তাই গ্রন্থশেষে মন্তব্য করেছেন—

"বর্তমান কাল ও ইংরেজকে অস্বীকার করেও ইংরেজের কাছ থেকে যেটুকু বস্তু-আরাধনা ও বুদ্ধিবাদ সমাজ-মানস আয়ত্ত করেছিল, তাই নতুন বাংলা, নতুন ভারতবর্ষ জন্ম দিয়ে গিয়েছে। প্রাচীনের আকর্ষণ তার এখনো কাটে নি অবশ্য, কিন্তু পুরাতন অভ্যাসের মতোই তা হৃদয়সম্পর্কহীন, নিষ্প্রাণ।" বেশ বোঝা যায়, উনিশ শতকেই স্বামীজী বস্তুভিত্তিক সভ্যতার যে সঙ্কট দেখতে পেয়েছিলেন, বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে লেখক অজ্ঞাতসারে সেই আবর্তেই পড়েছেন!

বস্তুতঃ আধুনিক জীবনের সমস্যা—ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্যসাধনের সমস্যা। ইউরোপের বস্তুভিত্তিক সভ্যতার সর্বব্যাপী কর্মচাঞ্চল্যের আদর্শকে স্বীকার করে সন্তুষ্ট থাকলে ভারতবর্ষ ইউরোপের মতোই সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। অধ্যাত্ম-চেতনাসঞ্জাত যে ধ্রুব শান্তি (তাকে নির্বাণই বলি, আর মোক্ষই বলি), তার মধ্যে এসে যদি সব কর্মধারা না মেলে, যদি কামনার নিরন্তর স্রোত মানবাত্মার পিপাসাকে কেবল বাড়িয়েই চলে—তাহলে মহাযুদ্ধের মল্লভূমিতে প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একথা মনে রাখতেই হ'বে—"ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ।" উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পটভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার এই সংঘাত এবং সম্মেলনের কথাই রয়েছে। এই দুই সভ্যতার মহামিলনের মধ্যেই ভবিষ্যতের সমুজ্জ্বল সম্ভাবনা নিহিত। উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ইতিহাসে সেই সম্ভাবনারই শুভ-সূচনা। (সমাপ্ত)

সমালোচনা

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ—শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার প্রণীত। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা—।৴০ + ২২৪, মূল্য ৪৷৷০। আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার লিখিত পরিচয়-সম্বলিত।

বর্ষীয়সী লেখিকা বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার কোন কোন গুরুভ্রাতার ও ভগিনী নিবেদিতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পরিস্ফুট।

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সূচনা ও ক্রমবিকাশ বিবেকানন্দ-জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই লেখিকা স্বামীজীর জীবনবিকাশের পটভূমিকায় গ্রন্থারম্ভ করিয়া বিষয়বস্তুকে ন্যায্য মর্যাদা দিয়াছেন। স্বামীজীর ভারতভ্রমণ ও পরবর্তী জীবনের প্রেরণা-লাভ সম্পর্কে অতিপ্রয়োজনীয় অনেক ঘটনা বাদ গিয়াছে, এদিকে অপ্রয়োজনীয় বহু বিষয় সবিস্তারে লিখিত। আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে সংগ্রামশীল প্রচারকের চিত্রাঙ্কনের পর ভারতে তাঁহার আদর্শ রূপায়িত করিতে তাঁহাকে যে কঠোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে তাহারও সার্থক চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতের নবজাগরণে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব ও স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর উহার প্রসার নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়া ১৯২৬ খৃঃ মহাসম্মেলনের পর লেখিকা গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। কিন্তু প্রসঙ্গ হইতে সহসা প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য বহু স্থলে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং নানা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় আসিয়া স্বল্পপরিসরে ভিড় করিয়াছে। এত খুঁটিনাটি কথার উল্লেখ ইহাতে আছে যে বহু ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়াছে—যাহাতে নূতন পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন। ইহাদের অনেকগুলি হয়তো ছাপার ভুল, তথাপি অন্য ভুলও যথেষ্ট আছে, চোখে পড়িয়াছে এমন কতকগুলি ভুল নিয়ে দেওয়া হইল।

পৃষ্ঠা ১, 'স্বামী মাধবানন্দ যে জীবনী লিখিয়াছেন,' তিনি প্রকাশক মাত্র (পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য), পৃঃ ৫ পঙ্‌ক্তি ১০—উক্ত জীবনীতে সতেরো জনকে সন্ন্যাসী শিষ্য বলা হইয়াছে কি? ইঁহারা সকলে একদিনেই সন্ন্যাসগ্রহণ করেন নাই।

পৃঃ ৩২, ১৮৯৪ খৃঃ 'এই সময় তিনি নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন।' পৃঃ ৪২—১৮৯৬ খৃঃ ঐ সমিতি স্থাপনের কথা আছে।

পৃঃ ৭৬—স্বামীজীর ভ্রাতা মহেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন '১৮৮৫ খৃঃ · বাবার হঠাৎ মৃত্যু হয়', ঐ ঘটনার কাল ১৮৮৪ খৃঃ।

পৃঃ ৮১—পং ১৩ : "স্বামীজীর 'টি্‌পলিকেনে' নামক এক শিষ্য"—'টি্‌প্লিকেন'—মাদ্রাজ শহরের একটি পাড়া।

পৃঃ ৮৩—পং ২৫ : 'আলমবাজারের' এই শব্দটি প্রক্ষিপ্ত। ঐ পৃষ্ঠায় পং ২৬ : 'ইহার আনুষঙ্গিক সমুদয় মঠকেই'। মঠের নিয়মাবলীতে আছে 'ইহার অধীনস্থ সমুদয় মঠকেই', এই পরিবর্তন করা হইয়াছে কেন?

পৃষ্ঠা ৯৪ : 'স্বামীজীর দুইজন শিষ্য · তাঁহার সহিত প্রেরিত হন',—স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রব্রজ্যাক্রমে একাই মহুলায় গিয়াছিলেন, দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য আরম্ভ হইলে পর স্বামীজীর দুইজন শিষ্য প্রেরিত হন। পৃঃ ৯৬,—১৮৯৭ খৃঃ গভর্ণমেণ্টের জমি দেওয়ার সংবাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে কে দিয়াছিল জানা নাই। সারগাছিতে অনাথ আশ্রমের পঞ্চাশ বিঘা জমি হয় অনেক পরে ১৯১২ খৃঃ। ঐ পৃষ্ঠায় স্বামীজীর পত্রখানির তারিখ জুলাই ২৯শে নয়, ২৪শে।

পৃঃ ১১৪ পং ২—৪ : বিরজাহোমের সময় শরচ্চন্দ্রকে পাহারা দিতে পাঠানোর কথা তাঁহার 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' নাই।

পৃঃ ১২১, পং ২১—২২ : মঠের নিয়মাবলীতে মুদ্রিত শুদ্ধপাঠ 'তাঁহার চরিত্র রামকৃষ্ণরূপ মুষায় প্রকৃষ্টরূপে দ্রুত হয় নাই' ; আলোচ্য পুস্তকে মুদ্রিত অর্থহীন অভিনব পাঠ লেখিকা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন?

পৃঃ ১৪৭, পং ১ : 'একই দিনে' নয়, নিবেদিতা বিদ্যালয় পরদিন প্রতিষ্ঠিত হয়। সে বার কালীপূজা হইয়াছিল ১২ই নভেম্বর নয়, ১৩ই নভেম্বর।

পৃঃ ১৬৫, পং ২৯ : এখানে 'বৃদ্ধ' মানে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' ; লেখিকার ব্যাখ্যা 'বৃদ্ধ অর্থাৎ পূজা অর্চনা সম্বন্ধে চিরদিনের সংস্কার'—উদ্ভট কল্পনা!

পৃঃ ১৮৭, পং ৪ : শুধু মিশনই রেজেষ্ট্রি হইয়াছিল, মঠ নয়। পং ৬, মঠ মিশনের ওয়ার্কিং কমিটি এই সময় (১৯০৯ খৃঃ) গঠিত হয় নাই। মহাসম্মেলনের পর গঠিত হয় ১৯২৬ খৃঃ। (পৃঃ ২১২, পং ১ দ্রষ্টব্য) পং ১৩, 'এক বিভাগের ভার লইলেন সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামী, অন্য বিভাগের ভার লইলেন সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দ'— একথা ঠিক নহে।

পৃঃ ১৯১, পং ৭ : 'কাশীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করিবার চেষ্টা চলিতেছে' হইতে পারে না, কারণ তখন উহা প্রতিষ্ঠিত।

পৃঃ ১৯৪, পং ১২ : 'মায়ের বাড়ীতে উদ্বোধন কার্যালয় ও প্রেস স্থাপিত হয়'—শেষাংশটি ভুল।

পৃঃ ১৯৬, পং ৫—৮ : ঘটনা অন্যরূপ। স্বামী সারদানন্দকে গভর্ণর কলিকাতায় দেখা করিতে ডাকিয়াছিলেন—'বম্বেতে' নয়। 'পি. সি. লায়নের সহিত' নয়—মিঃ গুর্লের সহিত কলিকাতাতেই তাঁহার কথাবার্তা হয়।

পৃঃ ২০১, পং ১৭ : 'রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প বিদ্যালয় (বেলুড়)' পৃথক হেডিং হইবে না, এটি একটি শাখা কেন্দ্র।

পৃঃ ২০৪, পং ২ : 'সন্ন্যাসী মহাসম্মেলন' নয় —শুধু মহাসম্মেলন হইবে, পং ৩১—২, দুইটি বাক্য পরস্পর বিরোধী।

পৃঃ ২০৬, পং ১৬—১৮ : বিবরণ ঠিক হয় নাই।

পৃঃ ২১২ প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই কার্যকরী সমিতির

উদ্দেশ্যের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। ২১৫ পৃঃ বিবৃতিপত্রের ৩য় অনুচ্ছেদে উহা পাওয়া যাইতেছে।

পুস্তকখানির বিষয়ের গুরুত্ববশতঃ পৃষ্ঠা ও পঙ্‌ক্তি ধরিয়া ঘটনা ও বিষয়ের ভ্রান্তিগুলি প্রদর্শিত হইল। এই প্রকার ইতিহাসধর্মী পুস্তকে ব্যক্তির নাম ও স্থান-কালের ভুল গুরুতর ভুল—আগে পৃষ্ঠা পরে পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করিয়া ঐরূপ কয়েকটি ভুলও সংশোধিত হইল।

পৃঃ ৫।১৫ বিশ্বেশ্বরানন্দ—বীরেশ্বরানন্দ, ৩৩।১৪ জ্যোতিমাতা—যতিমাতা, ৪৩।২৯ স্বামীজী—ষ্টাডি, ৪৯।১৬ দেবসেনা—দেবসেন, ১৩০।১৭ সারদানন্দ—সদানন্দ, ১৫৬।২৯ বোল্ডগেট—ব্লজেট, ১৯৪।২০ সান্ত্বনানন্দ—শান্তানন্দ, ২০৩।৩ কৃশ্চীনা—কৃষ্টীন, ২০৫।৪ জ্যোতিশ্বরানন্দ—যতীশ্বরানন্দ, ৩৭।১৭ মঠ—কাশী অদ্বৈত আশ্রম, ২০০।২৩ ময়ালপুর—মায়লাপুর, ২০০।২৯ মুন্সীগঞ্জ—মুট্‌ঠীগঞ্জ, ১৭৯।২৯ দুই মাস—দুই সপ্তাহ হইবে।

ভুল আরও অনেক আছে, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না। এই সকল ত্রুটি হেতু পুস্তকখানিকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, যদিও অল্পের মধ্যে ইহাতে অনেক কথা সংগ্রহ করা হইয়াছে; বইএর ছাপা ভাল, কিন্তু অক্ষর ছোট ও কাগজ সাধারণ। অনেকগুলি ছবি থাকায় পুস্তকটি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

আগামী বৎসর রামকৃষ্ণ মিশনের ষাট বৎসর পূর্ণ হইবে, তদুপলক্ষ্যে স্বামী গম্ভীরানন্দ ইংরেজীতে মঠ মিশনের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন, এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উহা হইতে সংঘের অনেক তথ্য অবগত হইবেন।

পরিশেষে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভূমিকায় 'অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ ও কর্মবিবরণীর সাহায্যে'র উল্লেখ আছে। ঐ সাহায্যের পরিমাণ এত অধিক যে, সকল বইগুলির নাম থাকিলে ভাল হইত। দেখা যাইতেছে, সাধারণের অপ্রয়োজনীয় ও প্রকাশের অযোগ্য মঠ মিশনের বিস্তর ভিতরের খবর বইখানিতে আছে। উহাও কি শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-মঠের স্বামী ত্রিপুরানন্দের প্রদত্ত? সে ক্ষেত্রে লেখিকার ঐ মঠের উৎপত্তির ইতিহাস স্মরণ করা উচিত ছিল। যিনিই উহা দিয়া থাকুন, ঐ সকল খবর কিরূপে সংগৃহীত হইয়াছে, পুস্তকে তাহার একটু বিবরণ থাকিলে উহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে ধারণা হইত। লেখিকা ঐগুলি মঠ মিশনের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ছাপিয়াছেন—এরূপ কোন স্বীকৃতি ভূমিকায় নাই। ইহাতে শিষ্টাচারের প্রশ্ন ছাড়া, স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত সংঘের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা কতটা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও বিবেচ্য। গ্রন্থশেষে উদ্ধৃত—স্বামী নির্মলানন্দকে লিখিত পত্রগুলিও পুস্তকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জাগায়। পরবর্তী সংস্করণে এই সকল বিষয়ে মনোযোগ বাঞ্ছনীয়।

স্বামী অবিনাশানন্দজীর দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অবিনাশানন্দজী (শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'শিবুদা' নামে পরিচিত) গত ১লা পৌষ (১৬ই ডিসেম্বর, '৫৬) রবিবার বেলা ৭টার সময় ৭০ বৎসর বয়সে বিশাখাপত্তনম্ কে. জি. হাসপাতালে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি রক্তচাপবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছিলেন। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইলে ২৩শে নভেম্বর তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্বামী অবিনাশানন্দজী বহুগুণসম্পন্ন ছিলেন, এবং অনেকগুলি ভারতীয় ভাষা জানিতেন। প্রথম-জীবনে তিনি কালিকট জ্যামোরিন কলেজে অধ্যাপক ছিলেন এবং কিছুদিন মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ 'হিন্দু'

পত্রিকার সহ-সম্পাদকের কাজও করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া ১৯১৯ খৃঃ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তিনি পরবর্তী তিন বৎসর (১৯২০-২২) সুরাট জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও উত্তর প্রদেশের কাংড়ী গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৬ খৃঃ উতকামণ্ড আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া উতকামণ্ড, মায়াবতী, সিংহল, ফিজিদ্বীপপুঞ্জ ও বিশাখাপত্তনম্ প্রভৃতি শাখাকেন্দ্রে বহু কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মভার লইয়া অবিনাশানন্দজী জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী এবং শ্রীশ্রীমা-সারদাদেবী-শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যথাক্রমে প্রকাশিত 'ভারতসংস্কৃতির উত্তরাধিকার' (Cultural Heritage of India) এবং 'ভারতের মহীয়সী নারী' (Great Women of India) নামক অমূল্য গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশনার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শতবর্ষ-উৎসব-পরিকল্পনা-রচনাতেও তাঁহার দান চিরস্মরণীয়। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব—গত ৮ই পৌষ রবিবার (২৩শে ডিসেম্বর) শুভ কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১০৪তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৭৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে উৎসব—৮ই পৌষ, শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সুদীর্ঘ শেষ একাদশ বৎসরের বহু পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত বাটীতে (১, উদ্বোধন লেন) শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতির পর সমবেত-কণ্ঠে বেদপাঠ দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। অতঃপর বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-পাঠ হোম, ভোগারতি দিবসব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। প্রায় ১৫০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পরেও বহু ভক্তের সমাবেশ হয়।

শ্রীসারদা মঠে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি—গত ৮ই পৌষ, রবিবার শ্রীসারদা মঠে (দক্ষিণেশ্বর) শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবীর শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া বিশেষ পূজা এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ভোর ৫টা হইতে ব্রহ্মচারিণীগণের দেবীসূক্ত পাঠ এবং উপনিষদ্ আবৃত্তির সঙ্গে উৎসব আরম্ভ হয়। ৭॥ টা হইতে ষোড়শোপচার পূজা এবং চণ্ডীপাঠ কালে ভক্ত মহিলারা সমবেত হইতে থাকেন।

মঠপ্রাঙ্গণে একটি নাতিবৃহৎ সুশোভিত মণ্ডপে শ্রীশ্রীমার প্রতিকৃতি পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বাগবাজার নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত ভজন করে। তারপর জনৈকা ব্রহ্মচারিণী সুদীর্ঘ ২ ঘণ্টা ধরিয়া শ্রীশ্রীমার জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন; সমবেত ভক্তমণ্ডলী সাগ্রহে নিবিষ্টচিত্তে উহাতে যোগদান করায় একটী সুন্দর শান্ত পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল। সুগায়িকা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় দুইটি মাতৃসঙ্গীত গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। দক্ষিণ কলিকাতার "দেব গীতাজীসঙ্ঘ" কর্তৃক নাম-

সঙ্কীর্তনে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। প্রায় আট শত ভক্ত মহিলা এবং বালক বালিকা বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যারতির পর শান্তি ও আনন্দের মধ্যে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কল্পতরু উৎসব—কাশীপুর উদ্যানবাটীতে, যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুআরি ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ দ্বারা 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তাহারই পুণ্যস্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি মঙ্গলবার 'কল্পতরু দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। পরবর্তী দুই দিন ২রা ও ৩রা বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, প্রসাদবিতরণ, ধর্মসভা, শ্রীশ্রীকথামৃত-ব্যাখ্যা, রামায়ণ গান প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম দিন বৈকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বোধাত্মানন্দ, বক্তা ছিলেন স্বামী অজয়ানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ গায়ক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী এতদুপলক্ষ্যে দুই দিন রামায়ণ গান করেন, প্রথম-দিন 'ভরত-মিলন' এবং দ্বিতীয় দিন 'দক্ষযজ্ঞ'। স্বামী পুণ্যানন্দ দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যলীলা অবলম্বনে সঙ্গীত সহযোগে কথকতা এবং স্বামী ওঁকারানন্দজী শেষ দিন 'শ্রীশ্রীকথামৃত' ব্যাখ্যা করেন। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে কয়েকদিনের উৎসবে বহু সহস্র ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন, নগরীতে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানেও 'কল্পতরু' দিবস উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন কার্যালয়ে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব—২৩শে পৌষ (৭ই জানুআরি) সোমবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, বেদ ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ, হোম, ভোগরাগ, পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের জীবনী-পাঠ, ভজন ও প্রসাদ বিতরণাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

বারাণসীধামে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব—বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব ৮ দিন (২৩শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর) ধরিয়া সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, বেদপাঠ, ভজন, তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ, কীর্তন, কথকতা, ধর্মসভায় বক্তৃতা ও মায়ের জীবনী আলোচনা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি এই উৎসব কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

Vedarthasamgraha—আচার্য শ্রীরামানুজের 'বেদার্থসংগ্রহ' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ। মূল সংস্কৃতও প্রদত্ত। অনুবাদক—এস্. এস্. রাঘবাচার, এম্-এ। স্বামী আদিদেবানন্দ লিখিত মুখবন্ধ সন্নিবিষ্ট আছে। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মহীশূর। পৃষ্ঠা—১৯৬+৮/০ ; মূল্য—৩॥০।

ভক্তিপ্রসঙ্গ—স্বামী বেদান্তানন্দ প্রণীত ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, রাঁচি হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১৭৪ ; মূল্য—১।০।

দেবর্ষি নারদ বিরচিত ভক্তিসূত্রের মূল, অন্বয়ার্থ, অনুবাদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ অবলম্বনে সূত্রগুলির মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা সম্বলিত।

Chandogya Upanishad—স্বামী স্বাহানন্দ অনূদিত ; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৬২৩+৬০ ; মূল্য—৮৲ টাকা।

দেবনাগরী হরফে মূল সংস্কৃত অন্বয়ার্থ, ইংরেজী অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা সম্বলিত। স্বামী বিমলানন্দ লিখিত ৫৮ পৃষ্ঠার তথ্যপূর্ণ একটি বহুমূল্য ভূমিকাও আছে।

বিবিধ সংবাদ

নানাস্থানে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব—জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১০৪তম জন্মোৎসব বিভিন্ন-স্থানে সাড়ম্বরে ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত স্থানসমূহের বিস্তৃত উৎসব-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি :—তেজপুর (আসাম), খেপুত ও বলরামপুর (মেদিনীপুর)।

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের জন্মোৎসব—গত ২৭শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর বারাসত শহরে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে তাঁহার ১০১তম শুভ জন্মোৎসব ষোড়শোপচারে পূজা, শিবমহিম্নস্তোত্র ও চণ্ডীপাঠ, চণ্ডীর কথকতা, ছায়া-চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী আলোচনা, রামনামকীর্তন ও ভজন, শোভাযাত্রা, কালীকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিপাঠ, জনসভায় বক্তৃতা ও প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

পরলোকে উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গত ২৯শে ডিসেম্বর, শনিবার রাত্রি ১০টার সময় কলিকাতায় ১২।১ রামকান্ত বসু স্ট্রীটে ভ্রাতার বাস-ভবনে ৯০ বৎসর বয়সে উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বেলুড় মঠে যাতায়াত করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং মঠে 'বাহাদুর' নামে পরিচিত ছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রারম্ভিক যুগে তিনি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং পূজ্যপাদ ত্রিগুণাতীত মহারাজের ও স্বামী শুদ্ধানন্দের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমরা তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

পরলোকে ধীরেন্দ্রনাথ রায়—বিগত ৩রা জানুআরি রাত্রি ১০॥ ঘটিকার সময় কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠে কল্পতরু উৎসবক্ষেত্র হইতে কাশীপুরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুক্ষণ পরেই নড়াইল জমিদারবংশের পরমভক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রথম জীবনেই ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সংস্পর্শে আসেন এবং শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির সহিত তাঁহার নিকট সম্পর্ক ছিল, বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশনের তিনি ছিলেন আজীবন সভাপতি। তাঁহাদেরই প্রদত্ত প্রায় দশ বিঘা জমির উপর ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। ধীরেনবাবু অকৃতদার থাকিয়া চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল রামকৃষ্ণ মিশনের নানাবিধ কল্যাণকর্মে ব্রতী ছিলেন। ১৯২১ খৃঃ তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া স্বদেশীব্রত গ্রহণ করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কিছুকাল বিধানসভার সদস্য ছিলেন। সরল অনাড়ম্বর জীবন, উচ্চচিন্তা, কল্যাণচেষ্টা ও চরিত্র-মাধুর্যের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। এই ভক্ত ও নিষ্কাম কর্মীর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ভ্রমসংশোধন—১৬ পৃষ্ঠায় 'ব্রহ্মানন্দ-শিবানন্দপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধের ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে 'রমাকান্ত' স্থানে 'রামকান্ত' হইবে।

বিজ্ঞপ্তি ঃ—

আগামী ৯ই মাঘ, ২২শে জানুআরি মঙ্গলবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইবে।

উদ্বোধন

লীলাবতরণ

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪।৬, ৯।১১, ১২।৫

জন্মহীন ঈশ্বরের মানবশরীরে জন্মগ্রহণ, বিশ্বব্যাপী ভগবানের পৃথিবীতে অবতরণ ও অবস্থান, আপাতবিরোধী মনে হয়; কিন্তু যুগে যুগে দেশে দেশে অপার্থিব উদ্দেশ্যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহামানবগণের আবির্ভাব ঐতিহাসিক ঘটনা। অধিকাংশ লোকই ইহার মর্ম বুঝে না—কিন্তু মানুষের নিজের কল্যাণের জন্য, উন্নতির জন্যই ইহা বুঝিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। গীতামুখে শ্রীভগবান্ স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিতেছেন:

আমি জন্মরহিত, বিকার-রহিত আত্মা, সর্বভূতের ঈশ্বর, তথাপি আমার সত্ত্বরজস্তমোগুণময় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া যোগমায়াশক্তিতে আমি জন্ম পরিগ্রহ করি।

আমি যখন মানুষ দেহ ধারণ করিয়া আসি সংসার-মায়ামুগ্ধ মানব আমার সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ঈশ্বরভাব এবং তদতীত পরমাত্মভাব বুঝিতে না পারিয়া আমাকে তাহাদেরই মত প্রকৃতির অধীন সাধারণ মানুষ মনে করিয়া অবজ্ঞা করে; আমার সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হয় না।

অব্যক্ত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মভাবের সাধককে সগুণ সাকার ঈশ্বরভাবের উপাসক অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া সাধনা করিতে হয়, কারণ দেহবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে নিরাকার ভাবে স্থিতিলাভ করা অতিশয় কঠিন।

তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে অরূপের সাধনা অপেক্ষা ঈশ্বরের কোন রূপের ধ্যান করা সহজ; মানুষের পক্ষে শ্রীভগবানের কোন মানবমূর্তি অবলম্বন করিয়া সাধনায় অগ্রসর হওয়াই স্বাভাবিক। ঈশ্বর যখন মানবদেহে অবতীর্ণ হন—তখন সেই দেবমানবের দিব্যজীবন ও চরিত্র অনুধ্যান করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া বহু সাধক তাঁহার সত্তা লাভ করেন এবং স্ব স্ব জীবন সার্থক করিয়া জগৎকেও ধন্য করেন।

কথাপ্রসঙ্গে

নূতন মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ

শীতের কুহেলী ভেদ করিয়া তপস্যাপূত শিব-রাত্রির পর ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়ার নূতন চন্দ্রকলা বহিয়া আনে এক নবজীবনের আমন্ত্রণ, পরিপূর্ণতার এক সুস্পষ্ট সম্ভাবনা।

সহস্রবৎসরব্যাপী নানা ঘাত-প্রতিঘাতের দুর্যোগে ঘনায়মান অন্ধকারে ভারতপ্রতিভা নানা স্থানে সাধক মহাপুরুষদের জীবন ও সাধনার মধ্য দিয়া তারকার মতো জ্বলিতেছিল, এবং দিগ্‌দর্শনে সহায়তা করিয়া জাতীয় জীবনাদর্শ অব্যাহত রাখিয়াছিল। কিন্তু রাত্রিশেষে যখন তারকাও নাই, সূর্যও উঠে নাই—নূতন দিনের আলোর জন্য মানুষ যখন রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষমাণ, চারিদিকে শ্রুতিগোচর হয় শুধু বিহগের কল-কাকলি—এমনি শুভ মুহূর্তে ভারতের পূর্ব দিগন্তে দেখা দিল উষার অরুণোদয়!

ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়ার ক্ষীণচন্দ্ররেখা আভাস দিয়া গিয়াছে এক পরম পরিপূর্ণতার! মানব-সমাজকে, তথা তাহার নিয়ামক ধর্মকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া নহে, আগামী যুগের শান্তি উন্নতি কল্যাণের জন্য আজই একান্ত প্রয়োজন,—এক অখণ্ড মানব-সমাজ—এক উদার-ভাব-সমন্বয়ে গ্রথিত, প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ একটি মানব-পরিবার। একের ক্ষতিতে সকলের ক্ষতি—একের সার্থকতায় সকলের সার্থকতা, চাই এই সমগ্র-জীবন-বোধ—যথা মানব-শরীরে তথা মানব-সমাজে।

উষার অরুণরেখার সোনার কাঠির স্পর্শে সহস্র বৎসরের নিদ্রা মোহ আলস্য কাটাইয়া জাগিয়া উঠিল—একটি দেশ—একটি জাতি, জগৎকে নূতন বাণী শুনাইতে—যে বাণী চিরপুরাতন, যে বাণী তাহার প্রচারিত সেই আত্মার মতই অজর অমর অক্ষয়—সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিসম্পন্ন!

রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর পাশ্চাত্ত্য শক্তি যখন শিক্ষার মাধ্যমে ভারতে তাহার কৃষ্টির অভিযান শুরু করিয়াছে, ঠিক তখনই রাজধানী হইতে দূরে—শিক্ষার কেন্দ্র হইতে অতিদূরে, পাশ্চাত্ত্য নগর-সভ্যতার বিষবাষ্প-বিনির্মুক্ত পল্লী-জননীর শ্যামল কোলে ভারতাত্মা দেহ পরিগ্রহ করিল—বর্তমান যুগের দুই মহাপ্রয়োজনে, প্রথম ভারতকে রক্ষা করিতে হইবে জড়বাদী ভোগ-সর্বস্ব জীবনাদর্শের গ্রাস হইতে, দ্বিতীয়—জাগ্রত ভারতের মাধ্যমে জগৎকে শিখাইতে হইবে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নূতন জীবনাদর্শ।

অপূর্ব অদ্ভুত এই আবির্ভাব! সভ্য-জগতের দৃষ্টির অন্তরালে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল একটি কিশোর, তথাকথিত শিক্ষা ও সভ্যতার স্পর্শমুক্ত—কিন্তু জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। অভাবনীয় অশ্রুতপূর্ব সাধনাপরম্পরায় যৌবন কাটাইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় যখন তিনি এই সভ্যতার মর্মস্থলে আবির্ভূত হইলেন—তখন তাঁহার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে—তাহাই সঞ্চারিত হইয়া সূচনা করিয়া গিয়াছে এক নূতন সমাজাদর্শের—যেখানে দেহ-কেন্দ্রিক ক্ষণিক ভোগসুখকে অতিক্রম করিয়া মানুষ চাহিতেছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অচঞ্চল আনন্দ,—যেখানে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সীমা লংঘন করিয়া সমাজ চাহিতেছে এক উদার উন্নত ভাবাদর্শ!

শ্রীরামকৃষ্ণ 'পুরুষঃ পুরাণঃ', তিনিই আবার নূতন মানুষ! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন সেই পুরাতন কথা—কিন্তু নূতনভাবে, নূতন ভাষায়! শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের তত্ত্বও অতি প্রাচীন, কিন্তু তাঁহার সাধনার পদ্ধতি অতি নবীন,—পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানসম্মত পথেই তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনা ও

অনুভূতি। তাহা যদি না হইত তবে তিনি নবযুগের মনোহরণ করিতে পারিতেন না।

সাধনার শেষে যখন তাঁহার অন্তঃশক্তি বাহিরে প্রসারোন্মুখ তখন তিনি চলিয়াছেন—বেলঘরিয়ার উদ্যানে নববঙ্গের ধর্মগুরু কেশবের সন্নিধানে, তাহার 'মন ভুলাইতে'! কেশবের মন 'ইয়ং বেঙ্গল' এর মানসকেন্দ্র। ইতিহাস-অনভিজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে সম্পূর্ণ সচেতন আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। কেশবের মন ভুলিল ভাবমগ্ন পুরুষের আনন্দপূর্ণ হাসি দেখিয়া, অন্তর্মুখী মনের বহিঃসচেতন দৃষ্টি দেখিয়া। কেশবের আচরণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার তন্ময়তা দেখিয়া যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝাইয়া দিলেন, সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে কেশবই 'লেজ-খসা বেঙাচি'র মত জলে স্থলে থাকিতে পারেন,—অর্থাৎ সংসারে ও ঈশ্বরে উভয়ত্র মন দিতে পারেন, তখন তাহার কথার অর্থগৌরবে ও অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতায় মানুষটির নূতনত্ব অনুভব করিয়া 'ইয়ং বেঙ্গল' সেদিন সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলটির প্রতি তাহাদের আকর্ষণ বাড়িতে লাগিল। কলিকাতার অধিবাসীরা সানন্দে সকলকে আহ্বান করিয়া গাহিয়া উঠিল :

'এসেছে নতুন মানুষ—দেখবি যদি আয় চলে!' যাহারা আসিল—তাহারা দেখিল—এক নূতন মানুষ—সর্বদা ভাবে বিভোর—ঈশ্বরকথায় মত্ত—কামকাঞ্চন-সম্পর্ক-শূন্য! সকল মতের সকল পথের সাধক এই নূতন মানুষটিকে তাহাদের অতি আপন মনে করিয়া ভালবাসে।

তাহারা শুনিল—নূতন মানুষের নূতন কথা,—'হ্যাঁ ঈশ্বরকে দেখা যায়, আমি তাঁকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি'। তাহারা শুনিল নূতন কথা—'সকল ধর্মই সত্য, সকল মত সকল পথ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়েছে; আমারটি ঠিক, আর তোমারটি ভুল—এইরূপ মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়।'

এই সব অপূর্ব কথায় বঙ্গহৃদয়-গোমুখী হইতে যে ভাবগঙ্গাধারা প্রবাহিত হইল—সেই গঙ্গাবতরণের প্রবল প্রপাত জটাভারে ধারণ করিবার জন্য প্রয়োজন হইল আর একটি নূতন মানুষের। তিনি আসিলেন 'অখণ্ডের ঘর' হইতে—জ্যোতির্ময় ধ্যানলোক হইতে!

শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে উপহার দিয়া গেলেন—নর-ঋষি নরেন্দ্রনাথ, যাহার মাধ্যমে জগৎ শুনিবে—তাঁহার মহাবাণী, বুঝিবে তাঁহার অপূর্ব জীবনের উদার গভীর মর্ম! আর রাখিয়া গেলেন—এই বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো, দৃষ্টির বাহিরে বৃক্ষমূলের মতো, সর্বশরীরে অদৃশ্য প্রাণশক্তির মতো—তাঁহারই উদ্বোধিতা—তাঁহারই সাধনশক্তির জীবন্ত জাগ্রত প্রতিমা—শ্রীসারদা দেবীকে—তাঁহার দেব-মানবতার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান।

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্ব এক দিক দিয়া যেমন চির পুরাতন, অন্য দিক দিয়া নিত্য নূতন; অতি সহজ সরল, অথচ অতি কঠিন গভীর গম্ভীর! সহজতাই ইহার নূতনত্ব নয়, নূতনত্ব ইহার সরলতায়, এবং সুগভীর ব্যাপকতায়!

'ঈশ্বর আছেন' একথা ত আমরা বাল্যাবধি বহু মুখে বহুভাবে শুনিয়াছি, বহু শাস্ত্রে পড়িয়াছি,—অর্ধসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছি, কিন্তু যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে শুনি—'হ্যাঁ গো, ঈশ্বর আছেন, তাঁকে দেখা যায়—আমি তাঁকে দেখেছি—যেমন তোমাকে দেখছি' তখন সংশয়সংকুল যুক্তিবাদ ভাসিয়া যায়।

'তুমিও তাঁকে দেখতে পাবে'—তবে তাঁর জন্য চাই ত্যাগ তপস্যা সাধন ভজন। ইহারও কত কাহিনী পুরাণের পাতায় পাতায় বর্ণিত। নূতন আশার কথা শুনাইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ,—'কলিতে অন্নগত প্রাণ, বেশি কঠোর সহ্য হয় না—ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তিন দিনেই হয়।' এই তীব্র ব্যাকুলতার সাধনা তাঁহার নিজ জীবনেই প্রদর্শিত, শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পথে সুদীর্ঘ সাধনার পূর্বেই তীব্র

ব্যাকুলতা সহায়ে মাতৃ দুগ্ধ-পিপাসু শিশুর মতো ব্যাকুল কাতর আহ্বানেই তাঁহার জগজ্জননী-দর্শন—নূতন করিয়া প্রমাণ করিয়াছে, 'ষড় দরশনে তাঁর না পায় দরশন,'—কিন্তু কাতর ব্যাকুল আহ্বানে ঈশ্বর-দর্শন সম্ভব।

'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি,' 'In my Father's house there are many mansions'—এ কথাও পুরাতন; কিন্তু সেই এক সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ—সাধনার দ্বারা একই জীবনে অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, পরমপিতার ভবনের সব ঘরের সংবাদ রাখেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যকেও তাহার মনের মত ঘরে, তাঁহার ইষ্টলোকে লইয়া যাইতে পারেন,—যার যা ভাব তাহাকে সেই ভাবেই আগাইয়া দিতে পারেন—এরূপ মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন মানুষ!

শ্রীরামকৃষ্ণ কেমন মানুষ—বলিয়া বুঝাইতে গেলে মনে পড়ে তাঁহারই কথিত কয়েকটি গল্পের নায়ককে, তাঁহাদের ভিতরেই যেন তিনি নিজের স্বরূপ লুক্কায়িত রাখিয়া গিয়াছেন।

বহু পরিচিত বহুরূপীর গল্প। বহুরূপীকে কেহ দেখিল লাল, কেহ নীল, কেহ সবুজ, কেহ হলদে; প্রত্যেকেই সত্য দর্শন করিয়াছে, প্রত্যেকেই ভিন্ন দর্শন করিয়াছে। তর্ক-বিবাদের পর সকলে উপনীত হইল সেই বৃক্ষ-সন্নিধানে, যেখানে তাহারা বহুরূপীকে দেখিয়াছে। সেখানে বৃক্ষতলবাসী একটি সাধু স্বীয় দর্শন ও অনুভূতি দ্বারা তাহাদের আংশিক-সত্য-দর্শনজাত তর্কের অবসান করিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ আমি এই গাছতলায় সর্বদা থাকি—সেই বহুরূপীকে সর্বদা দেখি—সে কখন লাল, কখন নীল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন আবার তার কোন রঙই থাকে না!'

এই ঈশ্বরাশ্রয়ী, সদা ভগবচ্চিন্তানিমগ্ন, বিভিন্ন সময়ে বহুরূপী সত্যের বিভিন্নরূপদ্রষ্টা সাধুই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তি!

শহরের উপকণ্ঠে এক অদ্ভুত রঞ্জক আসিয়াছে; একটি পাত্রে রঞ্জন দ্রব্য রাখিয়া সে সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে, 'ধৌত পরিষ্কৃত বস্ত্র রঙ করাইয়া লও, যার যে রঙে ইচ্ছা।' আশ্চর্য, একের পর এক—একই পাত্র হইতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী কাপড় রঙাইয়া লইতেছে। ধৌত বস্ত্র শুদ্ধ মন; বিভিন্ন রঙ ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টভাব, কিন্তু কে ঐ অদ্ভুত রঞ্জক? কি তার ঐ অদ্ভুত রঞ্জন দ্রব্য?

বুঝিতে বিলম্ব হয় না উপমার অন্তরালে নিজেকে লুকাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ—নিজেরই সমন্বয় মূর্তি প্রকাশ করিয়াছেন! জীবনের শেষে নরেন্দ্রের সন্দেহ নিরসনে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিতেছেন 'যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ'। নিজের কোন নূতনত্ব দাবি তিনি করেন নাই; তিনি পুরাতন সত্যের নবতম বিকাশ, বহুধা অনুভূত সত্যের সমন্বিত মূর্তি, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ চিরপুরাতন হইয়াও নিত্য নূতন!

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য

মধ্যযুগের অন্ধকারে বহিরাগত নানা জাতি যখন ভারতদেহ অধিকার করিয়া ভোগে প্রমত্ত, ভারতের কৃষ্টি ও ধর্ম লাঞ্ছিত, অবমানিত, বুঝি বা লুপ্ত হইবার উপক্রম, তখন শ্রীভগবানের অমিয় প্রকাশ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সেই ঘনঘোর অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া ভারতকে সচেতন করিয়াছিলেন স্বধর্ম রক্ষা করিতে। যুগোপযোগী ভাবপ্রবণ ভক্তি-ধর্ম প্রচার করিয়াই তিনি বন্যাবেগে সমাগত উগ্র বিশ্বাসপ্রবণ পরমতাসহিষ্ণু ধর্মের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।

শংকরাচার্য-প্রবর্তিত অদ্বৈত বেদান্ত জ্ঞানমার্গের শেষপ্রান্তে অনুভূতির তুঙ্গশীর্ষে অবস্থিত তুষার-শিখরের মতো। কিন্তু সাধনচতুষ্টয়হীন সাধারণ সাধক সে পথের শেষে যাইতে না পারিয়া অদ্বৈততত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া যখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্যের মহাভাবকে অহংকারে পর্যবসিত করিয়া বসিল, আবার ওদিকে বৌদ্ধধর্মের নানা সম্প্রদায়

উচ্চতর রীতিনীতি ভুলিয়া কতকগুলি তন্ত্রের আচারে দেশকে ভরিয়া তুলিতেছিল, তখন ভারতীয় সাধনায় নিশ্চয় একটি শূন্যের উদ্ভব হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারত হইতেই আচার্য রামানুজ ও মধ্ব ভক্তির তরঙ্গ তুলিয়া ঐ শূন্য পূর্ণ করিতে প্রথম প্রয়াসী হন, কিন্তু উহাকে মহাভাব ও প্রেমানুভূতি দিয়া পরিপূর্ণ করিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী। তিনি ভারতকে দিলেন—তার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক চৈতন্য। ভারত চিনিল—তাহার স্বরূপ কি, তাহার প্রাণপুরুষ কে, বুঝিল যুগোপযোগী ধর্ম কি, বুঝিল যুগ-যুগব্যাপী তাহার সাধনার মর্মই বা কি।

বহুবিস্তৃত ও বহুবিকৃত তন্ত্রসাধনার ধার দিয়া না গিয়া, দর্শনের দুর্ভেদ্য তর্কজালে জড়িত না হইয়া সহজ সরল জনসাধারণের জন্য তিনি প্রচার করিলেন সহজ সরল ভক্তিধর্ম, কলিযুগপাবন নামধর্ম। 'শিক্ষাষ্টকে'র প্রধান শিক্ষায় তিনি বলিলেন :

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

হে ভগবান, তোমার বহু নাম তো তুমিই করিয়াছ, প্রত্যেকটি নামে নিজের সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দিয়াছ, যে শক্তির বলে জীবের সংসারমোহ কাটিয়া যায়—যে নাম করিলে ভববন্ধন টুটিয়া যায়; যে মাত্র নামটুকু আশ্রয় করে সেই যথার্থ ভক্ত হইয়া জীবন ধন্য করিতে পারে। তোমার এই নাম স্মরণ করিবার নিয়মিত কোন স্থান-কাল নাই—যখন যেখানে খুশি অনুরাগভরে নাম করিলেই হইল; তোমার এত কৃপা, তুমি নিজেকে এত সহজলভ্য করিয়াছ, কিন্তু হায়! আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে তোমার এত নামের একটিতেও আমার অনুরাগ হইল না।

জীবের ভাব নিজেতে আরোপ করিয়া প্রেম-স্বরূপ প্রেমাবতারের এই আক্ষেপ, এই আর্তি—জীবকে শিখাইবার জন্য। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—এই আদর্শও যে তাঁহারই মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই নাম-ধর্ম, উচ্চ সংকীর্তন আপামর জনসাধারণকে আকর্ষণ করিল ঈশ্বরের দিকে, ধর্মের অবনতির গতি রুদ্ধ হইল। যাহাদের ধর্ম ছিল না—তাহারা পাইল নূতন সহজ ধর্ম, উচ্চবর্ণের অত্যাচারে ও দুর্ব্যবহারে যাহারা অন্য ধর্মের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছিল তাহারা বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয়ে হিন্দুসমাজেই থাকিয়া গেল। যাহারা স্বীয় স্বার্থে ধর্মকে বিকৃত করিতেছিল তাহারা সমাজ হইতে বিদূরিত হইল, যাহারা যুক্তি তর্কের গোলক-ধাঁধায় পথ হারাইয়া ঘুরিতেছিল, তাহারা প্রশস্ত সরল রাজপথে উপনীত হইয়া লক্ষ্যবস্তু দেখিতে পাইয়া স্বচ্ছন্দমনে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর যাহারা অযথা ভারতের ধর্মকে আক্রমণ করিতেছিল, এদেশের ধর্মভাব বুঝিতে না পারিয়া, তাহাকে হীন মনে করিয়া তাহার উচ্ছেদ-সাধনই নিজেদের পবিত্র ব্রত মনে করিতেছিল তাহারাও শুব্ধ হইল; ভাবিতে শিখিল—বুঝিতে শিখিল—এদেশের ধর্মেরও মূলমন্ত্র ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস ও শরণাগতি—এ গুলি প্রত্যেক ধর্মেরই সাধারণ সম্পদ কোন ধর্মের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। নাম বিভিন্ন হইলেও ঈশ্বরতত্ত্ব বস্তু এক। মধ্যযুগে এই ভক্তির ধর্ম, প্রেমধর্ম নানাভাবে নানা নামে—ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম সর্বত্র প্রচারিত ও আচরিত হইয়া ভারতের ভাবজগতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সংকটকালে যুগধর্ম রক্ষা করিয়া শ্রীচৈতন্য শ্রীভগবানের 'ধর্মগোপ্তা' নাম সার্থক করিয়াছেন। সেই রাত্রির ঘনান্ধকারে চৈতন্যচন্দ্রের উদয় না হইলে ভারতে ধর্মের কৃষ্টির সভ্যতার ও সাহিত্যের কি দশা হইত—তাহা অনুমানের অতীত। কিন্তু ভারতাত্মা অমর, তাই যথাসময়ে চৈতন্যচন্দ্ররূপে

উদিত হইয়া অমৃতক্ষরণ দ্বারা ম্রিয়মাণ ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া অনন্তযাত্রার পথে তাহার দেহে প্রাণে তিনি নব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন।

জাতি ও জাতিভেদ

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানকংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীনিবাস তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণে ভারতে জাতিভেদের নূতন ও পুরাতন রূপ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ কুফলের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, জাতিভেদ যদি দূর করিতেই হয় তো সংস্তরে ইহাকে অস্বীকার করিবার সময় আসিয়াছে, এক জায়গায় অস্বীকার করিয়া অন্যত্র ইহাকে স্বীকার করিলে চলিবে না।

তিনি বলিতেছেন,—'জাতিভেদের প্রতি সকলের এমন একটা নীরব সমর্থন আছে যে—যাঁহারা জাতিভেদের প্রচণ্ড বিরোধী তাঁহারাও ইহাকে সর্বত্র সমাজ-বৃত্তির মৌলিক উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন। অনেক নেতার মতে, যে সকল ধর্ম-সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করিতেছে—তাহাদের ক্ষতিকারক মনে করা উচিত নয়। রাজনৈতিকেরা চান—জাতিভেদ উঠিয়া যাক্, কিন্তু ইহার ভোটসংগ্রহ শক্তি সম্বন্ধে তাঁহারা সচেতন; এই খানেই উভয় সংকট! সমাধানের পথে প্রথম পদক্ষেপ—জাতিভেদের ব্যাপকতা স্বীকার করা, এবং ইহার অন্তর্নিহিত স্বরূপ বুঝিতে পারা।'

ইতিহাস আলোচনার সূত্রে তিনি বলিয়াছেন,—"বৃটিশপূর্ব যুগ-অপেক্ষা গত শতাব্দীতে জাতিভেদ শক্তিশালী হইয়াছে। সার্বজনিক বয়স্ক ভোটাধিকারে অনগ্রসর উপজাতিদের রক্ষাকবচ এই ভেদভাবকে আরও শক্তি দিয়াছে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির বিঘোষিত উদ্দেশ্য—'জাতিহীন শ্রেণীহীন সমাজ'। তাহার সহিত আধুনিককালে এই জাতিভেদভাবের শক্তিসঞ্চয় বড়ই বিসদৃশ লাগে।"

বৃটিশপূর্ব ভারতে জাতিভেদ আঞ্চলিক সীমায় নিবদ্ধ ছিল। একই অঞ্চলে বিভিন্ন বৃত্তি-অনুসারী ব্যক্তিগণ নিজেরা জাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া অপরাপর বৃত্তি-অনুসরণ কারী জাতির সহযোগিতায় সমাজ-জীবন গড়িয়া তুলিত। বৃটিশ অধিকারের পর রেল টেলিগ্রাফ ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্বেকার সীমা ভাঙিয়া গেল। বৃটিশ শাসনে নূতন আইন ও নূতন বৃত্তি—নূতন অর্থ-নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ওলট পালট করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতে জাতিভেদ দুর্বল হয় নাই, কারণ যাহারা নূতন শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া যুগোপযোগী বৃত্তি অনুসরণ করিয়া নূতন ধনী হইল—তাহারা পূর্বজাতির মধ্যেই সমাজের উচ্চস্তরে উঠিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বণিকশ্রেণীর ব্যক্তিরাই সর্বাগ্রে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও রীতি আয়ত্ত করিয়া চাকুরি, শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে উন্নতি করিতে লাগিল—তাহারাই শিক্ষিত নূতন মধ্যবিত্ত সমাজ গঠন করিল। বৃটিশ কিন্তু ইহাদের চাহিযাও চাহে নাই; তাই মানবিকতার নাম করিয়া তাহারা অনুন্নত জাতিদের জন্য রক্ষাকবচ সৃষ্টি করিয়া, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা দিয়া ভেদনীতির সূত্রপাত করিল; ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নেতৃবর্গও ইহাতে জড়াইয়া পড়িলেন, শাসন ব্যবস্থায় ইহাকে মানিয়া লইলেন।

বর্তমান ভারতে সকলেই চায়—অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হউক, অবহেলিত নিম্নবর্ণেরা সকলের সহিত সমান স্তরে এক হইয়া যাক,—কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে নাম পরিবর্তন হইলেও তাহাদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না।

'অস্পৃশ্য' না বলিয়া 'হরিজন' বলিলাম—এবং তাহাদের জন্য পৃথক্ কলোনি করিয়া সেই ত সভ্য ও শিক্ষিত সমাজ হইতে তাহাদের দূরেই রাখিলাম। নিম্নবর্ণ না বলিয়া 'পশ্চাৎপদ' বলিয়া তাহাদের জন্য

যে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তাহা কি তাহাদের ঐ নামের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে প্রলুব্ধ করিতেছে না?

জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে, সমাজে সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা স্থাপনের পথে, যদি জাতিভেদই প্রধান অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হয়—তবে আবার 'তপশীলী,' 'অনুন্নত' 'অনগ্রসর' 'উপজাতি' প্রভৃতি নূতন নূতন নামাবলী সৃষ্টির কি প্রয়োজন? বৃটিশের দায়স্বরূপ এই ভেদব্যবস্থা কতদিন জীয়াইয়া রাখিতে হইবে এবং কেন? ইহাতে কি জাতি দিন দিন দুর্বল হইতেছে না? ইহাতে কি 'অনগ্রসর' নামাঙ্কিত ব্যক্তিবর্গকে সুখসুবিধা লাভের আশায় দীর্ঘকালের জন্য অনগ্রসর থাকিতেই প্রকারান্তরে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে না? ইহাতে কি অনুন্নত নয়—এমন ব্যক্তিকেও সুবিধার জন্য বিশেষ তালিকায় নাম লেখাইতে প্রলুব্ধ করা হইতেছে না? উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় হয়তো তাহারা দুইদিন পিছাইয়া থাকিবে, কিন্তু তৃতীয় দিন হইতে নিশ্চয় তাহাদের সঞ্চিত শক্তি সহায়ে বর্ধিত গতিবেগে তাহারা আগাইয়া চলিবে; স্বোপার্জিত অগ্রগতি তাহাদের স্থায়ী ও যথার্থ উন্নতি আনিয়া দিবে।

জাতি হিসাবে 'পশ্চাৎপদ' প্রভৃতি নাম না রাখিয়া, এবং সেইভাবে সাহায্য-ব্যবস্থা ও জাতীয় সেবায় নিয়োগ-ব্যবস্থা না করিয়া শিক্ষা, জমি, স্বাস্থ্য, বয়স, আয় প্রভৃতির তারতম্যে প্রয়োজন ক্ষেত্রে সাহায্য করিলে এবং জাতীয় সেবার সকল ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে যোগ্যতম ব্যক্তি নিযুক্ত করিলে জাতীয় জীবনের মান এবং কর্মের ও কর্মক্ষমতার মান—অবশ্যই উন্নত হইবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতির ঐক্য এবং দেশের সামগ্রিক উন্নতি দ্রুত সাধিত হইবে। ভেদনীতিপরায়ণ বিদেশী-শাসক-নির্মিত প্রকোষ্ঠগুলি ভাঙিয়া দিলে ঐ সকল নামাঙ্কিত ব্যক্তিরা ভারতীয় জনতার সহিত মিশিয়া যাইবে, এবং আসন্ন অগ্রগতির স্রোতে তাহারা আপনিই আগাইয়া যাইবে। তথাকথিত উচ্চ-জাতি ব্রাহ্মণ-কায়স্থের এখন আর এমন অর্থনৈতিক সামাজিক শক্তি নাই যে তাহারা ইহাতে বাধা দিতে পারে। সমগ্র দেশে অধিকার-সাম্যদ্বারাই খণ্ডবিখণ্ড জাতি-ভেদ বিগলিত বিলুপ্ত হইয়া নূতন এক শক্তিশালী মহাজাতির অভ্যুদয় হইতে পারে; নতুবা নানাবিধ জাতিভেদবোধ, প্রাদেশিকতা এবং নিত্যনূতন অর্থ-নৈতিক স্বার্থবোধের ছদ্মবেশে ঐ সকল ভেদভাব আবির্ভূত হইয়া জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবে, জাতীয় জীবনের রক্তধারা বিষদুষ্ট করিবে।

প্রাকৃতিক জাতিবিভাগকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টানিয়া না আনিয়া ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়া যদি আমরা সমাজ হইতে ইহার দূষিত ভেদভাবটি দূরীভূত করিতে পারি তবেই কল্যাণ, নতুবা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ও প্রতিক্রিয়ায় একই সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপ বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে বিদ্বেষ করিয়া সমগ্র জাতীয় জীবনকেই দুর্বল ও কলুষিত করিবে যাহার ফলে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতি আরো খণ্ড বিখণ্ড হইতে বাধ্য; তাহার আভাষ বিভিন্ন স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, যথা ভারতের পূর্বপ্রান্তে নাগা সমস্যা, ছোটনাগপুরের আদিবাসী-আন্দোলন ও দক্ষিণে দ্রাবিড়-চেতনা। এই সকল খণ্ডচেতনার মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া যদি যথা-সময়ে ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করিয়া বৃহতের ভাব তাহাদের মধ্যে আমরা সঞ্চারিত করিতে না পারি তবে মহাজাতির স্বপ্ন স্বপ্নেই পর্যবসিত হইবে।

তরঙ্গসংকুল ঘটনাসমুদ্রে জাতীয় তরণী ঠিক পথে চলিতেছে কিনা, স্বামী বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতার দিগ্‌দর্শন হইতে তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব,' এবং প্রয়োজন হইলে দিক পরিবর্তন করিয়া সেই লক্ষ্যে তরণীর মুখ ঘুরাইতে হইবে।

স্বামীজীর স্পষ্টোক্তি: 'জাতিবিভাগ যথার্থ কি, তাহা লক্ষে একজন বোঝে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে

এমন কোন দেশ নাই—যেখানে জাতি নাই। ভারতে আমরা জাতিবিভাগের মধ্য দিয়া উহার অতীত অবস্থায় গিয়া থাকি। জাতিবিভাগ ঐ মূলসূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতে এই জাতি-বিভাগ করার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা—*ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ।* যদি ভারতের ইতিহাস পড়িয়া দেখ, তবে দেখিবে এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হইয়াছে এবং আরো অনেককে হইবে। শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হইবে। কাহাকেও নামাইতে হইবে না,—সকলকে উঠাইতে হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিবিভাগের চেয়ে ভারতের জাতিবিভাগ অনেক ভাল। ভারতীয় সমাজ স্থিতিশীল কবে? ইহা সর্বদাই গতিশীল। তবে আধুনিক জাতিভেদ ভারতের উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক; উহা সঙ্কীর্ণতা ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একটা গণ্ডী কাটিয়া দেয়। চিন্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।'

চিন্তার উন্নতি শিক্ষাসাপেক্ষ; এমন কোন *সামাজিক ব্যাধি নাই, যাহা শিক্ষার মোহন স্পর্শে* বিদূরিত না হয়। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূর করিবার জন্য ও নিষেধাত্মক বা রক্ষাকবচমূলক পন্থা অপেক্ষা ব্যাপক শিক্ষাপ্রচারের প্রশস্ত রাজপথই যে প্রকৃষ্টতর, এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতের আসন্ন জনজাগরণ মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াই কি স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া যান নাই—'উচ্চবর্ণেরা শূন্যে বিলীন হইয়া যাও, ঐ সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত!'

কেন?

'অনিরুদ্ধ'

নিস্পন্দ মর্মর-দেহে উঠিছে কি কোন প্রাণ-বাণী
গঙ্গার কল্লোল সনে? স্থিরাসনে বসি বদ্ধপাণি
কোন্ সিদ্ধি অভীপ্সায় রহ আজ—জাগে কৌতূহল।
অর্ধ-নিমীলিত আঁখি আজো কি গো হতেছে বিহ্বল
মর্ত্যের বেদনা বহি? অথবা কি শুধুই পাষাণ?
শুধুই কল্পনা-রাশি আমাদের স্তুতি পূজা গান?

কত তো কাঁদিয়া গেলে তপস্যায় করি' ক্ষীণ দেহ
কি যে তব প্রাণে ব্যথা, কেন ব্যথা—বু'ঝল কি কেহ?
বুঝিল কি কেন এলে, কি রাখিলে ভবিষ্যৎ লাগি
কেন মাতৃ-অঙ্ক ছাড়ি শত শত সাজিল বৈরাগী?
তবু মিটিল না সাধ? তবু এই মানুষের হাটে
দুর্লভ সঞ্চয় দিতে অযাচিত ফির ঘাটে ঘাটে?
কেহ তো দর্শক নাই, কেন তবে আর নৃত্য-গাওয়া
ব্যাকুল প্রতীক্ষা লয়ে কেন আর পথপানে চাওয়া?

যাও যাও রামকৃষ্ণ ফিরি যাও আপনার স্থানে
মায়ার একান্ত ঊর্ধ্বে বস গিয়া স্বরূপের ধ্যানে।
এ পৃথিবী নহে তব গেহ, এ পৃথিবী বড়ই নিষ্ঠুর
যত দিবে, রূঢ় প্রত্যাঘাতে হবে তুমি ততই বিধুর।
তোমার সারল্য স্নেহ আত্মভোলা লোকহিতৈষণা
শুধুই আনিবে টানি ক্রূর স্বার্থ নির্দয় বঞ্চনা।

জানি তুমি বোধিসত্ত্ব ছাড়িবে না হেথা নিজ পণ,
যত ক্ষরে হৃদয়-রুধির তত তব বাড়ে আকর্ষণ
মানব-কল্যাণ প্রতি। তাই আজো নাহি অবসর
মর্মর-মূরতি তাই প্রাণবান—কতই মুখর!
যে আসে তাহারে কয়, "আছি, আছি তোদেরি তো তরে
তোদের মূঢ়তা দম্ভ দৃষ্টির অন্ধতা যদি সরে
আমার নয়নে চাহি। আমার নয়ন-লোর দিয়া
যদি ধুয়ে দিতে পারি কারো কালি, রয়েছি বসিয়া
তাই সুর-নদীতটে; এই মোর জীবন-আকৃতি
বালক-নরেন্দ্রে ডাকি দিয়াছি যে এই প্রতিশ্রুতি।"

স্বামী প্রেমানন্দের দুইখানি পত্র

(জনৈক ব্রহ্মচারীকে লিখিত)

(১)

৺কাশীধাম

৪.১২.১৯১৬

স্নেহভাজনেষু

ন—তোমার শরীর নর্মদাতীরে ভাল আছে জেনে সুখী হইলাম। যেখানে থাক, প্রভু তাঁর ভক্তদের দেখবেনই দেখবেন। তুমি যখন লিখছ জব্বলপুরে plague (প্লেগ) আরম্ভ হয়েছে তখন আমাদের ঐ স্থানে গমন উচিত নয়। যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হয় তথায় কোন সময় লইয়া যাইবেন। শ্রীযুক্ত শৈ—র কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ভগবান তাঁহাকে শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে পূর্ণ রাখুন—ইহাই প্রার্থনা। যদি সুবিধা হয় শৈ—কে আগামী বড় দিনের ছুটিতে এখানে আসিবার জন্য বলিও। বোধহয় ঐ সময়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিমহারাজ আলমোড়া হইতে এস্থানে আসিবেন। তাঁর দেহ তত ভাল নয়, আবার তার উপর আমাশয় হয়েছে লিখেছেন।

ঠাকুর চরাচর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যে যেখান হতে তাঁকে ডাকিবে সেই প্রভুর অনন্ত কৃপা লাভ করিবে। অশরীরী ভগবান ভক্তের জন্য দেহধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। অশেষ দুঃখকষ্ট অকাতরে আমাদের জন্য সহ্য করেন—এসব প্রত্যক্ষ করেছি, অনুভব করেছি। তাঁকে একান্ত মনে অন্তরে অন্তরে ডেকে যাও—তবেই শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে। বলা ভাল, মিহিজামের মত বাড়াবাড়ি করিও না। কলির জীব, অধিক ভাবভক্তির বেগ ধারণ করতে পারবে না। সময়ে আহার করবে, নিয়মমত নিদ্রা যাবে। কখনও কখনও ভাল সাধুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবে। তর্ক করা ভাল নয়, ওতে ভক্তির হানি হয়। বৃথা তর্ক সর্বত্র পরিত্যাজ্য।

অভিমান ত্যাগ করা অতি কঠিন। নজর রাখবে যাতে ঐ মহাবৈরী নিকটে আসতে না পারে। উহা বহুরূপী—কত রকম বেশেই যে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে তার শেষ নাই। সাবধান—খুব সাবধান !

আমার দেহ এখানে ভালই আছে ও শিবানন্দ মহারাজ সুস্থ আছেন। শ্রীযুক্ত মহারাজ বাঙ্গালোর হইতে কন্যাকুমারী দর্শন জন্য গিয়াছেন।… এখানকার কুশল। তুমি কেমন থাক মাঝে মাঝে জানাবে। তুমি আমাদের স্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং শৈ—প্রভৃতি ভক্তদের আমাদের ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে। হও অতি মহৎ, হও অতি উদার।

ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী

প্রেমানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপদ
ভরসা

মঠ
বেলুড়
১২.৩.১৯১৭

স্নেহভাজনেষু

শ্রীযুক্ত ন—, তুমি ভাল আছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। এখন মঠে অনেক লোক, তাই বলি তুমি কিছুদিন ৺কাশীধামে বাস কর, আমাদের ইচ্ছা। একান্ত স্থান—এ সময়ে মঠে আদৌ নাই বলিলেই হয়। তুমি চঞ্চল হইবে না এ সময়। আমাদের মনে ভগবদ্‌ভক্তি-বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই যখন নাই তখন কাহাকে ভয় করিব? কেন করিব? ভালবাসায় জগৎ জয় হয়, বিশ্ব জয় হয়। চাই পবিত্র নিষ্কাম ভালবাসা। ঐ ভালবাসাই ভগবান, ভক্তিবিশ্বাস।

শরৎ মহারাজের সঙ্গে গত শনিবার লাট সাহেবের দেখা হয় লাটভবনে। এক আসনে বসাইয়া কথা হয় প্রায় দুই ঘণ্টা। বিশেষ খাতির করেছিল।·· জজ উডরফ কল্য মঠে আসিয়াছিলেন সস্ত্রীক,·· খুব খুশী হইয়া গিয়াছেন বোধ হয়। তোমরা সকলে কেমন আছ? আমার ভালবাসা সকলকে জানাইবে এবং তুমি জানিবে। ভগবান তোমাদের পবিত্রতায় পূর্ণ রাখুন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত তুরীয়ানন্দ স্বামী ও শিবানন্দজী ভাল আছেন, আর সকলেও ভাল। মাঝে গিয়াছিলাম মেদিনীপুর। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ

ধ্যান ও প্রার্থনা

স্বামী পবিত্রানন্দ

'আমাদের সব প্রার্থনাই কি পূর্ণ হয়?' কোন না কোন সময়—প্রায় সকলের মনেই এই প্রশ্ন জাগে। এক ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন ঠিক এমন প্রশ্নই করিয়াছিলেন, প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "আমি এক্‌শত বার বলিব যে, প্রার্থনা পূর্ণ হয়।" যাঁহাদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুভূতি হইয়াছে তাঁহারা বিনাদ্বিধায় এইরূপ আশ্বাস-বাণীই উচ্চারণ করিবেন। তাঁহারা বলেন, আমরা যাহা চাই তাহা অক্লেশেই পাইতে পারি। এখন দেখিতে হইবে প্রার্থনার কত প্রকার ভেদ ও স্তরবিন্যাস আছে, কি কি শর্ত পালিত হইলে ঈশ্বর আমাদের সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করেন, এবং সাধু-সন্তগণের এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নিজ নিজ জীবনে আমরাও উপলব্ধি করিতে পারি।

প্রথম প্রশ্ন: প্রার্থনা কি, এবং কিরূপেই বা ইহা পূর্ণ হয়? দর্শনের ভাষায় বলা যাইতে পারে, তীব্র চিন্তার দ্বারা আমরা ব্যক্তিত্বের গভীরে প্রবেশ করি, সর্বব্যাপী সত্তার সহিত একীভূত আমাদের হৃদয়স্থিত সত্য বস্তুকে স্পর্শ করি। যে বিশ্বমন হইতে জগতের যাবতীয় বস্তু শক্তি আহরণ করিতেছে তাহার সহিত আমাদের মন একীভূত হইয়া যায়, এবং সেই বিশ্বমনই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর দেন।

ভক্তিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা সেই একই

সত্যবস্তুকে, সাকাররূপে কল্পনা করি, এবং বলি, আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং তিনিই আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছেন। আমাদের ধারণা-অনুযায়ী ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, অতএব তিনি সমস্ত প্রার্থনাই পূর্ণ করিতে সক্ষম। আমরা তাঁহাকে আমাদের পিতা অথবা মাতা-রূপে কল্পনা করিয়া থাকি। মনুষ্য-সমাজে সকল পিতা-মাতাই যেমন তাঁহাদের সন্তানকে স্নেহ করেন, এবং তাহাদের সকল অভাব দূর করেন, তেমনি ঈশ্বরের নিকটও আমরা যাহা চাহিব, তাহা নিশ্চয়ই পাইব; তিনি আমাদের কোন অভাবই অপূর্ণ রাখিবেন না।

প্রার্থনা কত প্রকার হইতে পারে? আমরা প্রার্থনাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম প্রকার আবেদনমূলক, ইহাতে আমরা ঈশ্বরের নিকট 'এই দাও, ঐ দাও' বলিয়া প্রার্থনা করি। দ্বিতীয় প্রকার প্রশংসামূলক। ঈশ্বর চন্দ্র, সূর্য, ছয় ঋতু প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করি। তৃতীয় প্রকার প্রার্থনায় আমরা কেবল ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপস্থিতিই প্রার্থনা করি। শেষোক্ত প্রার্থনাই সর্বোৎকৃষ্ট।

অনেকে চীৎকার করিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ঈশ্বর যেন নিশ্চয়ই তাঁহাদের কথা শুনিতে পান। এক সময়—যখন আমি কলিকাতায় কোন এক আশ্রমে থাকিতাম, তখন ঠিক পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক প্রতিবেশিগণের যথেষ্ট বিরক্তি উৎপাদন করিয়া রাত্রিকালে জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। উচ্চৈঃস্বরে আমরা যাহা খুশি বলি না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না, অন্তরের সহিত যেটুকু বলিব সেইটুকুই ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য হইবে। সাধনার প্রারম্ভে—সাধরণতঃ আমরা বাক্যের দ্বারা প্রার্থনা করি, ক্রমে বাক্যের যে কোনই প্রয়োজন নাই আমাদের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা জন্মায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্রীষ্টধর্মের জনৈক মরমী সাধকের মতে: আভ্যন্তরীণ প্রশান্তিই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা; তখন বাহিরের গ্রহণযোগ্য সকল বস্তু হইতে, আমাদের চিত্ত সরিয়া আসে পবিত্র নির্জনতায়, জলন্ত বিশ্বাসে এবং বিনীত আত্মনিবেদনে। সাধক তখন ঐশ্বরিক সান্নিধ্যলাভের জন্য ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করে। পবিত্র আত্মার, অমূল্য প্রভাব লাভ করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। অবিরত অধ্যবসায়ে লভ্য এইরূপ অনুভূতির জন্য তুমি যখন একান্তে সরিয়া আস, তখন চিন্তা করিবে—তুমি যেন সেই ঐশ্বরিক সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছ, এবং তোমার সমস্ত দৃষ্টি কেবল তাঁহাতেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। মনে করিবে—তুমি তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছ এবং তিনি যাহা দিবেন তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ। সেই সঙ্গে ধীরভাবে, তোমার চিত্তকে অপূর্ব প্রশান্তি এবং স্তব্ধতায় ভরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। তোমার সমস্ত যুক্তি-তর্ক বিসর্জন দিবে, এবং স্বেচ্ছায় কোন কিছুর উপর চিত্তকে নিবদ্ধ করিবে না সে বস্তু তোমার নিকট যতই ভাল এবং কল্যাণকর বলিয়া মনে হউক না কেন। অনাবশ্যক কোন চিন্তার উদয় হইলে, মনকে ধীরভাবে সরাইয়া লইবে এবং এইরূপ বিশ্বাস ও ধৈর্য-সহকারে সেই ঐশ্বরিক সান্নিধ্য অনুভব করিবার জন্য অপেক্ষা করিবে।

সকল ধর্মশাস্ত্রেই প্রার্থনার নির্দেশ আছে, তবে প্রার্থনার কয়েকটি বিশেষ প্রকার ভেদকে অধিক মূল্য দেওয়া যাইতে পারে। যেমন বেদে বিভিন্ন দেবদেবী অথবা একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের নিকট, বহু প্রকার প্রার্থনার ইঙ্গিত আছে। বেদের জ্ঞান-কাণ্ড উপনিষদে ধ্যানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ধ্যান হইল অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় চিত্তকে সেই সত্যবস্তুর সহিত যুক্ত রাখা। সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবন-বিকাশের এই যে সার কথা উপনিষদের একটি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে: সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের যিনি অধিকর্তা

এবং যিনি আমাদের হৃদয়ে আসীন, তাঁহাকে আমরা মনের দ্বারা জানিতে পারি। যিনি সমাহিত চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সেই সর্বব্যাপ্ত কল্যাণপ্রদ অজরামর অখণ্ড সত্তার মহিমা উদ্ভাসিত হয়।

এই অংশে প্রার্থনার কোন উল্লেখ নাই। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যখন আমরা হৃদয়স্থিত ঈশ্বরের ·জ্ঞান লাভ করি তখন দেখি—তিনি কল্যাণমূর্তিতে সমগ্র বিশ্ব চরাচর আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন। অবশ্য এখানে এই 'জ্ঞান' কথাটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কারণ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা আমরা যে কোন জ্ঞানই লাভ করি না কেন, তাহা অজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। সেই সত্য বস্তুর জ্ঞান সাধারণ মানুষের মন ও বুদ্ধির অতীত। "তাহা হইলে মনের দ্বারা, আমরা তাঁহার জ্ঞান লাভ করি" এই কথাটির অর্থ কি! উপনিষদ এস্থলে সেই সর্বকলুষমুক্ত শুদ্ধ মনের কথা বলিতেছেন, যে মন আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎসর্গীকৃত। যে মুহূর্তে আমরা হৃদয়স্থিত চরাচরব্যাপ্ত সেই অখণ্ড সত্তার জ্ঞান লাভ করি, সেই মুহূর্তে আমরা নিজেদের জন্মমৃত্যুর পারে, অবিনাশী আত্মা বলিয়া অনুভব করিতে থাকি। উপনিষদ এই ভাবটিকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, অবশ্য দু'এক স্থলে প্রার্থনার কথাও বলিয়াছেন।

বুদ্ধও আবেদনমূলক প্রার্থনা অপেক্ষা এই ধ্যানের কথাই বেশি বলিয়াছেন। কিন্তু মূলতঃ ধ্যান ও প্রার্থনায় কি কোন প্রভেদ আছে? উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারি, হৃদয়স্থিত সত্য বস্তুতে চিত্ত সন্নিবদ্ধ করাই ধ্যান। আবার সর্বোত্তম প্রার্থনায় আমরা সেই একই অন্তর্নিহিত জ্ঞানাতীত সত্যবস্তুকেই সাকাররূপে কল্পনা করি, এবং তাঁহাকে লাভ করিবার এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত হইবার প্রার্থনা জানাই। আধ্যাত্মিক উন্নতির ঐ পর্যায়ে আমরা কখন জাগতিক বা বৈষয়িক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করি না। তিনি আছেন—এইটুকু জ্ঞানই তখন যথেষ্ট। অর্থাৎ প্রার্থনা এবং ধ্যান, সেই অখণ্ড সত্তারই নিকট উপনীত হইবার বিভিন্ন পথ মাত্র। সর্বোচ্চ স্তরে উভয়েই সমান।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের মধ্যে কয় জন বুদ্ধের মত বা উপনিষদের আদর্শে ধ্যান করিতে পারে। অধিকাংশ ব্যক্তিই বহু শিক্ষার পর ধ্যান করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। অবশ্য যাঁহাদের চিত্তে সেই সত্যবস্তু প্রতিফলিত হইয়াছে, তাঁহারা স্বভাবতই সেই উচ্চভাবে অবস্থান করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ধ্যানমগ্ন থাকিতেন তখন তাঁহার চিত্ত উচ্চ-জ্ঞানভূমিতে বিচরণ করিত, এবং তিনি কেবল আত্মার সহিত একীভূত হইয়া যাইতেন। সেই সময় বহির্জগতের সহিত তাঁহার কোন রূপ যোগ থাকিত না; কিন্তু তিনি যখন আবার সাধারণ-জ্ঞানভূমিতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি, দ্বৈত এবং অদ্বৈত—উভয় ভূমিতেই বিচরণ করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ সাধককে, বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিয়া ধ্যানী হইতে হয়।

একটি সংস্কৃত কবিতায় সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে চারিটি সোপান অতিক্রম করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় কিছু কিছু ধর্মাচরণ করিতে হয় যেমন—সন্ধ্যা, পূজা প্রভৃতি; ইহা ধর্মের বাহ্য রূপ। পরবর্তী অবস্থায় ভগবদনুরাগের জন্য প্রার্থনা করিতে হয়, এবং সেই সঙ্গে ভজন সঙ্গীত। তৃতীয় পর্যায়ে ধ্যান, অর্থাৎ চিত্তকে বিশেষ একটি চিন্তায় নিবদ্ধ রাখিবার অভ্যাস সাধন করিতে হয়। চতুর্থ অবস্থায়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপস্থিতি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হয়। ঐ অবস্থায় আমাদের ধ্যান করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না; বস্তুতঃ ধ্যান করা তখন অসম্ভব হইয়া

পড়ে, কারণ যে লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য আমাদের এই উদ্যম, তাহাই আমরা লাভ করিয়াছি।

এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে, আমাদের কতকগুলি শর্ত অবশ্যই পালন করিতে হইবে। জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রেই—বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এইরূপ কতকগুলি শর্ত মানিতে হয়। যথার্থ প্রণালী অনুসরণ এবং শর্তগুলি যথোপযুক্ত-ভাবে পালন করা না হইলেই ফললাভে তারতম্য ঘটে। ঋষিগণ যখন নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতে বলেন, 'প্রার্থনা সহজেই পূর্ণ হয়' তখন তাঁহারা ধরিয়া লন—শর্তগুলি ইতঃপূর্বেই যথাযথরূপে পালিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ প্রার্থনাকালে যথার্থ ব্যাকুলতা আনা চাই। সাধারণ লোকে প্রার্থনা করে না এবং প্রার্থনায় তাহাদের কোন আস্থাও নাই, কারণ তাহারা অহঙ্কার ছাড়া থাকিতে পারে না। যতক্ষণ আমরা মনে করি—আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই আমরা সব কিছু করিতে পারি, ততক্ষণ আমাদের প্রার্থনার সাহায্য নিষ্প্রয়োজন; এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে না পারিলে প্রার্থনা পূর্ণ হইবার কোন আশা নাই। অন্তরের অন্তস্তল হইতে প্রার্থনা করিবার জন্য ব্যাকুলতা আনিতে হইবে।

মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে দুইটি প্রধান সমস্যা মানুষকে পীড়িত করে, তাহাদের মধ্যে প্রথমটি হইল অসহায়ভাব এবং দ্বিতীয়টি হইল পাপবোধ। যদি প্রকৃতই আমাদের এই বোধ জন্মে যে, জীবনের সমস্ত কিছুই কোন স্থির লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবার পূর্বেই আমাদিগকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখনই আমরা একটি নির্ভর আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হই। পাপবোধের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রতি পদে সত্য ও শান্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যখন বিরক্তি ও নিরাশায় আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়, তখন আমরা এমন একটি আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হই—যাহা আমাদের শক্তি জোগাইবে, তখন প্রার্থনার জন্য যথার্থ ব্যাকুলতার উদয় হইবে।

ঐ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলেই আমরা একাগ্র হই। যখন আমাদের এই জ্ঞান হয় যে এমন একটি শক্তি আছে, যাহা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে—তখনই আমাদের প্রচেষ্টা একনিষ্ঠ হয়। অনেকের নিকট 'ঈশ্বর' সামান্য একটি শব্দ মাত্র, কিন্তু প্রকৃত উপাসক যতক্ষণ না তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তিনি বিচ্ছেদের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। যখন এই প্রকার ব্যাকুলতার উদয় হইবে, তখনই আমরা আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি করিতে পারিব। নিদারুণ বেদনার জ্বালায় জীবন যখন আমাদের নিকট দুর্বিষহ হইয়া উঠে—তখন বুঝিতে হইবে, সেই শ্রেয় বস্তু নিশ্চয় আমরা লাভ করিব। বস্তুতান্ত্রিক জগতেও, সাফল্য লাভ করিতে হইলে ঠিক এইরূপ ব্যাকুলতার প্রয়োজন হয়। অকপটে আমরা যাহা চাহিব তাহাই পাইব। চিত্ত যখন দৃঢ় হইয়াছে এবং যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিও ব্যয় করিয়াছি, তখন ফল আমরা নিশ্চয়ই লাভ করিব। সে সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছুই করিতে হয় না। কেবল প্রারম্ভেই কিছু উদ্যমের প্রয়োজন, তাহার পর তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলে অবশিষ্টটুকু আপনিই হইয়া যায়।

অপর আর একটি শর্ত হইল—প্রার্থনায় নিয়মানুবর্তিতা। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা করা উচিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে "ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজমান এবং কালাতীত, অতএব যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ে তাঁহাকে ইচ্ছামত প্রার্থনা করা চলিবে না কেন?" কিন্তু প্রকৃত বিষয় হইল, যদি অদ্য আমরা প্রাতরাশের পর প্রার্থনা করি, এবং আগামী কল্য শয্যাগ্রহণের প্রাক্কালে, এবং তৃতীয় দিনে কর্মস্থলে কাজের ফাঁকে, তাহা হইলে প্রার্থনা ক্রমশঃ বাহ্য হইয়া পড়ে। উপরি-উক্ত পন্থায় অগ্রগতির আশা অতি অল্প।

মনকে নিয়মনিষ্ঠ করিতে হইবে, এবং প্রার্থনার অভ্যাস অনুশীলন করিতে হইবে। অনেকে বলেন তাঁহারা প্রার্থনা করিতে পারেন না। প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের এই কথাই বলা যাইতে পারে, নিরাসক্ত ভাবে প্রার্থনার চেষ্টাটুকু মাত্র করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্ত আর কোন পথ নাই।

অধিকন্তু স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সারাদিন ধরিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রাতঃকালে অর্ধঘণ্টার জন্ম পবিত্রভাব অবলম্বন করিয়া বাকি দিন তাহার বিপরীত আচরণ করিলে চলিবে না। সর্বসময় আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা না হইলে আমাদের সকল প্রার্থনা বাহ্যাড়ম্বরে পর্যবসিত হইবে।

উপরন্তু, প্রার্থনায় আমাদের আস্থাবান্ হইতে হইবে। অবশ্য বিশ্বাস—একবারেই আসে না। প্রথমে কিছু অবিশ্বাস লইয়াই দৈনিক নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে বিশ্বাস জন্মাইবে। ইহা একপ্রকার আধ্যাত্মিক বিকাশ, এবং যাহারা নিত্যশুদ্ধ প্রকৃত বিশ্বাসীর সঙ্গ করিয়াছে, তাহারা প্রকৃতই ভাগ্যবান্। ধর্মোপদেশের অন্তর্নিহিত সত্য যে ঋষি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গ করিলে আমাদের অবিশ্বাস দূরে পালায়। সাধুসঙ্গ ছাড়াও—আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন বিকশিত করিবার চেষ্টা করিতে পারি এবং বিশ্বাসও লাভ করিতে পারি।

অনুশীলনের দ্বারা বিশ্বাস বর্ধিত হয়। আমাদের আস্থা যতই বাড়িবে, আধ্যাত্মিক নিয়মপালনেও আমরা ততই একনিষ্ঠ হইব। যতই ফল লাভ করিতে থাকিব, ততই আমাদের আকাঙ্ক্ষা বাড়িবে। উষাকালে পূর্বাকাশের রক্তিমাভা যেমন সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ঘোষণা করে, তেমনি আধ্যাত্মিক উন্নতির সামান্যতম স্ফুরণে, চরম সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা বিশ্বাসবান্ হই, এবং সেই সত্য বস্তু লাভ করিবার জন্ম নব প্রেরণা লাভ করি। একনিষ্ঠ ও অকপট চেষ্টায় আমরা চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারি, পূর্ণতার আস্বাদ লাভ করিতে পারি।

কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়—এতক্ষণ তাহাই আমরা আলোচনা করিলাম। প্রার্থনায় কি হয়? ইহা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু কেবলমাত্র কলাকৌশলের দ্বারাই সর্বসময়ে উন্নতি করা সম্ভবপর হয় না। বন্যা হইলে চতুর্দিক জলে ভাসিয়া যায়, তখন আর কূপ খনন করিবার প্রয়োজন হয় না। তেমনি গভীর আধ্যাত্মিক পিপাসা এবং অকৃত্রিম অনুরাগ জাগিলে কলা-কৌশল অনাবশ্যক হইয়া যায়। আমাদের সমস্ত অন্তর ঈশ্বরানুভূতির জন্ম ধাবিত হয় এবং সত্যবস্তু লাভ করে।

পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়, ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়, ভাবের চেয়ে মহাভাব, প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

যতপ্রকার অবস্থা আছে, তন্মধ্যে ধ্যানাবস্থাই জীবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। যতদিন বাসনা থাকে, ততদিন যথার্থ সুখও আসতে পারে না। যখন কোন ব্যক্তি ধ্যানাবস্থা হইতে সমুদয় বস্তু সাক্ষী-ভাবে পর্যালোচনা করিতে পারেন, তখনই কেবল তাঁহার প্রকৃত সুখলাভ হয়। ইতরপ্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে। মানুষের সুখ বুদ্ধিতে, আর দেবমানব আধ্যাত্মিক ধ্যানেই আনন্দলাভ করেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

"লহ মোর প্রণতি আভূমি"

অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পঞ্চতীর্থ

অরুণের অরুণিমা দিলে দেখা, পূর্বদিগঞ্চলে
অমার আঁধার ভেদি, মাতৃমন্ত্র গেয়ে উচ্চরোলে।
অগণিত মানবেরে জাগাইতে এসেছিলে তুমি,
অমরার প্রিয়পুত্র! লহ মোব প্রণতি আভূমি॥ ১

আষাঢ়েব সন্ধ্যাকাশ—লুপ্ত ববি-শশি-তারাগণ—
আনিল আঁধাব চক্ষে। দৈন্য-আর্তি-ব্যথা অনুক্ষণ
আশ্রিতের বক্ষ হতে বিদূরিলে নিজগুণে স্বামি,
আশ্রিতপালক প্রভো! লহ মোর প্রণতি আভূমি॥ ২

ইহধামে এলে যবে কৃপা করি ত্যজি দিব্যধাম
ইতরজনের লাগি, হ'ল তাবা পূর্ণমনস্কাম।
ইতিকথা শুনিবারে এল ছুটি কত জ্ঞানী গুণী
ইন্দিরার প্রাণধন! লহ মোর প্রণতি আভূমি॥ ৩

ঈশান হে! এসেছিলে ল'য়ে সঙ্গে তোমার ঈশানী,
ঈক্ষণে যাহাব জানি মুছে যায় সর্বক্লেদগ্লানি,
ঈর্ষা দ্বেষ মলিনতা দূব করি কোলে নিলে টানি
ঈপ্সিত সেবকজনে; লহ দেব! প্রণতি আভূমি॥ ৪

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত" বাণী
উমানাথ! দিলে কর্ণে মানবেব; জাগালে আপনি।
উদ্ধার করিলে সবে অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টি দানি'
উত্তুঙ্গ আলোকতীর্থে—লহ মোর প্রণতি আভূমি॥ ৫

ঊষার আলোক নামি সুবিশাল জলধির বুকে
ঊর্মিমালা সাথে দোলে, হেরি তোমা আপনার সুখে।
ঊর্ধ্বগ হইয়া ধায় ধোয়াইতে শ্রীচরণখানি
ঊর্মিলা-প্রাণের প্রাণ! লহ মোর প্রণতি আভূমি॥ ৬

ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাদেবী পেয়ে পূজা নানা উপচারে
ঋষিগণে দেখা দিয়া করে বাস তাঁদের অন্তরে।
ঋত্বিক হে! সেই দেবী এসেছিল সারদারূপিণী
ঋষিরাজ! তব সাথে; লহ দোঁহে প্রণতি আভূমি॥ ৭

এল ছুটে বিবেক রাখাল—লাটু হরি—শরৎ সারদা
এল কত ভক্ত যারা, জন্মে জন্মে সঙ্গে ছিল সদা।
একান্ত আপন জানি সকলেরে বুকে নিলে টানি
এ অধমে কর কৃপা; লহ লহ প্রণতি আভূমি॥ ৮

ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ভক্তি কারে বলে, কিবা শুদ্ধ মন—
ঐশীশক্তি কি সে বস্তু, জানি নাই ওহে তপোধন।
ঐতিহ্য হারায়ে গেছে, ফিরিতেছি আমি দিবা-যামী
ঐহিক সুখের লাগি, ক্ষমি, লহ প্রণতি আভূমি॥ ৯

ওপারে আলোর তীর্থ, এপারেতে ঘন অন্ধকার
'ওঠ চল' বলি কেবা ল'য়ে যাবে পঙ্গুরে এবার।
'ওখানে যে তোর ঠাঁই, কেন মিছে কাঁদিস বাছনি?'
ওহে নাথ! কে বলিবে? লহ দেব! প্রণতি আভূমি॥ ১০

ঔদ্ধত্য মাৎসর্য ঈর্ষা ক্রোধ আর ক্রূরতা নীচতা
ঔদাসীন্য, আধিব্যাধি নাশিয়াছে চিত্তের স্থিরতা।
ঔষধ প্রদানি তীব্র, কর দূর যত পাপ-গ্লানি
ঔচিত্যের কবহ বোধন, লহ মোর প্রণতি আভূমি॥ ১১

তিনি মানুষ হয়ে—অবতার হয়ে—ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়। বাউলের দল হঠাৎ এলো;—নাচলে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল। এলো গেল, কেউ চিনলে না।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংসদেব ও সংসার-জীবন

ডাঃ এস্. আহাম্মদ চৌধুরী

এই সংসার-জীবনে মানুষের দুঃখকষ্ট ভাবনা-চিন্তা অভাব অভিযোগ রোগশোক এই সকলের বিরুদ্ধে সতত সংগ্রাম করে চলতে হচ্ছে। এই যে বেঁচে থাকার সংগ্রাম এই তো জীবন! এমন দুঃখময় সংসারে বাস করা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি? তবু "কম্বলকে আমি ছাড়ছি, কম্বল তো আমায় ছাড়ছে না" বলে গল্পের সেই ভল্লুকের মত সংসারে আমরা জড়িয়ে আছি। অষ্টপাশ যেন বেতের কাঁটা, সর্ব শরীরে আঁকড়ে ধরে আছে। ঠাকুর তাঁর স্বাভাবিক সরল কথায় উটের উপমা দিয়েছেন, "উট কাঁটা ঘাস খেতে খুব ভালবাসে। মুখ দিয়ে দব্ দব্ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, তবু সে কাঁটা ঘাস খাচ্ছে। সংসারী লোক এত কষ্ট ভোগ করছে, তবুও তার চৈতন্যোদয় হচ্ছে না।"

এই সংসারে শান্তি কোথায়? এখানে এলাম কেন? সৃষ্টিকর্তা কি তবে নিষ্ঠুর? আমাদের দুঃখ দেওয়াই কি তাঁর উদ্দেশ্য? মন যখন এই সকল কথার বিচার করতে বসে তখন তাঁর ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে এই সকল কথার সমাধান খুঁজে পায় না। নিরাশার স্রোতে ভেসে যায়। কিন্তু মনকে যাঁরা আরও উর্ধ্বে চালিত করে সকল কারণের মূল কারণ ভগবানের সাথে যোগ করেছেন, তাঁরাই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, সমস্যার সমাধান করে গেছেন। পরমহংসদেব কথাটা এমন সুন্দর করে উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, বিদ্বান ও মূর্খ উভয়েরই তা বোধগম্য। তিনি বলেছেন, "সংসার শুধু কর্মক্ষেত্র, এটা চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। এখানে কাজ করে স্বধামে অর্থাৎ ভগবানের কাছে ফিরে যেতে হবে। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কলকাতায় কর্ম করতে আসা।" কর্ম কি? যা কিছু ভগবানের উদ্দেশ্যে করা যায় তাই কর্ম। শ্রীগীতার কথায়—কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা না করে, ভগবানে তা সমর্পণ করে কর্ম করতে হবে। এ ছাড়া অন্য ভাবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাজ করলে তাহা অকর্মে পরিণত হবে; যেন ভস্মে ঘৃতাহুতি। কোরানে আল্লা বলেছেন, "আমি জীবকে আমার উদ্দেশ্যে, আমার আরাধনা-জ্ঞানে কর্ম করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করে জগতে পাঠাইনি।" তাই প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে "বিছ্মিল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি" এই কথা বলে কাজে হাত দেওয়ার নির্দেশ আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমায় দিয়ে তোমার লীলা হবে
তাই তো আমি এলাম ভবে"

এমনি ভাবে ভগবানে সমর্পণ করে কাজ করলে জীবের ভাবনা অহংকার কমে যায়, কর্মে উৎসাহ হয় এবং সাফল্যে আত্মাভিমান ও বিফলতায় অবসাদ বা নৈরাশ্য আসে না। ঠাকুর বলেছেন, "সংসারে বাড়ীর দাসীর মত থাকবি; মনিবের ছেলেকে সে বলে আমার 'হরি', আমার 'যদু', কিন্তু মনে মনে জানে যে, এরা তার কেউ নয়। মনিবের বাড়ীতে চাকরি করে, কিন্তু মন পড়ে থাকে তার দেশের নিজ বাড়ীতে। হাঁস আর পানকৌড়ী জলে থাকে, কিন্তু জল তাদের গায়ে লাগে না। পাঁকাল মাছ কাদায় থাকে, কিন্তু তার গায়ে কাদা লাগে না। সংসারে চিনিতে বালুতে মিশে আছে। পিঁপড়ের মত চিনিটুকু বেছে নিতে হবে।"

ঠাকুর ছুতোরের মেয়ের উপমা দিয়েছেন, "ও দেশে ছুতোরের মেয়েরা এক হাতে ঢেঁকিতে ধান নেড়ে দেয়, চিঁড়ে কোটে;

আবার সময় সময় উনুনের কাঠ ঠেলে দিচ্ছে, ছেলেকে মাই দিচ্ছে, আবার পাওনাদারের কাছে পয়সা নিচ্ছে। এত যে কাজ এক সঙ্গে করছে তবু মন রয়েছে মুশলের দিকে।" ও দিকে একটু অন্যমনস্ক হলে হাত থেঁতলে যাবে। নষ্ট মেয়ের উপমা দিচ্ছেন, "নষ্ট মেয়ে সারাদিন সংসারের কাজ করছে, কিন্তু মন রয়েছে উপপতির দিকে। এমনি করে ভগবানের দিকে মন রেখে নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকতে পারলে তবেই সংসারের দুঃখ কষ্ট মনকে স্পর্শ করতে পারে না। এমনি ভাব মনে আনতে পারলে তবেই ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদের ভাষায় বলা যায়—

"এই সংসার মজার কুঠি
আমি খাই দাই আর মজা লুটি"

তা না হলে "এই সংসার ধুখের টাটি।" বদ্ধ জীবের সংসারজীবনকে ঠাকুর তাই আমড়ার সাথে তুলনা করেছেন, 'আমড়ার শুধু আঁটি আর চামড়া, খেলে হয় অম্লশূল।' তিনি বলেছেন, "মন নিয়েই কথা। মনের যেমন ভাব, যেমন লাভ। মন ধোপা ঘরের কাপড়ের মত। যে রঙে রঞ্জিত করবে সেই রঙই ধারণ করবে।" কোরান বলেছে "আল্লার রঙে রঞ্জিত হও।" যীশুখ্রীস্ট বলেছেন "Be perfect as thy father in heaven is perfect" অর্থাৎ স্বর্গীয় পিতা ভগবানের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন হও, ইহাই আসল Baptism (দীক্ষা)। যদি বলা যায় "হে রঙের মালিক, তোমার নিজের রঙে আমায় রঙিয়ে দাও" তবেই দোলপূজার আবির মাখা সার্থক হয়।

কৃচ্ছ্রসাধনার দরকার, তীব্র বৈরাগ্য ব্যাকুলতা হলে তবেই তাঁর দয়া হয়। তাঁর কৃপা হলেই ত সকল দুঃখের শেষ হয়। পরমহংসদেবের ভাষায় "যেন বহুকালের অন্ধকার ঘরে হঠাৎ কেউ আলো জেলে দিল।" মনকে আত্মমুখী করতে না পারলে সংসারের দুঃখ কষ্টে নির্বিকার ভাব হতে পারে না। স্বামী শিবানন্দ বলেছেন, "তুমি মনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সুখকে দুঃখে এবং দুঃখকে সুখে পরিণত করতে পার।" তাই সংসারমুখী মনকে বিবেকরূপ লাগামে বেঁধে, জ্ঞান ও প্রেমের দিকে টেনে আনতে হবে। সংসারী লোকের কি কোন গতি নেই? ঠাকুর তাই ভক্ত অধরকে আশার বাণী শুনাচ্ছেন: "সংসারে থেকে হবে না কেন? তিনিই পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা দীন দুঃখী প্রতিবেশী হয়ে তোমার সেবা গ্রহণ করছেন। জীবের সেবায় তাঁরই সেবা করা হচ্ছে, এই জ্ঞান নিয়ে সংসারে সকল কাজ করে যাবে। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে নির্জনে প্রার্থনা করবে,—মা, আমার কর্ম কমিয়ে দাও। এক হাত তাঁর পাদপদ্মে রাখবে, আর এক হাতে সংসারের কাজ করবে। যখন অবসর পাবে তখন দুখানি হাতই তাঁর চরণে রাখবে। তাঁর প্রতি ভালবাসা এলে সংসারের সুখ আলুনি লাগবে।" সংসারের দুঃখ ও যাতনা মনকে স্পর্শ করে আর বিচলিত করতে পারবে না। মনকে যে এই ভাবে নির্লিপ্ত করে সংসারের কাজ করে যেতে পারে কর্ম তার বন্ধনের কারণ হয় না। শ্রীগীতার সার কথা এই নিষ্কাম কর্ম। কর্মে কর্তৃত্বাভিমান থাকলে সে কর্ম দুঃখের কারণ হয়। কিন্তু তোমার কাজই আমি করছি, আমার আবার ইচ্ছা কি? তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ঠাকুর বলতেন "আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার। যেমন করাও তেমনি করি।" আগুনের তাপে চাল, ডাল, আলু, পটল উনুনের উপর হাঁড়ির মধ্যে লাফালাফি করছে কিন্তু উনুনের নীচে থেকে জ্বালানি কাঠ টেনে নিলেই সব নিস্তব্ধ। ঠাকুরের এই কথার ভাবটি মনে রেখে কাজ করলে কাজ করতে বেশ উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দীপন ব্যাখ্যার বস্তু নহে, অনুভূতির আনন্দ। মনে সেই আনন্দ এলে সংসার আর দুঃখময় থাকে না। সংসারী লোকের পক্ষে ঠাকুরের কথামৃত তাই নবজীবন-রসায়ন-স্বরূপ।

দক্ষিণেশ্বর

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় ভাস্বর,
স্মৃতির মূর্ত তীর্থধাম ঐ নিত্যধাম ঐ চিরাবিনশ্বর
দক্ষিণেশ্বর !

শাক্তধর্ম্মের মহাপীঠস্থান আদ্যাশক্তির হোথা অধিষ্ঠান
হোথা জগন্ময়ী জগ-বিধাত্রী হোথায় চিন্ময় মহাযোগেশ্বব,
দক্ষিণেশ্বর !

শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়-ঋদ্ধির সিদ্ধ-পীঠ ঐ সাধন-সিদ্ধির
'মা' মহামন্ত্রের অমৃত-ঝঙ্কাব বহে অনর্গল নিতি-নিরন্তর,
দক্ষিণেশ্বব !

পাবনী গঙ্গার মুক্তি-কল্লোল রম্য তীর্থেব মর্মে দেয় দোল্‌
শ্রীমন্দিরে মাব অভয়া মূর্তি, দ্বাদশ মন্দির মাঝে মহেশ্বর,
দক্ষিণেশ্বর !

পঞ্চবটীতল জ্ঞান ও ভক্তির জ্বাল্‌ল মঙ্গল বর্তি মুক্তির,
সর্বধর্মেব মিলন-ক্ষেত্র সর্বপন্থার সাম্যে ভাস্বর,
দক্ষিণেশ্বর !

সাকার-ভক্তের ভক্তি-মার্গের জ্ঞানানুরক্তের জ্ঞানের স্বর্গের
নিত্য-সত্যের সর্বতত্ত্বেব ঐক্য-মন্ত্রের মহাধামেশ্বর,
দক্ষিণেশ্বর !

সন্ত্রী-দণ্ডীর ব্রহ্মানন্দের বেদ ও চণ্ডীর ছন্দোবন্ধের
সকল ভাষ্যের মহারহস্যের সাম্য-ঐক্যের তথ্যে ভাস্বর
দক্ষিণেশ্বর !

ধর্ম-ধাম ঐ সাম্যসন্ধির, মৈত্রী-পীঠ ঐ ভিন্ন পন্থীর,
শৈব-শাক্তের ব্রাহ্ম-বৌদ্ধের জৈন-খ্রীষ্টের হোথা একেশ্বর
দক্ষিণেশ্বর !

বিবেকানন্দের তিনটি ফটো

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, এম্-এ

বিবেকানন্দ কেবল পুরুষশ্রেষ্ঠ নন, সুপুরুষেরও শ্রেষ্ঠ। এ যুগে ভারতের অগ্রগণ্যদের মধ্যে সুপুরুষের অভাব ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও জহরলালের কথা মনে আসে; তবু বিবেকানন্দের মূর্তিতে একটা বিশেষত্ব আছে।

মানব-ঐশ্বর্যের একটা বড় ঐশ্বর্য দেহরূপ। কেবল বৈষ্ণব নয়, সব মানুষই প্রথমে রূপ দেখে ভোলে। যাঁরা নরোত্তম, তাঁরা যখন দেবোত্তম হয়ে দাঁড়ান, তখন তাঁদের অর্চনার একটা ধারা বয়ে যায় ঐ রূপসাগরের দিকে। কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে ঘিরে ভারতের শিল্পচেতনার পরিস্ফূর্তি। "নীরদ নয়ন" চৈতন্যের রূপের বন্দনা করেছেন বৈষ্ণব কবি অপরূপ ভাষায়।

বিবেকানন্দের রূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় আসা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমরা তাঁকে দেখিনি। তাঁকে দেখেছেন এমন লোকও বিরল হয়ে আসছে। একজনকে বলতে শুনেছি, 'আর কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে দুটি আশ্চর্য কমল চোখ।' অন্য একজন বললেন, 'বক্তৃতা করছিলেন, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করে ফিরছিলেন প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, মেঘধ্বনির মত গম্ভীর অথচ সঙ্গীতময় কণ্ঠ গুরুগুরু করে উঠছিল।'

আমার বক্তব্য অন্যতর। বিবেকানন্দের খুব বেশি না হলেও কতকগুলি ফটো আছে। তার মধ্যে তিনটি সর্বাধিক পরিচিত। পরিব্রাজক, হিন্দু সন্ন্যাসী এবং ধ্যানস্থ—এই ত্রিমূর্তিতে বিবেকানন্দকে আমরা পথে ঘাটে ঘরে সর্বত্র দেখে থাকি। আরো নানা উৎকৃষ্ট ছবি তাঁর আছে, আরো সুদৃশ্য, তবু ঐ তিনটি ছবিই জনচিত্তে স্থান পেয়েছে।

জনতার বিচারবুদ্ধির উপর আমরা আস্থা রাখি না, বিবেকানন্দের বিপুল প্রত্যাশা ছিল কিন্তু তাদেরই উপর। তারাও ভালবেসে শ্রদ্ধা করে তাঁর যে তিনটি ছবিকে নির্বাচন করেছে, তার মধ্যে বিবেকানন্দের চরিত্র সম্বন্ধে তাদের বিচার ও সিদ্ধান্তের ঘোষণা আছে। সে সিদ্ধান্ত অত্যাশ্চর্য-রূপে সত্য। বিবেকানন্দ-জীবনের সংক্ষিপ্ততম টীকা তাঁর ঐ চিত্র তিনটি।

হুবহু প্রতিকৃতি, বিশেষ করে ফটোগ্রাফ এতই ব্যক্তিগত, যে তার মধ্যে আমরা সাধারণতঃ কোনো ব্যঞ্জনা অনুভব করি না। সেই কারণে বড় আর্টিস্ট যখন প্রতিকৃতি আঁকেন, তখন তার মধ্যে তিনি অতিরিক্ত কিছু যোগ করে দেন। তাঁদের আঁকা প্রতিকৃতি সত্যকার শিল্পচিত্র হয়ে ওঠে। ফটো সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। ক্যামেরার চোখ মিথ্যে দেখে না, কিন্তু সত্য দেখে কি? অন্ততঃ সর্বাঙ্গীণ সত্য? পরমাশ্চর্য, বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে জড় ক্যামেরা সত্য দর্শন করেছে। বিবেকানন্দের ফটো প্রতীকচিত্র হয়ে উঠেছে।

প্রতীকচিত্র আমরা তাকেই বলব, যখন ছবি নিছক মানুষটিকে নয়, ব্যক্তির অতীত একটা ভাবকে ফুটিয়ে তোলে। ব্যক্তিগত মানুষটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা সংস্কার যা কিছু আছে, সব মুছে দিয়ে প্রতীকচিত্র নিখিল মানুষের চিরন্তন হৃদয়াবেগের কাছে আবেদন জানায়। খুব পরিচিত মানুষের ছবি হতে সাধারণভাবে এই নৈর্ব্যক্তিক ভাব জাগান কঠিন হয়। শিল্পীর মডেল তাই অজ্ঞাত-কুলশীল। সে একটা মানুষ মাত্র। বিবেকানন্দের মত পরিচিত মানুষ ভারতে কম আছে। তত্রাচ তাঁর ছবি জনচিত্তে একটা বিশেষ ভাব উদ্দীপিত

করে। এইখানেও তাঁর সম্বন্ধে জনতার রায়: বিবেকানন্দ যতখানি জীবন, ততখানি আইডিয়া।

এইবার উপরোক্ত বক্তব্য দুটিকে সংযুক্ত করতে হবে—ছবি তিনটি কেন জীবনভাষ্য এবং সমভাবে ব্যক্তি-পরিচ্ছিন্ন ভাবপ্রতীক।

প্রথম পরিব্রাজক। যথার্থতঃ বিবেকানন্দের প্রথম প্রকাশ পরিব্রাজকরূপে; বিলে নয়, নরেন নয়, নরেন্দ্র নয়—বিবেকানন্দ। ঐ নামটিও পরিব্রাজক অবস্থায় নেওয়া। তার পূর্বে—

এখনো বিহার' কল্পজগতে
　অরণ্য রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্মবিহীন বিজন সাধনা
বসে বসে শুধু আনমনে শোনা
আপন মর্মবাণী।

বিবেকানন্দ যখন পথে বেরিয়ে পড়লেন আপন মানসগুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে, তখন তিনি স্রষ্টার হাতের শেষ ছোঁয়াটুকু পেয়েছেন। বিবেকানন্দ পরিব্রাজক হবেন না? যে অকূলান্ত মহাসাগরের তল থেকে বিবেকানন্দ-মহাদেশের জন্ম এবং তা যে কারণে—সেই মহাকারণই তাঁকে ঐ সমুদ্র-গভীরের অপার শান্তি ও স্তব্ধতা থেকে বঞ্চিত করেছে। ধারণ করতে হবে, বহন করতে হবে, তাই তো বেদনাক্ষুব্ধ বারিধি হতে হিমালয়শীর্ষ ভারত-ঊর্ধ্বাঙ্গের সমুন্নতি; রামকৃষ্ণ-সাগর হতে বিবেকানন্দের উন্নয়ন। পৃথিবীতে দুঃখ আছে, কান্না আছে, আছে নিষ্ঠুর শাসন ও নিঃসীম অত্যাচার; বিবেকানন্দ তা জানেন, কিন্তু পথে নেমে জনতার জন হয়ে তা বুকে বিঁধে উপলব্ধি করতে হবে, তাই বিবেকানন্দ ভারতের পথে। আর এই উপলব্ধি যেন খণ্ডিত না হয় আসক্তি ও অভিমানে, বিকারে বা বাসনায়—ভারতসত্তার পূর্ণরূপ সন্ন্যাসের সত্যদর্শনের আলোকে গ্রহণ করতে হবে—বিবেকানন্দ তাই পর্যটক নন, তিনি পরিব্রাজক।

আরো এক কারণে প্রথম পরিস্ফুট বিবেকানন্দকে পরিব্রাজক-রূপেই পাই। নরেন্দ্রের বড় ইচ্ছা ছিল সমাধি-সমুদ্রে ডুবে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সবলে তাঁকে ব্যক্তিমুক্তির গহন থেকে ছিন্ন করে আনলেন। বিশ্বের মধ্যে বিবেকানন্দকে বিশ্বরূপ দেখতে হবে, শুধু আপনার মধ্যে নয়। পরিব্রাজক-রূপে সেই নবসাধনার সূত্রপাত। কর্মসমুদ্রের তরঙ্গচূড়ায় দাঁড়িয়ে পরবর্তীকালে একদিন স্বামীজী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "সেই কৌপীন, মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন, ভিক্ষায় ভোজন, হায় ইহারাই এখন আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়"—কর্মযোগীর কঠোর বৈরাগ্যের জীবন এই কালেরই; আবার তীর্থে তীর্থে বৈদান্তিক তাঁর ক্ষুধার্ত নারায়ণকে যখন দেখছেন—সেই পরম প্রেমিকও প্রকাশিত হয়েছেন এখনই; বিবেকানন্দের এই দুই রূপই সত্য; এবং পরিব্রাজক অবস্থায় সবচেয়ে সার্থকভাবে উভয়ে মিলিত হয়েছে; তার পরে বা পূর্বে নয়। হয়ত কখনো কর্মী বড়, কখনো বা ধ্যানী।

কেবল ঐ দুই রূপই নয়, আরো একটি প্রকাশ—সেই চিরসংগ্রামী—সেও এসেছে এই লগ্নে; ভারতের গ্রামে তীর্থে নগরে জলদ্-মনীষা বিবেকানন্দের জয়ধ্বজা উড়েছে। নরেন্দ্র জয় করে, বিবেকানন্দ করে উপলব্ধি। তাই বলি পরিব্রাজক হ'ল বিবেকানন্দের প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব মূর্তি, হয়ত শেষও।

এইবার দেখতে বলি সেইরূপ— দাঁড়িয়ে আছেন এক সন্ন্যাসী, পদপল্লব থেকে মুণ্ডিত মস্তক অবধি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেহ, করোদ্ধৃত চিরসঙ্গী যষ্টি, ঈষৎ পার্শ্বীকৃত উন্নত মুখ, উদার আঁখি সুদূর দিগন্তে বিলগ্ন—এ রূপ কি শুধুই বিবেকানন্দের?

'তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।'

বিবেকানন্দ কি সেই লক্ষ্যে, সেই পথে এসে দাঁড়ান নি? বিবেকানন্দ কি বিলীন হয়ে যাচ্ছেন না 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'র 'যুগযুগ ধাবিত যাত্রী' দলের মধ্যে? ঐ পদধ্বনি, ঐ ভ্রমণ-যষ্টির মৃদুস্থির আঘাত কি অনাদিকালের বিচিত্র পথচলার ঐকতানে মিলিত হচ্ছে না?

ঐ পরিব্রাজক মূর্তি চিরন্তন যাত্রীর।

স্মরণে আনবার চেষ্টা করছি পথ-চলার শ্রেষ্ঠ ছবি আর কি আছে আমাদের। বাস্তব ও কাল্পনিক!

বুদ্ধের কথা মনে আসে, মনে আসে শঙ্কর এবং চৈতন্যের কথা। তাঁদের ভারত-পরিক্রমণের সঙ্গে বিবেকানন্দের ভারত-পর্যটনের প্রভেদ আছে। বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্য আগে সিদ্ধ হয়েছেন, এবং সেই সিদ্ধির দুর্লভ সত্য জনে জনে বিতরণ করতে ভারতের পথে পথে ফিরেছেন। বুদ্ধ তাই পথ চলেন যখন, পরম বরাভয় ও করুণার মুদ্রায় দক্ষিণ-করতালু পৃথিবীর পানে উত্তোলিত উন্মুক্ত থাকে। শঙ্করের চিত্রের কথা মনে করতে পারছি না, কল্পনা করতে পারি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার দুঃসহ দীপ্তিকে, সে যেন জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের মর্ত্যবেষ্টন। আর দুই বাহুর আন্দোলিত আকুলতা ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত করে সংবিৎ-হারা ছুটে চলেন যিনি, তিনিই প্রেম-দেহ শ্রীচৈতন্য!

এঁরা নয়, বিবেকানন্দই যথার্থ পরিব্রাজক, কারণ এ তাঁর সাধনার ক্ষণ। গুরুর নিকটে আত্ম-সিদ্ধি যদি বা হয়ে থাকে, ভারত-সিদ্ধি অথবা বিশ্ব-সিদ্ধি তখনো তাঁর হয় নি। বিবেকানন্দ যে পরবর্তী জীবনে বলেছিলেন, আমি অশরীরী বাণী (I am a voice without a form)—সে কথা তিনি বলতে পারতেন না, যদি ঐ বাণীর শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ না করতেন সমগ্র ভারতদেহে। এর জন্য তাঁকে সন্ধান করতে হয়েছে কাশ্মীর থেকে কন্যা-কুমারিকা, বঙ্গ থেকে গুজরাট; এই পরিক্রমার পথেই দেখা যায়—রাজা যাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে আছে, তাঁকেই আবার পাঠ গ্রহণ করতে হয়েছে নর্তকীর নিকটে।

ও তো গেল অতীতকালের চিত্র, পরিব্রাজকের নিকট কালের ছবি মেলে কি? প্রথমেই যেটির কথা মনে আসে সেও আর্টিস্টের কল্পনার ধন—নন্দলালের আঁকা গান্ধীজীর ডাণ্ডী-অভিযান চিত্র। 'হাম যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে, তব তামাম হিন্দুস্থান উথল যায়েঙ্গে'—আত্মবিশ্বাসের অনমনীয় মূর্তি—প্রতিটি পদক্ষেপ পড়ে আর ভারত উথলে উথলে ওঠে—সে ছবি নন্দলালের; সেই কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত যষ্টিসম্বল, ঈষৎ নত দুর্গমপথযাত্রীর অভ্রান্ত চিত্র। এ ছবি যত অপূর্ব হোক, যথাযথ পরি-ব্রাজকের নয়। দুঃসাধ্য এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে লাভ করবার যে সুকঠোর দৃঢ়তা ফুটেছে প্রত্যেকটি দেহসন্ধি এবং মাংসপেশীতে—সে দৃঢ়তা এবং তপস্যার কাঠিন্য পরিব্রাজকেরও আছে—সেই সঙ্গে আরো আছে মুক্ত আকাশতলে আত্মবিকীরণের উদার প্রসন্নতা। পরিব্রাজক পথ চলবেন, ভূমিতলে আসন পাতবেন, ডুবে যাবেন নিশীথিনীর গভীর গম্ভীরে, উত্থিত হবেন অরুণোদয়ের সঙ্গে, চলতে চলতে ঘনপ্রসন্ন কণ্ঠে আবার ডাক দেবেন গৃহস্থ প্রাঙ্গণে—ভবতি, ভিক্ষাং দেহি। বিবেকানন্দের মূর্তিতে সেই প্রকাশ।

আরও একটি ছবি, সে এখনও শিল্পীর তুলিতে ধরা পড়ে নি—সমর্থ প্রতিভার প্রতীক্ষায় রয়েছে এক শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রীর ভাবরূপ। "দূরে বহুদূরে ঐ নদী ছাড়াইয়া, ঐ পাহাড় পর্বত অরণ্য ছাড়াইয়া ঐ আমাদের দেশ"—সে যেন এক অশরীরী কণ্ঠ বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির অনুসরণের মত মনপ্রাণ উচ্চকিত করেছিল একদা—আমার দেশ আছে দূরে অনেক-দূরে—অতএব পথিক চল। এ আমার মাটির দেশ, এ আমার স্বপ্নের দেশ, কত দিবসরাত্রির দ্বার অতিক্রম করে ঐ আনন্দলোকের সিংহদ্বারে উত্তীর্ণ

হতে হবে—"ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা"—যিনি ডাকছেন তাঁর দূরাগত কণ্ঠই শুনেছি, দর্শন করিনি তাঁকে, সে বাণীরূপের সঙ্গে চিরযাত্রীর মূর্তি কি সংযুক্ত করতে পারি না ?

স্বামীজীর দ্বিতীয় চিত্র—আমেরিকায় হিন্দু সন্ন্যাসীর; মোহিতলাল যে বিবেকানন্দের কথা বলেছেন,—"পুরুষসিংহ, জগতের মহত্তম মহাকাব্যের নায়ক হইবার উপযুক্ত, তাঁহার চক্ষে জলদর্চি, কণ্ঠে পাঞ্চজন্য" স্বামীজী-চরিত্রের সেই দ্বিতীয় প্রকাশও এই রূপে। বিপ্লবী সন্ন্যাসী পূর্ণপ্রভায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমেরিকার মানুষ সে অসহ্য রূপ দেখে বলেছে—সাইক্লোনিক হিন্দু-মঙ্ক। ভারতের মানুষ বলে, "মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বলভাস্কর"। ভাষা ভিন্ন, কিন্তু বক্তব্য এক। এইরূপেই বিবেকানন্দ সর্বাধিক মনোহরণ করেছেন। পশ্চাত্যবিজয় এবং প্রাচ্যপ্রতিষ্ঠা এর পরেই ঘটেছে। পরিব্রাজক মূর্তির পরে কোন্ দৈববলে এই বিজয়ী রাজবেশ, তা আমাদের ধারণার অতীত, অথচ বিবেকানন্দের কথা চিন্তা করতে—মাঝের আর কোন 'চেহারার কথা মনেই আসে না।

বিবেকানন্দজীবননাট্যের ক্লাইম্যাক্সও এইখানে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দকে প্রথম এবং শেষ সম্পূর্ণাত্মব প্রকাশ বলেছি। পরিব্রাজক জীবনের অন্তে সন্ন্যাসী সংগ্রামীরূপে দেখা দিলেন। সংগ্রামীরূপের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঐ বৈশাখী ঝঞ্ঝার মূর্তিতে। কর্মী নেতা যোদ্ধা বিবেকানন্দ সহস্র শিখায় জ্বলে উঠেছেন এখানে। আগ্নেয় পর্বত যেন সচল হয়ে পৃথিবী পর্যটন করেছে। অতঃপর স্বাভাবিক ভাবেই আসবে শান্তভাব, জীবনের সত্য লক্ষ্য সম্বন্ধে নবভাবনা—তাই সংগ্রামী হতে সন্ন্যাসীতে প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ ঝটিকোত্তর শান্ত স্তব্ধ সমুদ্র। ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পরেও যে বিবেকানন্দ 'কলম্বো থেকে আলমোড়া' গর্জন করে ফিরেছেন, সে অভ্যাসবশে—আরো সঠিকভাবে—নিছক প্রয়োজনবশে। বাহ্যতঃ উন্মাদনার স্পন্দন বজায় থাকলেও অন্তরে "বিপুল বিরতির" সন্ধ্যাসঙ্গীত শুরু হয়ে গিয়েছে।

এইবার চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করতে বলি। অপরূপ! অপরূপ! সেই বীরমূর্তি! পরিব্রাজকের সমতুল মিলবে, ধ্যানী বিবেকানন্দের সমতুল মিলবে, মিলবে না ঝঞ্ঝারূপী বিবেকানন্দের। স্পর্ধা ঘোষণা করে বলা চলে এ চিত্র দ্বিতীয়রহিত। ঐ বীরমূর্তি কোথায় এ দেশে? ঐ সমুন্নত উষ্ণীষ, দীপ্তায়ত নয়ন, সুদৃঢ় চিবুক, বিশাল আনন, ঐ বিস্তৃত বক্ষ—বক্ষোপরি স্থাপিত যুগল বাহু—অমের দর্প ও মহিমায় এ কি তুঙ্গ মূর্তি! ভারতে বীরের অভাব ঘটেছে ইদানীংকালে, বীরমূর্তির ততোধিক। বিবেকানন্দের একটি চিত্র শূন্যস্থানের অনেকখানি পূরণ করেছে। বিশাল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে পিষ্ট করে দুই বাহুর বেষ্টনী, মুখ ঈষৎ সাচীকৃত, পদ্ম-নয়ন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, অধরোষ্ঠ সম্বদ্ধ অথচ মেঘ-মন্দ্রিত হতে উন্মুখ—

'Sinners? It is sin to call a man so; it is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep.'

* * *

'মহা spiritual tidal wave আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

ঐ মহাক্ষত্র-বিবেকানন্দ-চিত্র যে বীর্যের প্রতীক চিত্র, তা আর না বললেও চলবে। আমাদের আলোচ্য বিবেকানন্দের তৃতীয় এবং সর্বশেষ চিত্র হ'ল ধ্যানমূর্তি।

ভারতে বুদ্ধের ধ্যানমূর্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ; এবং তার পরেই সম্ভবতঃ বিবেকানন্দের। দেবতা

শিবকে বাদ দিলে ভারতের শিল্প-চৈতন্যকে সর্বাধিক উদ্বুদ্ধ করেছে দুটি মানুষ—কৃষ্ণ ও বুদ্ধ। একটি আকর্ষণ করেছে রসচেতনার পথে, অন্যটি ধ্যানগভীরতায়। ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ঐ দুই রূপই সত্য। কদম্বতলে এবং বোধিদ্রুমতলে দুই পুরুষশেখর আমাদের আনন্দিত করে বিরাজ করছেন যুগ হতে যুগান্তরে।

ভারতীয় শিল্পদৃষ্টি যে ধ্যানদেহকে গৌতমদেহে আবিষ্কার করবে—সে কিছু আশ্চর্য নয়। ভারতে বোধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষের অভাব কোনদিন ঘটেনি, কিন্তু বুদ্ধ একজনই। অর্থাৎ বুদ্ধ আর কিছু নন, কোনো মানবীয় সত্তা নন, তিনি বোধিদেহ। বুদ্ধের বোধি ধ্যানে—সেই ধ্যান অনুধারণ করে বুদ্ধ হয়েছে। সন্দেহ হয় বুদ্ধ রক্তমাংসের কোন মানুষ কি না! পতিত মানুষের জন্য তাঁর অমেয় করুণা, মৈত্রীর বাণী-শতদল নিয়ে ভারত-পরিক্রমণ? জানি—সবই মানি। কিন্তু সে করুণা কি অপার্থিব নয়? ঐ যে মানুষটি ভারতের পথে পথে পরিভ্রমণ করছেন, তাঁর চরণ কি মৃত্তিকা স্পর্শ করেছে? বুদ্ধের যেন ধ্যানসঞ্চরণ—তাঁর যে উপদেশ, সে ঐ ধ্যানলোক থেকেই আসছে; নইলে বাস্তব সমাজবিধিকে অস্বীকার—সর্বমানুষের জন্য বাসনা-ত্যাগের পরমা নিবৃত্তির নির্দেশ?

তাই বুদ্ধ ধ্যানদেহে সর্বোত্তম।

তারপরেই বিবেকানন্দ, কেন?

অপরূপ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন তাঁর এক সমাধি দর্শন। রূপলোকের পারে অরূপলোকে যে সপ্ত ঋষি সমাধিস্থ, এক জ্যোতির্দেহ শিশু ধ্যান ভাঙিয়ে তাঁদের একজনকে মর্ত্যভূমিতে আকর্ষণ করে এনেছেন।

রামকৃষ্ণ সেই শিশু, বিবেকানন্দ সেই ঋষি।

শিশু ঋষির ধ্যান ভাঙিয়েছে,—ধ্যানোত্থিত বিবেকানন্দ কর্মী ভক্ত সংগ্রামী প্রেমী।

ঋষি আবার সমাধিতে হারিয়ে যাবেন, গিয়েছেন অচিরকালে। ঐ তাঁর সত্যরূপ: মৌনগম্ভীর পরমহংস শ্রীমৎ বিবেকানন্দ!

বুদ্ধের এবং বিবেকানন্দের ধ্যানমূর্তি পাশাপাশি রাখতে ইচ্ছা হয়। সদ্য বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধের সে কি কৃশকঠিন স্তব্ধতা—ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার বাহুল্যহীন আধার। বিবেকানন্দের বিশাল গম্ভীর মূর্তি, হিমগিরির মৌনমহিমা। এমন কেন হয়! বুদ্ধের যে নির্বাণ, দুঃখহীন সর্বশূন্যতায় নিঃশেষ বিলয়। বিবেকানন্দের নির্বিকল্প সমাধি,—চিরানন্দ অমৃত-স্বরূপে আত্মসংহরণ। প্রাপ্তির চরম লোকে হয়ত উপলব্ধির পার্থক্য নেই, কিন্তু মর্ত্যসাধনায় সাধন পথের ভিন্নতা থাকে। তপস্যার সেই বিশেষরূপই আমরা সাধকের ভাবরূপে আরোপ করি। যেমন বুদ্ধ-বিবেকানন্দের ধ্যান, তেমন চৈতন্য-রামকৃষ্ণের দিব্যোন্মাদ।

নিবাত নিষ্কম্প আত্মস্তব্ধ বিবেকানন্দ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট; তুষারশিখরের মত তাঁর উষ্ণীষ; শৃঙ্গচ্যুত স্রোতস্বিনীর মত স্কন্ধ ও বক্ষোবিলগ্ন উষ্ণীষ-প্রান্ত; বিশাল বিস্তৃত প্রান্তরতুল্য দেহাবয়ব, ঐ বিস্তারকে আকার দান করে দুই বাহুতট; বাহুপ্রান্তে শিথিল মুক্ত করতলের পদ্ম প্রসন্নতা—উপরে অন্তর্মুখী নয়নের শান্ত সংহরণ—এ মূর্তি ধ্যানী বিবেকানন্দের না ধ্যানী ভারতের? অনাগত যুগের শিল্পী—বিবেকানন্দের ধ্যানদেহের প্রত্যেকটি রেখা অনিবার্য-ভাবে একই বিন্দুতে কেমন করে মিলিত হয়েছে, সেই আশ্চর্য সামঞ্জস্যই দেখবেন না—বিবেকানন্দের ধ্যানরূপে ভারতরূপকেও আবিষ্কার করবেন তিনি।

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।' কিন্তু বিবেকানন্দের জীবনকাব্য—সে তো কোন রোমান্টিক কবির রচনা নয় যে 'অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে' থেকে কোন একস্থানে সে তার স্থান খুঁজে পাবে; ঝঞ্ঝারূপী বিবেকানন্দ ফিরে আসবেন আপন চিরনৈঃশব্দ্যের আসন'পরে। তাঁর সেই

'নিজ নিকেতনে' প্রত্যাবর্তনের ছায়া-ইতিহাস তাঁরই পত্র-মুখে শুনতে ইচ্ছা করে :

২৪শে জানুআরি, ১৮৯৫—প্রাণ ঢেলে খেটেছি।……বক্তৃতা ও অধ্যাপনাতে বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে।……একটি লেখবার খাতা আমার আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরছে। দেখছি সাত বৎসর পূর্বে লেখা রয়েছে—'এবার একটি একান্ত স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে।' কিন্তু তাহলে কি হয়, এইসব কর্মভোগ বাকি ছিল।

১লা ফেব্রুআরি, ১৮৯৫—হৃদয় শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও। ···· জীবন কিছুই নয়, মৃত্যু ভ্রম মাত্র। এই সব যাহা কিছু দেখিতেছ সে সকলের অস্তিত্ব নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, হৃদয় ভয় পাইও না, নিঃসঙ্গ হও। ভগিনি, পথ দীর্ঘ এবং সময় অল্প, আবার সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে, আমায় শীঘ্র গৃহে ফিরিতে হইবে।

*　　*　　*

নিশীথ রাত্রির স্তব্ধ আসনে নীলাকাশ! 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।' অমাব্যাপ্ত আকাশ, আকাশব্যাপ্ত তপস্যা। বিবেকানন্দ তপোমগ্ন! এই বিবেকানন্দই কি একদা বৈশাখের মেঘ হতে চেয়েছে, হয়েছে কি ঝঞ্ঝা বজ্র বিদ্যুৎ? কবি, তোমার বীণা থামাও; নন্দী, তোমার প্রহরা সরাও; ঘুমাও ঘুমাও তরু লতা পশু পাখী, অনির্বাণ সত্য শুধু জাগো! পরিনির্বাণের পূর্বে বিবেকানন্দের শেষ প্রার্থনা—"ভগবান্ সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলে মায়ামুক্ত হোক, ইহাই আমার চির প্রার্থনা।"

চাঁদ ও পৃথিবী

শ্রীরবি গুপ্ত

যাত্রী আমি, বসুন্ধরা, বাসি তোমায় ভালো—
আঁধার তব তাইতো করি আলো!
গোপন সুরে নামিয়া আসি,
ছড়াই গানের লহররাশি,
স্বর্ণ-শিখার বর্ণে মুছি তোমার ছায়া কালো।

গহন রাতে মেঘলোকের তোরণখানি খুলি'
মন্ত্রে সোনার বুলাই পরশ তুলি!
অচিন্তনের বহ্নিবুকে—
চলা মোদের যুগে যুগে,
কোন্ সে আলো মূর্তি লভে ধন্য করি ধূলি!

অচিন্তনের যাত্রা-পথে আমি তোমার সাথী
উজল করি তাইতো তোমার রাতি।
নিদ্রাহরা সঙ্গীতনে
স্নিগ্ধ কিরণ-বিচ্ছুরণে
নীরবতার গোপন-তারে স্বপ্নমালা গাঁথি।

কত কালের এই যে মোদের মিলন-অভিসার—
পার হয়ে যাই কালের পারাবার!
হে পৃথিবী, বক্ষে তব
আনি মধুর দীপ্তি নব,
লহ পাবক-লগ্নে আজি আপন অধিকার।

তোমায় ঘিরে আঁধার রাতের বাঁধন যত মিছে,
থাক না তারা থাক না পড়ে পিছে।
মুক্ত তোমার মুক্তি-পথে
আসে উদয় স্বর্ণ-রথে
কোন্ গভীরের খোলে দুয়ার ছড়ায় সুরভি যে।

বিত্ত তোমার তোমার মাঝেই, ফেরাও সেথা আঁখি
গহন-মণি আনি তোমার লাগি
অতন্দ্র এই চলার তালে
চাই যে রবি তোমার ভালে—
অকূল খেয়ায় একলা তরী—সঙ্গী যে তাই জাগি।

যাত্রী ওগো বসুন্ধরা, বাসি তোমায় ভালো—
আঁধার তব তাইতো করি আলো!
গোপন সুরে নামিয়া আসি
ছড়াই গানের লহররাশি
স্বর্ণ-শিখার বর্ণে মুছি তোমার ছায়া কালো।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীমতী উষা বসু, এম্-এ

লক্ষ্মীরূপা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পত্নী। তিনি ছিলেন সতীকুল-চূড়ামণি। প্রাচীন ইতিহাসের আবরণ উন্মোচন করলে দেখতে পাই সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, চিন্তা, প্রভৃতি মহীয়সী নারীগণ সতীত্বের দিব্য বিভায় প্রদীপ্ত হয়ে রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কেহই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। তিনি ত্যাগ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত বিকাশ—অনাবিল পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রতিমা। মনে হয় জগতের যত মধুরিমা তিল তিল করে সংগ্রহ করে বিধাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সমস্ত নারীকুলের আদর্শস্থানীয়া। তাঁর অশেষ গুণের মাধুর্যে তিনি অপরূপা। অন্যান্য পৌরাণিক নারীদের মত তাঁর চরিত্রের সম্যক্ আলোচনা হয় নাই। মুগ্ধ ভক্তগণ চিরদিনই এই মহীয়সীকে তাঁদের অন্তরের নিভৃত মন্দিরে পূজা করেছেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনের অমৃতময় আনন্দকাহিনী স্বল্পসংখ্যক লোকেই জানেন। জনসাধারণ আজও এই আনন্দ হতে বঞ্চিত।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন যেন একখানি করুণ কাব্য—একটা চাপাকান্না, একটা বুকফাটা দীর্ঘ-শ্বাস। সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন অপরূপ লাবণ্যবতী, লজ্জাবতী ও ভক্তিমতী। একদিন গঙ্গার ঘাটে শচীদেবী এই সৌন্দর্যময়ী কিশোরীকে দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি বাড়ী ফিরে গিয়ে প্রিয়তম পুত্র নিমাইয়ের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের প্রস্তাব করে পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের নিকট লোক পাঠালেন। তখন নিমাইয়ের অগাধ পাণ্ডিত্যের যশোগাথায় সমগ্র নবদ্বীপ নগরীর আকাশ বাতাস মুখরিত। নিমাইকে জামাতারূপে লাভ করার সৌভাগ্যে উৎফুল্ল সনাতন মিশ্র সানন্দে শচীদেবীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যথাসময়ে যথোচিত আড়ম্বরে নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ সুসম্পন্ন হ'ল। বিবাহের পরে বিষ্ণুপ্রিয়া বেশী দিন স্বামীকে নিজের কাছে পান নাই। যতটুকু তিনি পেয়েছিলেন ততটুকু সময়েরও অধিকাংশ ভাগ নিমাই নাম-সংকীর্তনে মাতোয়ারা থাকতেন; কখনও কখনও কীর্তন-রসে বিভোর হয়ে যেতেন। ভগবদ্‌ভক্তিতে তাঁর নয়নযুগল হতে দরদর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ত—

নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর।

কিশোরী বধূ স্বামীর এরূপ ভাব দেখে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। শচীদেবীর কাছে গিয়ে বধূ উপস্থিত হতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু ঘরের বধূ। সকলের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশিত করবার কোন অধিকার তাঁর ছিল না। তাই বিকশিত কুসুমের মত ষোড়শী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজের অন্তরের রঙীন কামনা-বাসনার স্বপ্নকে সবলে অবদমিত করে যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, জগতের ইতিহাসে তা বিরল। স্বীয় অবরুদ্ধ বেদনা সহ্য করে বিষ্ণুপ্রিয়া কত বিনিদ্র রজনী প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় চোখের জলে একাকী রাত্রি প্রভাত করেছেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব লোকশিক্ষার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি মানবের চিত্তক্ষেত্রে ভক্তিবারি সেচন করে প্রেম ও করুণার শস্য ফলিয়েছেন। তিনি সর্বত্যাগী, তিনি সন্ন্যাসী। তিনি প্রেম-করুণা-ত্যাগের মূর্ত অবতার। তাঁর ত্যাগে সেদিনের জগতের গ্লানি বিদূরিত হয়েছিল।

কিন্তু নিমাইয়ের সন্ন্যাস-ধর্ম-অবলম্বনে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে যে নিদারুণ আঘাত লেগেছিল—সেই বেদনার ছবি প্রকাশিত করা কঠিন। ভাবী অশুভের ছায়া তাঁরা দু'জনেই যেন চারিদিকে দেখতে পেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পাগলিনীর ন্যায় সিক্ত বস্ত্রে বাড়ী ফিরে শচীদেবীর কাছে গিয়ে অধীর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। শচীদেবী সস্নেহে বধূকে কাছে আকর্ষণ করে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন—আমি চারদিকেই আজ অমঙ্গল দেখতে পাচ্ছি। মায়ের অনুরোধে নিমাই কয়েক দিন মাত্র সংসারে বাস করেছিলেন। এই কয়েকটি দিনের মধুর স্মৃতি অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনা-কাতর অন্তরের এক অমূল্য সম্পদ। সংসার পরিত্যাগ করবার পূর্বরাত্রে নিমাই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করলেন: বিষ্ণুপ্রিয়া মালা ও চন্দন দিয়ে প্রিয়তমকে সজ্জিত করলেন; নিমাইও বিষ্ণুপ্রিয়াকে অপরূপভাবে সাজালেন। এইভাবে গভীর সুখে রাত্রির মধ্যভাগ অতিবাহিত হ'ল। স্বামি-সুখ-গরবিনী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর কোলে মাথা রেখে গভীর ঘুমে নিমজ্জিতা,·· সেই গভীর নিশীথে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে ধীরে ধীরে বহির্গত হলেন আপন অভীষ্ট-সাধনার পথে। খোলা দ্বারপথে বাতাস যেন আকুল আর্তনাদ করে উঠল। বৃক্ষ-পত্রের মর্মরধ্বনি যেন করুণসুরে শোক প্রকাশ করে কেঁদে উঠল। কলস্বনা গঙ্গার স্রোত যেন থেমে গেল। ত্রিযামা-সুন্দরীর নক্ষত্রের কণ্ঠহার যেন অকস্মাৎ খসে পড়ল। বিষ্ণুপ্রিয়া চমকে জেগে উঠলেন। দেখতে পেলেন—উন্মুক্ত দ্বার ও শূন্য পালঙ্ক! বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। আলুলায়িতকুন্তলা শ্রীমতী কাঁদতে কাঁদতে শচীদেবীর দ্বারের কাছে এসে বসে পড়লেন। শোকাকুলা মাতা প্রদীপ জ্বেলে বধূর সঙ্গে পথে বাহির হয়ে "নিমাই! নিমাই!" বলে কাঁদতে লাগলেন। সমস্ত নদীয়া নগরী যেন বিষাদের সমুদ্রে পরিণত হ'ল। বিষ্ণুপ্রিয়া পার্থিব বিলাসিতা সমস্তই পরিত্যাগ করলেন—

"যে দিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া,
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥"

কিন্তু প্রিয়বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়ার আকুলভাবে ক্রন্দন করবার অবকাশ কোথায়? পুত্রবিরহে কাতরা শচীদেবী বধূর কান্নায় অধিক শোকে অভিভূতা হবেন—এই ভয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া আপন দুঃখের দুর্বার বেগ সবলে অন্তরে চেপে শচীদেবীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেই স্তব্ধ পাষাণ-প্রতিমার ভাবলেশহীন মুখ দর্শন করলে পাষাণও গলে যায়।

নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলেন। ভক্তগণ এই নবীন সন্ন্যাসীর প্রেমে মুগ্ধ। ভক্তগণের সকাতর অনুরোধে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন যাবার পথে সকলকে দর্শন দিতে শান্তিপুর এলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রশ্ন করলেন—"প্রভু! সকলেই আসতে পারবেন তো?"

শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর দিলেন—"যিনি আসতে চান তাঁকেই আনবে। আমি সকলের নিকটই আনন্দের সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করবো।" অকস্মাৎ বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মনে উদয় হ'ল। কিছুক্ষণ তিনি কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি বললেন—"যে আসতে চায় তাকেই আনবেন, কেবল একজন ছাড়া।" সজলনয়নে নিত্যানন্দ এই বার্তা নবদ্বীপে প্রচার করে দিলেন—"মহাপ্রভু সকলকে যেতে বলেছেন—কেবল একজন ছাড়া।" এই নিষ্ঠুর আদেশ শুনে সমস্ত নবদ্বীপ-বাসী নির্বাক্ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন-বার্তা সমস্ত নগরে প্রচারিত হ'ল। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হ'ল আনন্দের সুর। পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। নবদ্বীপের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দর্শন-মানসে শান্তিপুরে

যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁদের প্রাণের নিমাই ফিরে এসেছেন। শচীদেবীও তাঁর প্রিয়তম পুত্রের জন্য আনন্দ-ব্যাকুল অন্তরে ধাবিত হলেন। শুধু একটি নারী—অবগুণ্ঠনবতী তরুণী বধূ অশ্রুসজল নয়নে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর যাওয়ার কিংবা দর্শনের অধিকার নেই, কারণ নিমাই সন্ন্যাসী। শাস্ত্রানুসারে তাঁর বিষ্ণুপ্রিয়াকে দর্শন করা নিষিদ্ধ। বেদনাহতা নারী সেদিন চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে। যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন স্বামীর পাদুকা পূজা করে তাঁর ধ্যানে মগ্ন থেকে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন। এই মহীয়সী নারীর জীবনের ইতিকথা বড়ই করুণ, বড়ই মধুর!

শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের একদিক

অধ্যাপক শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ

শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী আমাদের হতাশ প্রাণে আশা আনে এবং অবিশ্বাসীর অন্তরেও সঞ্চারিত করে গভীর বিশ্বাস। আবার তা ভক্তি ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের সুপ্ত বহ্নিকে উদ্দীপিত করে, অনেককেই সাধকের আকাঙ্ক্ষিত জগতে যাবার প্রেরণা দেয়। যাঁরা সাধনপথে প্রথম পদক্ষেপ করেছেন, কিংবা যাঁরা সেই পথে কিছুদূর এগিয়ে গেছেন তাঁদের শুভ-যাত্রা-পথের সুপেয় প্রাণবারি হয়ে উঠেছে এই ভাষারূপে প্রবাহিত ভাব-মন্দাকিনী। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের আধ্যাত্মিক মূল্য স্বতই নির্ধারিত। তাঁর উপদেশের পারমার্থিক মূল্য আপনা-আপনিই ব্যাখ্যাত হয়েছে, নানা সহজবোধ্য গল্প ও উদাহরণের সাহায্যে। যেখানে কোন গল্প-উপমা নেই, সেখানেও তাঁর উপদেশ কোন টীকাকারের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর না করে সাধারণ-বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের অন্তরে উপলব্ধির গভীর স্তরে পৌঁছে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে শ্রীভগবানের যুগোচিত বাণীপ্রচারের এইটিই হচ্ছে বিশিষ্ট ধারা। তাই যুক্তি তর্ক ও উদাহরণের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের তত্ত্বমূল্যনির্ধারণের কোন অবকাশ বা প্রয়োজন দেখতে পাই না। তবে তাঁর উপদেশাবলীর একটি দিক সচরাচর আমাদের সচেতন লক্ষ্যের বাইরে থেকে যায়। সে বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ আছে বলে মনে হয়।

কাব্য-সাহিত্য পড়তে ও আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় অনেক শক্তিশালী কবি তাঁর রচনার ভাষাসম্পদকে কাব্যের মূল প্রয়োজন সিদ্ধ করেও অন্য কাজে লাগাতে পেরেছেন। শ্রেষ্ঠ কবির রচনা প্রবাদবাক্যরূপে বা অন্য আকারে কাব্যের বাইরেও মানুষের ব্যবহারে এসেছে। কবি কালিদাসের 'ন যযৌ ন তস্থৌ,' ভারতচন্দ্রের 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন,' মধুসূদনের 'একে একে নিবিছে দেউটি' প্রভৃতি অসংখ্য উদাহরণ এই কথাই প্রমাণ করে যে রচয়িতার প্রতিভা তাঁর রচনাকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ও প্রয়োজনে মানুষের ব্যবহারে এনে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলী পাঠ করলে অনেক সময়ই উক্ত বিষয়টি আমাদের মনে পড়ে যায়। আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতবাণী ভক্ত ও সাধকের পরম পাথেয় হয়েছে; আবার এই মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেও তা অনেক উল্লেখযোগ্য গৌণকার্য সফল করেছে তাও আমরা পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে পারি। ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগবৈরাগ্যের আদর্শকে উজ্জ্বলতম বর্ণে ফুটিয়ে তুললেও সংসারী ভক্তেরা তাঁর কাছে পেয়েছে পরম প্রশ্রয় ও আশ্বাস। কিন্তু চিত্তাকর্ষক বিষয় হচ্ছে এই যে তাঁর উপদেশ সংসারীকে শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতির পথেই সাহায্য করে না; তাঁর উপদেশের কথাগুলি থেকে সংসারে বেঁচে থাকার মত মানসিক বলও সংসারীরা পেয়ে থাকে। তাঁর উপদেশের বহু স্থল আছে যেখানে তাঁর প্রধান

উদ্দেশ্য মানুষকে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করা, কিন্তু তার মধ্যে এমন অর্থও প্রকাশ পায় যা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে মানুষ একজন শ্রেষ্ঠ সংসারীরূপে সমাজে বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারে। কবিদের রচনায় আনুষঙ্গিক অর্থের মতো ঠাকুরের উপদেশের এইপ্রকার অর্থগুলিও যে নগণ্য নয় তা বিশেষ বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যায়। এগুলির দ্বারা মানুষ জীবনযুদ্ধে পায় উৎসাহ, বৈষয়িক উন্নতিতে পায় প্রেরণা এবং হতাশা ও হীনম্মন্যতা থেকে পেয়ে থাকে চিরস্থায়ী মুক্তি। তাঁর এই প্রকার অসংখ্য অমূল্য উপদেশের কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করলে বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে।

তিনি বলেছেন—'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়। * * * যারা হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্যগীত করতে পারবে না, তাদের কোনকালে হবে না। ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি? * * *" দেখতে পাচ্ছি এই উপদেশের তাৎপর্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাত হচ্ছে তাঁরই নিজের কথায়। লজ্জা-সঙ্কোচাদি সাধনপথের কত বড় বিঘ্ন তাই তাঁর মুখ্য বক্তব্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লজ্জা-ঘৃণা-ভয় আমাদের সাংসারিক উন্নতির পথেও যে বিঘ্নস্বরূপ হয়, গৌণ হ'লেও সেই অর্থ এখানে উল্লেখযোগ্যভাবে ফুটে উঠেছে। বিত্তাদি-লাভ বা জাগতিক উন্নতিলাভ করতে ইচ্ছুক মানুষ কত সময়েই মনের লজ্জা-ঘৃণা-ভয়ের জন্য অভীষ্ট বস্তুকে আয়ত্তাধীন করতে পারছে না—এ উদাহরণ অহরহই আমাদের নজরে পড়ছে। সে-ক্ষেত্রে ধর্মোপদেশের জন্য উচ্চারিত বাণী—'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়' লৌকিক জীবনেও মানুষকে শিক্ষা দিয়ে জনকল্যাণ সাধন করে থাকে।

আবার কখনও তিনি বলেছেন—"বিষয়ী লোকদের রোক্ নাই। হোলো হোলো, না হোলো না হোলো। জলের দরকার হয়েছে কূপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুলো, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে! আর এক জায়গায় খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল, কেবল বালি বেরোয়; সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে, সেখানেই খুড়বে, তবে তো জল পাবে। * * * * * যা মিথ্যে বলে জেনেছ, রোক্ করে তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ কর। যখন আমার ভারী ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ বল্লে স্বর্ণপটপটি খেতে হবে; কিন্তু জল খেতে পাবে না; বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে করলে জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাকবো! আমি রোক্ কল্লাম, আর জল খাবো না।" —ধর্মকথা শুনে এবং সৎপথে চলার নির্দেশ পেয়েও বিষয়ী ব্যক্তিরা ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় অভাব সংকল্পের দৃঢ়তার। শ্রীরামকৃষ্ণ গল্প বলে এবং নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে ভক্তকে উপদেশ দিয়েছেন সেই রোক্ বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে। কিন্তু এই সমস্যা তো কেবল অমৃতপথের পথিকদের নয়। সংসারে থেকে ভগবানকে আশ্রয় করার জন্য যে অবিচল নিষ্ঠা প্রয়োজন, যে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যই তার উপযোগিতা স্বীকার করতে হয়! জাতি, সমাজ ও দেশকে উন্নত করার ইচ্ছা থাকলেও অব্যবস্থিতচিত্ততা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার অভাব আমাদের সফলকাম হতে দিচ্ছে না—এর পরিচয় কি আমরা অনেক সময়েই দেখতে পাই না? যা যা মন্দ, অশুভ ও জীবনপথের কণ্টকস্বরূপ তাকে দলিত . মথিত করার দৃঢ়সংকল্প করতে কি আমরা কুণ্ঠিত হই না? শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের অভিব্যঞ্জনা এদিক দিয়ে আমাদের প্রভূত সাহায্য করে।

"কেউ কেউ মনে করে আমার বুঝি জ্ঞানভক্তি হবে না, আমি বুঝি বদ্ধজীব। গুরুর কৃপা হলে কিছুই ভয় নাই।" এই উপদেশ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাগলের পালে প্রতিপালিত ব্যাঘ্র-শাবকের গল্প বলেছেন। কি ভাবে একটি বাঘ এসে সেই

ঘাস-খেকো বাঘকে রক্তের স্বাদ, তথা ব্যাঘ্রস্বরূপ বুঝিয়েছিল—এ গল্প ভক্তদের কাছে খুবই পরিচিত। গল্প বলার পর তিনি আবার বলেছেন—"তাই গুরুর কৃপা হলে আর ভয় নাই। তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।" এই স্বরূপবোধ বা আত্মোপলব্ধি শুধু ঈশ্বরস্বরূপ-উপলব্ধি নয়; এই উপদেশে পরমেশ্বর-নির্মিত আমাদের দেহ ও জীবন কত কর্মক্ষম তা উপলব্ধি করবার প্রেরণা আমরা পেয়ে থাকি। মানুষ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে আস্থাশীল নয় বলেই জীবনযুদ্ধে তাকে পশ্চাৎপদ হতে হয়। সদ্‌গুরু বা আদর্শ শিক্ষক আমাদিগকে সেই বিশ্বজয়ী ক্ষমতায় বিশ্বাসী করে তোলেন। এই বিশ্বাস অর্থসম্পদ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে আমাদের ধারণাতীত সাফল্য এনে দেয়। স্বামীজী পরবর্তীকালে বলেছেন যে, আমাদের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বকে বিকশিত করে দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা। তিনি বলেছেন, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসই হচ্ছে নাস্তিকতা। "বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—আপনার উপর বিশ্বাস—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।"

সাধনরাজ্যে ক্রমোন্নতিতে ভক্তদের প্রেরণা দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কাঠুরের গল্প বলেছেন। জনৈক ব্রহ্মচারীর উপদেশে কাঠুরে এগিয়ে গিয়েছিল বলে ক্রমে ক্রমে মূল্যবান বস্তুর সন্ধান পেয়েছিল। নিষ্ঠাসহকারে এগিয়ে গেলে ভক্ত পরমবস্তু লাভ করেন—এই হচ্ছে এই উপদেশের প্রধান তাৎপর্য। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে সংসারী ব্যক্তিও লাভবান্ হয়। মানুষের অফুরন্ত কর্মশক্তির ছেদ টানতে নেই। এই কর্মময় জীবনে কর্মের সফলতার সীমা পরিসীমা নেই। তাই 'এগিয়ে পড়ো'—এই উপদেশ আশা ও উৎসাহের প্রেরণায় সকলকেই উজ্জীবিত করে দেয়।

ঈশ্বরভক্ত সংসারীকে সংসারের নিবদ্ধ পরিবেশে থাকতে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সব উপদেশ দিয়েছেন, সেগুলি বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়। যথা—পাঁকাল মাছের মত থাকা, নিজেকে বড়লোকের বাড়ীর দাসীর মত মনে করা, ইত্যাদি। পথের অন্তরায়সমূহ দূর করার জন্যই এই সুচিন্তিত উপদেশগুলি দেওয়া হয়েছে। এগুলি বর্তমান ক্ষেত্রে আলোচ্য উপদেশগুলির মতো দুইপ্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য কথিত হয়নি। কিংবা বলা চলে যে, এই উপদেশগুলিতে একাধারে দুই প্রকার অর্থগৌরব পাওয়া যায় না।

নিম্নলিখিত বহুবিখ্যাত উপদেশগুলিতে আলোচ্য দুই প্রকার গুণ বর্তমান:

"ডুব দাও। ডুব না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না, জলের উপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।"

"যত মত, তত পথ।"

"যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি।"

"শ, ষ, স।"

উদাহরণের শেষ হবে না। তাঁর এই ধরণের বহুমূল্য বাণী সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে নিজ জীবনে রূপ দিয়েছেন। তাই ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর জনমানসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের গুরুত্ব যে নিজস্ব মহিমায় উজ্জ্বল—তা আমরা ভাল-ভাবে বুঝতে পেরেছি। শত শতাব্দী ঈশ্বরোপাসনায় অভ্যস্ত ভারতবাসী জড়বিজ্ঞানচর্চা ও বৈষয়িক উন্নতিতে পিছিয়ে পড়েছিল। তাই স্বামীজী অধর্ম ও নাস্তিক্যের সাময়িক গ্লানি দূর করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে কার্যে পরিণত করেছেন, আবার এদেশের মানুষের বৈষয়িক দৈন্যকে দূর করার জন্য উৎসাহের সিংহনাদ তুলেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী তাঁর মূল প্রেরণা জুগিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের এই দুই যুগ প্রয়োজনই ছিল। তাঁর বহু উপদেশও তাই দুইপ্রকার অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ। সেই কারণে তাঁর ভাবগম্ভীর বাণী ঈশ্বরভক্তকে যেমন পথ দেখায়—সৎপথাশ্রয়ী সংসারী ব্যক্তিকেও তেমনি জীবনযুদ্ধে জয়ী করে তোলে।

বিশেষ্য ও বিশেষণ

শ্রীদ্বারকানাথ জ্যোতির্ভূষণ

বিশেষ্য, তোমারে আমি খুঁজি কতবার,
নির্ণয় করিতে শক্তি হ'ল না আমার ;
বাল্যে বিদ্যালয়ে গিয়া
ব্যাকরণ হাতে নিয়া
পড়েছি বুঝেছি কত শিক্ষকের কাছে,
বস্তু, ব্যক্তি, জাতি, গুণ, দ্রব্য যাহা আছে ;
সেইগুলি 'নাম' তব,
এবে দেখি ভুল সব,
বিশেষণে বিশেষ্য যে বুঝেছি তখন,
কি আশ্চর্য ভ্রান্ত শিক্ষা পেয়েছি এমন !

নয়ন মেলিয়া যাহা দেখিবারে পাই,
সকলি তো বিশেষণ, বিশেষ্য যে নাই ;
সবাই কহিছে এসে,
বিশেষ্য নাহিক দেশে,
চন্দ্র-সূর্য নদ-নদী গ্রহ-তারাগণ—
এক মহা বিশেষ্যের নানা বিশেষণ !
নয়ন যাহার আছে,
দেখিতে সে পাইয়াছে ;
এক আদি অদ্বিতীয় বিশেষ্য-সাগরে
অগণন বিশেষণ সদা খেলা করে।

ঘুমন্ত তারকারাজি জীয়ন্ত জোছনা—
মধুর চাঁদিমা-নিশি নীলিম-বসনা,
ললিত লতিকা দল,
কুসুমের পরিমল,
শীতল সমীর চারু, বালার্ক-কিরণ ;
গভীর সাগর আর জীবের জীবন,
শ্যামল পাদপ-দল,
কাদম্বিনী সচঞ্চল,
সব সেই বিশেষ্যের বহু বিশেষণ—
গুণের বাচক তাঁর নিখিল ভুবন।

করিয়াছি আবিষ্কার বিশেষ্য তোমারে,
বিশেষণ-পরিপূর্ণ রাজ্যের মাঝারে
তোমার সত্তার মাঝে,
ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া আছে,
একাকী পুরুষ তুমি, একাই বিশেষ্য—
এ জগতে তুমি দেব, জীবের নমস্য।
প্রকৃতি আনন্দ ভরে
তব গুণ গান করে,
হে বিশেষ্য ! বিশেষণ সকলি তোমার !
তাই তব পদে করি কোটি নমস্কার।

দুই আমি

শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

এক 'আমি,' নিশিদিন মত্ত এক পুতুল খেলায়,
আর 'আমি,' একা একা কেঁদে মরে মর্মের গভীরে।
এক 'আমি,' তাকে ঘিরে রূপরস প্রপঞ্চমায়ায়,
আর 'আমি,' নিশিদিন আমার সত্তারে খুঁজে ফিরে।
এক 'আমি,' কী বিস্ময় ! সে আমার অন্তকে চেনে না,
আর 'আমি,' মনে ভাবে কবে হবে ওর সাথে চেনা।

শ্রদ্ধার শক্তি

(একটি পুরানো গল্প অবলম্বনে)

স্বামী জীবানন্দ

সম্ভ্রান্ত ধনীর গৃহে এক মহাপুরুষ এসেছেন। লোকে লোকারণ্য। দলে দলে সকলে সাধুদর্শন করে ধন্য হচ্ছেন।

'কিন্তু এ কী! কেবল ধনীরাই কি এই মহাপুরুষের কৃপা লাভ করবেন? যারা গরীব তাদের ভাগ্যে কি দর্শনও নেই?' দরিদ্র পরান চাষীর মনে উঠল এই কথা।

দূরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে পরান জনস্রোতের দিকে এক দৃষ্টে, আর ভাবে: 'কত রয়েছে আমারই মত গরীব চাষী, তাঁতি, চামার, মুচী, দিনমজুর। সর্বহারা রিক্তের দল না পায় পেট পুরে দুবেলা দুমুঠো খেতে, না পায় পরনের কাপড়। কিন্তু তা না হয় হল, সাধুদর্শনে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য থাকবে কেন? সুন্দর বসনভূষণে সুসজ্জিত সম্ভ্রান্ত লোকদের কি এখানেও একচেটে ব্যাপার!'

দূরে পরানের ভাঙা কুটীর। গ্রীষ্মের রৌদ্র আর বর্ষার জল রোধ করবার ক্ষমতাও হারিয়েছে এ কুটীর। উপরি উপরি দুতিন বছর অজন্মা, ক্ষেতে খড় হয়নি, তাই ঘরও ছাইতে পারেনি।

কিন্তু গরীব হলে কি হয়! শিক্ষা-দীক্ষা না থাকলে কী হয়। পরানের ভক্তিবিশ্বাস ছিল খুব। প্রাণে তীব্র অভিলাষ হল—সাধুদর্শন করবেই। তার ফলে দারিদ্র্য ঘুচে যাবে, অভাব-অনটনের অবসান হবে।

দৃঢ় সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করবার জন্যে সুযোগ খুঁজতে থাকে শুভ মুহূর্তের।

বহুদিন পর সুবৃষ্টি হয়েছে। বোধহয় মহাপুরুষের আগমনের সুফল। সকলের দৃঢ় বিশ্বাস তাই। মরুভূমির মত শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল মাটি সূর্যের খরতাপে। ধরণী সুশীতল হয়েছে দেবতার অকৃপণ বর্ষণে। লোকের প্রাণে আর আনন্দ ধরে না, বিশেষ করে চাষীদের। এবার চাষ করলে ধান হবে প্রচুর। শস্যপূর্ণা হবে বসুন্ধরা।

পরানের প্রাণও আনন্দে ভরপুর। সে কাঁধে লাঙল, মাথায় বোঝা নিয়ে আর হাতে বলদ দুটির দড়ি ধরে ক্ষেতের দিকে চলেছে আপন মনে গাইতে গাইতে—

"মনরে কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত' সোনা।"

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল: তার বহুআকাঙ্ক্ষিত সন্ন্যাসী তারই ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছেন; তবে তো ভগবান্ তার কথা শুনেছেন।

আহা কি সৌম্যদর্শন! অপরূপ রূপ—নয়ন জুড়িয়ে যায়।

বলদ দুটির দড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, 'তোরা ঘাস খা, আমি আসছি।' পরান ছুটে গিয়ে করজোড়ে প্রণাম করে সাধুর সামনে দাঁড়াল, যেন কিসের প্রতীক্ষায়। সাধুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তার উপর। পরানের বহুদিনের সাধ সাধুসঙ্গ করবার, আজ সেই সাধ পূরণের সুযোগ এসেছে—এ সুযোগ যাতে বিফলে না যায়, এই ভয়ে মাথার বোঝা আর কাঁধের লাঙল নামাবারও তার অবসর হল না। আবেগ ভরে বলল,—'প্রভু, আমাকে কিছু উপদেশ দিন, যাতে আমার সব দুঃখ ঘুচে যায়।'

পরানের সর্বাঙ্গে ব্যাকুলতার তরঙ্গ খেলে চলেছে। সাধু দেখলেন, ব্যাকুলতা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে তাঁর সামনে উপস্থিত। তিনি কত লোকের সংস্পর্শে এসেছেন এমনটিতো দেখেন নি; বললেন,

'তুমি উপদেশ নেবে, উপদেশ কি তুমি পালন করতে পারবে? কত কাজের মানুষ তুমি; সারাদিন চাসের কাজ, নয় ঘরের কাজে ব্যস্ত থাক। এই বৃষ্টি হয়েছে, এখন কাজ আরও বেড়েছে, সময়মত আবাদ না করলে যে ফসল হবে না।'

পরান বলল,—'প্রভু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ঠিক ঠিক আপনার উপদেশ পালন করব, একটুও ত্রুটি হবে না। আমি অশিক্ষিত, দরিদ্র চাষার ঘরে আমার জন্ম, ছোটবেলায় লেখাপড়া শেখার ইচ্ছা ছিল খুব, কিন্তু সুযোগ হয়নি। অল্প বয়সে বাপ মা মারা গেলেন—সারা সংসারের ভার পড়ল আমারই ওপর। তবু রামায়ণগান কীর্তন-ভজন কোথাও হচ্ছে শুনলে ছুটে যাই, যদি কিছু মনের খোরাক পাই, যদি মনের ময়লা কাটে। শুনে শুনে কত গান আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, আপন মনে নির্জনে বসে সেই সব গান গাই অবসর সময়, আর কাজের সময়েও গানের সাথে সাথে কাজ করে চলি। মূর্খ আমি, আপনার কঠিন উপদেশ ধারণা করবার যোগ্যতা আমার নেই, যাঁরা জ্ঞানী গুণী তাঁদের সে শক্তি আছে; তাই আমার উপযোগী করে এমন একটি সহজ উপদেশ দিন যার মর্ম বুঝতে কোন কষ্ট না হয়। প্রাণও যদি যায় তবু আপনার উপদেশ পালন করব।' পরানের মুখ থেকে ঐকান্তিকতার সঙ্গে কথাগুলো বেরিয়ে এল। সন্ন্যাসী মুগ্ধ হলেন, বুঝলেন—জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলেই এমন ব্যাকুলতা, এমন সরলতা, চরিত্রের এমন দৃঢ়তা সম্ভব হয়েছে।

সত্যই আজ পরানের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ সমুপস্থিত। কখন যে কার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে কে জানে? দুর্লভ মহাপুরুষের সংশ্রয়! দুর্লভতর তাঁর কৃপা!

ক্ষণকাল নীরব থাকার পর সাধু প্রসন্ন গম্ভীর মুখে বললেন, 'মনের কথা শুনো না।' পরান গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে নিল। সাধু চলে গেলেন তাঁর তীর্থযাত্রার পথে।

'মনের কথা শুনো না' আকাশে বাতাসে এই কটি কথা অনুরণিত, পত্রের মর্মর-শব্দের মধ্যে যেন এই বাণীই প্রতিধ্বনিত। যে দিকে কান যায় এই একই ধ্বনি। কর্ণকুহরে যে শব্দ প্রবেশ করে তাই শ্রীগুরুর বাণী। ধন্য পরান, সার্থক তার জীবন!

পরানের মন বলল, 'এখনতো তোর সাধুসঙ্গের বাসনা পূর্ণ হয়েছে, এইবার কাঁধের লাঙ্গল নামা, মাথার বোঝা মাটিতে রাখ—আর কতক্ষণ এভাবে থাকবি?' পরান উত্তর দেয়,—'ওরে মন, তোর কথা আর শুনবো না, এযে আমার গুরুর আদেশ। গুরুর কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তাঁর উপদেশ কখনও লঙ্ঘন করব না।' মন যুক্তি দেখায়—'কাজ না করলে খাবি কি? ছেলেমেয়ে মানুষ করবি কি করে? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে? জমিতে চাষ দিতে হবে, বীজধান ফেলতে হবে। ঐ দূরে বলদ জোড়া চরছে, ধরে নিয়ে এসে চাষে লেগে যা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে। সব লোক কাজ করে চলেছে, দেখতে পাচ্ছিস্ নে।'

পরান বলে, 'তোর কথা আর শুনছি না, এই পঞ্চাশ বছর ধরে তোর কথামত চলে আসছি—কিন্তু কী লাভ হয়েছে আমার? যে দুঃখ সেই দুঃখই তো রয়েছে, বরঞ্চ আগের চেয়ে বেড়েছে। তুই যখন যা বলেছিস্ তাই করেছি, কখনও তো অবহেলা করিনি। তোর কথা শুনে আমার কিছুই উপকার হয়নি। এখন থেকে আর তোর মতে চলব না।'

তামাক খাওয়া পরানের খুব প্রিয়। যখনই পরিশ্রান্ত বোধ করে তখনই তামাক খায়। অনেকক্ষণ তামাক খায় নি, খুব ইচ্ছা হল তামাক খেতে। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেতেই মিলিয়ে যায়, এমনি তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

বহুক্ষণ একভাবে মাথায় বোঝা, কাঁধে লাঙল নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তার পা অবশ হয়ে আসে; বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু গুরুবাক্যে অটল পরান স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে—যেন সুমেরুর মতো অচল। দ্বিপ্রহর অতীত হতে চলেছে, আহারের সময় হল। ক্ষুধা-তৃষ্ণাও পেয়েছে, ভ্রূক্ষেপ নেই। বাড়ি যাবার উদ্যোগ করে না। মন বলে, 'বাড়ি চল্।' মনের সঙ্কল্প মনেই লীন হয়ে যায়, যেখানে উৎপত্তি সেখানেই লয়!

এতো দেরি হচ্ছে কেন? অন্যদিন তো এমন হয় না,—স্ত্রী চিন্তিত হয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছে। ছেলে এসে কত ডাকাডাকি করে। পরান কিন্তু এক পাও নড়ে না। একভাবে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অগত্যা ছেলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দেয়। বাড়ির লোকেরা ও পাড়াপড়শীরা—ব্যাপার কি—দেখতে ছুটে আসে। পরানকে নিয়ে যাবার জন্যে কত সাধ্য সাধনা করে, সবই বিফলে যায়। সংসারের মায়া যেন তাকে আর বাঁধতে পারে না। এইরূপে একভাবে তিন দিন তিন রাত্রি কাটল। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, প্রাণসংশয় হবে নাকি? তবু সে বিচলিত হয় না। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন! শরীরতো যাবেই, দুদিন আগে আর দুদিন পরে;—তবে গুরুর আদেশ-পালনে যাওয়াই ভাল।

ভক্তের দৃঢ়তায় আর গুরুবাক্যে নিষ্ঠায় ভগবানের আসন টলল। ভক্তেরই যে ভগবান্! ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান লক্ষ্মীদেবীকে খাদ্যপানীয় নিয়ে গিয়ে পরানকে দিতে বললেন।

বৈকুণ্ঠ থেকে স্বয়ং লক্ষ্মী আহার্য নিয়ে সামনে উপস্থিত। অহো ভাগ্যম্! মা লক্ষ্মী বললেন, 'বাবা, তুমি তৃষ্ণায় কাতর, তোমার জন্য সুশীতল পানীয় এনেছি—এই নাও, আর এই খাবার খাও। তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণা সব চলে যাবে, মনে শান্তি পাবে।'

দিব্যাভরণভূষিতা দেবীর হাতে অপূর্ব খাদ্যপানীয় দেখে ক্ষুধার্ত পরানের মন খাদ্যগ্রহণে অভিলাষী হল। কিন্তু সে যে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করবে না, তাই লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধও রক্ষা করতে পারল না।

লক্ষ্মীদেবী তাকে আবার বললেন 'আমার কথা শুনলে তোমার ভাল হবে বাবা, সামনের মঙ্গলকে ছেড়ে কেন অনিশ্চিতের আশায় আছ?'

পরান কাতরস্বরে বলে, 'মা, তোমার কথা শোনবার জন্যে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল, কিন্তু কি করব উপায় যে নেই।'

মা লক্ষ্মী অবাক্ হয়ে বলেন, 'উপায় নেই, সে কি কথা!'

পরান আবেগভরে বলে যায়, "মা, গুরু আমায় বলেছেন, 'মনের কথা শুনো না' আমি কেমন করে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করি। প্রাণ যায় তাও স্বীকার, আমি গুরুর আদেশ অমান্য করব না। তুমি অসন্তুষ্ট হয়ো না মা, আমি নিরুপায়।"

লক্ষ্মীদেবী এই অদ্ভুত ভক্তের অভূতপূর্ব গুরু-ভক্তির কথা ভগবানের কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন। ভগবান বিষ্ণু তখনই চতুর্ভুজ মূর্তিতে আহার্যহস্তে উপস্থিত হলেন। পরান শ্রীভগবানের অপরূপ রূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কে আপনি, কেন এখানে এসেছেন?' ভগবান্ উত্তর দেন, 'দেখছ না, আমি স্বয়ং বিষ্ণু। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তোমার গুরুভক্তিতে আমি মুগ্ধ, তোমার শ্রদ্ধায় আমার চিত্ত পুলকিত। আমি তোমাকে বর দিতে এসেছি। তোমার মন যা চায়, তাই প্রার্থনা কর। অতুল ঐশ্বর্য, অমিত বিক্রম, পুত্র পরিজন যা তোমার ইচ্ছা চাও, কোন প্রার্থনাই তোমার অপূর্ণ রাখব না। আর এই অমৃততুল্য আহার্য গ্রহণ কর।'

শ্রীভগবানের দিব্য মূর্তি তাঁর অমৃতনিস্যন্দিনী বাণী ও সুগন্ধি খাদ্য পরানের মন হরণ করল। আজ তিন দিন সে উপবাসী, পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, পানীয়-গ্রহণের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হল। মন বলে, 'পরান, অমৃত গ্রহণ করে জীবন ধন্য কর'।

শ্রীগুরুর উপদেশ স্মরণ হতেই মনে মনে বলে, 'না কিছুতেই কথা শুনছি না, যা হয় হোক্।' পরান ভগবানকে মিনতি করে জানায়, 'ঠাকুর আপনার আহার্য পানীয় বর কিছুই আমি চাই না। আমার মন এগুলি চায়, কিন্তু গুরুর আদেশ—'মনের কথা শুনো না'। আপনি আমাব উপর রুষ্ট হবেন না, আমি কিরূপে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করি?'

ভগবান্ দেখলেন, গুরুগতপ্রাণ ভক্ত গুরুবাক্যে হিমাদ্রির মতো অচল অটল। কিন্তু এভাবে বেশীক্ষণ থাকলে প্রাণ তো থাকবে না। তাই প্রসন্ন হাস্যে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে তার বহু প্রশংসা করে বললেন, 'গুরু যা বলেন তা তো শুনবে? তাতে তো কোন বাধা নেই।'

পরান সানন্দে বলে ওঠে, 'নিশ্চয়ই, তিনি যে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়, তাঁর কথা শুনব না তো কার কথা শুনব।'

এইবার ভগবান স্বয়ং তার গুরুকে নিয়ে এলেন। সাধু পরানকে প্রাণভরে আলিঙ্গন করলেন। গুরু-শিষ্য উভয়েরই দরদর ধারায় প্রেমাশ্রু নির্গত হচ্ছে। সম্মুখে শ্রীভগবান্ স্বয়ং। কী সুন্দর চিত্তবিমোহনকারী দৃশ্য!

গুরু শিষ্যকে সম্বোধন করে বলেন, 'পরান, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার সাধনা, আজ তোমারই পুণ্যফলে আমিও ভগবানের দর্শন পেলাম। এখন যাও, স্নান করে এস।'

গুরুভক্ত বীর গুরুর আদেশ পেয়ে তৎক্ষণাৎ স্নান করে এল। তখন গুরু শিষ্যের সঙ্গে ভগবানের পূজা করে প্রণাম করলেন—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

শিষ্য গুরুর আদেশে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করল। ভগবান গুরুশিষ্যকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলেন। গুরুশিষ্য উভয়েরই জীবন সার্থক হল।

অশিক্ষিত কৃষকের প্রাণে গুরুর বাক্যে অচলা শ্রদ্ধা ছিল বলেই তার পক্ষে ভগবান বিষ্ণু-প্রদত্ত বর এবং লক্ষ্মীদেবীব আহার্যও প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়েছিল, তথাপি তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি ভক্তকে প্রত্যাখ্যান করা। গুরুবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাসই শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধাই সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার শক্তি দেয়। পরান মনের বশ্যতা অস্বীকার করে যে মুহূর্তে বাসনাশূন্য হল, অমনি তার নির্মল অন্তঃকরণে ভগবানের আবির্ভাব হল।

বাসনাই তো সংসার; বাসনার নাশেই সংসারের নাশ। বাসনার নাশ হলেই ভগবদ্দর্শন হয়। গুরুনির্দিষ্ট পথে শ্রদ্ধা নিয়ে সাধনা করলে শিক্ষা-দীক্ষায় বঞ্চিত অতি সাধারণ মানুষও ভগবৎকৃপা-লাভে ধন্য হয়।

ঈশ্বরকে পেতে হলে খুব উদার সরল হতে হবে। বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না। সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না।

সরল হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। সরল হলে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়। পাটকরা জমি—কাঁকর কিছু নাই; বীজ পড়লেই গাছ হয় আর শীঘ্র ফল হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

অবতার

৺যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্‌-এ, রায় বাহাদুর

(পূর্বানুবৃত্তি)

[বিগত পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির প্রারম্ভে সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য। উঃ সঃ]

ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম—যিনি দিক্‌কালের অতীত, সুতরাং সর্বতোভাবে অচিন্তনীয় (কারণ মানবের চিন্তাশক্তি দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ) —তিনি পরিমিত মানবদেহে রোগ শোক জরা বার্ধক্যাদি ভোগের জন্য কেন আবদ্ধ হইবেন? সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য?

সাধুও ঈশ্বরের সৃষ্ট, অসাধুও ঈশ্বরের সৃষ্ট। যাহার উচ্চ প্রবৃত্তিগুলির এখনও বিকাশ হয় নাই সেই ত অসাধু; যখন বিকাশ হইবে, তখনই সে সাধু হইবে। সেই হতভাগাদের বিনাশের জন্য স্বয়ং পরমেশ্বরের দেহধারণ করিবার কি প্রয়োজন? আর যদি মনুষ্যরূপই ধারণ করিলেন, তবে দুষ্কৃতকারীদিগকে সাধু করিয়া তাহাদের উদ্ধারসাধন করিলেই তো হইত, বিনাশে কি বেশী বাহাদুরি? অসাধুর সংখ্যা তো বেশী। সকলের বিনাশ করিতে হইলে তো ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড় হইবে। পক্ষান্তরে, সাধুদিগের উদ্ধার করা—তেলা মাথায় তেল দেওয়া, সেজন্য ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কি প্রয়োজন?

ভগবান যদি বহু শতাব্দী পরে পরেই অবতীর্ণ হন, তবে মধ্যবর্তীকালের যত সাধু ও অসাধু লোক তাহাদের উদ্ধারের ও বিনাশের জন্য কি ব্যবস্থা হয়? তাহাদের জন্য যে ব্যবস্থা, অবতারকালের সাধু ও অসাধুদের জন্য সেই ব্যবস্থা হইলেই বা ক্ষতি কি?

কেবল মানুষের জন্যই ভগবানের এত কষ্ট স্বীকার কেন? কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী আদি কত অনন্ত কোটী প্রাণী রহিয়াছে। পৃথিবীর মত কত অনন্ত কোটী গ্রহ রহিয়াছে। পরমেশ্বরের কাছে সকলই সমান। মনুষ্য-অবতার স্বীকার করিলে ভগবানকে পশু পক্ষী কীট সরীসৃপ ইত্যাদি সর্ববিধ অবতারই স্বীকার করিতে হয়। পৌরাণিক মৎস্য-কূর্মাদি অবতারও মনুষ্যের উপকারার্থে হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ, তাহাতে মৎস্য-কূর্মাদি প্রাণীর কোন উপকার হয় নাই। পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহে এবং সর্ববিধ প্রাণীর মধ্যে যদি তাঁহাকে জন্ম স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বরকে কেবল অবতাররূপেই ঘুরিতে হয়। সৃষ্টির অন্য সমস্ত অংশ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর কেবল মনুষ্যের প্রতিই ভগবানের পক্ষপাতিত্ব কেন?

আর তাঁহার অখণ্ডনীয় অপরিবর্তনীয় নিয়মেই তো ধর্ম সংস্থাপিত রহিয়াছে। এই অখণ্ডনীয় নিয়মেই তাঁহার লীলা চলিতেছে। যেমন যন্ত্র দ্বারা কোন স্থানের বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া লইলে চতুর্দিক হইতে নৈসর্গিক নিয়মের বলে আপনিই সেই স্থানে বায়ু প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে,—যেমন দুইটি তরল পদার্থ এক আধারে রাখিলে লঘুটি প্রথমতঃ নীচে থাকিলেও উপরে উঠিতে চেষ্টা করে,—সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টির ক্রমশঃ বিকাশের যে বিধান রহিয়াছে, কোনও কারণে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, (ভগবদ্গীতার কথায়—কোনও কারণে ধর্মের গ্লানি হইলে), প্রাকৃতিক নিয়মের বলেই যেখানে যেটির থাকা উচিত, সেটি সেইখানে আসিবে, এই নিয়মেই সমস্ত সৃষ্টি বিধৃত আছে, আর এই নিয়ম বা বিধানের নামই ধর্ম।

এই ধর্ম সনাতন—অর্থাৎ সৃষ্টির আরম্ভ হইতে প্রলয় পর্যন্ত একই ভাবে থাকিবে। জগতের প্রতি পরমাণু এই বিধানে বা ধর্মে চালিত: যেমন অগ্নির

ধর্ম দাহ করা, জলের ধর্ম সিক্ত করা, মেঘের ধর্ম বর্ষণ করা, আলোকের ধর্ম প্রকাশ করা, সেইরূপ জীবের ধর্ম বিকাশের বা উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া। এই বিকাশোন্মুখী প্রবৃত্তির স্ফুরণেই ক্রমে কীটাণু হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং কালে মনুষ্য হইতেও মহত্তর জীবের সৃষ্টি হইবে। যে কার্য এই বিকাশ বা অভিব্যক্তির মুখ্য-ভাবে বা গৌণভাবে অনুকূল, তাহাই পুণ্য কার্য; আর যাহা মুখ্যভাবে প্রতিকূল তাহাই পাপ। ধর্মাধর্ম প্রভৃতি কথাগুলি সংকীর্ণভাবে সচরাচর মনুষ্যের কার্যকলাপের প্রতি প্রযুক্ত হয়, কিন্তু জড় জগৎ এবং ইতর প্রাণিগণও যে, ধর্ম দ্বারা চালিত সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। জড় জগতের জড় ধর্মগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। চেতন জগতের ধর্মগুলি মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। জড় জগৎ যেমন অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন, চেতন জগৎ বা অন্তর্জগৎও সেইরূপ অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন। কি জড় জগৎ, কি চেতন জগৎ, কোথাও ধর্ম অসংস্থাপিত হইতে পারে না। এক মুহূর্ত অসংস্থাপিত হইলে তখনই সমস্ত সৃষ্টি বিনষ্ট হইবে। যতদিন সৃষ্টি আছে—(সৃষ্টির আরম্ভ বা বিনাশ মনুষ্যের চিন্তা-শক্তির অতীত)—ততদিন ধর্ম অসংস্থাপিত হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। সুতরাং তাহা পুনঃ-সংস্থাপন করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানের মানবদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবার আবশ্যকতা কি?

একটি লোককে আজন্ম কোন গৃহমধ্যে এমন ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে যে, সে জীবন-ধারণোপযোগী যাবতীয় কার্যই করিতে পারে, কিন্তু আকাশ দেখিতে পায় না; সে হয়তো মনে করিবে যে আকাশে সূর্য নামক কোন পদার্থ নাই। যদিও লোকের মুখে শুনিয়া অথবা নিজের অনুমান দ্বারা সে স্থির করে যে সূর্য আছে, এবং তাহারই আলোকে সে গৃহমধ্যস্থ সকল পদার্থ দেখিতে পাইতেছে—তখনও হয়তো সে মনে করিবে যে, সূর্যটা মাঝে মাঝে নিভিয়া যায়, আবার জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু সূর্য নিভেও না, জ্বলেও না। অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীনে সূর্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে। আজন্ম গৃহবদ্ধ ব্যক্তি তাহা প্রত্যক্ষ করে নাই, অথবা অনুমান দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই বলিয়াই সূর্যালোকের আবির্ভাবের ও তিরোভাবের ব্যাপার লইয়া গোলযোগে পড়িয়াছে। সেইরূপ পরিমিতবুদ্ধি মানুষ আমরা সংসারের দুঃখকষ্ট, জ্বালাযন্ত্রণা, রোগশোক, জরামরণাদি দেখিয়া মনে করি—বুঝিবা ধর্ম এ জগতে নাই, বুঝিবা ভগবান অবতীর্ণ হইয়া আবার ধর্মকে কিছুদিনের জন্য জগতে স্থাপিত করিয়া দিয়া যাইবেন—ধর্মের কল কিছুদিন চলিবে, যখন দম ফুরাইবে, তখন ভগবান আসিয়া আবার দম দিয়া যাইবেন। ভগবানের কলের শক্তি যে অফুরন্ত, এ কল যে চিরকালই চলিতেছে এবং চিরকালই চলিবে, এ কল যে থামিতে পারে না, তাহা আমাদের মনে হয় না। ভগবানের কল যদি থামিলই তবে তাঁহার ঈশ্বরত্ব কোথায় রহিল? বিশ্বকর্মার কলে খুঁত নাই, মেরামতের দরকার হয় না। কলের এমনই গুণ, যে ভগ্ন স্থান আপনিই জোড়া লাগে। যখন যেটির দরকার তাহা আপনিই হয়। জন্মিবার পূর্বেই মাতৃস্তনে খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই কি পশুপক্ষী, কি মানুষ সকল প্রসূতির বুকেই সন্তান-স্নেহের আবির্ভাব হয়। কেবল তাহাই নহে, মানুষের অব্যক্ত শক্তিগুলি ক্রমশই ব্যক্ত হইতে চেষ্টা করে। মাধ্যাকর্ষণ যেমন নৈসর্গিক নিয়ম, এগুলিও তেমনই নৈসর্গিক নিয়ম। সৃষ্টি-রক্ষার জন্য—সৃষ্টিবিকাশের জন্য অনন্ত কৌশল।

এই যে সৃষ্টির বিকাশোন্মুখিতা, ইহা কোথায় গিয়া পরিণত হইবে, মানুষ তাহা বলিতে পারে না, ভাবিতেও পারে না। যেমন পদ্মকোরক হইতে পদ্মের বিকাশ, যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের বিকাশ,

সেইরূপ সৃষ্টি ক্রমেই ব্যক্ত হইতে ব্যক্ততর হইতেছে। পূর্ণ অভিব্যক্তি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, যাঁহার এই লীলা তিনিই তাহা জানেন।

এ জগতে কিছুই স্থির নহে। সকলই গতিশীল। সায়ংকালের দীপশিখা, নিশীথসময়ের দীপশিখা এবং প্রভাতের দীপশিখা একটি বস্তু নয়। প্রতি নিমিষে দীপশিখার পরিবর্তন হইতেছে; কিন্তু লোকে দেখে যে ঠিক একটি দীপই সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্যন্ত অপরিবর্তিত-ভাবে জ্বলিতেছে। নদীর স্রোতে প্রতি মুহূর্তে নূতন জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু তুমি আমি দেখি যে, দশ বৎসর পূর্বেও যে গঙ্গা ছিল, আজও সেই গঙ্গা। মানব-শরীরের পুরাতন পরমাণুগুলি প্রতি সেকেণ্ডে অন্তর্হিত হইতেছে, আবার খাদ্যাদির সাহায্যে নূতন পরমাণু তাহার স্থান অধিকার করিতেছে; অথচ আমার মনে হইতেছে যে, আমার শরীরটা কালও যাহা ছিল, আজও তাহাই রহিয়াছে। বনের পুরাতন বৃক্ষগুলির স্থানে নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, অথচ দর্শক মনে করিতেছে যে, বনটা বিশ বৎসর পূর্বেও যাহা ছিল, আজও তাহাই রহিয়াছে। জগতে সকলই গতিশীল সকলই পরিবর্তনশীল; ভাঙ্গিয়া গড়িয়া পুরাতন সর্বদাই নূতন হইতেছে। যাহা কিছু অচল হইল, তাহারই তখন বিনাশ আরম্ভ হইল। স্রষ্টা যে উদ্দেশ্যে তাহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টি-প্রবাহ প্রবাহিত রাখিবার জন্য, সৃষ্টির বিকাশের জন্য আরও নূতন কিছু চাই। যাহা চাই তাহারই আবার সৃষ্টি হইতেছে। সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক বিষয় কি জড় কি চেতন, সকলই মহাবেগে বিকাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, দাঁড়াইবার উপায় নাই। যে দাঁড়াইল, সেই পড়িল; যে পড়িল সেই মরিল। হয় চলিতে হইবে, নয় মরিতে হইবে। যে মরিল—তাহার স্থানে তাহারই উপাদানে আবার নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইবে।

অপরিবর্তনীয় সৎপদার্থ কেবল একটি। অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায়, মনুষ্য তাহা কেবল অসম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে। তাহার স্বরূপ ধারণা করিতে মনুষ্যবুদ্ধি অক্ষম। সৃষ্ট পদার্থ সকলই অসৎ, অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল—মরণশীল। এই সৃষ্টিই ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতার দিকে যাইতেছে। জগতের অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও যে কথা, মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধেও সেই কথা। মনুষ্যের একটা অপরিবর্তনীয় আদর্শ থাকিলে, সেইখানে পঁহুছিয়া মনুষ্যসমাজ স্থিতিশীল হইত। কারণ সম্মুখে আর নূতন আদর্শ নাই। কিন্তু সৃষ্টির নিয়ম সেরূপ নহে। সৃষ্টির অন্যান্য অঙ্গের মত, মনুষ্য-সমাজও ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যখনই এই বিকাশের বাধা হয়, যখনই সমাজের প্রাচীন—সুতরাং বর্তমান অবস্থার অনুপযোগী রীতিনীতিগুলি অপরিবর্তিত এবং অপরিমার্জিত থাকিয়া বিষাক্ত রক্তের ন্যায় সমাজশরীরের ধ্বংস সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই স্বাভাবিক নিয়মের বলে সেই সমাজে এমন কোন মহাপুরুষের উৎপত্তি হয়, যিনি স্বীয় জীবনের কার্য দ্বারা এবং উপদেশ দ্বারা চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান-পূর্বক তাঁহার সমসাময়িক লোকদিগকে উন্নতির পথ, বিকাশের পথ দেখাইয়া দেন।

হিমালয়ে এবং বল্মীকে যে পার্থক্য, দিবাকর এবং খদ্যোতে যে পার্থক্য, অশ্বত্থবৃক্ষ এবং দুর্বাঘাসে যে পার্থক্য, চক্ষুষ্মান্ ও জন্মান্ধে যে পার্থক্য, সেইসব মহাপুরুষ এবং সমসাময়িক অপরাপর মানুষের মধ্যে সেই পার্থক্য। মহাপুরুষের মহাশক্তি দেখিয়া লোক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পদানুসরণ করে। কখনও কখনও তাঁহার জ্ঞানের জ্যোতি এত প্রখর থাকে যে, লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়, লোকে তাঁহার দিকে চাহিয়া সব অন্ধকার দেখে। সে মহাসূর্যের দিকে অনেকের চাহিতেই সাহস হয় না। তখন লোকে তাঁহাকে বোঝেও না, চিনেও না;

তাঁহাকে আগুনে পোড়ায়, ক্রুশে বিদ্ধ করে, কারাগারে বদ্ধ করে, দেশছাড়া করে। তারপর যখন সে মহাপুরুষ পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন লোকে তাঁহার উপদেশ এবং কার্য একটু একটু বুঝিতে আরম্ভ করে। তখন পৃথিবীর যত সম্রাট, যত সিজার, যত বাদশাহ তাঁহার একগাছি চুলের উপর, একখানা অস্থির উপর বা একটি দন্তের উপর পিরামিড বা মন্দির নির্মাণ করিতে বসেন। তিনি যে নদীতে স্নান করিতেন, তাহার এক ফোঁটা জল মস্তকে দিয়া মানুষ মনে করে যে, তাহার অন্তঃশুদ্ধি বহিঃশুদ্ধি, সব হইল। তিনি যে স্থানে বসিতেন, তাহার ধূলি অঙ্গে মাখিয়া আমরা পবিত্র হই; তাঁহার উপদেশ বা জীবনচরিত যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, সেই গ্রন্থের পূজা আরম্ভ করি। এই সব মহাপুরুষ তখন স্বয়ং পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচারিত হন। ইঁহারা ইঁহাদের সমসাময়িক মানুষের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর, অনেক বিকাশ-প্রাপ্ত। ইঁহাদের আবির্ভাবও প্রাকৃতিক অন্যান্য ব্যাপারের মত অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন। যে নিয়মে গ্রীষ্মের পর বর্ষা, নির্বাতের পর তুমুল ঝড়, রাত্রির পর দিবস, সেই নিয়মেই ইহাদের আবির্ভাব। যখন তাঁহাদিগের অত্যন্ত আবশ্যকতা যখন তাঁহারা না আসিলে সমাজ যায় যায়, তখনই তাঁহারা আসেন। আর যদি আবশ্যক সময়েও না আসেন, তবে সে সমাজ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। সে সমাজের যখন আর বিকাশ হইল না, তখন তাহার বিনাশ নিশ্চিত। এ সংসারে অপ্রয়োজনীয় পদার্থের স্থান নাই।

চিকিৎসক বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্য-শরীরের এমনই গঠন যে, যাহা কিছু শরীরের পক্ষে অপকারী, তাহা বিদূরিত করিবার চেষ্টা সৃষ্টির নিয়মানুসারে স্বতই হইয়া থাকে। সমাজশরীরে এই চেষ্টার বহির্বিকাশ—মহাপুরুষের আবির্ভাব। শরীরের বিষনিষ্কাশিকা শক্তি বিষের শক্তি অপেক্ষা দুর্বল হইলে যেমন শরীরের বিনাশ নিশ্চিত, সেইরূপ আবশ্যক সময়ে মহাপুরুষের আবির্ভাব না হইলেও সমাজের বিনাশ নিশ্চিত। সে বিনষ্ট সমাজের স্থান শূন্য থাকিবে না। বিকাশের উপযোগী অন্য নীরোগ নূতন সমাজ তাহার স্থান অধিকার করিবে। সৃষ্টির এই যে অখণ্ডনীয় নিয়ম, এই নব নব বিকাশ,—ইহাই ধর্ম। এই বিকাশশীলতা-রূপ ধর্মের যখনই কোন প্রতিবন্ধক হয়—অর্থাৎ যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়—তখনই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। যিনি স্রষ্টা—তিনি কিরূপে স্বয়ং সৃষ্ট হইবেন, তাহা বুঝা যায় না। জগদীশ্বর সকলই পারেন, কেবল একটা জিনিস পারেন না,—তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য লোপ করিতে পারেন না। ঐশ্বর্যহীন জগদীশ্বর, বৃক্ষত্বহীন বৃক্ষ, ঘটত্বহীন ঘট, ত্রিভুজত্বহীন ত্রিভুজ ইত্যাদির সত্তাই অসম্ভব; অন্ততঃ মনুষ্য-বুদ্ধিতে ইহাদের অস্তিত্বের ধারণা হয় না। ঈশ্বর যদি সৃষ্ট হইলেন, তবে তাঁহার ঐশ্বর্য লোপ হইল; তিনি দেশকালে আবদ্ধ হইলেন; তিনি ত্রিগুণের বিষয়ীভূত হইলেন।

জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে প্রতিদেশেই সময় সময় মহাপুরুষগণের আবির্ভাব দেখা যায়। তাঁহাদের উৎপত্তির আবশ্যকতা না থাকিলে তাঁহাদের আবির্ভাব হইত না। বৈদিক কর্মকাণ্ড-মূলক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে যখন দেশ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রায় তিরোহিত, তৎস্থলে আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞাদির স্থূল অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যজ্ঞস্থলে লক্ষ লক্ষ পশু হত হইতেছে, পশুরক্তে বসুন্ধরা কর্দমাক্ত, তখনই করুণাঘন বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইল; বিশ্বজনীন মৈত্রী বিঘোষিত হইয়া পৃথিবীময় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আবার বীরাচারী তান্ত্রিকদের পাশব আচারে যখন দেশে মদ্য-মাংসাদির স্রোত বহিতেছে, প্রেম ও ভক্তি তিরোহিত, তখনই প্রেমঘনমূর্তি শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইল। প্রেম ও ভক্তির

স্রোতে নাস্তিকতা, পশুত্ব সব ভাসিয়া গেল। ইহুদী পুরোহিতদিগের বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানে, জগজ্জয়ী রোমকদিগের দাম্ভিকতা, অত্যাচার এবং বিলাসিতায়, ষ্টোইক্ এবং ইপিকিউরিয়ান-দিগের শুষ্ক দার্শনিক মতে যখন পাশ্চাত্ত্য জগৎ শুষ্ক সাংসারিকতার এবং ভক্তিবিশ্বাস-হীনতার চরম সীমায় আসিয়া পহুঁছিয়াছিল, তখনই যীশুখ্রীষ্ট আবির্ভূত হইলেন। আবার খ্রীষ্ট ধর্ম যখন বাহ্যক্রিয়াকাণ্ডে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, আরবীয়দিগের পৌত্তলিকতা অতি কদর্য আকার ধারণ করিল, তখনই হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাব। ধর্মজগতে ইয়োরোপ-খণ্ডে—এইরূপে উইক্লিফ্, ইগ্নেশিয়াস, ফ্রান্সিস্, লুথার, ওয়েসলি, এবং ভারতে শঙ্করাচার্য, নানক, কবীর, রামমোহন রায়, কেশব-চন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ—যখন যাঁহার আবশ্যক হইয়াছে, তাঁহারই আবির্ভাব হইয়াছে। চিন্তা-জগতেও সক্রেটিস, গ্যালিলিও, কাণ্ট; রাজনীতি-ক্ষেত্রে ক্রমওয়েল, ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন, ম্যাটসিনি, গারিবলডি, উইলবারফোর্স, হাওয়ার্ড — যখন যাঁহার আবশ্যক হইয়াছে তাঁহারই আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই নৈসর্গিক নিয়মের ফলভূত মনুষ্য; সমাজের উন্নতির জন্য, বিকাশের জন্য মনুষ্য-সমাজ হইতেই উদ্ভূত।

মহাপুরুষদের যখন আবশ্যক হয় তখনই তাঁহারা আবির্ভূত হন—এ কথার অর্থ এই নয় যে, যদি যজ্ঞভূমিতে অসংখ্য পশুহত্যা না হইত, তবে শাক্যসিংহ জন্মিতেন না; যদি ফরাসী দেশে বহু শতাব্দী যাবৎ রাজা রাজকর্মচারী এবং অভিজাত-গণের অত্যাচার চরম সীমায় না পহুঁছিত—যদি ফরাসী বিপ্লব না হইত, তবে নেপোলিয়ন নামক কোন ব্যক্তিরই জন্ম হইত না। যে কারণে শাক্যসিংহের বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির আবশ্যক হইয়াছিল অথবা নেপোলিযনের নররক্তপাত করা আবশ্যক হইয়াছিল, সেই সব কারণ না থাকিলে, তাঁহাদের জীবনচরিত হয়তো তাঁহাদের সমসাময়িক অপর দশ জনের ন্যায় হইত। তাঁহাদের যে শক্তির বিকাশে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল সেই শক্তি তাঁহাদের মধ্যে অবিকশিত অবস্থায়ই থাকিত। সমাজের যে রোগের চিকিৎসা তাঁহাদিগকে করিতে হইয়াছিল, সমাজ রুগ্ণ না হইলে—তাহাতে গ্লানি না হইলে—তাঁহাদের সে প্রতিবিধানশক্তির কথা জনসমাজে চিরকাল অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত।

এই সব সাধারণ লোকশিক্ষক অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর আর এক শ্রেণীর লোকগুরু পৃথিবীতে আসেন—যাঁহারা ঈশ্বরের অবতার! তাঁহারা স্পর্শমাত্র ইচ্ছামাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। অতি নীচ জঘন্য প্রকৃতির মানুষও তাঁহাদের আদেশে নিমেষে মহাসাধুতে পরিণত হয়। তাঁহারা আচার্যদের আচার্য, মানুষের মধ্য দিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তাঁহাদের ভিতর দিয়া ছাড়া আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পারি না। তাঁহাদের উপাসনা না করিয়া আমরা পারি না, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই উপাসনার একমাত্র পাত্র—তাঁহাদের উপাসনা করিতে আমরা বাধ্য। ······যতক্ষণ আমাদের মনুষ্যদেহ ততক্ষণ মানুষের ভিতর দিয়াই মানুষের ভাবেই আমাদের ঈশ্বরকে পূজা করিতে হইবে। যতই আমরা কথা বলি না কেন, যতই চেষ্টা করি না কেন ঈশ্বরকে মনুষ্যমূর্তি ছাড়া অন্যভাবে আমরা চিন্তা করিতে পারি না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

নবধা ভক্তি

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য শ্রীভগবানকে লাভ করা—একথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বার বার বলিয়াছেন। ভগবান লাভ হইলেই চিত্তের প্রসন্নতা আনন্দ বা শান্তি লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে সূত মুনিগণকে এই কথাই বলিতেছেন :

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

(১।২।৬-সূতঃ)

"মহাভাগ মুনিগণ! ভগবান নারায়ণে যে অহৈতুকী ঐকান্তিকী ভক্তি, যাহার দ্বারা আত্মা বিশেষরূপে প্রসন্নতা লাভ করেন, তাহাই পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।"

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে "অহৈতুকী" ও "অপ্রতিহত" এই দুইটি বিশেষণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ঐকান্তিকী ভক্তি ভগবানের প্রতি ভালবাসা আনয়ন করে, ভালবাসা হইতে আকর্ষণ; ভগবানে আকর্ষণ মনকে সংসার হইতে সরাইয়া লইয়া যায়। এই আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইলে সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়—অর্থাৎ মনুষ্য সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। স্বার্থ বিজড়িত নহে বলিয়া অহৈতুকী ভক্তি ভগবানের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করে। ঐ প্রীতি হওয়ায় ভক্ত ভগবানকে স্বস্বরূপে দর্শন করে; এবং ভগবদ্দর্শনের ফলে যে জ্ঞান হয়, তাহা লাভ করিয়া ভক্ত ধন্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে :—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

(১।২।৭-সূতঃ)

"শ্রীভগবান বাসুদেবে ঐকান্তিকী ভক্তি হইতে শীঘ্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং অহৈতুকী ভক্তি হইলে অচিরেই জ্ঞানের উদয় হয়।"

ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করার উপায় ও ক্রম প্রহ্লাদবাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে, যথা :—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।

(৭।৫।২৩-প্রহ্লাদঃ)

"শ্রীবিষ্ণুর বিষয় শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ, তাঁহার চরণসেবা অর্চনা বন্দনা, তাঁহাতে দাস্য ও সখ্যভাব এবং তাঁহাকে আত্মনিবেদন এই কয়টি উপায়ে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হয়।"

এই বিষয়ে আরও বলা হইয়াছে যথা :—

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

(৭।৫।২৪-প্রহ্লাদঃ)

"এই নয় প্রকার ভক্তি যদি সাধক বিশ্বস্ত হৃদয়ে শ্রীভগবান বিষ্ণুর প্রতি অর্পণ করে, তাহা হইলে তাহাকেই (ভক্তিবিষয়ক) উত্তম শিক্ষা বলিয়া মনে করি।"

সাধারণ দৃষ্টিতে কথাগুলির এই অর্থ হয় : কর্ণ দ্বারা জাগতিক অন্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া শ্রীভগবান অচ্যুতের ও ভক্তগণের কথা শ্রবণ. বাক্য দ্বারা বৈষয়িক কোন কথা না বলিয়া নারায়ণের গুণকীর্তন, মন দ্বারা সাংসারিক চিন্তা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ও লীলা স্মরণ, হস্ত দ্বারা জাগতিক কর্ম না করিয়া শ্রীভগবানের মন্দিরাদি মার্জনা করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও তাঁহার বিগ্রহের সাজ-সজ্জা সাধন এবং তাঁহার ভক্তের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান দ্বারা তাঁহার সেবা, উপচারাদি দিয়া তাঁহার বিগ্রহের এবং আসনাচ্ছাদনাদিদানে তাঁহার ভক্তের পূজা, সংগীত স্তব স্তুতি সাহায্যে তাঁহার বন্দনা, তাঁহাকেই সর্ব-কর্মের প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিয়া সর্বক্ষণ তাঁহার

অন্য দাসভাবে অবস্থান, জীবনে মরণে অন্তরে বাহিরে তিনিই একান্ত আপনার এই চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রতি সখ্যভাব অবলম্বন; তাঁহা হইতেই জন্ম হইয়াছে, তিনি জীবন পরিচালিত করিতেছেন, শেষে তিনিই টানিয়া লইবেন, এই চিন্তা করিয়া তাঁহার কাছেই আত্মসমর্পণ। ইহাই নবধা ভক্তি, বা ঐকান্তিকী ভক্তি লাভের নয়টি উপায়।

অথবা সাধক মনে করিতে পারেন,—শ্রীভগবান ভিন্ন আর কেহই সংসারে নাই, সংসারে যাহা কিছু শোনা যায় সব তাঁহারই বাণী, যাহা কিছু বলা যায় সব তাঁরই কীর্তন, যাহা কিছু চিন্তা করা যায় সব তাঁহারই বিষয়, অতএব নিত্য তাঁহারই স্মরণ হইতেছে; হস্ত দ্বারা যাহা কিছু করা যায় সব তাঁহারই সেবা, বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁহারই বিভিন্ন মূর্তি অতএব যাহাকে যাহা দেওয়া হয় সব তাঁহাকেই নিবেদন, সব তাঁরই পূজা। এই ভাবেও ভক্ত সাধনা করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই নবধা ভক্তির প্রত্যেকটির কথা বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে। যথা শ্রবণ-বিষয়ে :—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্ ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥
(১০।৩১।৯-গোপ্যঃ)

"হে নাথ! তোমার কথা অমৃতস্বরূপ, সংসার তাপে তপ্ত ব্যক্তির জীবনস্বরূপ, জ্ঞানীরাও ইহার গুণ গান করিয়া থাকেন, ইহা হৃদয়ের কালিমা নাশ করে। শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয়, শান্ত হৃদয় ভক্তগণ চারিদিকে ইহার প্রচার করেন, এই প্রচারই শ্রেষ্ঠ দান স্বরূপ এবং তাঁহারাই অন্নপ্রদানকারী যাঁহারা ভগবৎকথা প্রচার করেন।"

গৃহেষ্বাবিশতাং চাপি পুংসাং কুশলকর্মণাম্।
মদ্বার্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥
(৪।৩০।১৯-শ্রীভগবান্)

"গৃহে থাকিয়াও যাহারা অনিন্দিত কর্ম ভিন্ন অন্য কর্ম করে না, এবং আমারই কথা কীর্তন করিয়া কালযাপন করে, গৃহ তাহাদের বন্ধনের কারণ হয় না বলিয়া আমি মনে করি।"

স্মরণ-বিষয়ে গোপীগণের প্রতি উদ্ধবের বাক্য স্মরণীয়।

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ॥
(১০।৪৭।২৩-উদ্ধবঃ)

"অহো সাধ্বীগণ! শ্রীভগবান বাসুদেবে আপনাদের মন সমর্পিত হইয়াছে, আপনাদেরই মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে; আপনারাই সকলের পূজনীয়া।"

পাদসেবন-বিষয়ে ভগবান কপিল দেবহূতিকে বলিয়াছেন।

"জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ।
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্॥
(৩।২৫।৪২-কপিলঃ)

"মা! জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া নিজ কল্যাণার্থ যোগিগণ আমার ভয়শূন্য চরণযুগল আশ্রয় করিয়া থাকেন।"

অর্চনা বিষয়ে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিতেছেন :

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চন্ উভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্॥
(১১।২৭।৪৯-শ্রীভগবান্)

"কর্মযোগ, বৈদিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি যে কোন পথ অবলম্বন করিয়া মনুষ্য যদি আমার অর্চনা করে, তাহা হইলে আমার কৃপায় উভয় লোকে (ইহলোক ও পরলোকে) সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।"

ভগবানের শ্রীচরণবন্দনা-বিষয়ে অক্রুরের নিম্নোক্ত কথাও অতি সুন্দর :

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্॥
(১০।৩৮।৬-অক্রুরঃ)

"যোগীদের ধ্যানগম্য শ্রীভগবানের চরণকমলে

আমি আজ প্রণাম করিব, ইহাতে আমার যাবতীয় অমঙ্গল নষ্ট হইবে এবং মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে।"

উদ্ধব দাস্য ও সখ্য ভাবের কথা এইভাবে বলিয়াছেন :

"কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠ॥"

(১১।২৯।৪-উদ্ধবঃ)

"হে অচ্যুত! তোমার মিত্রতার শেষ নাই, এই জন্য তোমার যাহারা দাস তাহারা আর কাহাকেও আশ্রয় করে না, আপনাতেই তন্ময় হইয়া থাকে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। রাজা দিগেরও কিরীট আপনার আসনে লুণ্ঠিত হয়। এইরূপ নিখিলজনপূজ্য হইয়াও আপনি শ্রীরামচন্দ্র অবতারে সামান্য বানরের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে আপনি সখ্যভাবের জন্য কত ব্যগ্র।"

সখ্যভাবের কথা আরও সুন্দর ভাবে ব্রহ্মা বলিতেছেন :

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্॥

(১০।১৪।৩২-ব্রহ্মা)

"নন্দগোপ এবং অপর ব্রজবাসীদিগের আহা কি সৌভাগ্য! আহা কতই না ভাগ্য! স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, নিরতিশয় সুখস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সখা।"

আত্মনিবেদন-বিষয়ে শ্রীভগবান বলিতেছেন :

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপাদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

(১১।২৯।৩৪-শ্রীভগবান্)

"মনুষ্য যখন সমস্ত কর্মের কর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া আমাতে আত্মনিবেদন করে এবং মৎকর্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমারই কর্ম করিবার ইচ্ছা করে, তখনই সে অমৃতত্ব লাভ করে এবং আমার আত্মস্বরূপ হইবার যোগ্য হয়।"

এই ভাবে নবধা ভক্তি সহায়ে শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হইলে সংসারের প্রতি মনুষ্যের অতি স্বাভাবিক ভাবে বৈরাগ্য হয়, এবং সে বৈরাগ্য অতি শীঘ্রই হয়। তখন বিষয়ের কথা শুনিতে, বৈষয়িক কথা বলিতে, বিষয় চিন্তা করিতে, বিষয়ীর পূজা বন্দনা দাসত্ব তাহার সহিত মিত্রতা ও তাহার হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিতে একেবারেই ইচ্ছা হয় না। সে সকল কথা চিন্তা করিতেও তাহার ভাল লাগে না। উহাদের প্রতি ঘোরতর বিতৃষ্ণার উদয় হয়। এইরূপে স্বার্থবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে চলিয়া গেলে তখন অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া সূত বলিয়াছেন।

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্॥

(১।২।২২-সূতঃ)।

"এই সকল কারণবশতই পণ্ডিতেরা সানন্দে শ্রীভগবান বাসুদেবকে সেই প্রকার ভক্তি করিয়া মনের নির্মলতা সাধন করেন।" কোন হেতু নাই, স্বার্থবুদ্ধিরূপ মলিনতার লেশমাত্র নাই মনের এইরূপ ভক্তির ভাব, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে।

এই প্রকার ভক্তি হইলে সাধক অনুভব করে—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥

(১।২।২৮-সূতঃ)

"বেদসমূহ শ্রীভগবানের ভাবই প্রকাশ করিতেছে, যজ্ঞ ও যোগ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আর ক্রিয়াকর্মেরও লক্ষ্য তিনি, সব তাঁহাকে ঘিরিয়া।"

বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥

(১।২।২৯-সূতঃ)

"জ্ঞানবিষয়ক যাবতীয় ভাবসকলের মধ্যে ভগবানেরই প্রকাশ, লোকে সেই প্রকাশ উপলব্ধি করিবার জন্যই তপস্যা করিয়া থাকে, ধর্ম ভগবানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাবতীয় সাধনার গতি একমাত্র সেই ভগবান।"

অতএব যিনি যে ভাবে পারেন সেই ভগবানের আরাধনা করুন,—এই কথা শ্রীশুকদেব বলিতেছেন :

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকামঃ উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

(২।৩।১০-শুকঃ)

"কাম্যবস্তু লাভের ইচ্ছায় অথবা কোনও প্রকার বাসনার বশবর্তী না হইয়া, অথবা উদারচিত্তে মোক্ষ মাত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায়, তীব্র (নিরন্তর প্রবাহশীল) ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া সেই পরম পুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার পরম লাভই হইবে।"

তখন শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হয় ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সৌভাগ্য হয়, এ কথা কপিল তাঁহার মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন :

পশ্যন্তি মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি।"

(৩।২৫।৩৫-কপিলঃ)

"হে মাতঃ! এই সকল সাধকগণ, রক্তিমবর্ণ-নয়ন-শোভিত সহাস্যবদন সমন্বিত আমার মনোজ্ঞ দিব্য ও বরদান-মূর্তি দর্শন করিয়া থাকেন। শুধু দর্শন করেন তাহা নয়, মনের সাধে আমার সঙ্গে কথাও বলেন।"

এমন পরম কারুণিক শ্রীভগবানের গুণেরও সীমা নাই, মহিমারও অন্ত নাই। তাই সেই পরম প্রেমিক পরম দয়ালকে মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধুরাও ভক্তি করিয়া থাকেন। সূত বলিতেছেন,

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

(১।৭।১০-সূতঃ)

"যে সকল মুনিরা নির্বিকল্প সমাধিযোগে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সর্ববন্ধন ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাদের আর সাধনার কোন প্রয়োজন নাই—তাঁহারাও পরম প্রেমিক বলিয়া যাঁহার কীর্তি বিশ্ববিশ্রুত—সেই ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি অবলম্বন করিয়া কালাতি-পাত করেন। শ্রীহরির এমনই মহিমা।"

এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোক হইতে, বিভিন্ন লোকগুরুর বাক্য হইতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানকে ভক্তি করিয়া সংসারের দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইতে গেলে, নিজের জীবনে শান্তি পাইতে গেলে নবধা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা সকলের বিশেষ কর্তব্য। ভক্তির আচার্যগণ সকলেই একবাক্যে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই নবধা ভক্তি এক পরম প্রকৃষ্ট পথ। ইহা অবলম্বনে জ্ঞানী পুরুষেরা, পরম ভক্তেরা এমনকি যাঁহারা শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাও আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের ভজনা করার নাম ভক্তি। কায়,—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা; পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কাণে তাঁর ভাগবত ও নামগুণ কীর্তন শোনা। চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন,—অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তবস্তুতি, তাঁর নামগুণ কীর্তন—এই সব করা।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

সমাজ-জীবনে ভোগ ও ত্যাগ

শ্রীবলাই দেবশর্মা

সমাজের প্রাচীন বিন্যাস-প্রথায় বিশেষ বিপর্যয় ঘটিতেছে। ইহাকে কালধর্মের অপরিহার্য পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া পরাজিত মনোবৃত্তিরই লক্ষণ। যে বিবর্তনকে প্রগতি বলিয়া অভিনন্দন করা হইতেছে, তাহা স্বৈরাচারের রূপান্তর মাত্র। হিন্দু-সমাজ-মানসিকতায় আসিয়াছে একটা দোলা। সুখের হিল্লোল। এই সুখ সেই 'ভূমা' নহে, ইহা 'অল্প'। ইহা পশু-প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি। বর্তমান মানব নচিকেতার ন্যায় শ্রেয়ঃপন্থী না হইয়া—প্রেয়োবিলাসী হইয়াছে। জার্মান দার্শনিক নিট্‌শে তাহার মনের কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন—We want the best food and the fairest woman.

প্রেয়পন্থার একটা অপরিহার্য কুপরিণতি আছে। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন—'জাতিগঠনের জন্য, সমাজ-সংহতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন—আশিষ্ঠ, দ্রঢিষ্ঠ, বলিষ্ঠ মেধাবী মানব।' ক্ষুরধার শ্রেয়ঃপথে চলিতে না পারিলে মানুষ অন্ধতমে প্রবেশ করে, মহতী বিনষ্টির সম্মুখীন হয়।

ভোগলোলুপ আধুনিক সভ্যতা এই পথেই ধাবমান। ইহা কল্পনা নহে, ইহাই বর্তমান কালের বাস্তব ইতিহাস। এই যযাতি-মানসিকতার ভোগৈকলক্ষ্য সংস্কৃতির অনুসরণ করিয়া সংসার অধঃপাতের শেষ সীমায় উপনীত। রাজনীতিবিৎ জনৈক পাশ্চাত্ত্য মনীষীর ভাষায়—All Europe is rattling back into barbarism. বর্বরতা শব্দটার যথার্থ প্রয়োগ হয় নাই। বর্বরতা আপনার মূঢ়তায় আপনিই আচ্ছন্ন; আর আসুরিকতা নিজের সহিত অপরেরও অনিষ্ট-সাধনে তৎপর। বর্তমান মানব আসুরিক; এক দিকে ভোগে প্রমত্ত, অন্য দিকে অভিচারে ব্রতী। তাহার এক হাতে মহস্র কামনার সুরা-পাত্র, অন্য হাতে আণবিক বজ্র—অ্যাটম বম্ব্।

মানবতার মহিমা রক্ষার জন্য প্রয়োজন চরিত্রের কাঠিন্য, ধর্মের ক্ষুরধার পথে চলিবার সংকল্প ও শক্তি। পশু ও মানবে জীবত্ব সাধারণ; জীবনের সহিত যে জীবত্ব ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহা স্বভাবতই ভোগকাতর। সন্তানের যৌবন লুণ্ঠন করিয়া অনন্ত যৌবন ভোগের জন্য যযাতির মতো সকলেই ব্যাকুল। ভারত ভোগকে সংযমের বাঁধে বাঁধিতে চাহিয়াছে। তাই তপস্যায় অতন্দ্রিত থাকিবার বিধি, পদে পদে ব্রত নিয়ম, সংযম ও সদাচারের অনুসরণ। উপনিষৎ এই কারণেই উদাত্ত কণ্ঠে কহিয়াছেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। জাগ্রত হও শুভ বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রেরণায়। গীতায় ইহারই ব্যাখ্যা ও নির্দেশ,—যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ। এই যুদ্ধ মনুষ্যত্ব-হীনতার বিরুদ্ধে। দম-শক্তি প্রয়োজন সংসারের স্থিতি ও শান্তির জন্য। অবৈধ কামনা মানুষকে ধ্বংসের ও অশান্তির পথে লইয়া যায়। ভোগপ্রমত্ত আধুনিক জগৎ ইহার দৃষ্টান্ত। সেদিন লণ্ডনের কতকগুলি খ্যাতনামা সংবাদপত্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিয়াছেন—লণ্ডন নগরের শিক্ষিত যুবকেরা নানা প্রকার কদর্য কর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অভিজাত বংশের পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নানা দুষ্কার্যের অনুষ্ঠাতা-রূপে অভিযুক্ত হইতেছেন।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা মানুষের মনুষ্যত্বকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই নানা ব্রত নিয়মের বিধান দিয়াছেন। শ্রুতি ব্রহ্মচর্যকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতুভূত বলিয়াছেন—এই ব্রহ্মচর্যের নিত্য নিরন্তর অনুষ্ঠানে মনুষ্যত্বের অগ্নি অনির্বাণ থাকে।

আমাদের বর্তমান সমাজ সেই ব্রহ্মচর্যের

"জ্ঞানবিষয়ক যাবতীয় ভাবসকলের মধ্যে ভগবানেরই প্রকাশ, লোকে সেই প্রকাশ উপলব্ধি করিবার জন্যই তপস্যা করিয়া থাকে, ধর্ম ভগবানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাবতীয় সাধনার গতি একমাত্র সেই ভগবান।"

অতএব যিনি যে ভাবে পারেন সেই ভগবানের আরাধনা করুন,—এই কথা শ্রীশুকদেব বলিতেছেন :

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকামঃ উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

(২।৩।১০-শুকঃ)

"কাম্যবস্তু লাভের ইচ্ছায় অথবা কোনও প্রকার বাসনার বশবর্তী না হইয়া, অথবা উদারচিত্তে মোক্ষ মাত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায়, তীব্র (নিরন্তর প্রবাহশীল) ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া সেই পরম পুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার পরম লাভই হইবে।"

তখন শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হয় ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সৌভাগ্য হয়, এ কথা কপিল তাঁহার মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন :

পশ্যন্তি মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বদন্তি।"

(৩।২৫।৩৫-কপিলঃ)

"হে মাতঃ! এই সকল সাধকগণ, রক্তিমবর্ণ-নয়ন-শোভিত সহাস্যবদন সমন্বিত আমার মনোজ্ঞ দিব্য ও বরদান-মূর্তি দর্শন করিয়া থাকেন। শুধু দর্শন করেন তাহা নয়, মনের সাধে আমার সঙ্গে কথাও বলেন।"

এমন পরম কারুণিক শ্রীভগবানের গুণেরও সীমা নাই, মহিমারও অন্ত নাই। তাই সেই পরম প্রেমিক পরম দয়ালকে মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধুরাও ভক্তি করিয়া থাকেন। সূত বলিতেছেন,

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

(১।৭।১০-সূতঃ)

"যে সকল মুনিরা নির্বিকল্প সমাধিযোগে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সর্ববন্ধন ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাদের আর সাধনার কোন প্রয়োজন নাই—তাঁহারাও পরম প্রেমিক বলিয়া যাঁহার কীর্তি বিশ্ববিশ্রুত—সেই ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করেন। শ্রীহরির এমনই মহিমা।"

এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোক হইতে, বিভিন্ন লোকগুরুর বাক্য হইতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানকে ভক্তি করিয়া সংসারের দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইতে গেলে, নিজের জীবনে শান্তি পাইতে গেলে নবধা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা সকলের বিশেষ কর্তব্য। ভক্তির আচার্যগণ সকলেই একবাক্যে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই নবধা ভক্তি এক পরম প্রকৃষ্ট পথ। ইহা অবলম্বনে জ্ঞানী পুরুষেরা, পরম ভক্তেরা এমনকি যাঁহারা শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাও আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের ভজনা করার নাম ভক্তি। কায়,—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা; পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কাণে তাঁর ভাগবত ও নামগুণ কীর্তন শোনা। চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন,—অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তবস্তুতি, তাঁর নামগুণ কীর্তন—এই সব করা।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

সমাজ-জীবনে ভোগ ও ত্যাগ

শ্রীবলাই দেবশর্মা

সমাজের প্রাচীন বিন্যাস-প্রথায় বিশেষ বিপর্যয় ঘটিতেছে। ইহাকে কালধর্মের অপরিহার্য পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া পরাজিত মনোবৃত্তিরই লক্ষণ। যে বিবর্তনকে প্রগতি বলিয়া অভিনন্দন করা হইতেছে, তাহা স্বৈরাচারের রূপান্তর মাত্র। হিন্দু-সমাজ-মানসিকতায় আসিয়াছে একটা শৈথিল্য। সুখের হিল্লোল। এই সুখ সেই 'ভূমা' নহে, ইহা 'অল্প'। ইহা পশু-প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি। বর্তমান মানব নচিকেতার ন্যায় শ্রেয়ঃপন্থী না হইয়া—প্রেয়োবিলাসী হইয়াছে। জার্মান দার্শনিক নিট্‌শে তাহার মনের কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন—We want the best food and the fairest woman.

প্রেয়ঃপন্থার একটা অপরিহার্য কুপরিণতি আছে। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন—'জাতিগঠনের জন্য, সমাজ-সংহতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন—আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ মেধাবী মানব।' ক্ষুরধার শ্রেয়ঃপথে চলিতে না পারিলে মানুষ অন্ধতমে প্রবেশ করে, মহতী বিনষ্টির সম্মুখীন হয়।

ভোগলোলুপ আধুনিক সভ্যতা এই পথেই ধাবমান। ইহা কল্পনা নহে, ইহাই বর্তমান কালের বাস্তব ইতিহাস। এই যযাতি-মানসিকতার ভোগৈকলক্ষ্য সংস্কৃতির অনুসরণ করিয়া সংসার অধঃপাতের শেষ সীমায় উপনীত। রাজনীতিবিৎ জনৈক পাশ্চাত্ত্য মনীষীর ভাষায়—All Europe is rattling back into barbarism. বর্বরতা শব্দটার যথার্থ প্রয়োগ হয় নাই। বর্বরতা আপনার মূঢ়তায় আপনিই আচ্ছন্ন; আর আসুরিকতা নিজের সহিত অপরেরও অনিষ্ট-সাধনে তৎপর। বর্তমান মানব আসুরিক; এক দিকে ভোগে প্রমত্ত, অন্য দিকে অভিচারে ব্রতী। তাহার এক হাতে সহস্র কামনার সুরা-পাত্র, অন্য হাতে আণবিক বজ্র—অ্যাটম বম্‌।

মানবতার মহিমা রক্ষার জন্য প্রয়োজন চরিত্রের কাঠিন্য, ধর্মের ক্ষুরধার পথে চলিবার সংকল্প ও শক্তি। পশু ও মানবে জীবত্ব সাধারণ; জীবনের সহিত যে জীবত্ব ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহা স্বভাবতই ভোগকাতর। সন্তানের যৌবন লুণ্ঠন করিয়া অনন্ত যৌবন ভোগের জন্য যযাতির মতো সকলেই ব্যাকুল। ভারত ভোগকে সংযমের বাঁধে বাঁধিতে চাহিয়াছে। তাই তপস্যায় অতন্দ্রিত থাকিবার বিধি, পদে পদে ব্রত নিয়ম, সংযম ও সদাচারের অনুসরণ। উপনিষৎ এই কারণেই উদাত্ত কণ্ঠে কহিয়াছেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। জাগ্রত হও শুভ বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রেরণায়। গীতায় ইহারই ব্যাখ্যা ও নির্দেশ,—যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ। এই যুদ্ধ মনুষ্যত্ব-হীনতার বিরুদ্ধে। দম-শক্তি প্রয়োজন সংসারের স্থিতি ও শান্তির জন্য। অবৈধ কামনা মানুষকে ধ্বংসের ও অশান্তির পথে লইয়া যায়। ভোগপ্রমত্ত আধুনিক জগৎ ইহার দৃষ্টান্ত। সেদিন লণ্ডনের কতকগুলি খ্যাতনামা সংবাদপত্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিয়াছেন—লণ্ডন নগরের শিক্ষিত যুবকেরা নানা প্রকার কদর্য কর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অভিজাত বংশের পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নানা দুষ্কার্যের অনুষ্ঠাতা-রূপে অভিযুক্ত হইতেছেন।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা মানুষের মনুষ্যত্বকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই নানা ব্রত নিয়মের বিধান দিয়াছেন। শ্রুতি ব্রহ্মচর্যকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতুভূত বলিয়াছেন—এই ব্রহ্মচর্যের নিত্য নিরন্তর অনুষ্ঠানে মনুষ্যত্বের অগ্নি অনির্বাণ থাকে।

আমাদের বর্তমান সমাজ সেই ব্রহ্মচর্যের

আদর্শচ্যুত হইয়া ঘোরতর ভ্রান্তভাবে ভাবিত হইয়া পড়িতেছে। চারিদিকে তাহার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। স্বাধিকার-প্রাপ্ত ভারতবর্ষ সমাজগঠনে, যে বিধি-ব্যবস্থাকে অনুসরণ করিতেছে, তাহা একান্ত ভাবে পরানুকরণ। বিবেকানন্দের কণ্ঠে ভৎর্সনা-বাক্য ধ্বনিত হইয়াছিল 'এই দাসসুলভ পরানুকরণ সহায়ে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা লাভ করিবে?' পরানুকৃতি আজ শ্লাঘার কারণ, প্রগতির লক্ষণ। স্বামীজী ভবিষ্যৎ ভারতকে প্রার্থনামন্ত্র দিয়া গেলেন, 'মা আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা! আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর।'

সমাজের প্রাচীন রীতিনীতি কুসংস্কার, অতএব তাহা পরিহার পূর্বক যে পুনর্গঠননীতি অবলম্বন করা হইতেছে, তাহাতে ইওরোপের ইন্দ্রিয়ভোগের পদ্ধতিই অনুসরণ করা হইতেছে। কোথায় নব্য-ভারতের অধিনেতা বিবেকানন্দের সতর্কবাণী, 'ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিওনা তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর,'—আর কোথায় জীবনের মান-বৃদ্ধির নামে ভোগবাহুল্য। সাধ্বী অরুন্ধতী ও তপস্বিনী উমার উত্তরসাধিকাগণ আজ কি ভাবে ভাবিতা? যে যথাতিবৃদ্ধি হিন্দু সমাজে নিতান্ত অবজ্ঞেয় ছিল, তাহাই আজ হইয়া উঠিয়াছে পরম কাম্য!

অবশ্যই হিন্দু সমাজের যুগোপযোগী পুনর্গঠন প্রয়োজন, কারণ পাশ্চাত্ত্যের আধিব্যাধি হিন্দু সমাজে প্রবলভাবে সংক্রমিত হইতেছে। যাঁহারা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর উত্তরাধিকারিণী হইবার ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সিনেমার অভিনেত্রী হইবার জন্য ব্যাকুলা। যে ভারতভুবনের জনপদপতি একদিন শ্লাঘাসমৃদ্ধ কণ্ঠে কহিয়াছিলেন—

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপঃ।
নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ?

সেই জনপদ বিস্তারে কদর্যতার প্লাবন বহিতেছে, কামনার বহ্নি জ্বলিতেছে।

সমাজের পুনর্বিন্যাসের জন্য আজ একান্তই প্রয়োজন আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ভাবের অনুশীলন। বিবেকানন্দের বীরবাণীকেই এখন মন্ত্ররূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে—"জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন"।

সন্ন্যাসীর অনুশাসন বাক্য অবজ্ঞা করিলে আমাদের মহতী বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী। দেশের দেহে মনে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

'বিবেকবাণী'কে উপেক্ষা করিয়াই আমরা সর্বনাশের সমীপবর্তী হইতেছি। দেশে অপরাধ-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদিন যাহারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনে জীবনকে তুচ্ছ করিয়াছে, তাহাদেরই পরবর্তিগণ আজ উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী। যে বুদ্ধি বোধি, মেধা মনীষা বিশ্ব জয় করিয়াছিল, তাহাই আজ পরমুখাপেক্ষী, পরানুকারী। প্রতীচ্যের সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসরণ করিয়া আমাদের আধুনিকতা এক বিকট ভাবদাস্যে মগ্ন হইতেছে।

ভারতবর্ষের বেদ-সম্মত সংস্কৃতি—ত্যাগের পথকেই জীবনাদর্শ বলিয়া বরণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য-ভাব-ভাবিত দেশ জীবনের মান উন্নয়নে আগ্রহশীল হইয়া ভোগপ্রতিযোগিতায় লিপ্ত—এই জন্যই রাষ্ট্রে, সমাজে, গৃহে প্রতিষ্ঠানে, জাতিতে জাতিতে, নর-নারীতে, শিক্ষকছাত্রে—নিরন্তর সংঘর্ষ। বিচার বিবেচনা করিয়া ভোগসাম্য লক্ষ্যে রাখিয়া পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই পুনর্বিন্যাস-পদ্ধতি কেমন হইবে, তাহা বিবেকানন্দ বারংবার বহু ভাবে বলিয়াছেন: "হিন্দুগণ, ঐ ত্যাগের পতাকা পরিত্যাগ করিও না। উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর। বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য ইহা প্রয়োজন। আমাদিগকে 'ত্যাগ' অবলম্বন করিতেই হইবে। এই ত্যাগ ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ।" এই ত্যাগের অনুসরণেই হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন সম্ভব হইবে। ঈশোপনিষদে সেই পরম আদর্শই উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

ত্যাগের পথেই ভোগসাম্য!

মায়ের পরিচয়*

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মায়ের পরিচয় তিনি মা। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র মায়ের আসন বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট। মা বহু কষ্ট সহ্য করেন তাঁর সন্তানের জন্ত—কুপুত্র হলেও মা চিরদিন মা হয়েই থাকেন; সন্তানকে মানুষ করতে, তাকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, মায়ের ত্যাগ মায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আমাদের দেশে প্রবাদেই ফুটে উঠেছে:

কুপুত্র যত্তপি হয়, কুমাতা কখনও নয়।

আজ থেকে এক শত চার বছর আগে এই বাংলা দেশের এক অজ্ঞাতনামা গ্রামে আমাদের একটি মা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মায়ের জন্মস্থান বলে জয়রামবাটি আজ প্রসিদ্ধ পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত।

শ্রীশ্রীমা বাল্যকাল থেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ আদর্শে গঠিত করেছিলেন। নিজে তিনি ছিলেন পরম-প্রভাময়ী, মূর্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা; স্বামীরূপে যে পরমপুরুষকে তিনি পেয়েছিলেন, সেই দেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশে নারীজাতির ধর্মজীবনের শুধু নয়, কর্মজীবনেরও আদর্শ এবং সাধনার পথ নির্দিষ্ট করে দেখাবার জন্তই মা তপস্যা ও সাধনা করে গেছেন।

নিজের জীবনে তিনি সেই মহান আদর্শ স্থাপন করেছিলেন যা সমগ্র ভারতীয় নারীর জীবনে কর্ম-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করতে পারে। বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতার আবহাওয়ায় নারীর মহান আদর্শ বিকৃত থেকে বিকৃততর হয়ে ধ্বংস হতে চলেছিল। ভারতীয় নরনারী ত্যাগ ভুলে কেবলমাত্র ভোগকেই গ্রহণ করেছিল, নিবৃত্তির কথা ভুলে প্রবৃত্তিকেই উচ্চ আসন দিয়েছিল। স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মতই তারা ভেসে চলেছিল, তখনই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব; জ্ঞানের প্রদীপ হাতে করে নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে-ছিলেন অন্ধকারে দিশাহারা জনগণকে পথ নির্দেশ করতে। সেইদিনকার দুর্নীতি ও অনাচারের মধ্যে তিনি প্রচার করেছিলেন—'ভোগে সুখ নাই—নিবৃত্তিতেই আছে শান্তি।' পথভ্রষ্ট জনগণের সামনে সত্যযুগের নির্দেশ দিয়েছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ।

জনগণের কল্যাণে, বিশেষ করে নারীজাতির কল্যাণের জন্তই মায়ের আবির্ভাব। স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী—শিবের শক্তি—পরমকল্যাণী শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে দেখেছিলেন দিব্য ভাবময় প্রজ্ঞাপূর্ণ এক মহাপুরুষ রূপে; শ্রীমায়ের মধ্যে ঠাকুর দেখতে পেয়েছিলেন পরমকল্যাণী জগজ্জননীকে—যার পরিচয়—তিনি মা, পরম স্নেহময়ী মা। তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে চিনেছিলেন—তাই তাঁদের মধ্যে ছিল না কোন আসক্তি, তাঁদের প্রেম ছিল অপার্থিব। ঠাকুর অনাসক্তভাবে দিয়ে গেছেন ধর্মসম্বন্ধীয় খুঁটিনাটি শিক্ষা এবং মা ভক্ত শিষ্যার মতই সেই শিক্ষা গ্রহণ করে ভারতীয় নারীর ধর্মাদর্শ নিজের জীবনে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন।

সমগ্র নারীজাতির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণের ভার ঠাকুর তাঁর মাথায় তুলে দিয়েছিলেন, আর মা ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য করে চলেছিলেন সারাজীবন।

ঠাকুর বারবার বলেছিলেন—'মেয়েদের আমি আর কয়জনকে দেখেছি। তোমার কাছে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আসবে—তোমাকে তাদের পথ দেখাবার ভার নিতে হবে।'

শ্রীমা প্রায় চল্লিশ বৎসর ঠাকুরের এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। নিজের কর্তব্য

* জয়নগর-মজিলপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাসংঘে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ।

হতে তিনি কোন দিন মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হন নি। পুরুষ, নারী; ব্রাহ্মণ, শূদ্র; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান; ভারতবাসী, ইংরেজ প্রভৃতি কোন বর্ণ বা জাতির মধ্যে তিনি ভেদ রাখেন নি। তাঁর কাছে সবাই ছিল সমান, মাতৃস্নেহে সকলকে সমান আদরে তিনি কোলে টেনে নিয়েছেন, অমৃতবাণী সকলকে দান করেছেন। সকলের মুক্তি এবং কল্যাণই ছিল সন্তানবৎসলা, সর্বসন্তাপহারিণী মায়ের প্রাণের একান্ত কামনা।

কেবলমাত্র ভক্তিমান গৃহস্থ বা ত্যাগী সন্ন্যাসীই নয়, কেবলমাত্র উচ্চবর্ণই নয়, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, সমাজের ঘৃণ্য পতিত বা পতিতা বহু নরনারী তাঁর পূত স্নেহধারায় অভিষিক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করেছে।

মায়ের মনে অপার স্নেহ ভালবাসা থাকলেও মা কোন দিনই অন্যায় সইতে পারেন নি। বাইরে তিনি ছিলেন ধীর, স্থির—বাঙ্গালীর ঘরের লজ্জানত বধূ, বাইরে হতে দেখে কেউ বুঝতে পারত না—এই মানুষটির ভিতরে রয়েছে অফুরন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি—অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই শান্তপ্রকৃতি নারীই দাঁড়াতেন অতি উগ্র ভীষণ মূর্তিতে—যার কল্পনাও অনেকে করতে পারে না।

নারীজাতিকে গঠন করা ছিল তাঁর পরম লক্ষ্য। তিনি মেয়েদের লক্ষ্য করে বহু উপদেশ দিয়ে গেছেন—যেমন "সহ্য গুণ বড় গুণ। মেয়েদের লজ্জা থাকা ভাল। ঝগড়াটে হওয়া ভারী অলক্ষণ—ওতে সংসারের শ্রী নষ্ট হয়ে যায়।"

"সবাইকে ভালবাসতে শেখো"—এই ছিল মায়ের প্রধান উপদেশ; কেউ যেন কারও দোষ-ত্রুটি না দেখে, কারও মনে কষ্ট না দেয়; সংসারের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভগবানকে স্মরণ করুক, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

মা বলেছেন—সব মানুষই শান্তি চায়, কিন্তু শান্তি কি সহজে পাওয়া যায়? মন হতে ভোগ-বাসনা দূর না হলে শান্তি পাওয়া অসম্ভব। ভুলেও ভগবানকে একটিবার ডাকবে না, এতে আর কি করে শান্তি হবে?

কর্মফল ভোগ করতে হবেই—তবু ঈশ্বরের নাম করলে যে বোঝা ভারী মনে হতো, সে বোঝা হবে হাল্কা—এই ছিল মায়ের শিক্ষা।

আমাদের পরম পুণ্য যে, আমাদের মাকে আমরা এই বাংলার বুকেই পেয়েছি। এই বাংলার কৃষ্টি সভ্যতা ও ধর্মের আবেষ্টনীর মধ্যে এই বাংলার মাটিতে এসেছিলেন আমাদের জগন্মাতা—আমাদের কম গৌরবের কথা নয়।

মায়ের সুন্দর সুন্দর উপদেশ আমরা যেন না হারিয়ে ফেলি। মায়ের আদর্শ শুধু আমাদের নয়, আমাদের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের সামনে জ্যোতির্ময় হয়ে ফুটে থাকবে, এই কামনাই আজি করছি। পরমা প্রকৃতি স্নেহময়ী মায়ের পূত আশীর্বাদ অক্ষয় অভেদ্য বর্মের মতই তাঁর সন্তানদের আচ্ছাদিত করে থাক—তাদের সকল আপদ বিপদ হতে রক্ষা করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিক, আজ মায়ের জন্মদিনে আমি তাঁর কাছে সেই প্রার্থনাই করছি।

বিজ্ঞপ্তি:—আগামী ১৯শে ফাল্গুন (৩.৩.৫৭) রবিবার বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ও বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম শুভ জন্মতিথি-পূজা এবং পরবর্তী রবিবার ২৬শে ফাল্গুন (১০.৩.৫৭) বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব (সাধারণ উৎসব) অনুষ্ঠিত হইবে।

সমালোচনা

(১) ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ (২) গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) **(৩) দীন মহারাজ** (স্বামী সচ্চিদানন্দ)—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। 'মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটী' কর্তৃক ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে—১৲ টাকা, ॥৹ আনা ও ॥৹ আনা।

(১) যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আগমনে ধর্মের নূতন নূতন ভাব প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার কোন্ ভাবটি কোন্ ভক্তের মধ্যে কি ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা জানা যায়—তাঁহার ভক্তদের জীবন আলোচনা করিলে। ৺দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ছিলেন ঠাকুরের একজন গৃহী ভক্ত। সামান্য অবস্থার লোক, সামান্য ভাবে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহারই মধ্যে ঠাকুরের পবিত্র সংস্পর্শে আসিয়া নিজের দৈন্য দশা ভুলিয়া তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে সেই আনন্দ তিনি দুই হাতে বিলাইয়াছেন, তাহা লাভ করিবার জন্য অনেক ভক্ত তাঁহার নিকট ছুটিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থত্রয়ের প্রথমটিতে তাঁহারই বৈচিত্র্যময় জীবনের কয়েকটি ঘটনা গ্রন্থকার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বেশ সরল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা পাঠে ভক্তগণের উপকার ও আনন্দ হইবে।

(২) স্বামী বিবেকানন্দকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা নিজ নিজ জীবন ধন্য করিয়াছেন—গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) তাঁহাদের অন্যতম। স্বামীজীর হৃদয় কত বিশাল ছিল, তাহা গুপ্ত মহারাজের জীবন আলোচনা করিলে জানা যায়। একবার যাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন তাহাকে সর্বভাবে রক্ষা করিতে হইবে—গুপ্ত মহারাজের জীবনে স্বামীজীর এই ভাবটি পরিস্ফুট। ফলে সারাজীবন ধরিয়া আধ্যাত্মিক তেজ ও ত্যাগ-সম্বলিত সেই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জীবন কাটাইয়া কি ভাবে তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় পুস্তকের কয়েকটি ঘটনায় বেশ বোঝা যায়। কাহিনীর ন্যায় বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার সুন্দরভাবে আলোচ্য জীবনটি সকলের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

(৩) সম্পূর্ণভাবে নিজের উদ্যমে চরিত্র গঠিত করিয়া দীন মহারাজ (স্বামী সচ্চিদানন্দ) গৃহী জীবনে যে অধ্যবসায়ের সহিত ব্যবসায়-পরিচালনা এবং অর্থোপার্জন করিয়া নিজের ব্যয় নির্বাহ করিতেন,—কাহারও দ্বারস্থ হইয়া বা কাহারও কর্ম স্বীকার করিয়া স্বাধীনতা বিসর্জন দিতেন না—সন্ন্যাসী হইয়াও সেই উদ্যম ও অধ্যবসায় বজায় রাখিয়া তিনি কিরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তৃতীয় পুস্তকে সেই বিবরণ পাঠ করিয়া সকলেই শিক্ষা লাভ করিবেন।

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—(প্রথম খণ্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ; শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত; প্রকাশক—মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি; পৃষ্ঠা—২০৭, মূল্য—দুই টাকা বারো আনা।

গ্রন্থকার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে লণ্ডনে যান। তখন সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা করিতেছিলেন। স্বামীজীর সহিত ঐ সময়ে গ্রন্থকারের কিছুকাল থাকিবার সৌভাগ্য হয়। তখনকার কিছু ঘটনা এই গ্রন্থে লিখিত। স্বামীজীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের কথা এই গ্রন্থে আছে—যথা মিঃ গুডউইন, স্টার্ডি, মিঃ ফক্স, মিস্ মুলার, মিস্ ম্যাকলাউড, মিসেস লেগেট, মিঃ ম্যাক্সমুলার এবং স্বামী সারদানন্দ। স্বামীজীর সহৃদয়তা, বাগ্মিতা, প্রতিভা, তেজস্বিতা, স্বদেশপ্রেম, পাণ্ডিত্য, শিশুসুলভ সরলতা প্রভৃতি অনেকগুণের পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া স্বামীজীকে স্বগৃহে, শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সন্নিধানে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে দেখিয়া থাকিলেও, লণ্ডনে দেখার বৈশিষ্ট্য আছে ; যুগের আচার্যরূপে স্বামী বিবেকানন্দকে গ্রন্থকার ফুটাইয়া তুলিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টায় তিনি সফল হইয়াছেন। এরূপ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে বাহির হইবার সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল, ইহা বিশেষ দুঃখের কথা। আশা করি সকলে, বিশেষতঃ ছাত্র ও যুবকগণ ইহার যথেষ্ট আদর করিবে।

নৃত্যকলা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত ; *প্রকাশক—মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি ; মূল্য* এক টাকা।

গ্রন্থকারের 'বৃহন্নলা' নামক কাব্য হইতে ইহা সঙ্কলিত। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট রাজার রাজপ্রাসাদে 'বৃহন্নলা' বেশে আত্মগোপন করিয়া রাজকুমারী উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারই কতক বিবরণ কাব্যের ভঙ্গীতে ইহাতে দেওয়া আছে। নৃত্যকলা যে একটি উচ্চাঙ্গের বিষয়—ইহা সকলকে জানানোই এই গ্রন্থ ছাপিবার উদ্দেশ্য।

—অচিন্ত্যানন্দ

Tantraraja Tantra—সার্ জন্ উড্‌রফ্ প্রণীত। গণেশ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, মাদ্রাজ—১৭ হইতে প্রকাশিত। ১১৭ পৃষ্ঠা + ১৩ ; মূল্য ৬৲ টাকা।

তন্ত্রশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার সার্ জন্ উড্‌রফ্ ইহাতে ইংরেজী ভাষায় "তন্ত্ররাজ তন্ত্রের" সারমর্ম উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে ছত্রিশটি অধ্যায় ছত্রিশ তত্ত্ব অনুসারে অভিহিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে তন্ত্রসার সংকলন করিয়াছেন এবং তন্ত্রের সাধনরহস্য গভীরভাবে আলোচনা করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত কুণ্ডলিনী শক্তি কিভাবে জাগরিত হয় তাহা দেখাইয়াছেন। মানবদেহের প্রতি তত্ত্বের পশ্চাতে অধিষ্ঠাত্রী দেবী রহিয়াছেন, সেই সব দেবীর মন্ত্র, যন্ত্র ও চক্র ইহাতে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কাশ্মীর সম্প্রদায়ের সুভগানন্দ নাথের 'মনোরমানাম্নী' টীকা এই পুস্তকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। মহাশক্তির কাদি, হাদি, ও কহাদি নামে বিভিন্ন রূপের মন্ত্র ও পূজা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই তন্ত্রে ললিতা, ত্রিপুরাসুন্দরী, মহামঙ্গলা প্রভৃতি দেবীর স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ রূপের পূজার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে বিবিধ রঙে অঙ্কিত একটি শ্রীযন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে, এবং শ্রীচক্রের পূজা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শিত হওয়ায় তন্ত্রমতের সাধকবর্গ অনেক ইঙ্গিত পাইবেন। পুস্তকখানি খুব কৃতিত্বের সহিত সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত।

—মৈথিল্যানন্দ

অন্তরাগে আলাপন (দ্বিতীয় ভাগ)—স্বামী বাসুদেবানন্দ কর্তৃক লিপিবদ্ধ এবং পি ২৩৬।১ লেক রোড, কলিকাতা-২৯ হইতে শ্রীশুভেন্দু রায়চৌধুরী ও শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। পৃষ্ঠা (ডিমাই)—১৩০ ; মূল্য—২॥০ টাকা।

বেলুড় মঠের অন্যতম সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী স্বামী বাসুদেবানন্দজী (দেহত্যাগ—২২শে মে, ১৯৫৬) নানা স্থানে শাস্ত্রের ক্লাস লইবার সময় ধর্মসাধনা এবং বিবিধ দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রসঙ্গ করিতেন, তাহার কিছু কিছু তিনি নিজের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। 'অন্তরাগে আলাপন (প্রথম ভাগ)' এবং 'দিব্য-বাণীর প্রতিধ্বনি' নামক দুইটি পুস্তকের আকারে ইতঃপূর্বে ঐ আলোচনাগুলির অনেক অংশ তাঁহার উৎসাহী বিদ্যার্থিবৃন্দকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থ ১৯৪৬ হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে ঐরূপ আরও কতিপয় প্রসঙ্গের সংকলন।

প্রসঙ্গগুলিকে ৫২টি বিভাগে সুন্দরভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার পটভূমিকায় পাশ্চাত্ত্যের ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও বিচারে বক্তার গভীর পাণ্ডিত্য এবং অন্তর্দৃষ্টি সুপরিস্ফুট। চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকারা পড়িয়া উপকার লাভ করিবেন।

শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী—শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত-প্রণীত। প্রকাশিকা—শ্রীমতী বিজয়া দাশগুপ্ত, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট-২, গবর্ণমেণ্ট হাউসিং এস্টেট্, এণ্টালী, কলিকাতা-১৪ ; পৃষ্ঠা (ডিমাই) —৫২৪ ; মূল্য—৬৲ টাকা।

দুই বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তীর সময় বেলুড় মঠের জয়ন্তী-কমিটির উদ্যোগে স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত এবং উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত জননীর বৃহৎ প্রামাণিক জীবনী-গ্রন্থ ‘শ্রীমা সারদাদেবী’ ব্যতীত বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন লেখক-লেখিকা এই সর্বজন-পূজ্যা মহীয়সীর অদ্ভুত জীবন-কথা অবলম্বনে ছোট বড় অনেকগুলি বই প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্তমান পুস্তকটিও শ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তীর সময়ে প্রকাশের জন্য রচিত হইয়াছিল—‘লেখকের নিবেদন’ হইতে জানিতে পারা যায়। অনিবার্য কারণে প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের সঙ্কলনে লেখক ‘পরিশিষ্টে’ যে পঁচিশটি উপাদান-পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন তাহার অধিকাংশই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রকাশন। উপাদানের দিক দিয়া পুস্তকটির বেশী মৌলিকতা না থাকিলেও মায়ের জীবনের ঘটনাবলীর বিভাগ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণে অভিনবত্ব স্পষ্টই চোখে পড়ে।

গ্রন্থকার সারদাদেবীর ৬৭ বৎসরের জীবনকে তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম স্তর খ্রীঃ ১৮৫৩ সাল হইতে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত—তাঁহার জীবনের প্রথম ৩৩ বৎসর লইয়া; দ্বিতীয় স্তর খ্রীঃ ১৮৮৬-৮৭ সালের ‘বৃন্দাবনে এক বৎসর’ এবং তৃতীয় স্তর খ্রীঃ ১৮৮৭ হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত শ্রীমায়ের জীবনের অন্তিম ৩৩ বৎসর অবলম্বনে আলোচিত। প্রথম স্তরে ১৮টি এবং তৃতীয় স্তরে ৩৩টি উপবিভাগ আছে। বিভাগ এবং উপবিভাগগুলির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকে ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপিত করিতে গিয়া লেখককে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। আমাদের বিচারে তাঁহার এই পরিশ্রম সার্থক। সারদাদেবীর জীবনের কোন ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির পরিবেশিত বিবরণীতে যে সকল অসামঞ্জস্য তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন গবেষকের দৃষ্টিতে তাহাদের বিচারও এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থের ভাষা সাবলীল, আবেগ সংযত, ঘটনার বিশ্লেষণধারা যুক্তিপূর্ণ।

—শ্রদ্ধানন্দ

The Gist of Religions:—স্বামী নারায়ণানন্দ। প্রকাশক—মেসার্স এন. কে. প্রসাদ এ্যাণ্ড কোম্পানী, পোঃ ঋষিকেশ, (উত্তর প্রদেশ)। পৃষ্ঠা--১৩৮ ; মূল্য ২৲ টাকা।

বাংলায় পুস্তকখানির নামকরণ করা যাইতে পারে ‘সর্বধর্ম-সার’। ধর্মসাহিত্যের কিছুটা ব্যাপক সংবাদ যাঁহারা রাখেন তাঁহাদের নিকট সুপণ্ডিত স্বামী নারায়ণানন্দের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ধর্মতত্ত্বের উপর তাঁহার বিশেষ দখল রহিয়াছে এবং এই তত্ত্ব পরিবেশনেরও যে তিনি যোগ্য অধিকারী, সমালোচ্য পুস্তকখানিতে পুনরায় তাহারই পরিচয় আমরা পাইয়াছি। হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, শিখধর্ম, ইসলামধর্ম, সুফীধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম প্রভৃতি মুখ্য ধর্মগুলির সারমর্ম ধর্মের ধারক শাস্ত্রাদির বহু মূল্যবান উক্তিসহ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং মাত্র ১৩৮ পৃষ্ঠার সীমায়িত পরিধির মধ্যে বলিতে গেলে অসম্ভবকে সম্ভব করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের সার্থক ভূমিকারূপে পুস্তকখানি ধর্মানুরাগী কিংবা জ্ঞানান্বেষী পাঠকের নিকট অপূর্ব হইবে। স্থানে

স্থানে তত্ত্বের ব্যাখ্যায় সহজ ছোটখাট ও ঘরোয়া দৃষ্টান্তের আশ্রয় লওয়ায় উহা আরও সুখপাঠ্য হইয়াছে। ধর্মের ঠিক ঠিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম বা উপলব্ধি না করিয়া উহার খোলস লইয়া বিতর্কসৃষ্টির ঝোঁক এখনও অনেক মহলেই প্রবল। সকল ধর্মের সারবস্তুর মধ্যে বা অন্তর্নিহিত ভাবের মধ্যে যে সুমহৎ ঐক্য রহিয়াছে তাহা বুঝিবার পক্ষে এই পুস্তকখানি বিশেষ সাহায্য করিবে।

—শ্রীমনকুমার সেন

শ্রীশ্রীবুদ্ধযশোধরা—ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী প্রণীত। ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীটস্থ প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১৫৫; মূল্য আড়াই টাকা।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ-জয়ন্তী-উপলক্ষ্যে যে সকল গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে, তা প্রায় সমস্তই বুদ্ধদেবের জীবনচরিতমূলক। ভগবান বুদ্ধ ও জননী যশোধরার জীবনালেখ্য, বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য, এবং পরবর্তী যুগের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিষয়ে "শ্রীশ্রীবুদ্ধযশোধরা"র মতো এমন সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ অতি বিরল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও দর্শনে পরম পণ্ডিত ডক্টর চৌধুরী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ইংরেজী বা সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত না করে মাতৃভাষা বাংলাতেই যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তজ্জন্য বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ তাঁর কাছে ঋণী থাকবেন।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে ডক্টর চৌধুরীর সংস্কৃতে রচিত বুদ্ধস্তুতি, বুদ্ধধ্যান, যশোধরাস্তুতি প্রভৃতি সাতিশয় ভক্তি-প্রণোদিত। তৎপর বুদ্ধযশোধরার জীবনাদর্শ, বুদ্ধবাণী ও তার মূলানুসন্ধানপূর্বক বঙ্গানুবাদ, গৌতমের সাধনা, নির্বাণ, বৌদ্ধ নারী-কবি, বুদ্ধপরম্পরা, 'বুদ্ধবংশ' নামক পালি গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ অংশের বঙ্গানুবাদ, পালি ত্রিপিটকের মনোরম পুস্তকানুক্রমিক সমালোচনা, ত্রিপিটক প্রচারের ইতিহাস, সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য এবং সর্বশেষে "শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ" প্রভৃতি পাণ্ডিত্যমূলক নিবন্ধ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। এখানে জননী যশোধরার জীবন দিব্যালোকে হয়েছে পরিস্ফুট; নির্বাণের জটিলতত্ত্ব সরস বিকাশ লাভ করেছে; বহু পালি গ্রন্থের বিশিষ্ট অংশ এখানে মাতৃভাষার যাদুমন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুক্ত। গবেষণায় সিদ্ধহস্ত ডক্টর চৌধুরী যেমন ভাবের উচ্ছ্বাসে কোনও স্থলে ইতিহাসের মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন নি, তেমনি শত কথাকে সামান্য কয়েকটি কথার সার্থক ব্যঞ্জনায় করেছেন সুব্যক্ত। তাঁর রচনাশৈলীও একেবারে নিজস্ব। ভাষার ফেনিল উচ্ছ্বাস নেই; অথচ সাবলীলতা ও মাধুর্য সর্বত্র সংপ্রসারিত হয়ে রয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে ডক্টর চৌধুরীর এই সার্থকতম নবাভিযান আরো মধুময় হয়ে উঠুক, তাঁর গমনপথ পুষ্পিত ও সুরভিত হোক্— ভগবান্ বুদ্ধের কাছে এই প্রার্থনা করি।

—শ্রীধর্মাধার মহাস্থবির

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

OUR EDUCATION—স্বামী নির্বেদানন্দ প্রণীত। পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। শিক্ষাবিষয়ক সুচিন্তিত সমালোচনা ও শিক্ষা-সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতপূর্ণ প্রবন্ধাবলী। পৃষ্ঠা ১৭২; মূল্য—৩৷৷০। প্রকাশক—রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস হোম, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

অতীতের স্মৃতি (স্বামী বিরজানন্দ ও সমসাময়িক স্মৃতিকথা)—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। পরিশিষ্টে স্বামী বিরজানন্দের কতকগুলি রচনা ও পত্র সন্নিবিষ্ট। প্রকাশক—স্বামী অভয়ানন্দ, বেলুড় মঠ, হাওড়া, পৃষ্ঠা ৫৭০; মূল্য—৬৲, আশীটিরও অধিক চিত্র সম্বলিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ৯ই মাঘ (২২শে জানুআরি) মঙ্গলবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ৯৫তম আবির্ভাব-উৎসব সারা দিন ব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভের পর বেদপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা, কঠোপনিষদ্-ব্যাখ্যা, কালীকীর্তন, ভজন-গান, হোম, ভোগরাগ প্রভৃতি হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির ও তাঁহার ঘরটি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী স্বামীজীর চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। দ্বিপ্রহরে ছয় সহস্রাধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ছায়াতলে গঙ্গাতীরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সভায় বাংলায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং ইংরেজীতে স্বামী গম্ভীরানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করিলে পর সভাপতি স্বামী ওঁকারানন্দ বলেন,—শ্রীরামকৃষ্ণদেব সূত্র, এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিশদ ভাষ্য; বৈদান্তিক বিবেকানন্দের মনীষা অসাধারণ, কিন্তু মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের তুলনা আর কোথাও দেখা যায় না। তিনি শুধু বেদান্তের প্রচারকই ছিলেন না, দুঃখী ও আর্ত মানুষের জন্য তাঁহার বাণীর মধ্যে যে অপরিসীম সহানুভূতি ও প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের চিন্তানায়কদের প্রভাবিত করিবে।

সন্ধ্যারতির পর স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

বেলুড় মঠে দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামা—গত ৫ই মাঘ (১৯.১.৫৭) শনিবার বেলা ১১টায় বৌদ্ধধর্মগুরু পরমপূজ্য দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামা তাঁহাদের সহযাত্রী সহ বেলুড় মঠ দর্শনে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরটি দর্শন করান। দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিমূর্তির সম্মুখে কিছুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন। তাঁহাদের দলের একজন প্রবীণ সদস্য শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উত্তরীয় প্রদান করেন। লামাদ্বয় বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ ও দোভাষীর সাহায্যে কিছুক্ষণ আলাপ ও ধর্মপ্রসঙ্গ করার পর স্বামী বিবেকানন্দের মন্দিরে স্বামীজীর মর্মরমূর্তি ও 'ওঁকার' দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। মঠ পরিদর্শনকালে তাঁহাদের সঙ্গে বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সিকিমস্থ ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধি শ্রীআপ্পা সাহেব পন্থ ছিলেন। ধর্মগুরুদ্বয়কে ভারত-সংস্কৃতি ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়া হয়।

রাজপুর (২৪ পরগনা) ছাত্রাবাসের ভিত্তিস্থাপন—গত ১৪ই জানুআরি পৌষ-সংক্রান্তির শুভদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজ ভিত্তিস্থানে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রার্থনা করিয়া আসিলে পর গত ১৬ই জানুআরি বহু সাধু ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-ছাত্রাবাসের ভিত্তিস্থাপন-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভারতের পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। আশ্রমের (বর্তমানে ১৮, যদুমল্লিক রোড, পাথুরিয়া-

ঘাটা, কলিকাতায় অবস্থিত) পরিচালক-সমিতির সভাপতি শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস—ছাত্ররা যাহাতে আশ্রমিক পরিবেশের ভিতরেই কলেজের শিক্ষা-লাভের সুযোগ লাভ করিতে পারে তজ্জন্য একটি আবাসিক কলেজের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। আমেরিকার কন্সাল জেনারেল শ্রীমতী কে. ব্র্যাকেন্স বলেন, যে সব প্রতিষ্ঠান মানুষ তৈয়ারী করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, কল-কারখানার তুলনায় তাহাদের দাম অনেক বেশী। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ ডি. এম্. সেন বলেন, যুবকদের শিক্ষাদানই হউক বা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনই হউক এই কাজগুলির সুষ্ঠু সম্পাদনের দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মিশন যেন গ্রহণ করেন। শ্রীধান্না বলেন যে, উদ্বাস্তুদের অবস্থার উন্নতিকল্পে স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও শিক্ষণকার্যের মধ্য দিয়া রামকৃষ্ণ মিশন যে সেবা করিতেছেন, তাহার প্রতি তাঁহার দপ্তরের আন্তরিক সহানুভূতি আছে। এই ছাত্রাবাসে উদ্বাস্তুদের দুইশত ছাত্র স্থানলাভ করিবে, পুনর্বাসন দপ্তর এই আবাসের নির্মাণ-কার্যে ৪,৮৭,০০০, টাকা সাহায্য করিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে সমবেত সকলে বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব—ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে গত ৮ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর) পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ এবং ১৩ই পৌষ অপরাহ্ণে মহিলাদিগের একটি সভায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়গুলির কয়েকজন ছাত্রী স্তোত্র, আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে। সভান্তে সমবেত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়।

বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির ছাত্রাবাসের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা—গত ২২শে জানুআরি, ১৯৫৭, মঙ্গলবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি-দিবসে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দ মহারাজ মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি ও বেদ-পাঠের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরের নূতন ছাত্রাবাসের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করেন। বেলুড় মঠের অনতিদূরে এবং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সন্নিকটে প্রায় ২০ বিঘা জমির উপর এই ছাত্রাবাসটি নির্মিত হইবে। উক্ত অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ, অন্যান্য বহু প্রাচীন সন্ন্যাসী ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে শিল্পমন্দিরের উপকারিতা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়া ছাত্রদিগকে স্বামীজীর ভাবাদর্শে জীবন গঠন করিয়া নিজের ও দেশের উন্নতিবিধান করিতে আহ্বান করেন।

বেলুড় বিদ্যামন্দিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী-উৎসব—বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে গত ২০শে হইতে ২৮শে জানুআরি পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নবদিনব্যাপী যে শিক্ষাপ্রদ বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহা অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-কল্পে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিদ্যামন্দিরের পতাকা উত্তোলন করেন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ। তাঁহার উপদেশপূর্ণ ভাষণের পর বিদ্যামন্দিরের সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দ মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

এতদুপলক্ষ্যে ২১শে জানুআরি বিদ্যামন্দিরে যে সংস্কৃতি-সভা আহূত হয়, তাহাতে সভাপতি ডাঃ

কালিদাস নাগ ও প্রধান অতিথি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এবং বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ ভারত সংস্কৃতির ধারা, মূল উৎস ও আদর্শ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। সভান্তে ডক্টর নাগ বিদ্যামন্দিরের সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে বিদ্যার্থীর সাংস্কৃতিক জীবন, শিক্ষা ও কার্যাবলী বিস্তারিতভাবে দেখান হয়।

২৫শে জানুআরি বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী তাঁহার ভাব-গম্ভীর ভাষণের মাধ্যমে বাল্মীকি-রামায়ণ, তুলসীদাসকৃত রামচরিতমানস ও সংস্কৃত নাট্যকার ভাস রচিত 'প্রতিমা' নাটক অবলম্বনে শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীভরতের আদর্শ জীবন ও চরিত্র-মহিমা বর্ণনা করেন। ২৭শে জানুআরি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিদ্যামন্দিরের পুরস্কার-বিতরণী সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার স্বরূপ, শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তাৎপর্য ও ছাত্রগণের আদর্শ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

ক্রিকেট, ভলিবল, ফুটবল প্রভৃতি বিবিধ খেলাধুলা ও চলচ্চিত্র-প্রদর্শন শতবার্ষিক উৎসবের অঙ্গস্বরূপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহা আরও চিত্তাকর্ষক ও আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। সারদাপীঠের সমাজ-শিক্ষা-শিক্ষণ বিভাগ (Social Education Organisers' Training Centre) এর অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 'College of Physical Education' এর ভূতপূর্ব প্রধান পরিদর্শক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ রায় যথাক্রমে ছাত্রগণের বিতর্ক-সভা ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা সভার পৌরোহিত্য করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে বিদ্যামন্দির-গৃহ আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়। শেষ দিন বিদ্যামন্দিরে যে বিচিত্রানুষ্ঠান হয়, তাহাতে কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের বহু খ্যাতনামা শিল্পী যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন এবং বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ রবীন্দ্রনাথের দুইটি হাস্যরসাত্মক একাঙ্কিকা অভিনয় করিয়া সকলকে খুব আনন্দ দেয়।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ-পূর্তি—এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে পৃথিবীর নানা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পঁচিশ জন প্রতিনিধি শুভেচ্ছার বাণী বহন করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ২০শে জানুআরি একটি জনসভায় উৎসবের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য শুধু তাহার প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্যের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, আধুনিক ভারতের মানসিক ভিত্তি-গঠনে, সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে ও জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ-সাধনে এই মহৎ প্রতিষ্ঠান এক অসামান্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই উপলক্ষ্যে আশুতোষ-ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের নানা তথ্য ও চিত্র সংগ্রহ এবং শিক্ষা-বিষয়ক পরিসংখ্যান-সম্বলিত প্রাচীর-চিত্র এবং সেনেট ভবনে পুরাতত্ত্বের ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী কয়দিনের জন্য শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের ও ছাত্রবৃন্দের আকর্ষণ-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস—এই বৎসর কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনের অনুষ্ঠান ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি ও সার্থকতার গৌরবপূর্ণ ইতিহাসের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ আকর্ষণ করিয়াছে। বিজ্ঞানকে বর্তমান ভারতের উন্নতির অন্যতম প্রধান সহায়করূপে জাতীয় কর্মোদ্যমে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইতেছে দেখিয়া আমরা ইহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

লণ্ডনে কমনওয়েলথ শিশুশিল্প-প্রদর্শনী—লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনসটিট্যুটে বর্তমানে যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মালয় ও হংকং প্রভৃতি ২০টি বিভিন্ন দেশের শিশুদের অঙ্কিত দুই শতাধিক চিত্র ও ড্রইং প্রভৃতি শিল্প-নিদর্শনের সমাবেশ করা হইয়াছে। শিল্পীদের বয়স ৭ হইতে ১৭-র মধ্যে।

নানাস্থানে জন্মোৎসব—ইম্ফল (মণিপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব-সংবাদ এবং কাটোয়া (বর্ধমান) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা—শিকরা-কুলীন গ্রামে (২৪ পরগনা) গত ১লা ফেব্রুআরি, শ্রীমৎ-স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা-উৎসব সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষ্যে ঐ দিন পূজা, চণ্ডীপাঠ, ভজন এবং ৩রা ফেব্রুআরি একটি ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমহারাজের জীবনী ও বাণী আলোচনা, রামনাম-সংকীর্তন প্রভৃতি হইয়াছিল। বহু সাধু ও ভক্ত সমাগমে ও বিবিধ অনুষ্ঠানে গ্রামখানি আনন্দ-মুখর হইয়া উঠে।

দরিদ্র-বান্ধব-ভাণ্ডারের সেবাকার্য—কলিকাতার ৬৫।২ বি, বিডন স্ট্রীটস্থ দরিদ্র-বান্ধব-ভাণ্ডার একটি জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান। আমরা ইহার ৩৩তম বর্ষের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে দাতব্য চিকিৎসালয়, চেস্ট ক্লিনিক, যক্ষ্মা সেবায়তন, গ্রন্থাগার, দুর্গত-সেবা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কার্যে উন্নতি লক্ষণীয়।

আজমীরে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব—স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে নবনির্মিত বিবেকানন্দ পাঠাগারে স্বামীজীর এক মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পরলোকে ভবতোষ ঘটক—গত ১৫ই জানুআরি মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে ৬৮ বৎসর বয়সে কলিকাতার বিখ্যাত লৌহব্যবসায়ী এবং বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের অন্যতম পরিচালক হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মুঙ্গেরে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভবতোষবাবুর নেতৃত্বে ঘটক প্রপার্টি কম্পানির সত্ত্বাধিকারিগণ বাগবাজার উদ্বোধন লেনে উদ্বোধন অফিসের সংলগ্ন বাড়ীটি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠকে দান করিয়া মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই শোকসন্তপ্ত-পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার—শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য প্রাচীন ভক্ত শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মজুমদার গত পৌষ মাসে ৭৩ বৎসর বয়সে ভুবনেশ্বর-ধামে পরলোক গমন করিয়াছেন। বীরেনবাবু শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী কিন্তু তাঁহার কর্মজীবন শিলঙেই কাটিয়াছিল। ওখান হইতেই তিনি কলিকাতা এবং জয়রামবাটী গিয়া বহুবার শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন। শেষ বয়সে শ্রীভগবানের স্মরণ-মনন লইয়া তিনি রাঁচিতে থাকিতেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যপ্রসঙ্গে সকলকে আনন্দ দিতেন। জগদম্বার প্রিয় সন্তান এই ভক্ত-প্রবরের আত্মা মাতৃ-অঙ্কে পরমা শান্তি লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা।

উদ্বোধন

প্রার্থনা

সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি
সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
ভবে ভবে নাতিভবে
ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ॥

ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং।
ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতি-
র্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিবোম্॥

শাশ্বত পুরাতন হইয়াও যিনি নিত্য নূতন সেই সদ্যোজাতকে আশ্রয় করিতেছি, আমি যেন তাঁহাকে প্রাপ্ত হই। সেই সদ্যোজাত পরমেশ্বরের উদ্দেশে নমস্কার। হে শিব, অজ্ঞান-অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন নানা জন্মের পথে আর আমাকে প্রেরণ করিবেন না; যাহাতে আমি ঐরূপ জন্ম অতিক্রম করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি তজ্জন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করুন। সংসারদুঃখনাশকারী শিবকে আমি বার বার প্রণাম করিতেছি।

যিনি সমস্ত বিদ্যার নিয়ামক, সকল প্রাণীর প্রভু, বিশেষরূপে যিনি বেদের অর্থাৎ জ্ঞানরাশির পরিপালক, সূক্ষ্মজগতের প্রাণস্বরূপ হিরণ্যগর্ভের অধিপতি সেই ব্রহ্মা, সেই প্রবুদ্ধ পরমাত্মা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত শান্তরূপে আবির্ভূত হউন। যেন বুঝিতে পারি—আমি সেই সদাশিব, সদাশিবই আমার স্বরূপ।

কথাপ্রসঙ্গে

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব

সম্প্রতি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শতবার্ষিকী-উৎসবানুষ্ঠান উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে দেশবাসীকে নূতন করিয়া সচেতন করিয়াছে, এবং স্বভাবতই শিক্ষাব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রশ্ন ও সমালোচনা শুরু হইয়াছে। স্বাধিকার লাভের পর ভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছে—তাহা শিক্ষার ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে।

শিক্ষার সমস্যাগুলি নূতনরূপ পরিগ্রহ করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য ও সরকারের দায়িত্ব বাড়িয়াছে। জাতীয়-জীবনের সর্বক্ষেত্রে—কি শাসন-বিভাগে, কি শিল্পে, কি ব্যবসায়ে—সর্বত্র এখন স্বাধীন চিন্তা ও স্বকীয় চেষ্টার প্রয়োজন। কোথা হইতে ইহা আসিবে? অবশ্যই উচ্চ-শিক্ষিত যুবক-দের ভিতর হইতে। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক—সকলের জন্য, এবং উচ্চতম বিশেষ শিক্ষা বা গবেষণা মুষ্টিমেয় প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্য,—অতএব ঐ উভয় স্তর আলোচনার বাহিরে রাখিয়া এখানে মধ্যবর্তী শিক্ষার কথাই আমরা বলিতেছি।

শিক্ষার এই স্তরে সাহিত্য, বিজ্ঞান, যন্ত্র, কৃষি, সব কিছুই অন্তর্গত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সর্ববিধ না হইলেও বহু অভাব দূরীভূত হইতে পারে। ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ, ভারতবাসী আজ নবজীবনসম্পদে ভরিয়া উঠিতেছে। শিক্ষাসহায়ে তাহার জীবনের মান বাড়াইবার—এই তো উপযুক্ত সময়।

জগৎ জুড়িয়া আজ যে সকল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত আসিতেছে, মানব-সমাজ ও মানবমনের মূলগত বিশ্বাস লইয়া যে টান পড়িয়াছে—কোথায় তাহার পরিণতি? যুক্তির পরীক্ষায় পুরাতন ধর্মবিশ্বাস গিয়াছে, প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা যাইতে বসিয়াছে; কিছুদিন আগেও মনে হইত—এগুলি বুঝি হিমালয়েরই মতো অচল! কিন্তু হিমাচলও আজকাল চঞ্চলতার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে।

ভারত আজ জগৎ-প্রশ্নের সম্মুখীন! দিনে দিনে প্রাচীন-নবীন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য, ধর্ম-বিজ্ঞানের সংঘর্ষ বাড়িতেছে—আরো বাড়িবে। শান্তি ও সমাধানের জন্য কোন দিকে তাকাইব?

যাহারা বর্তমানের প্রয়োজনেই আত্মহারা, তাহাদের কি চিন্তা করিবার সময় আছে? যাহারা সুবিধাবাদী তাহারা তো ভাগ্যান্বেষণেই ব্যস্ত। রাজনীতি ও অর্থনীতি, সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টিই করিতে পারে—সমাধান করিতে পারে না; প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিতে পারে—উত্তর দিতে পারে না, বাক্যজালের ও হিসাবের গোলক-ধাঁধায় পথ হারাইয়া—মানব-সমাজকে যুদ্ধ হইতে যুদ্ধান্তরেই লইয়া যাইতে পারে, শান্তি দিতে পারে না।

উত্তরের জন্য, সমাধানের জন্য, শান্তির জন্য মানুষ আজও চাহিয়া আছে—উচ্চস্তরের সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক শিল্পী সাধক ও কবির দিকে—যাঁহারা সভ্যতার স্রষ্টা ধারক ও বাহক, উচ্চশিক্ষার নিভৃত-মন্দিরে যাঁহাদের চিন্তা ও সাধনা নীরবে চলিতে থাকে—সত্য শিব ও সুন্দরকে ঘিরিয়া।

* * *

জীবনের উদ্দেশ্য না জানিলে জীবনের উন্নতি-সাধন কিরূপে সম্ভব? আজকাল অনেক লেখকের একটা 'ফ্যাশন' হইয়াছে—উদ্দেশ্যবিহীন জীবনবাদ প্রচার করা। হয়তো ব্যক্তিগত বিফলতার ভিত্তির উপর যুক্তির বালুকা-সহায়ে নিজ নিজ সৌধ রচনা করিয়া তাঁহারা আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। 'জীবন বড় জটিল, জীবনের মূলরহস্য দুর্জ্ঞেয়, মানুষ বড়

অসহায়—তাহার কোন দায়িত্ব নাই, উদ্দেশ্য নাই; ধর্ম একটা ভাবের নেশা, রাজনীতি একটা জুয়াখেলা। সব কিছু সন্দেহ কর, কিছুই বিশ্বাস করিও না, যতটা পার ভোগ করিয়া যাও।' এই জাতীয় উদ্দেশ্যশূন্য দায়িত্বহীন স্বার্থকেন্দ্রিক মনোভাব বর্তমান মানবকে আচ্ছন্ন করিতেছে ও বহুক্ষেত্রে ইহাই তাহার নানাবিধ অবনতির কারণ। গত দুই মহাযুদ্ধ ভিক্টোরিয়া-যুগের প্রসন্নতা নষ্ট করিয়াছে, মানবের নিরাপত্তা ভাঙিয়া দিয়াছে; উপরি-উক্ত মনোভাব তাহারই অন্যতম বিষময় ফল। এই বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করিবার, প্রতীকার করিবার রসায়ন—নূতনতর চিন্তা, নূতনতর শিক্ষা।

সকল শিক্ষারই উদ্দেশ্য হইল—জগৎ ও জীবনের একটি সমগ্র ও সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্র চোখের সামনে তুলিয়া ধরা। এক বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিতে করিতেই সকল বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে থাকিলে একটি সমন্বয়ের দৃষ্টি খুলিয়া যায়; নতুবা শিক্ষা কতকগুলি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের (information-এর) যোগফলে পরিণত হয় ও মনকে অশান্ত বিভ্রান্ত করে। অন্তরের অন্তরে মানুষ চায় সর্বত্র একটা নিয়ম, শৃঙ্খলা ও শান্তি। জীবনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা নানা কিছু শিখিতে পারি, কিন্তু যাপন করিবার সময় বুঝি জীবন এক ও অখণ্ড। উচ্চশিক্ষা মানবকে সেই জীবনের জন্যই প্রস্তুত করিবে।

উপনিষদে স্বীকৃত হইয়াছে, 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈব অপরা চ'—প্রাচীনকালে আরণ্যক গুরুরা বিশেষ বিশেষ (অপরা) বিদ্যা শিক্ষা দিতেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত শিষ্যের হৃদয়ে জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া দিতেন স্বীয় হৃদয়ের জ্বলন্ত শিখা হইতে। জীবনের স্পর্শেই জীবন জাগিয়া উঠে, শুধু বই পড়িয়া বা কথা শুনিয়া মন ভারাক্রান্তই হয়। বহু বিষয় শিখিয়াও জ্ঞান হইল না, আবার দর্শন বিজ্ঞান কিছু না পড়িয়াও কাহারও চোখে মুখে জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান, চরম জ্ঞান, সকল জ্ঞানের ভিত্তি! এই উচ্চতম জ্ঞানলাভও অবশ্যই শিক্ষার শেষ ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। 'কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?'—এমন কি আছে যাহা জানিলে সব জানা হয়? ইহাও উপনিষদের বাণী, ঋষি-বালকের প্রশ্ন!

জীবনের স্তর-বিভাগ থাকিতে পারে, কিন্তু জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বলা চলে না—এতটা লৌকিক (Secular), বাকীটা আধ্যাত্মিক (Spiritual)। যে জ্ঞানলাভের পথে চলিবে সে কাজ করিবে না, যাহারা আধ্যাত্মিক হইবে তাহারা সামাজিক হইবে না—এ কথাও যেমন সত্য নয়, তেমনি ইহার বিপরীতও সত্য নয়। শিক্ষার যুগ্ম উদ্দেশ্য সত্যানুভূতি ও জীবনগঠন। লৌকিক স্তরে ইহারই প্রতিরূপ—নূতন নূতন প্রাকৃতিক সত্য আবিষ্কার ও জীবিকার উপযোগী করিয়া নিজেকে গড়িয়া তোলা। কোনটিকেই আমরা অবহেলা করিতে পারি না। জীবনেরই প্রয়োজনে, যুগের তাগিদে, মনুষ্যত্বের দাবিতে আজ শিক্ষার্থীদের একান্ত প্রয়োজন—পল্লবগ্রাহিতা বর্জন করিয়া উৎকর্ষ অর্জন, নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীরও উন্নতি-সাধন; এবং প্রতিবেশীর পরিধি আজ ক্রমবর্ধমান।

সমাজ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সংসার কল্যাণে বিধৃত—এ কথা মুখে উচ্চারিত হইলেও ব্যবহারে অন্তর্হিত। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শক্তি বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া স্ব স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া একদিন সমাজসেবা করিত; আজ তাহার অভাবে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থনৈতিক জীবন ও দলীয় স্বার্থ রাষ্ট্রজীবন চালিত করিতেছে। জাতীয় উন্নতির জন্য, যথার্থ কল্যাণের জন্য—কি চিন্তার জগতে কি রাষ্ট্রপরিচালনায়, কি ব্যবসাবাণিজ্যে আজ একান্ত প্রয়োজন নূতন নেতৃত্ব, যাহা ভারত-প্রতিভার অনুসরণে, ত্যাগ ও সেবার প্রাচীন ভিত্তির উপর আধুনিক উপকরণে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ গড়িয়া

তুলিবে। সেই আয়ত আদর্শও এই উচ্চ-শিক্ষার অঙ্গীভূত। এক জাতীয় খাদ্য শরীরকে রোগগ্রস্ত করে, এক-বিষয়ক শিক্ষাও মনকে ভারাক্রান্ত করে। স্বাস্থ্যের জন্য যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য (balanced diet) প্রয়োজন, তেমনি সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সর্বাবয়ব বিদ্যাও বর্তমানের অন্যতম প্রয়োজন।

শুধু খাপছাড়া শিক্ষা, প্রতিযোগিতা ও বিশেষ অভিজ্ঞতা দ্বারা দুই চার জনের মানসিক ও আর্থিক উন্নতি হইতে পারে ; কিন্তু সমষ্টি-উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন—সর্বাঙ্গসুন্দর প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে সহযোগিতা ও জীবিকা-উপযোগী বিষয়ে উৎকর্ষ সাধন। আয়তভিত্তির উপরেই গগন-স্পর্শী চূড়া নির্মিত হইতে পারে। গবেষণা, আবিষ্কার ও বিশেষত্ব-অর্জনের বিভাগগুলি উচ্চতম স্তরে আবদ্ধ থাকিতে পারে—উপযুক্ত ছাত্রদের জন্য। গবেষণার কৃতিত্বে ও যশঃসৌরভে চারিদিক আমোদিত হয় বটে, কিন্তু সাধারণ শিক্ষা দ্বারা সমগ্রজাতির প্রাণশক্তির জাগরণ না হইলে জাতির উন্নতি হইল না। শরীরের একটি অঙ্গ—যথা মস্তিস্ক—পুষ্ট হইলেই তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। রক্তাল্পতা ও রক্তদুষ্টি দূরীভূত হইয়া সারা শরীরে সতেজ রক্ত সঞ্চালিত না হওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্যের উন্নতি অসম্ভব। ব্যাপক নিরাশা ও দুর্দশার কারণগুলি দূরীভূত না করা পর্যন্ত দেশ কখনও উন্নতির পথে নিশ্চিত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

প্রাথমিক ও উচ্চতম শিক্ষার মধ্যস্তরেই আমরা উচ্চ শিক্ষার বিকাশ দেখিতে চাই—যাহা দ্বারা জাতির জীবন ও কৃষ্টির মান ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিবে। প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষার্থীর চোখে জীবনের এমন একটি ছবি ফুটিয়া উঠিবে যে, সে বুঝিবে ছাত্রজীবন কখনও শেষ হয় না, সারাজীবনই শেখা চলিবে—সঙ্গে সঙ্গে শেখানোও চলিবে, আদান-প্রদানের প্রবাহ ব্যতীত জীবন-ধারা পঙ্কিল পল্বলে পরিণত হয়। মনের প্রসারই জীবনের প্রসার, হৃদয়ের উদারতাই জ্ঞানলাভের চরম ফল। যথার্থ শিক্ষা মানুষকে দেয় ভয়শূন্য পৌরুষ ও আত্মনির্ভরতা এবং অপরের সহিত তাহার ব্যবহারে ফুটিয়া উঠে সহানুভূতি ও সেবার প্রবৃত্তি।

ইহা সর্বজন-সুবিদিত যে, ভারতবর্ষে এখনও যে শিক্ষাপদ্ধতি চলিতেছে তাহা মেকলের প্রবর্তিত পন্থারই অনুসরণ। শাসন-কার্য পরিচালনার জন্য, ভারতকে পরাধীন রাখিবার জন্য বিদেশী শাসকদের ইহা প্রয়োজনীয় ছিল; কিন্তু এখন ভারতের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য, নূতন জাতি সংগঠনের জন্য নূতনতর শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় আসিয়াছে। শিক্ষা শুধু নাগরিকতা-অভ্যাস বা নানা চিন্তার চর্বিত-চর্বণ নয়। প্রকৃত শিক্ষা জীবনাবেগকে সত্য ও সুনীতির পথে চালিত করে, শিক্ষার্থীকে জ্ঞান ও সেবায় উৎসাহিত করে।

* * *

স্বদেশের উন্নতিচিকীর্ষু মনীষী বয়োজ্যেষ্ঠেরা শিক্ষাব্যাপারে খুবই চিন্তামগ্ন; বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন-ভাষণে তাঁহাদের অনেকেই নানাবিষয়ে আলোকপাত করেন, বিশেষত বর্তমানে উচ্চশিক্ষার মানের অবনতির যে সকল কারণ তাঁহারা নির্দেশ করিয়াছেন—সেগুলি প্রণিধানযোগ্য। ছাত্র এবং শিক্ষকের ব্যক্তিগত যোগাযোগের অভাব, ছাত্রদের অসংযত আচরণ এবং শিক্ষকের বৃত্তি ও বেতন সম্মানজনক না হওয়াই তাঁহাদের মতে শিক্ষার মান অবনতির বিশেষ কারণ। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যতীত কৃষ্টির ও আদর্শের আদান-প্রদান সম্ভব নয়। এতদুদ্দেশ্যে নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রয়োজন, পুরাতনগুলি বিদ্যার দোকানে পর্যবসিত হইতেছে। শিক্ষকের বৃত্তি সম্মানজনক করিতে হইলে সমাজে সসম্মানে তাঁহার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে ; নতুবা উপযুক্ত যুবকেরা কেহ এ পথে আকৃষ্ট হইবে না। নানাবিধ অভাব ও অভিযোগের দরুণ জনসাধারণের বিক্ষোভ ও

উচ্ছৃঙ্খলতাব অবশ্যই ছাত্র-সমাজে প্রতিফলিত হইবে; আবার ইহাও সত্য যে সুশৃঙ্খল যুবশক্তি ছাড়া জাতির উন্নতি অসম্ভব। যুবকেরই স্বপ্নদৃষ্টি ও আদর্শনিষ্ঠা দেশকে আগাইয়া লইয়া চলে। এই প্রচণ্ড যুব-শক্তিকে সংযত ও সংহত করিবার উপায় সমষ্টি-কল্যাণের ভিত্তিতে শারীর শিক্ষার সহিত সামরিক শিক্ষা। ইহাতে তাহাদের বজ্রদৃঢ় শরীরের ভিতর সুসংযত মন বাস করিবে; তবেই সম্ভব ব্রহ্মতেজের সহিত ক্ষাত্রবীর্যের মিলন।

গত দুই মহাযুদ্ধ জগৎ জুড়িয়া শিক্ষার মান ও জীবনের মান যথেষ্ট অবনত করিয়াছে—তথাপি দেখা যায় পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি পূর্ব মান ফিরিয়া পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে; তা ছাড়া দেখা যায় শিক্ষার ব্যাপারকে তাহারা বেশি ব্যাহত হইতে দেয় নাই। তাহারা মনে করে শিক্ষার ব্যাপারে খরচ খরচই নয়, উহা তো মূলধনকে খাটানো—অধিকতর লাভের আশায়। আমাদের দেশে শিক্ষা ও শিক্ষকের জন্য—কি সরকারের, কি জনসাধারণের মুক্তহস্তে ও মুক্তমনে খরচ করা উচিত। কারণ শিক্ষাই গণতন্ত্রকে নিরাপদ করে, স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। এখন প্রশ্ন, ব্যয় হইবে কোন্ শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে? প্রচলিত পদ্ধতির সময়োপযোগী পরিবর্তন করিতে হইলেও অনেকখানি চিন্তা ও পরিকল্পনা প্রয়োজন, নতুবা বহু জীবনের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। তাই সর্বক্ষেত্রেই নেতাদের আজ যথেষ্ট বিশ্লেষণী শক্তি, ঐতিহাসিক চেতনা ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি প্রয়োজন। তার জন্যও চাই নূতনতর অনুভূতি।

যা কিছু পুরাতন তাই চিরন্তন, যেহেতু চিরাচরিত অতএব ভাল—এই মনোভাব অগ্রগতির অন্তরায়। অতীতের স্মৃতি যেন একটা পাহাড়ের মত সামনের পথ রুখিয়া না দাঁড়ায়। জীবনের পথে যদি গতিশীল থাকিতে হয় তবে একদিকে যেমন পুরাতনের মুগ্ধপূজা ছাড়িতে হইবে—আবার অন্যদিকে যা কিছু নূতন—তাহাই ভাল, এরূপ ভাবিলেও চলিবে না। পুরাতনের মধ্যে যা কিছু কল্যাণকর তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিয়া নূতনের ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে। উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে পুরাতন ও নূতনের ঢেউএর দোলায় দুলিতে দুলিতে তরুণচিত্ত আগাইয়া চলিবে।

কিরূপ সমাজ-ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা দিতেছি—শিক্ষাপদ্ধতি-রচয়িতাদের এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। জাপান ও জার্মানি তাহাদের অবস্থা বুঝিয়া সামরিক শিক্ষার উপর জোর দিয়াছিল। রাশিয়া ও চীন তাহাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যাপক শিল্পায়নের পথে লইয়া চলিয়াছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা জানে তাহাদের বর্তমান অবস্থা, সেই অনুযায়ী তাহারাও চলিয়াছে শিল্পের পথে, কৃষ্টিকে ব্যাহত না করিয়া। আমাদেরও আজ বুঝিতে হইবে—কি আমাদের প্রয়োজন? কোথায় আমরা চলিয়াছি—কোন্ লক্ষ্যে? এই লক্ষ্য সম্বন্ধে যদি আমরা একটা সিদ্ধান্তে না আসিতে পারি তো আমরা কোন না কোন একটা ভাবের স্রোতে ভাসিয়া যাইব। দুইটি বিপরীত ভাবের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া হালছাড়া তরণী শেষে না বিপন্ন হয়! ভারতের শিক্ষাদর্শ কাহারও অন্ধ অনুকরণ না হইয়া তাহার জাতীয় প্রতিভার অনুসরণেই রচিত হওয়া উচিত।

ভারতের গঠনতন্ত্রে অবশ্য সমাজ-দর্শনের একটি ধারা নির্ণীত হইয়াছে—যদ্দ্বারা তাহার শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। সেখানে স্বীকৃত হইয়াছে:

—সকল অধিবাসীর জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ন্যায়বিচার,

—সকলের চিন্তা ভাষা বিশ্বাস ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা,

—সকলের সমান সম্মান ও সমান সুযোগ,

—সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বিস্তার, প্রত্যেকের মর্যাদা ও জাতির একত্ব।

অতএব আমরা উক্তভাবগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য

শিক্ষাপদ্ধতি রচনা করিতে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা বিস্তার করিতে প্রতিশ্রুত।

শরীর, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সামঞ্জস্য-পূর্ণ বিকাশের নিমিত্ত ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্যক্তিকে ছাড়িয়া সমাজ নয়, আবার সমাজকে ছাড়িয়া ব্যক্তি নয়। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ব্যক্তিগত দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য অশিক্ষা দূর করিতেই হইবে। অসাম্য থাকিলে অন্যায় অবশ্যম্ভাবী। মানুষের মধ্যে পরস্পর প্রীতির সম্বন্ধ, পাঁচজনে একযোগে কাজ করিবার ক্ষমতা, মতবিরোধ জয় করিবার শক্তি, এ সমস্তই অনুশীলন করিতে হইবে। উপযুক্ত নেতৃত্বে ও জ্ঞানসমৃদ্ধ পদ্ধতিতেই ইহা সম্ভব। এ সকলই আজ শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি হইতে একদিক দিয়া যেমন বিভিন্ন-বিজ্ঞানবিদ্, নানাবিধ শিল্পী, সর্বসমাদৃত সাহিত্যিক বাহির হইবে—অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজের নেতা এবং অভিজ্ঞ শাসনকুশলী বাহির হইবে। আবার জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী পথ ধরিয়া শাসকমণ্ডলী কখনও ভুল করিলে ভুল ধরাইয়া দিবার জন্য যে নিরাসক্ত মুক্তমনের প্রয়োজন—তাহাও আসিবে এই সকল আলোক-কেন্দ্র হইতেই। দলীয় স্বার্থের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন সমুদ্রে সেই আলোই পথ দেখাইয়া জাতীয়-তরণীকে নিরাপদ পোতাশ্রয়ে টানিয়া আনিবে। তার জন্য যে চিন্তা ও ভাষার স্বাধীনতা প্রয়োজন তাহাও শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়া আর কোথায় অনুশীলিত হইতে পারে? বিদ্যালয়গুলি মিস্ত্রি ও কেরানির কারখানা না হইয়া হইবে অফুরন্ত বিদ্যুৎ শক্তির ডায়নামো।

* * *

শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারই আজ সকলের প্রথম ও প্রধান দাবি! পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের দুঃখদুর্দশায় মর্মাহত হইয়া এবং পাশ্চাত্ত্যদেশে শিক্ষার অপূর্ব বিকাশ দেখিয়া বজ্রনির্ঘোষে বারংবার বলিয়া গিয়াছেন, 'শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা—শিক্ষাই সেই সর্ব-রোগহর মহৌষধি—যাহা দ্বারা মৃতকল্প ভারত সঞ্জীবিত হইবে!' শিক্ষার যাদুস্পর্শেই ভারতের অভাব দূরীভূত হইতে পারে—অন্নাভাব বস্ত্রাভাব ভিক্ষার দ্বারা মেটানো অসম্ভব, স্বাস্থ্যাভাবও বিদেশী ঔষধ-পথ্য দ্বারা মিটিবে না—কিন্তু শিক্ষাই মানুষকে আত্মসম্মানসম্পন্ন করে, স্বাবলম্বী করে—যাহা দ্বারা সকল অভাব দূরীভূত হয়।

সকলেই ভাবিয়াছিল, বয়স্ক ভোটাধিকারের পূর্বেই সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে; কিন্তু তাহা এখনও সম্ভব হয় নাই। ইহার জন্য এখনও আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে! বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-জনিত দুঃখ যেমন আমরা যুদ্ধকালীন উদ্যোগের সাহায্যে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করি, দেশব্যাপী অশিক্ষা ও অজ্ঞান-জনিত দুঃখ ও অভাব দূর করিবার জন্য কবে আমরা অনুরূপ উদ্যম করিব?

দেশের আনাচে কানাচে নূতন শিক্ষার বন্যায় কুসংস্কারের পচা ডোবা ভাসিয়া গেলে দেশ একদিনে নূতনরূপ ধারণ করিবে—জনসাধারণ বুঝিবে তাহাদের দাবি-দাওয়া ও দায়িত্ব। তখনই স্বাধীনতা-সূর্যের আলোক ও উত্তাপ কুটিরে কুটিরে অনুভূত হইবে। শিক্ষাবিষয়ে সাম্য অবশ্য স্বীকার্য, তথাপি একথাও অতি স্পষ্ট, যাহারা পুরুষানুক্রমে নিরক্ষর তাহাদের দাবিই সর্বাগ্রে! উচ্চশিক্ষিতেরা এতদিন তাহাদের বঞ্চিত করিয়া আভিজাত্য অর্জন করিয়াছে। আজ ঋণ-পরিশোধের সময় উপস্থিত। স্বেচ্ছায় সেবার ভাবে প্রাপ্যটুকু মিটাইয়া দিলে সমাজের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্তরের মধ্যে প্রীতির একটি সংযোগসেতু রচিত হইয়া সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। নতুবা উচ্চবর্ণদের শূদ্রে বিলীন হইতে হইবে—ইহাই সেই যুগপ্রবর্তকের ভবিষ্যদ্বাণী। ভারতের শান্তিপূর্ণ উপায়ে উন্নতি নির্ভর করিতেছে শিক্ষার এই আদান-প্রদানের উপর। বায়ুমণ্ডলে চাপের তারতম্য

হইলে যেমন ঝড় অবশ্যম্ভাবী, সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে ও ধনবিভাগে সাম্য রক্ষিত না হইলে উপরিস্তর নীচে নামিবে এবং নিম্নস্তর উপরে উঠিবে, সমাজ-বিপ্লবের পথে।

ইতিহাসের মোড় ফিরিতেছে—বর্তমান যুগের ছাত্রেরা ভাগ্যবান্। আজ কোটি কোটি লোকের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্য শত শত উপযুক্ত উৎকৃষ্ট কর্মী চাই, সহস্র বৎসরের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক চাই। উচ্চ শিক্ষিত যুবকেরা বুঝিয়াছে শিক্ষার কি শক্তি—তাহারা কবে ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে ছড়াইয়া পড়িবে? শিক্ষার আলো, স্বাস্থ্যের উত্তাপ বিকীরণ করিবে? এবং নূতন শক্তিশালী ভারত গড়িয়া তুলিবে? সমস্যা অনেক, বাধাও প্রচুর। জাতিগঠনের কাজে দলাদলি ছাড়িয়া সহযোগিতার পথে শান্ত ও সহিষ্ণুভাবে অগ্রসর হইলে নিশ্চয় এই তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতি শীঘ্রই জাগিয়া উঠিবে,—বুঝিবে কি তাহার কৃষ্টি, কি তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য, বুঝিবে—বিশ্বের দরবারে কি তাহার করণীয়।

পল্লীভারত যুবশক্তিকে আহ্বান করিতেছে—সাদরে আহ্বান করিতেছে—সংগ্রামে আহ্বান করিতেছে! পল্লীজননী তাঁহার শ্যামল কোমল কোলে তাঁহার সন্তানকে ফিরিয়া চাহিতেছেন; দুঃখ দারিদ্র্য রোগ অশিক্ষার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য—স্বীয় সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। সে কি সাড়া দিবে না? সে কি আজও মাতিয়া থাকিবে—শহরের স্বার্থ-প্রতিযোগিতায়? সে কি সেখানেই তাহার সারা জীবন ও সর্বশক্তি নিয়োজিত করিবে? কবে সে ফুটাইয়া তুলিবে মনোময় ভারত? দিকে দিকে ফুটিয়া উঠিবে সুশ্রী ছবির মত শান্ত তপোবন—শিক্ষায় স্বাস্থ্যে সুন্দর, কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ। এ সকলের জন্য আজ শিক্ষাভিমানী যুবকদের হইতে হইবে ত্যাগী কর্মানুরাগী, নিরলস স্বার্থশূন্য ও সংঘবদ্ধ! অন্ধকার নিরাশার মাঝে তাহারাই বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে আশার আলো।

কেহ আমাদের শত্রুও নয় বা বন্ধুও নয়—আলস্য আত্মপ্রসাদই আমাদের শত্রু, আত্মনির্ভর কর্মশক্তিই আমাদের বন্ধু। আমরা নিজেরা না করিলে অপর কেহ আসিয়া রাতারাতি আমাদের উন্নত করিয়া দিবে না। অশিক্ষিত অর্ধভুক্ত জনসাধারণ কখনও মহাজাতিতে পরিণত হয় না; রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনে নাই। শিক্ষা-সহায়ে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া—আমাদেরই আমাদের অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্যশিল্প প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। যে চেতনার অভাবে একটা জাতি পরাধীন হয়, অবনত হয়—শিক্ষাসহায়ে সেই অভাব দূর করিতে না পারিলে, জাতি বারংবার কোন না কোন প্রকার স্বৈরাচারের পদানত হইবে।

* * *

ব্যক্তিগত, জাতিগত উন্নতি ছাড়া উচ্চশিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য আছে সেটি প্রায়ই সর্বত্র উপেক্ষিত; সেটি বিশ্বগত, মানবতাবোধের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত। সমাজদর্শনে যে ভ্রাতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহারও তিনটি স্তর—প্রথম ব্যক্তিগত বা পারিবারিক, দ্বিতীয় ভাষা বা কৃষ্টিগত, দেশগত বা জাতীয়—অতঃপর আন্তর্জাতিক বা বিশ্বমানবিক। এই বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রত করাও উচ্চশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতি ধর্ম জীবিকা বৃত্তি—সব কিছুর উর্ধ্বে, সব কিছুর মূলে, মনে রাখিতে হইবে—'আমরা মানুষ'। এই বোধই সমগ্র মানবজাতিকে এক পরিবারে পরিণত করিতে পারে।

রাজনীতিক্ষেত্রে কখনও বিশ্বশান্তি স্থাপিত হইবে না, কৃষ্টির ক্ষেত্রেই ইহা সম্ভব। 'বিশ্বশান্তির জন্য যুদ্ধ' নিত্যনিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছে—কৃষ্টিকেন্দ্রে, স্কুলে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষাভাষীর পরস্পরকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টার মধ্যেই উহার বীজ নিহিত। ব্যক্তিগত জাতিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করিয়াও অপরকে গ্রহণ করা সম্ভব—বর্তমান যুগে এই উদারভাব

হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এই ভাবের অভাবেই সকল ভাবসংঘর্ষ ; এই ভাবের প্রতিষ্ঠাতেই শান্তি।

মানব-জীবন ও ব্যক্তির মূল্য স্বীকার করাই ঐ ভাবের ভিত্তি। যাহা কিছু ইহাকে খর্ব করে তাহাই বর্জন করিতে হইবে। জীবনের বিভিন্ন দিক যেখানে অবহেলিত, কৃষ্টির বিভিন্ন বিকাশ যেখানে অসম্মানিত, সমষ্টির নামে ব্যষ্টি যেখানে উপেক্ষিত উৎপীড়িত, ক্ষুদ্র যেখানে বৃহৎযন্ত্রের অংশমাত্রে পরিণত, এরূপ ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাদর্শের বহির্ভূত।

মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেকটি জীবন এক একটি নূতন অভিযান। এই জীবন ও ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করিতে শেখামাত্র বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তরুণ মনের তাল মিলাইয়া দেওয়া—উন্নততর জীবনের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করাই উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য—মাত্র বুদ্ধির বিকাশ নয়, শুধু জীবিকার উপায়ও নয়, অন্তর্নিহিত শক্তি কল্পনা ও ভাবাবেগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া যথার্থ পথে চালিত করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য ;—হৃদয়ের বিকাশেই, সহানুভূতিতেই এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবায় উহার চরম সার্থকতা!

'Love thy neighbour as thy self'—'প্রতিবেশীকে ভালবাসো—নিজের মত করিয়া'—কথাটি কত ছোট—অথচ কত বড়! শিক্ষার সকল আদর্শ ও উদ্দেশ্য এই মহাবাক্যে নিহিত রহিয়াছে। পাশের মানুষটিকে ভালবাসার মধ্যে যে সত্য, যে কল্যাণ নিহিত—তাহারই ব্যাপক প্রয়োগে বিশ্বশান্তি—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এতদিনেও ইহা সম্ভব হইল না কেন? এবং কখনও যে সম্ভব হইবে বলিয়াও ত মনে হয় না। তবু বলিতে হয়, শিক্ষার ভিতর দিয়াই ঐ অসম্ভবের সাধনা!

শিক্ষার সফলতা নির্ভর করিতেছে শিক্ষকের উপর। শিক্ষক মানবজাতির নীরব সেবক, ইতিহাসের অদৃশ্য অভিনেতা। শিক্ষকের আদর্শে ও সাহচর্যে শিক্ষা জীবনের পরতে পরতে মিশিয়া যাইবে। শিক্ষা কেনাবেচা না হইয়া হইবে অন্তরের আদান-প্রদান। শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইবে সেই দিন—যে দিন শিক্ষার্থী একটি পরিপূর্ণ 'মানুষ' রূপে বিকশিত হইয়া উঠিবে। পুরাকালে ছাত্র-জীবনের আরম্ভে ও শেষে যে উপনয়ন ও সমাবর্তন-প্রথা ছিল—সেখানে ছাত্রদের জীবনের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হইত। বর্তমান কালের উপযোগী করিয়া তাহার পুনঃপ্রবর্তন করিলে ছাত্র জীবনের প্রারম্ভেই শিক্ষার্থী বুঝিবে—কি তাহার উদ্দেশ্য, আর শেষে বুঝিবে—কি তাহার দায়িত্ব। জীবন ও জগতের প্রকৃত রূপ তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিবে—শান্ত সমাহিত মনে সে সংসারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, সমাজের সেবা করিতে। উপযুক্ত শিক্ষক ও গুরুর আদর্শেই সে ধীরে অথচ ধ্রুবগতিতে জীবনের পথে আগাইয়া চলিবে। ঊর্ধ্বমুখী শিক্ষার অনির্বাণ অগ্নিশিখা জ্বলিতে থাকিবে।

তাহাদের ঘরে আলো নাই, শিক্ষা নাই। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কে তাহাদের ঘরে আলোক ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে?

—বিবেকানন্দ

শরণাগতি*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

'বেড়াল-ছানা হবি, বানর-ছানা হবি না।' বানর-ছানা মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে, এ গাছ থেকে ও গাছে লাফিয়ে যাবার সময় তার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মাকে ধরে থাকলেও তার পতনের সম্ভাবনা বেশি। তাই ঠাকুর বলতেন 'বানর-ছানা হবি না, বেড়াল-ছানা হবি—মা যেখানে রাখেন, হেঁসেলে বা আঁস্তাকুড়ে, কিংবা বিছানায় যে অবস্থায় মা তাকে রাখেন, বেড়াল-ছানা সেই অবস্থাতেই খুশী থাকে। সে মাকে ডাকে মিউ মিউ করে। মায়ের ওপর তার পূর্ণ নির্ভরতা, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভরতা বোঝাবার জন্য ঠাকুর এই উদাহরণটি দিতেন। এটি সকল শাস্ত্র ও সাধনার শেষ কথা : ভগবানে আত্মসমর্পণ। কি নির্ভরতা! বেড়াল-ছানার কোন অভিযোগ নেই, সে শুধু মাকে ডাকে। সংসারে আমাদের থাকতে হবে এই বেড়াল-ছানার মত, ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। পূর্ণ শরণাগতি চাই।

এই নির্ভরতা আসে তাঁকে ভালবাসলে। পাঁচ বছরের ছেলে, সে জানে একমাত্র মাকে। সে মায়ের ওপর পূর্ণ নির্ভর করে চলে। খিদে পেলে মাকে জড়িয়ে ধরে, ভয় পেলেও মা-ই তার আশ্রয়। মা বই সে আর কিছু জানে না। মায়ের ওপরই তার সব নির্ভর। এটি আমাদের বুঝতে হবে, এতেই আসবে শান্তি। বালক যেমন মার ওপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে সেই রকমটি হতে হবে।

ভগবানকে এইভাবে সব সমর্পণ করলে, তিনিও আমাদের খাওয়া-পরার সব ভার নেন। গীতায় ভগবান একে অনন্যা ভক্তি বলেছেন। সংসারে শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে হলে এই ভক্তি চাই। মায়ের ওপরেই সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥'

যার মন তাঁতে সমাহিত, তার সব দায় সব ভার তিনি মাথায় করে বয়ে পৌঁছে দেন, লোক মারফৎ পাঠিয়ে দেন না। তাঁতে সব সমর্পণ করলে কত বড় দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। আর আমরা বেশী বুদ্ধিমানের মতো নিজের বুদ্ধি খরচ করে ভগবানের ওপর ভরসা না করে নিজের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে চলি আর প্রতি পদে আঘাত পাই।

'যোগ' শব্দের অর্থ—না পাওয়া জিনিস পাওয়া, আর 'ক্ষেম' শব্দের অর্থ—পাওয়া জিনিস রক্ষা করা। ভক্ত ভগবানের এই যে সম্বন্ধ এটি বড় অদ্ভুত, সব ভার তিনি নেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কাশীর এক পণ্ডিত অর্জুন মিশ্র শাস্ত্রজ্ঞ, নিত্য ভোর-রাত্রে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান সেরে পূজা করে গীতা পাঠ করতেন। গীতা পড়বার সময় উক্ত শ্লোকটি তাঁকে নিত্য ব্যাকুল করত। তাঁর মনে সংশয় এলো, ভগবান মাথায় করে সব ভার বয়ে দেন, কি আশ্চর্য! সংশয়াকুল মনে শেষে তিনি স্থির করলেন, ভগবান বয়ে দেবেন কি? তিনি দান করেন। এটা 'দদাম্যহম্' হবে, 'বহাম্যহম্' নয়। এই ভেবে শ্লোকের ঐ জায়গাটি লাল কালি দিয়ে কেটে 'দদাম্যহম্' লিখে দিলেন। তার পর তিনি দ্বিপ্রহরের স্নানে গেলেন। তাঁদের সাংসারিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না, তাঁর গৃহিণী স্নানাহ্নিক শেষ করে মহা চিন্তায় পড়েছেন, কি রান্না হবে আজ!

* আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পূজ্যপাদ মহারাজের ১৮.১১.৪৬ তারিখের একটি ধর্মপ্রসঙ্গ।

ঘরে তো কিছুই নেই, স্বামী ফিরে এলে তাঁকে কি খাওয়াবেন। শেষে চিন্তার কোন কূল না পেয়ে, 'ভগবান যা করেন',—ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ কে যেন তাঁদের দরজায় ঘা দিল। তিনি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে দেখলেন, দুটি অপূর্ব সুন্দর বালক, পরনে তাদের সুন্দর ধুতি, মাথায় করে তারা দু'ঝুড়ি ভরতি নানান রকম তরকারি, ফলমূল এনে ডাকাডাকি করছে। আর অদ্ভুত ব্যাপার তাদের দুজনের বুক রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত, দর দর ধারে দুজনেরই বুক বেয়ে রক্ত ঝরছে। তিনি আকুল হয়ে তাদের এই রক্তপাতের কারণ জানতে চাইলেন, আর জিজ্ঞেস করলেন, এই তরিতরকারিই বা কে দিল? তারা কিন্তু কোন কথার বিশেষ উত্তর না দিয়ে, ঘরের মধ্যে ঝুড়ি নামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। মহিলা ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। তবু বার বার ছেলে দুটির বুকের সেই রক্তের কথা তার মনে উঠে তাকে আকুল করে তুলতে লাগল। ক্রমে যখন তাঁর স্বামী ঘরে ফিরে এলেন, তখন তিনি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বলে ছেলে দুটির বুকে ছুরিকাঘাত জনিত সেই রক্তপাতের কথাও বললেন। স্বামী ভক্ত, তিনি শুনেই সব বুঝতে পারলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, মহাভাগ্যবতী তুমি, ভগবান বালকবেশে এসে তোমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার সংশয় সন্দেহ মিটাবার জন্য, তিনি মাথায় করে আমার বোঝা বয়ে দিয়ে গেলেন। আমার কলমের লাল কালির আঁচড় রক্তের স্বাক্ষর হিসাবে তিনি বুক পেতে নিয়েছেন। আজ সব সন্দেহের আমার অবসান হ'ল— 'দদাম্যহম্' নয় 'বহাম্যহম্'ই ঠিক।

সত্যই—শরণাগতের তিনি অনন্যশরণ, অভয় আশ্রয়। ঠাকুরও তাই বলেছেন, 'বেড়াল-ছানা হও।' তিনি সব ভার মাকে দিয়েছিলেন। মা-ও তাই সব যোগালেন তার জন্য। তাঁর পঞ্চবটী ঘেরবার কঞ্চি, দড়ি মায় পেরেকটি পর্যন্ত তিনি যুগিয়েছিলেন। তাঁর অবর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য মথুরবাবু একবার তাঁকে ষাট হাজার টাকার জমিদারী লিখে দিতে চেয়েছিলেন। তাতে ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমার মা, আবার আমার জমিদারী, কটা জিনিস আমার হবে। মা থাকলে সব হবে। ও সব চাই না!' শরণাগতি—ভগবানে পূর্ণ নির্ভরতা—আত্ম-সমর্পণ—এই হচ্ছে অনন্যচিন্তা।

'সংসারে থাকবি, ঝড়ের এঁটো পাত হয়ে'— হাওয়া যেদিকে নিয়ে যায় তাকে, সে আঁস্তাকুড়ও হতে পারে কিংবা বড় লোকের দালানেও হতে পারে, যে দিকে হাওয়ার খুশি সেই দিকেই সে নিয়ে যাবে পাতাকে। পাতার কোন নিজস্ব সত্তা নেই, সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে সে। সাধনার শেষে আসে এই অবস্থা। সম্পদ ঐশ্বর্যের মধ্যে যে ভালবাসা, তার শেষ নেই; আরো চাই, আরো দাও এই ভাবে চাওয়া ক্রমশঃ বেড়েই চলে। এতে শান্তি মেলে না। এই ঐশ্বর্য সম্পদ ডেকে আনে অশান্তি আর দুশ্চিন্তা। এর থেকে মুক্তি পেলে তবে আসে শান্তি। ঠাকুর চিলের উদাহরণ দিতেন, মাছটি ফেলে দিলে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারবে। বাসনা ত্যাগ করলে তবে শান্তি। নইলে টাকা, গয়না, অসুখবিসুখের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে। আসল জিনিস সত্য ধর্ম ভগবান। সব ছেড়ে যদি তাঁর ওপর টান হয়, ভালবাসা হয়, তবে তো সব চেয়ে সুন্দর। তার দিকে তুমি যদি এক পা এগিয়ে যাও, তিনি তোমার দিকে একশো পা এগিয়ে আসবেন।

এই সমস্ত বিষয়-বাসনা নিয়ে মনের স্বাভাবিক চঞ্চলতা আরও বেড়ে যায়। এর মধ্যেও শান্তির পথ আছে; কিন্তু আমরা সে পথে যাই না। এই দেহসুখের আসক্তিতেই আমরা নোঙর ফেলে আছি। চারটি মাতাল মদ খেয়ে একবার নৌকা

বিহার করবে ঠিক করলে। নদীতে গিয়ে একটি নৌকা নিয়ে চারজন তাতে উঠে বসলো—একজন গেল হালে, আর তিনজন ধরলো দাঁড়। ভাবছে বেশ নৌকা চলছে, সারা রাত ধরে তারা দাঁড় টেনেছে। ভোর যখন হ'ল, তাদের নেশাও তখন একটু ফিকে হয়ে এসেছে। হঠাৎ তাদের হুঁশ হ'ল যে সারা রাত তারা একই জায়গায় রয়েছে। কি ব্যাপার, না দেখলে নোঙর তোলা হয় নি। সারা রাত তারা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড় বেয়েছে। এই আসক্তি নোঙর, ঐটি না তুলতে পারলে কিছুই হবে না, সব পরিশ্রমই ব্যর্থ। যত সাধন-ভজন জপ-তপ করো না কেন, আসক্তি থাকলে কিছু হবে না। আসক্তি-নোঙর আগে তুলে ফেলো।

ঠাকুর এক চাষীর গল্প বলতেন। সে সারাদিন পরিশ্রম করে নালা কেটে ক্ষেতে জল সেচেছিল। কিন্তু সারাদিন পরিশ্রমের পর সে অবাক হয়ে দেখলে তার ক্ষেত যেমন শুকনো ছিল তেমনিই রয়ে গিয়েছে। অনেক খোঁজাখুজির পর সে দেখতে পেল নালার মুখে ইঁদুরের কতকগুলি গর্ত। সমস্ত জল ঐ গর্ত দিয়ে মাটির নীচে অন্যদিকে চলে গিয়েছে। সাধকেরও ঐ রকম কামনা-বাসনার গর্তে সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়।

আত্মসমর্পণ আপনা থেকে আসে না। মন চঞ্চল, তাকে স্থির করতে হবে। অর্জুন পর্যন্ত বলেছেন, বায়ুকে যেমন নিগ্রহ করা যায় না, মনকেও তেমনি বাঁধা যায় না। এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মনকে বশে আনবে, কি করে শোন: "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়, বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" অনাসক্তভাবে অভ্যাস করলে সব সম্ভব হয়।

চাই সাধন। সব কিছু হয় এই সাধন থেকে। কিন্তু সেই সাধন সম্ভব হয় আবার কৃপা থেকে। কৃপা পেতে হলে কিছু করতে হয়। কৃপা মানে—করে পাওয়া। 'কৃ'-মানে করা, 'পা'-মানে পাওয়া। সাধনার শেষে আসে আত্ম-সমর্পণ। যার মন ভগবানে সমাহিত হয়েছে, সেই পারে আত্মসমর্পণ করতে। যে সব তাঁকে দিয়েছে সেই পারে নিশ্চিন্ত হতে।

ঠাকুর দুই বেয়ানের গল্পে এটি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। আমরাও সংসারে, ভগবানকে ডাকি এক হাত তুলে। ঠাকুর বলতেন, আমি দুহাত তুলে নাচি। সংসারের কামনা-বাসনা বগলে চেপে, এক হাত তুলে নাচলে আনন্দ হয় না। তাই সব ছেড়ে দিয়ে, দুহাত তুলে তাঁতে নির্ভর না করলে আনন্দ হয় না। এই নির্ভরতা আসে মন শুদ্ধ হলে, তখন সব বাসনা যায় তাঁর দিকে। বিল্বমঙ্গল সমস্ত মন দিয়ে চিন্তামণিকে ভালবেসেছিল, কিন্তু একটি কথায় সব পালটে গেল। ষোল আনা মন—যা চিন্তামণিকে দিয়েছিল তার মোড় ফিরিয়ে দিলে ভগবানের পায়ে।

তুলসীদাস, যিনি আজ প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি বিবাহিত জীবনে বড় স্ত্রৈণ ছিলেন, স্ত্রীর আঁচল ধরে বেড়াতেন। তাঁরও পরিবর্তন হল একটি কথায়। স্ত্রীকে একবার তাঁর অনুপস্থিতিকালে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুমতি নিয়ে বাপের বাড়ী যেতে হয়। বাড়ী ফিরে এসে স্ত্রীকে না দেখে তুলসীদাস মায়ের কাছে কারণ জানতে পেরে মাকেই প্রথমে খুব ধমক দিলেন, তারপর নিজেই ছুটলেন স্ত্রীর পালকির উদ্দেশে। বহুদূর ছুটে গিয়ে যখন স্ত্রীর পালকি তিনি ধরলেন, তখন তাঁর অবস্থা শোচনীয়। সমস্ত মুখ রৌদ্রে লাল, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো। এই অবস্থায় তাঁকে দেখে তাঁর স্ত্রী হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বললেন, 'এই দেহের অস্থি-চর্মের প্রতি তোমার যে ভালবাসা, তা যদি শ্রীরামকে দিতে তবে নিশ্চয়ই ভব-বন্ধন হতে মুক্ত হতে।' এই ভর্ৎসনায় তাঁর চেতনা হ'ল। তিনি সমস্ত মন ফিরিয়ে নিয়ে ভগবানকে দিলেন। সাধনার অন্তরায় এই আসক্তি। এর থেকে মুক্ত হতে হ'লে ভক্তি নিয়ে সংসারে চলতে হবে।

ঠাকুর মাস্তুলের পাখীর উদাহরণ দিয়ে শরণাগতদের অবস্থা বোঝাচ্ছেন। জাহাজটি যখন মাঝ দরিয়ায় এসে পড়েছে তখন পাখী আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে, একবার পূর্বে, একবার পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত ঘুরেও কোন কূলকিনারা না পেয়ে শেষে শ্রান্ত হয়ে আবার সেই মাস্তুলের ওপরই বসল। মানুষও এই রকম সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে কোন নিস্তারের পথ না পেয়ে বুঝতে পারে,—ভগবান ভিন্ন তার গতি নেই, তাঁর শরণ নিলেই শান্তি।

গীতায় শ্রীভগবান বলছেন, তুমি স্থিরচিত্তে শোন: তোমাকে সর্বগুহ্যতম কথা শোনাচ্ছি—তুমি আমার অতি প্রিয়, তোমার কল্যাণের জন্য, তোমাকে বলছি, যে আমার ভক্ত শুধু তারই জন্য এ উপদেশ দিচ্ছি। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে বিশ্ববাসী সকলকেই তিনি বলেছেন, সকলকে মায়া-যন্ত্রে ফেলে তিনি ঘোরাচ্ছেন। সকলের ভেতরেই তিনি রয়েছেন। আমরা ঘুরছি অবিরত। কিন্তু এর থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কি? পূর্ণ নির্ভরতা আর আত্মসমর্পণ। 'আমার' ও 'আমি'তে বদ্ধ হয়ে সবাই ঘুরছে। এর থেকে নিস্তারের উপায় তিনি বলছেন, 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত'। কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাগত হও। এতটুকু ভাবের ঘরে চুরি থাকবে না। সব আসবে ভালবাসার ভেতর দিয়ে। যে যত নিজের জন্য ভাববে, ভগবান তার থেকে তত দূরে সরে যাবেন।

সংসার মানে যাতায়াত। 'পরিশ্রান্ত হয়েছি, আর পারি না দীর্ঘ পথ চল্‌তে, এইবার রেহাই দাও প্রভু—এই ভাব মনে না এলে তাঁকে পাওয়া যায় না। তাই মন মুখ এক করো, তবেই "ত্বৎ প্রসাদাৎ পরা শান্তিঃ", এই পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। তাঁর পা জড়িয়ে ধরো, কামনা-বাসনার মোড় ফিরিয়ে তাঁর সঙ্গ কামনা কর। আসক্তি হোক তাঁতে। শান্তি পেতে হ'লে বাইরের মন গুটিয়ে এনে তাঁর পাদপদ্মে সমর্পণ করো। 'অকামো বিষ্ণুকামো বা'। ঠাকুর বলতেন, "হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়।" যাকে পেলে সব পাওয়া যায় তাঁকে চাও, যার থেকে শ্রেষ্ঠ লাভ আর নেই, সেই অন্তর্যামীকে আশ্রয় করো।

তিনি বলছেন, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ',—তোমাকে আমি ধুয়ে মুছে সাফ করে নেব, সব কিছু পরিত্যাগ করে যদি তুমি আমার শরণ নাও তবে তোমাকে মালিন্যমুক্ত করে আমার যোগ্য করে নেব। আবার তিনি বলছেন, 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো, মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'। আমাকে ভালবাসো, আপনার জ্ঞান করো, বাইরের অনিত্য জিনিস দেখে ভুলে থেকো না, আমার উপাসনা করো, আমার ভক্ত হও, সংসারের কাজ করো আমাকে অবলম্বন করে, তাহলে আমাকেই লাভ করবে। শ্রীভগবান নিজে প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন। আমরা 'আমিত্ব'কে খোঁটা করে কাজ করি। কিন্তু 'আমি'র পেছনে যে তিনি রয়েছেন সেটি দেখি না। তাই তিনি বলেছেন, 'অহম্' ছেড়ে তাঁকে ধরো। শরণাগত হও। আমি পশ্চাতে রয়েছি আমাকে নমস্কার করো। জীবনের লক্ষ্য যদি শান্তি-লাভ হয়, তুমি আমাকেই লাভ করবে। এই তার রাস্তা। এই জীবন গঠনের আদর্শ পাবে গীতায়, কথামৃতে। কিন্তু শুধু বই পড়ে কিছু বিশেষ হয় না। 'সাধন কব্‌না চাহিয়ে' মীরা যেমন বলতেন, সাধন চাই। আকুলতা চাই, আর চাই তাঁতে সব সমর্পণ। ভার লাঘব করতে হ'লে, বোঝা হালকা করতে হ'লে তাঁকে ভার দিয়ে দাও। ভক্ত কবীর বলতেন: "চলতি চাক্কী সব কোঈ দেখে, কীল না দেখে কোঈ।" জাঁতার আশে পাশে সব ছোলা পিষে যায়, কিন্তু কীলের কাছে যে দু'একটি পড়ে যায় তারা আর পেষাই হয় না। ভগবান হচ্ছেন এই কীল। যারা তাঁকে আশ্রয় করে তারা অভী হয়, তাদের কোন চিন্তা থাকে না, তাদের ধ্বংস নেই। তাই তাঁর শরণাগত হও।

কারে আমি হেরিলাম সহসা নিভৃতে!

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কর্মচক্র আবর্তনে আনন্দের করি অন্বেষণ
ধরণীর এ ধূলিতে জন্ম লয়ে আমি!
অলীক সম্ভোগ-সুখে কানে আসে মায়ার ক্রন্দন,
সঙ্কীর্ণ জীবনে মোর পরিকীর্ণ ভ্রান্তি-ভরা মন।
সংখ্যাতীত কামনায় আজো অধোগামী।
স্বপনের মধুকর গুঞ্জরিছে আশার সৌরভে,
বস্তুবিশ্বমাঝে কোথা চিরস্থিতি বিভূতি-গৌরবে।

বিচিত্র তর্কের জালে জড়ায়েছি সন্দেহ-সংশয়,
ইন্দ্রিয়-বিলাসে কোথা আনন্দ-সম্পদ?
কল্পনা-বিভ্রম লয়ে পলে পলে হ'ল ক্ষতি ক্ষয়,
ঘুরে ঘুরে অন্তরীক্ষে উড়ে-যাওয়া পাখী পেলো ভয়,
ক্লান্ত হয়ে গেল কিগো আশ্রয়ের পথ?
সীমাহীন ভবার্ণবে পণ্যবাহী তরণীরা দোলে,
কূলহারা হয়ে তারা প্রকম্পিত তরঙ্গের কোলে।

রূপোন্মত্ত সুষমার এষণায় ব্যর্থ পরিক্রমা,
পার্থিব ঐশ্বর্যতরে উদগ্র লালসা?
রহস্যের একি লীলা! দিনে দিনে অশ্রু হ'ল জমা,
মধুরিমা লয়ে আসে মরীচিকা হয়ে মনোরমা;
মরুবক্ষে কেন মোর সহস্র দুর্দশা?
কোথায় গাহন করি জুড়াইতে অজস্র যাতনা,
চিদানন্দরসে ডুবি কবে আর হবে গো সাধনা?

মরদেহে ব্রহ্মপুরে যেথা শোভে জ্যোতি পদ্মাকার
সেথা যারে হেরিলাম সহসা নিভৃতে,
সে যেন আনন্দময়! শুধাইনু, 'কে তুমি আমার?'
কিছু তার কথা নাই; আত্মভোলা গান গেয়ে গেয়ে—
অনাহত সুরে তার কি চাহিছে দিতে।
প্রেমসূত্রে সে কি মোর গেঁথে দিবে মৌন মন-মালা,
বিবেক-বৈরাগ্য-দীপ ওই ঘরে কার পাশে জ্বালা?

তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

'A spark disturbs our clod.' ব্রাউনিং ঠিক কথাই বলেছেন। আমাদের এই মাটির দেহের মধ্যে আলোর একটা শিখা আছে! এই শিখা আমাদিগকে না দেয় বসে থাকতে, না দেয় দাঁড়িয়ে থাকতে। ওর কাজ আমাদের রক্তের মধ্যে একটা জ্বালা ধরিয়ে দেওয়া। সেই জ্বালায় অস্থির হয়ে দিগন্তের ডাকে আমরা ঘর থেকে পথে এসে দাঁড়াই চলার দুরন্ত নেশায়। এই যে 'Sting that bids nor sit nor stand but go!' (এই যে যন্ত্রণা যা বসতে দেয় না, দাঁড়াতে দেয় না, শুধু চলার প্রেরণা দেয়) এই অশান্তি কেবল মানুষেরই মধ্যে। অন্নে তার সুখ নেই, তার কাছে ভূমাই সুখ। তার মর্মের গভীরে অনন্তের জন্যে কী অপরিমেয় পিপাসা! ব্রাউনিংএর ভাষায় আমরা যদি হ'তাম 'Finished and finite clods, untroubled by a spark' (অগ্নিকণা-দ্বারা অস্পৃষ্ট সীমাবদ্ধ রূপায়িত মৃত্তিকাখণ্ড)—তবে ছিল স্বতন্ত্র কথা। কোকিলের মতো আমের মুকুল খেতাম, বসন্তের আকাশে সুরের ঢেউ তুলতাম, গরুর মতো গোগ্রাসে গিলতাম এবং শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটতাম। সুদূরের জন্যে তাদের মনে কোন দুঃখ নেই; ঈশ্বর আছেন

কি নেই—এ নিয়ে ওদের মনে সংশয়ের কোন বালাই নেই।

মানুষের বেলায় কিন্তু ওটি হবার যো নেই: বাইরে থেকে মনে হচ্ছে বেশ দিব্যি আছে; খাচ্ছে দাচ্ছে, মোটর হাঁকিয়ে দিব্যি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, দামী চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ছে, গল্‌ফ্‌ খেলছে, দু-বেলা পোশাক বদলাচ্ছে, মূল্যবান গহনায় দেহ সাজাচ্ছে, চর্ব্য-চূষ্য লেহ্য-পেয় দিয়ে রসনাকে তৃপ্ত করছে। কিন্তু ঈর্ষা করবার কিছু আছে কি? খুব সুখে আছে ওরা—এমন কথা মনে করবার সত্যই কি কোন হেতু আছে? ঠাকুর বলতেন:

> কামিনী-কাঞ্চনের সুখ—এই আছে, এই নাই; ক্ষণিক! কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর আছে কি? আমড়া, আঁটি আর চামড়া; খেলে হয় অম্লশূল। সন্দেশ, যাই গিলে ফেললে আর নাই।

ওই আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান, হাসি ঠাট্টা এবং সাজ-সজ্জার অন্তরালে আর একটি মানুষ রয়েছে যে নিঃশব্দে বহন করে চলেছে প্রচ্ছন্ন আত্মগ্লানির এবং নৈরাশ্যের দুর্বহ বোঝা। এই আসল মানুষটিকে বাইরে থেকে বুঝবার কোনই উপায় নেই। হাক্সলীর ভাষায়, এই যে insufferable boredom, এই যে secret silent loathing and despair—হুইট্‌ম্যানের ভাষায়,—এই অন্তহীন ক্লান্তির এবং হতাশার কথা স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে বলে না, বন্ধু বন্ধুর কাছে ব্যক্ত করে না। মার্কিণ কবির ভাষায়: No husband, no wife, no friend, trusted to hear the confession. মানুষ বাইরে ভোগ্যবস্তুর পিছনে যতই ছুটাছুটি করুক, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কসরৎ নিয়ে যতই প্রমত্ত থাকুক—the soul of man is still athirst for essential things—ঐতিহাসিক টয়েনবীর ভাষায়। চরম সত্যের জন্যে মানুষের অন্তরে যে পরম তৃষা রয়েছে সে তৃষা তো যাবার নয়। অতীতে যেমন সে চেয়েছে, আজও সে তেমনি চাইছে সত্যকে, সুন্দরকে, ভগবানকে।

Principles of Social Reconstruction (পুস্তক)-এর উপসংহারে ইংরেজ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখেছেন:

> Life devoted only to life is animal, without any real human value, incapable of preserving men permanently from weariness and feeling that all is vanity. If life is to be fully human, it must serve some end which seems, in some sense, outside human life, some end which is impersonal and above mankind, such as God or truth or beauty.

অনুবাদ: শুধু বাঁচার জন্যে বাঁচা মানবেতর প্রাণীর জন্যে। ওর মধ্যে যথার্থ মনুষ্যত্বের কোন গৌরব নেই। ঐ জান্তব জীবনের কোন সাধ্য নেই মানুষকে বরাবরের জন্যে বাঁচায় ক্লান্তির হাত থেকে, 'সমস্তই নিশার স্বপ্ন'—এই হতাশার ভাব থেকে। জীবনকে পরিপূর্ণ মানুষের জীবন হতে গেলে বাঁচতে হবে এমন একটা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে যা নৈর্ব্যক্তিক, যা মানুষের জীবনের বাহিরে, যা সুদূরের—যেমন ঈশ্বর অথবা সত্য অথবা সুন্দর।

এ হচ্ছে এমন একজন মানুষের মন্তব্য যাঁর বইগুলিকে কোনমতেই রামকৃষ্ণ-কথামৃত অথবা চৈতন্য-চরিতামৃতের পর্যায়ে ফেলা চলে না, যিনি গণিতশাস্ত্রের জটিল সমস্যা নিয়ে বই লিখেছেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গিমা থেকে কথা বলেছেন, নিঃশঙ্ক চিত্তের স্বাধীন চিন্তার প্রদীপ্ত আলোকে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছেন। সত্যের প্রতি একটা জলন্ত অনুরাগ নিয়ে জীবনকে তলিয়ে

বুঝবার চেষ্টা করলে রাসেলের সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই হবে। কেবল জান্তব স্তরে প্রবৃত্তির জীবনকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করলে সিন্‌ক্লেয়ার লুইসের ব্যাবিটের (Babbit) মতো একদিন না একদিন তাকে নিরাশ হতেই হবে, Dodsworth (সিন্‌ক্লেয়ার লুইসের অপর একখানি উপন্যাসের নায়ক) এর মতো বলতেই হবে : And I am tired (আমি ক্লান্ত). আমেরিকার অতুল ঐশ্বর্যের চমক্‌লাগানো আড়ম্বরের মধ্যে মানবাত্মার প্রচ্ছন্ন নৈরাশ্যের কথা লুইসের উপন্যাসগুলিতে নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠেছে।

আমার বলবার কথা : ইওরোপ এবং আমেরিকা বুদ্ধির ক্ষেত্রে চোখ-ঝলসানো সফলতা অর্জন করেছে—সন্দেহ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ওদের বিফলতার কথা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। ওরা 'রক্তকরবী'র সেই রাজার মতো, যে পুঞ্জীভূত সোনার তালের উপরে বসে বলছে : 'আমি রিক্ত, আমি তপ্ত, আমি ক্লান্ত।' আর মানুষের জীবনের আধ্যাত্মিক দিকটা কোন মতেই উপেক্ষা করবার নয়। উপেক্ষা করে পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীতে ইতিমধ্যে নিয়ে এসেছে দুটো মহাযুদ্ধ; তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে এখন পাঁয়তারা ভাঁজছে। ইওরোপ আমেরিকা সারা-পৃথিবী চুঁড়ে চুঁড়ে বেড়াচ্ছে তেলের জন্যে, সোনার জন্যে, কাঁচামালের জন্যে—যাতে ওরা সিগার, শ্যাম্পেন আর মোটর নিয়ে বিলাসব্যসনে মত্ত থাকতে পারে। আফ্রিকা ওদের মৃগয়াক্ষেত্র। ওরা যা করছে তা আনন্দেরই জন্যে। মানুষের স্বভাবই আনন্দকে অন্বেষণ করা। ওদের ভুল হচ্ছে একটা জায়গায়। ভাবছে বিদ্যুৎকে বশ করতে এবং জড়প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব কায়েম করতে পারলেই সব-পেয়েছির দেশে পৌঁছে যাবে। তা হবার নয়। চরম সত্য—ঈশ্বরের মধ্যে সেই শান্তি, যার সম্পর্কে বাইবেলে বলা হচ্ছে, 'the peace of God that passeth all understanding'—ঈশ্বরীয় যে শান্তি বুদ্ধির অগোচর এবং আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'যতো বাচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' —যাকে না পেয়ে বাক্য ফিরে এল মনের সঙ্গে। এই পরম সত্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে তবেই মানুষকে ভালবাসা সম্ভব হয়। কিন্তু মনটাকে সিগারে শ্যাম্পেনে মোটরে লাগিয়ে রাখলে সে মনকে ঈশ্বরে দেওয়া তো সম্ভব নয়। এমন কথা বলা হচ্ছে না যে আমাদের মধ্যে যে জন্তুটা রয়েছে তার দিকে মন দেবার কোনই প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। খালি পেটে তো ধর্ম হবার নয়। কিন্তু মন যদি সর্বক্ষণের জন্য বাহিরের বিষয়বস্তুতে লেগে থাকে—ফল কখনই শুভ হবে না।

ইওরোপ এবং আমেরিকা ভুল করেছে বুদ্ধির দিকটাকে প্রাধান্য দিয়ে এবং আধ্যাত্মিক দিকটাকে উপেক্ষা করে। ঐতিহাসিক টয়েন্‌বী ঠিকই লিখেছেন :

Man has been a dazzling success in the field of intellect and 'know-how' and a dismal failure in the things of the spirit; for the spiritual side of man's life is of vastly greater importance for man's well-being than is his command over non-human nature (বুদ্ধির ও বিজ্ঞানের জগতে মানুষের সাফল্য বিস্ময়কর, কিন্তু অধ্যাত্মবিষয়ে তার ব্যর্থতা ভয়াবহ। মানুষের কল্যাণের জন্য জীবনের অধ্যাত্ম দিকটির প্রয়োজনীয়তা জড়প্রকৃতি-জয়ের থেকে অনেক বেশি।)

পাশ্চাত্ত্য যদি বাঁচতে চায় এবং পৃথিবীকে বাঁচাতে চায় তবে তাকে জোর দিতেই হবে জীবনের আধ্যাত্মিক দিকটার উপরে। কেবল জড়প্রকৃতিকে নয়, তাকে আত্মজয় করতে হবে। ওয়েল্‌স্ (H. G. Wells)এর ইতিহাসে পড়ছিলাম : We

have tamed and bred the beasts; but we have still to tame and breed ourselves. (আমরা পশুদের পোষ মানিয়ে শিক্ষিত করে তুলেছি, কিন্তু নিজেদের সুশিক্ষিত করতে বাকি)।

পরানুকরণপ্রিয়তার মোহ থেকে ভগবান তরুণ ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন। কামিনীকাঞ্চনের বিরুদ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিযান ঐতিহাসিক গুরুত্বে পরিপূর্ণ। টয়েন্‌বী-র A study of History তরুণ-তরুণীদের পড়া উচিত। রাসেলকেও পড়া দরকার। হাক্সলি (Aldous Huxley)-র বই-গুলির মধ্যেও কথামৃতের সুরকে আমরা খুঁজে পাব। পাশ্চাত্যের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে একদল মনীষী জড়বাদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে তর্জনী তুলেছেন। তাঁদের এই বিদ্রোহ উপেক্ষা করবার নয়। তাঁদের চিন্তাধারার পটভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনার বৈশিষ্ট্য আরও পরিষ্কার করে বোঝা যাবে।

ইতিহাস-পর্যটক কবি আমি

শ্রীনারায়ণ পাত্র

আমি এক ইতিহাস-পর্যটক—কবি,
অনেক সভ্যতা আর অনেক শতাব্দী পার হয়ে
এসেছি দেখিতে বিংশ-শতাব্দীর ছবি,
অনেক বিস্মৃতি স্মৃতি আনিয়াছি সংগে মোর বয়ে।

গিয়েছি হস্তিনাপুরে, সেখানের যা কিছু বৈভব
দেখেছি হৃদয় ভরে, ইন্দ্রপ্রস্থ—নব রাজধানী,
দেখেছি সেখানে স্বল্পদিনের উৎসব,
কুরুক্ষেত্রে সব শেষ, দুদিনের মিছে হানাহানি।

গিয়েছি পাটলিপুত্রে, মগধের শ্রেষ্ঠ নগরীতে,
বৈভবে গৌরবে ভরা বৈচিত্র্যের পূর্ণ সমাবেশ—
সেখানেও কদিনই বা? ভায়ে ভায়ে ভাগ ক'রে নিতে
বৈভব, বৈদূর্য আর বৈচিত্র্যের হয়ে গেছে শেষ!

রাজ্যও যায় নি রাখা, ধনরত্ন সেও গেছে চলে,
কীর্তি শুধু পড়ে আছে আপনার উজ্জ্বল গৌরবে!
ইতিহাস-রথচক্র বাহুবল পরাক্রম দুই পায়ে দলে—
আপন নিয়মে চলে তুচ্ছ করি' সকল বৈভবে।

তারপর আরও কত সভ্যতার পরিক্রমা পথে
এলাম দিল্লীতে, যবে হিন্দুত্বের অন্তিম লগন—
পৃথ্বীরাজ অস্তমিত আত্ম-কলহেতে;
বাহুবলে হয় নাই পাঠানের রাজত্ব-স্থাপন।

অতঃপর একই পথ: অনিবার্য সেই পথ ধরে
মোগলের উত্থান পতন, হয়েছে কবে তা জানি।
এসেছে পশ্চিম তার সদাগরী বুদ্ধিতরী ভরে,
করায়ত্ত ক'রে পৃথ্বী শোনায়েছে মদমত্ত-বাণী।

এতো বুদ্ধি, অহঙ্কার, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, শাসন পীড়ন,
বণিক সভ্যতা সেও টিকিল না আপন নিয়মে।
একে একে নিভে গেল, দর্পবুদ্ধি হোলো সমাপন—
তারো তার গেল ছিঁড়ে, তাল আর ফিরিল না সমে।

সত্যের লাঞ্ছনা দেখি অসত্যের তীব্র অট্টহাস
শুনেছি, দেখেছি আমি অনর্থ নিরীহ-রক্তপাত;
ধর্মের পীড়ন দেখি অধর্মের অযথা উল্লাস—
থেমেছে যখন বজ্র পড়েছে সে শিরে অকস্মাৎ!

ইতিহাস-পর্যটক, আমি কবি ভারতবর্ষের,
ধর্ম মোর ন্যায়-ধর্ম, আমি সত্য-শিব-উপাসক;
কতো রাজা এল গেল, শেষ হ'ল কত রাজত্বের—
আমি সব দেখিতেছি, যুগে যুগে সত্যের সাধক!

শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী ও তদীয় কীর্তি

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

প্রেমাবতার শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কবি কর্ণপূর বাল্যাবধি পিতৃদৃষ্টান্তে ছিলেন গৌরানুগত। অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিবলে অতি অল্পবয়সেই শাস্ত্ররাশি তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল। প্রেমপ্রবণ চিত্তকে মধুরভাবের অনুভবে নিষিক্ত করে পরবর্তী কালে তিনি অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী শক্তিমান্ ভক্তপুরুষরূপে পরিচিত হন। বিভিন্নগ্রন্থে তিনি তাঁর অসামান্য শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর বহুবিধ সৃষ্টির মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, অলঙ্কার-কৌস্তুভ, শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থাবলী বিদ্বৎসমাজে সম্পদ্‌রূপে আদৃত হয়ে আসছে; সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়েছে একথা অনেকেই অবগত নন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ-কৃত বঙ্গভাষার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব ও মাধুরী শ্রীচৈতন্যের যাবতীয় চরিতগ্রন্থকে অতিক্রম করে বিরাজমান রয়েছে। এর পূর্বে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, তদানীন্তন কালের মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ে প্রমাণপুরুষরূপে পরিচিত শ্রীল মুরারি গুপ্ত-রচিত সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃতই একমাত্র গ্রন্থ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল; কিন্তু সে-কথা অল্প লোকেই আলোচনা করেন। এই মূল গ্রন্থকে সহায় করে কবি কর্ণপূর গোস্বামীও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জীবনচরিত রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষীকৃত ও সাক্ষাৎকারী গৌরভক্তদের নিকট যথাশ্রুত বিষয়াবলী অবলম্বন ক'রে। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের ভাষা অতিশয় সরল ও উদার। এতে কবি দুরূহ শব্দের প্রয়োগ প্রায় বর্জনই করেছেন। যথাযথ লীলাকাহিনী বর্ণনাই এ কাব্যের মুখ্য উপজীব্য। এজন্য এতে দার্শনিক তত্ত্বাদির গভীরতম বিচার অত্যন্ত বিরল। আদ্যোপান্ত মহাপ্রভুর লীলা-বিন্যাসের চেষ্টা থাকাতে দুরূহ তত্ত্বোদ্ধার ও বিতর্ক বিষয়ে ফলাফল জ্ঞাপন করেই কবি অগ্রসর হয়েছেন। মূলতর্কগুলি এতে আভাসে প্রকাশ করে গেছেন মাত্র। কিন্তু এই সরল পন্থার কৌশল সত্ত্বেও কর্ণপূর গোস্বামীর স্বভাবসিদ্ধ গুণের ছায়া প্রথম জীবনের এই রচনাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শত সরলতার মধ্যেও অপূর্ব কবিত্ব-চমৎকারিতা স্থানে স্থানে প্রকটিত হয়েছে। যেমন দৃষ্টান্তরূপে বলা যেতে পারে,—শ্রীবাসাচার্য এক সময়ে মহাপ্রভুকে তাঁর পূর্বলীলা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন,—প্রভু, পূর্বকালে আপনি মৃগনয়না তরুণীদের সঙ্গে বিলাস-পূর্বক প্রেমাবিষ্ট হ'লে যে মহাপ্রেমসম্পদের উদয় হয়েছিল, তাতে আপনিও তৃপ্তিলাভ করতে পারেন নি, তা না হ'লে হে নাথ, বলুন, অতিহর্ষে এই বিভব নিত্যই কেন নব নব রূপে প্রতীত হয়েছিল?—

> "পুরা বৃন্দারণ্যে তরুণহরিণাক্ষীভিরনিশং
> ত্বয়ি প্রেমাবিষ্টে বিলসতি য আসীৎ স বিভবঃ।
> ত্বয়ৈবাতৃপ্তেনাজনি ন যদি তন্নাম রভসঃ
> কথঙ্কারং নিত্যং নব নব ইবায়ং সমভবৎ॥" ৮।৩১

পরমানন্দপুরী স্বামী ও শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণসহ রামানন্দ-ভবনে উপনীত হ'লে ভক্তগণকে উদ্যান দেখান হ'ল, তাতে উদ্যানবর্ণনা স্থলে কবিত্ব-চমৎকারিতা ফুটিয়েছেন কবি—

> "পরমানেন ললিতা পরমানেন সর্বতঃ।
> রাজীবনস্থ সা জীবরাজীবযুগমবভৎ॥" ১৯।১৯

অর্থাৎ সুবৃহৎ পরিমাণশালী 'পরমান' অর্থাৎ অন্যান্য বৃক্ষের পরিমাণে যা সমধিক সুন্দর (ললিতা) বনরাজী, (রাজী বনস্থ) জীব অর্থাৎ জীবিত বা সজীব রাজীবগণযুক্ত হয়েছিল।

মহাপ্রভুর রূপবর্ণনায় কবি আবির্ভাবের কারণ-রূপে যে সম্ভাবনা প্রকাশ করেছেন মঙ্গলাচরণ শ্লোকে

তা যেমন অপূর্বভাবদ্যোতক, তেমনি ভক্তির প্রকাশেও উজ্জ্বলতর। কবি বলেছেন,—

"যঃ বৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত।
তাসাং শশ্বদ্ দৃঢতরপরীরম্ভসংভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ॥"

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন শ্যামকান্তি শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্বে বৃন্দাবনভূমিতে সদৃশকান্তি গৌরাঙ্গী গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে নৃত্যবিলাস করতেন, তিনিই কি তাঁদের নিরন্তর আলিঙ্গন-জনিত দৃঢ়তর আলিঙ্গনে গৌরাঙ্গ হয়ে নবদ্বীপ ধাম অবলম্বন করে বিরাজমান রয়েছেন?

এভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম থেকে অন্তর্ধানাবধি জীবনলীলার রূপায়ণে এই অনবদ্য মহাকাব্যটি নানা-রত্নে ভূষিত করেই কবি রচিত করেছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়।

সৎ-শীলতার দিক্ থেকে কবি যে কত বড় উদারহৃদয়, মহচ্চরিত্র ও অকপট ছিলেন তা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গীতে শুধু যে প্রমাণিতই হয় তা নয়, তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি করে। মাত্র গ্রন্থের সাহায্য-লাভ নিবন্ধন গ্রন্থকর্তার প্রতি ঋণ স্বীকারের মাধ্যমে এত বড় মহিমা অনুস্মরণ করে মুক্তহৃদয়ে প্রণতি নিবেদন প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত গুণেরই সমুদার নিদর্শন, যা আজকালকার জগতে স্বপ্নের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব-কবি মুরারি গুপ্ত-রচিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্" থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছেন বলে কবি মুক্তকণ্ঠে বলছেন,—

"আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ
কৈশ্চিন্মুরারিরিতি মঙ্গলনামধেয়ৈঃ।
যদ্‌যদ্বিলাসললিতং সমলেখি তত্তৎ-
স্তত্তদ্ বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ॥"

পূর্ব কবির নিকট নিজের শিশুত্ব স্বীকার করে উপকারের জন্য প্রণতি নিবেদন জানিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে বলছেন,—

"বদ্ধাঞ্জলিঃ শিরসি নির্ভরকাকুবাদৈ-
র্ভূয়ো নমাম্যহমসৌ স মুরারিসংজ্ঞঃ॥"

এই সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যটি ১৪৬৪ শকাব্দে রচিত হয়। কবি নিজেই বলে গেছেন—"বেদা রসা শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে। শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি"॥......সুতরাং ৪+৬+৪+১=১৪৬৪ শকাব্দে রচিত। মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪০৭ শকাব্দে। তিনি ৪৭ বৎসর জীবিত থেকে লীলা অপ্রকট করেন। সুতরাং তাঁর তিরোধানের ৯ বৎসর পরেই কবি এই গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করেন। যা দেখেছেন ও প্রমাণ সহ শুনেছেন, তাই কবি সাজিয়ে দিয়েছেন। কবি বলেছেন—"যদ্দৃষ্টং শ্রুতমপি চ যত্তস্য লীলাবিলাসৈঃ .... ক্ষুদ্রোঽহম্ তৎ কথয়তি কিঞ্চিৎ কৃপায়া বশঃ সন্॥"

এই গ্রন্থটি বহরমপুর থেকে পণ্ডিত রামানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গাব্দ ১২৯১ সালে প্রথম মুদ্রিতরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক মহাশয় তাতে নিবেদনপত্র লিখেছেন—"এ পর্যন্ত এ গ্রন্থের এই ভারতভূমিতে প্রকাশ নাই, এবং ইহা যে আছে, অদ্যাবধি তাহা কেহ অবগত নহে, আমি বহু অনুসন্ধানে এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই গ্রন্থ স্বয়ং অবলোকন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রমাণস্বরূপ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে দ্বিধা নাই।"

কিন্তু উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের সমুদয় অভিমতের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। কারণ এই গ্রন্থের প্রথমেই বলা হয়েছে, মহাপ্রভু এভাবে লীলাবিলাসাদি লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে আস্বাদন করে অন্তর্হিত হ'লে তদীয় ভক্তগণমধ্যে অনেকে জীবন বিসর্জন দিলেন, কেহ কেহ শোকে আর্তনাদ করতে লাগলেন,—

"ইত্থং তত্তদ্বিলসিতসুধাপূরমাস্বাদ্য ভূয়ঃ।
শিক্ষাব্যাজাৎ প্রথিতকরুণে হন্ত হান্তর্দধানে॥" ইত্যাদি (১।১৪)

তাঁরা বলেছিলেন,—

"জগচ্ছূন্যং মন্যে ক্ষিতিরপি চ দুঃখাগ্নিনিবহে
বিলীনা লীয়ন্তে সকলমনুজাস্তত্র বিকলাঃ।" ইত্যাদি (১।২৬)

গ্রন্থের অন্তিম পর্যায়ে একথাও বলা হয়েছে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের বিরহ সহ্য করতে অক্ষম হয়ে রায় রামানন্দ দেহত্যাগ করেন,—"রামানন্দ-স্তদ্বিয়োগাধিপীডাক্ষীণক্ষীণস্তত্যজেহসূন্ মহাত্মা।" গ্রন্থকার আরো লিখেছেন,—

"সদা শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা সততমনুভূয়াপি চ সুখং।
বিনা তং জীবামঃ শিব শিব মহদ্দুষ্কৃতমিদম্॥"

"সর্বদা তাঁর কথা শুনে, তাঁকে দেখে, নিরন্তর সে সুখ অনুভব করেও আজ তাঁর বিরহ-দশাতেও জীবিত রয়েছি। হায়, হায়, এর চাইতে মহাপাপের ভোগ আর কি থাকতে পারে।"

সুতরাং গ্রন্থটির আরম্ভ-সময়ের উল্লেখ না থাকলেও সমাপ্তি-কালের স্পষ্ট উল্লেখ এবং মহাপ্রভুর তিরোধানাদি বিন্যস্ত থাকাতে তিনি এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ দেখেছিলেন—এরূপ অভিমত যথার্থ বলে মনে হয় না, অথচ পূর্বোক্ত সম্পাদক মহাশয় কোন্ প্রমাণসূত্র অবলম্বন করে যে এ কথা লিখেছেন, বোঝা গেল না।

এই চরিতকাব্যে দুরূহ তত্ত্বমূল বিচারবহুল সিদ্ধান্তাদি গভীরভাবে বর্ণিত না হলেও কবি তাঁর নাটকে তার অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, নানাবিধ সূক্ষ্ম দার্শনিক সিদ্ধান্তাদি বিন্যস্ত করে। এজন্যও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকটি কবি কর্ণপূর গোস্বামিপাদের এক অপূর্ব গ্রন্থ। অলঙ্কার-কৌস্তুভ-গ্রন্থে কবি কাব্যের চমৎকারিত্ব-নিরূপণে যে প্রণালীর সমুল্লেখ করেছেন, তার যথাযথ প্রয়োগ স্বয়ং দেখাবার চেষ্টা করেছেন এই সমুদয় নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থে। গ্রন্থের অবতারণাতেই কবি অনুপ্রাস-বহুল রচনা এবং ভক্তির অপূর্ব রীতি প্রকাশ করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোভাব দুঃখে আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায় সর্বশূন্যতাবোধ এমনকি আনন্দময় পুরুষোত্তমের রথযাত্রার ন্যায় মহামহোৎসবেও মহাপ্রভুর অভাবে চরম বিষণ্ণতা ব্যক্ত করে কবি কৌশলে ভক্তহৃদয়ে মহাপ্রভুর অনন্যসুলভ অধিকারের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই জন্যই মহাপ্রভুর প্রতি কবির "রসময়বপুঃ" বিশেষণটি সার্থক হয়ে উঠেছে। ঐ সঙ্গে সেই বিশাল কল্পদ্রুমের শাখাসমূহের অর্থাৎ ভক্তগণের, ব্রহ্মানন্দ ভেদ করে তদূর্ধ্বে বিরাজমানতা ব্যাখ্যা করে কবি প্রারম্ভেই তাঁর অভিমত ভক্ত সাধকের লক্ষ্য ও সফলতাময় সিদ্ধান্ত বিষয়ে অভিনব সঙ্কেত প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ কবি ছিলেন মধুরভাবে ভাবান্বিত। এই জন্য দেখা যায়, কবি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সচ্চিদানন্দ নির্বিশেষ-ব্রহ্মমাত্ররূপে ব্যাখ্যায় বক্তব্য সমাপ্ত না করে, লীলাময় শ্রীকৃষ্ণরূপতা ব্যক্ত করেও, লীলাবৈচিত্র্যে ও প্রকৃত রসময়তা বোঝাবার জন্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগ্মাত্মকতা প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছায় 'খগমিথুন'শব্দের প্রয়োগ করেছেন এবং "ভিন্নভাবেন হীনম্" বলে বস্তুতঃ অভেদরূপতা জ্ঞাপন করেছেন।

পূর্বেই আমরা বলেছি যে, এই নাটকে বহুক্ষেত্রে অপূর্ব অপূর্ব সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয়েছে, যা বিদ্বজ্জন-মাত্রেরই অপরিসীম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। বিশেষ করে নাটকের ভিতর দিয়ে এত সব দুরূহ ভক্তির উদ্ঘাটন, কঠিন সমস্যার সমাধান, পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্তজ্ঞাপন ও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি যথোচিত সুসঙ্গত উত্তর দান—এই সমুদয় উল্লেখযোগ্য রত্নরাশি বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে এক অপরূপ সম্পদ দান করেছে। অথচ রসরীতির বৈশিষ্ট্য অণুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়নি, মূল উপজীব্য মহাপ্রভুর লীলাবিন্যাসটিও ব্যাহত হয়নি; তবে নাটক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে নাটকীয় রীতির অনুরোধে লীলাবিন্যাসের ক্রমপরম্পরা হয়ত সর্বত্র রক্ষিত হয়নি।

কাব্যগত রসসৃষ্টিতেও ধ্বনির ধ্বন্যন্তর সূচনায় যে মহাচমৎকারিতা তাঁর স্বকীয় অলঙ্কারগ্রন্থে বিশেষ-ভাবে বলা হয়েছে, তার যথাযথ প্রয়োগ দেখিয়ে কবি এখানে তা সপ্রমাণ করেছেন। এজন্যে এঁর গ্রন্থ কাব্যরসিক, ভাবুক এবং কবিদেরও পরম আস্বাদযোগ্য। এ রীতির রসসৃষ্টিতে ইনি অনন্য। এ

নাটকের পদ্য এবং গদ্য উভয়ক্ষেত্রেই কবি এ কৌশল বিন্যস্ত করেছেন। প্রথমেই সূত্রধারের উক্তিতে, পারিষদের উক্তিতে এবং অন্যত্রও বহুলপরিমাণে রয়েছে। যেমন সূত্রধার ·····"ভো ভোঃ অদ্যাহং রত্নাকরবেলাকন্দলিত দলিতকজ্জলোজ্জ্বলমহানীলমণি-কন্দলস্য নীলগিরিদরী-দরীদৃশ্যমান-ঘনদলমালতমাল-তরুকড়ম্বস্য"—ইত্যাদি, তেমনি পারিষদ—"এতাব-তাপি ভগবতঃ শ্রীনীলাচলচলদানন্দকন্দস্য স্যন্দনযাত্রা-পরমানন্দে কতিপয়ে সুখোপরম-পরম বিমনস্কাস্ত-ময়স্কান্ত ভাণ্ডমিব ব্রহ্মাণ্ডং মন্যমানা বিলপন্তঃ সন্তি"—অর্থাৎ শ্রীনীলাচলের আনন্দকন্দস্বরূপ ভগবান্ পুরুষোত্তমদেবের মহানন্দজনক রথযাত্রা-মহোৎসব সমাগত হ'লে অনেকে মনোদুঃখে নিতান্ত বিমনস্ক হয়ে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অন্ধকারাবৃত ক্ষুদ্র ভাণ্ডের ন্যায় মনে করে নিয়ত এই বলে বিলাপ করেছিল।

এ নাটকে ভক্তি ও জ্ঞানের পার্থক্য বিশ্লেষণ—একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বলা যায়, যা সাধারণতঃ কোন দর্শনবিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থে নিবদ্ধ থাকাই স্বাভাবিক। ভক্তিতেই ভগবানে অনুরাগরূপ রতি আসে, তাতেই রতিবশতঃ ভগবৎপার্ষদ-প্রাপ্তিরূপ মুক্তি সাধিত হয়। জ্ঞানে ব্রহ্মনির্বাণ আসতে পারে কিন্তু তা প্রকৃত মুক্তি নয়, এই বিষয়-নির্ণয়ে যে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা বেশ উপভোগ্য। কবি বলেছেন, দিবানাথের পূর্ব দিগঙ্গনে আবির্ভাবের পূর্বেই অরুণপ্রকাশে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়ে যায়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের সাক্ষাতের পূর্বেই তাঁর অনুগ্রহে হৃদয়ের অজ্ঞানরাশি বিলুপ্ত হয়ে যায়!

"পুরোঽনুগ্রহ এবাস্য ধোদয়াধারধারণঃ।
উদয়াৎ পূর্বমর্কস্য বিনিহন্তি তমোঽরুণঃ॥"

এই ভক্তির ব্যাখ্যাতে এ-থেকে একটি অপূর্ব সংবাদ আমরা জানতে পারি যে, জননী বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর জীবনে কতখানি ছিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রভৃতি ভক্তদেরও সেই সর্বত্যাগিনী জননীর প্রতি কি সুগভীর শ্রদ্ধা বিদ্যমান ছিল।

শ্রীঅদ্বৈতের পরিহাসোক্তি, যে ভগবান নবদ্বীপে রয়েছেন বলে শুধু আমারই এখানে থাকার অভিলাষ তা নয়, শ্রীবাসও এইজন্যে এখানে রয়েছেন। আচার্য শ্রীবাস একথার তদন্তরে উত্তর করেন—"শ্রীবাস" শব্দে 'শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা সহ বাসো যস্য—শ্রীবাসঃ ভগবান্'। কিন্তু লক্ষ্মী দেবী যে গত হয়েছেন, সুতরাং অদ্বৈতের উক্তি টিকল না। শ্রীবাসের এই অসঙ্গতির অভিযোগ খণ্ডন করে দেন মহাপ্রভু, তিনি বলে-ছিলেন,—'শ্রী' হ'ল বিষ্ণুভক্তি, তা তো ভক্তদের সকলের মধ্যেই রয়েছে। এখানেই শ্রীঅদ্বৈতের সেই অপূর্ব উক্তি—এই বিষ্ণুভক্তি তো এখন মূর্তিমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—"ইদানীং সা বিষ্ণুপ্রিয়া"। ভগবানের উক্তিটিও সুমধুর এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে অর্থপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন,—"হাঁ, জ্ঞানাদি নানা উপায় সত্ত্বেও ভক্তিই বিষ্ণুর প্রিয়া বটে। অদ্বৈতাচার্য সুন্দর উত্তর দেন—"অতএব ভগবানপি তামঙ্গীচকার।"

লীলাবর্ণনার মাধ্যমেও কবি নাটকীয় রীতি রক্ষা করে যে, মহাপ্রভুর তত্ত্ব সুকৌশলে প্রকাশ করেছেন, তা অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায় অনবদ্য। শ্রীঅদ্বৈতের শ্যামরূপ দর্শনাভিলাষ পরিপূরণের জন্য মহাপ্রভু যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা ভক্তমাত্রকেই অনুরক্ত করে। ভগবান গৌরচন্দ্র মুখে বলেছিলেন, 'সেরূপ ত আমার অধীন বা আয়ত্ত নয়, কি করে তা সম্ভব!' তারপর বললেন, 'আচার্য, মানসনেত্রে তা চেয়ে দেখ'। অদ্বৈত ধ্যানস্থ হয়ে এক অপূর্ব মূর্তি দেখলেন,—শ্রীগৌরাঙ্গের শরীর থেকে এক অপরূপ নীলজ্যোতিঃ নির্গত হয়ে অদ্বৈতের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠল, আবার শ্রীগৌর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এ ভাবে কবি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরে—লীলায় ভিন্ন হলেও তত্ত্বতঃ অভেদ জ্ঞাপন করলেন। কেবলমাত্র অভেদই নয়, কবি সমুদয় বিরুদ্ধ ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গে গীতোক্ত পুরুষোত্তম-তত্ত্বের পরাকাষ্ঠাও

দেখিয়েছেন। যে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে সর্ববিধ ভেদ-অভেদ সবিশেষ-নির্বিশেষ ভাব, ক্ষর-অক্ষরদ্বন্দ্ব অর্থাৎ সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মরূপতার পরম পরিণতি,—একেতেই জগতের বিরুদ্ধরীতির অতীত অচিন্ত্য শক্তিময় পুরুষোত্তমে থাকাতে যা অবিরুদ্ধ —সে পরম সিদ্ধান্ত-তত্ত্বটিতে স্বকীয় অভিমত জ্ঞাপন করেছেন :

"আনন্দোঽপি চ মূর্তো ব্যাপী চ তথা পরিচ্ছিন্নঃ।
তদ্বদ্বিহারবিলাসোঽপি চ বৈরাগ্যাশ্রয়ো ভগবান্ ॥"

এ জন্যেই কবি মহাপ্রভুর ভক্তভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য প্রকাশের সংবাদে ঈশ্বর-ভাবের মহিমাটিও ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে তদ্দর্শনমাত্রই যবনের আনন্দবিহ্বলতা, সঙ্কর্ষণ-মূর্তি ধারণ, রুদ্র, বরাহ, নৃসিংহ অবতারাদির অনুকরণ, ষড়্‌ভুজ মূর্তি ধারণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এ ভাবে ঐশ্বর্য-প্রকাশ বর্ণনা করেও কবি সন্দেহবাদীদের বিরুদ্ধ যুক্তিকে উপেক্ষা না করে সদুত্তর দানেব চেষ্টা করেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ-ব্যাপার নিয়ে তাঁর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে অনেকের মনে হয়তো নানা প্রশ্ন জাগত, এত সব মহিমা ও গুণরাশি অবগত হয়েও সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে মেনে নিতে অনেকেই হয়ত কুণ্ঠিত হ'ত। কবি এ সম্বন্ধে যুগরাজ কলির মাধ্যমে উত্তর দিয়েছেন—অপূর্ব যুক্তি আশ্রয় করে। কলি অধর্মকে বলছেন, "তিনি বিবাহ করেছেন, তাতে কি হয়েছে? ঈশ্বর অবতীর্ণ হলে তদীয় শক্তিও অবতীর্ণা হন। যখন ভগবান দেবতারূপে, তখন তদীয় শক্তিও দেবীরূপে; যখন তিনি মানুষের মধ্যে, তখন তাঁর শক্তিও মানবী—তদীয় শক্তি লক্ষ্মী—পৃথিবীর অংশরূপা সর্বংসহা বিষ্ণুপ্রিয়া। এ-কে আবার গ্রহণ করেছেন, বর্জন করে বৈরাগ্য শিক্ষা দেবার জন্যে।

"অবতরতি জগত্যামীশ্বরে হন্ত তস্যা-
প্যবতরতি হি শক্তিঃ কাপ্যসৌ রূপিণী শ্রীঃ।" ইত্যাদি

আবার যুগরাজ কলি বলছেন—শুধু তাই নয়, আরো লীলা রয়েছে; লক্ষ্মী-শক্তির অন্তর্ধানের পর পৃথিবীর অংশরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া আসবেন এবং পরিত্যক্তা হবেন—

"ভুবোঽংশরূপামপরাঞ্চ বিষ্ণু-
প্রিয়েতি নিত্যাং পরিণীয় কান্তাং।
বৈরাগ্যশিক্ষাং প্রকটীকরিষ্যন্
হাস্যত্যথৈনাং স নবাং নবীনঃ ॥"

লীলাবর্ণনার মাধ্যমে কতক সংবাদ আমরা এ থেকে পাই, যা পরবর্তীকালের লেখকদের সঙ্গে সর্বদা ঐক্যবদ্ধ নয়। এ থেকে জানা যাচ্ছে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মদিবস পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল এবং তাতে সকলে হরিগুণগানে মত্ত হয়েছিল—এই হরিপ্রমত্ততার মুহূর্তে গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব।

"জায়মানঃ পূর্ণিমায়ামুপরাগচ্ছলেন যঃ।
গ্রাহয়ামাস যুগপদ্ধরের্নাম জগজ্জনান্ ॥"

এ সংবাদ আমরা শ্রীবৃন্দাবন দাস-কৃত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'গ্রন্থেও পাই। শ্রীল মুরারি গুপ্ত মহোদয়ের গ্রন্থেও এ সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে।

আর একটি সংবাদ সম্বন্ধে আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বরাত্রের কাহিনী বর্তমানে নানাভাবে বিকৃত হয়েছে,—মনে হয়। এখানে দেখা যায়, সন্ন্যাসের পূর্বদিন মহাপ্রভু আচার্যরত্নের গৃহে সারারাত্রি কীর্তনানন্দে কাটিয়েছেন এবং রাত্রির শেষযামে আচার্যরত্নের সঙ্গে অন্যান্য সকলের অলক্ষিতে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে নিত্যানন্দ-সঙ্গে মিলন হয়েছিল। এঁরা দু'জন সঙ্গী মহাপ্রভুর সঙ্গেই ছিলেন। সেখান থেকে শ্রীমন্নিত্যানন্দই সন্ন্যাসদীক্ষার পর পথ ভুলিয়ে বৃন্দাবনযাত্রী প্রেমবিহ্বল মহাপ্রভুকে শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। পূর্বরাত্রে মা শচী দেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কিছুই জানতে পারেন নি। এ জন্যে পরে মহাপ্রভু ক্ষমা ভিক্ষা করে ভক্তজন ও জননীর অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন যে, "আমার এই ত্রুটির ফলে বিঘ্ন হয়েছে,

বৃন্দাবন যাওয়া হ'ল না। আপনারা অনুমতি দিন"। মহাপ্রভু বলেছিলেন,—

"ভো অদ্বৈতপ্রভৃতয় ইদং শ্রূয়তাং যজ্জনস্থা
যুষ্মাকঞ্চ প্রণয়িসুহৃদামাজ্ঞয়া ন প্রযাতং।
বিঘ্নস্তেন ব্যজনি মথুরাং গন্তুমীশে ন তস্মা-
দাজ্ঞাং সর্বে দদতু কৃপয়া হন্ত যামামিদানীম্ ॥"

অথচ চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে গৃহত্যাগের পূর্বরাত্রে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ও দুঃখবিষাদের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে, রচনা মনোহারিণী হলেও ইতিহাসের দিক থেকে এর সত্যতা বিবেচ্য।

আমরা পূর্বেই বলেছি, নাটক হলেও মহাপ্রভুর লীলা প্রকাশই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এ জন্য এতে তিনটি রীতি অবলম্বিত হতে দেখা যায়। কোথাও প্রভু স্বয়ং প্রকাশিতরূপে দর্শন দিয়েছেন, কোথাযও অন্যেতে আবিষ্ট হয়ে স্ব-প্রকাশ হয়েছেন, কোথাযও বা যোগীর ধ্যানবলে আবির্ভূত হয়ে তার তৃপ্তিবিধান করেছেন। এ সব লীলামাধুরী এবং ঐশ্বর্যপ্রকাশ যেন ক্ষুদ্র হয়ে গেছে রায় রামানন্দের প্রসঙ্গে অবতরণ করে। এখানে মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে দিয়ে যে তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন, তা মরজগতে অভাবনীয় ও বোধাতীত সুখময় বলে প্রতীত হয়। ঐ তত্ত্বটির উদ্ঘাটনে কবির চাতুর্যও প্রশংসনীয়।

রামানন্দের সঙ্গে তত্ত্ব-আলাপনে মহাপ্রভুর এভাবে বিমুগ্ধ হয়ে রামানন্দ স্বকীয় অনুভূতির কথা অকপটে প্রকাশ করতে লাগলেন, মহাপ্রভুর প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রামানন্দ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আবার মহাপ্রভু প্রশ্নের উত্তর চান, যেন হৃদয়-জুড়ানো সে অপার্থিব বস্তুটি, রামানন্দ কোন বক্তব্য খুঁজে না পেয়ে অন্তরে অনুসন্ধান করেন আর বলেন,—এভাবে দু'বার তিনবার চারবার বলেও প্রভুকে তুষ্ট করতে পারেন না। প্রভু কেবলই বলেন—"সমানার্থকমেতৎ" অর্থাৎ—পূর্বকথারই পুনরাবৃত্তি হয়ে গেল, নূতন শোনাও,—চৈতন্যচরিতামৃতের মধুর ভাষা—"এহ বাহ্য আগে কহ আর"। এভাবে মহাপ্রভুই যেন তাঁর মুখ দিয়ে সেই পরম গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করাচ্ছেন। পরিশেষে সে তত্ত্ব প্রকাশিত হ'ল—মধুর রসময় প্রেমের এক অপূর্ব অভিব্যক্তি, যা নিঃশেষে তল্লীনতা, তাঁর প্রেমে আপন-সত্তা হারিয়ে তন্ময়তা, সর্বভেদ বিস্মৃত হ'য়ে মধুরতম একাত্মতা। শ্রীরাধার উক্তি অনুসরণ করে রামানন্দ অনুভূত সে পরমতত্ত্ব শোনালেন,—

"সখি, ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে।
প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ ॥"

"হে সখি, সে রমণ আর আমি রমণী, এই ভেদবোধ পূর্বে আমাদের ছিল না, কারণ দুরন্ত মদন বলপূর্বক প্রেমরসে উভয়ের চিত্তকেই নিষ্পেষণ করেছিল।"

তারপর বললেন,—

"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূ-
ন্মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা;
ভবান্ ভর্তা ভার্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি—
স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্ ॥"

কিন্তু তখন "আমি কান্তা ও তুমি কান্ত"—এরূপ বুদ্ধি ছিল না। যেহেতু তখন চিত্তবৃত্তি লুপ্ত—'তুমি ও আমি' এই ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হয়েছিল। এক্ষণে—'তুমি ভর্তা ও আমি ভার্যা' এরূপ বিসদৃশ বুদ্ধি হয়েও আমার জীবন বেঁচে আছে। এর চাইতে আশ্চর্যের বিষয় আর কি আছে?

এ কথার পর ভগবান্ রামানন্দের মুখ হস্তদ্বারা আবৃত করে দিয়েছিলেন। কারণ, পূর্বার্ধে রাধা-কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত প্রেমের স্বরূপ প্রকটিত হয়েছে, তাকে বিশ্লেষণ করে লঘু করা বা তার রহস্য এ ভাবে ভাষার ব্যাখ্যায় কর্দমাক্ত করা অসঙ্গত এজন্য তাতে অসম্মতি জানালেন। রামানন্দ কি দেখেছিলেন—তা তিনিই জানেন, প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

এ ভাবে এই অপূর্বতত্ত্ব যে সাক্ষাৎ ভগবৎ-স্পর্শ

ব্যতীত কারো দ্বারা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়, দৃঢ়ভাবে তা বোঝাবার জন্যে, এবং যাঁরা তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন বা এই মানুষী তনুতে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষ ও সাকার মূর্তরূপে আবির্ভাবে অবিশ্বাস করেন, তাদের প্রতি কটাক্ষ করে কবি কর্ণপূর ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মুখে অপূর্ব তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত শুনিয়েছেন; যুক্তি দিয়েছেন, যে ধনবান নয় সে অপরকে কখনো ধনী করে দিতে পারে না, নিজে আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দপ্রচুর না হলে [আনন্দময়—এখানে প্রাচুর্যার্থে ময়ট্—বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে] তাঁর দর্শনে অপরের সে আনন্দোদয় সম্ভব হতে পাবে না। সুতবাং মূর্ত কি অমূর্ত—সে বিচার অযোগ্য। কেবল অমূর্তই তত্ত্ব হলে অমূর্ত পদার্থমাত্রই—দম্ভ অসূয়া প্রভৃতিও ভগবত্তত্ত্ব হোক। ব্রহ্মানন্দ ভারতী বলছেন,—

"অমূর্তত্বং তত্ত্বং যদি ভগবতস্তৎকথমহো
মদাসূয়াদীনামপি ন ভগবত্তত্ত্বগণনা।
ন মূর্তামূর্তত্বে ভবতি নিয়মঃ কিন্তু পরমো
য আনন্দো যস্মাদপি স চ স ঈশো মম মতম্ ॥"

তাই দেখা যায পরম বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুক্তহৃদযের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি-স্বাক্ষর এ নাটকে অঙ্কিত রযেছে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্তুতি করে শ্রীগৌরাঙ্গকে জানালেন পত্রসহ শ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রসাদ পাঠিযে—

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥"

ঐ বেদান্তকেশরী ভট্টাচার্য ভগবদ্‌বিশ্বাসে প্রণতি জানালেন আত্মসমর্পণ করে,—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥"

কবি এ নাটকে লীলাকাহিনী যা দেখেছেন ও যা শুনে অবগত হয়েছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন, কোনরূপ কল্পনার আশ্রয় নেন নি, এ কথা সত্য। তিনি নিজেই এ কথা প্রকাশ করে গেছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের কোন সূত্র খোঁজা হীনতার পরিচায়ক। কবি বলেছেন,—

"শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতম্।
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপযা বালেন যেয়ং মযা ॥"

এ গ্রন্থটি সমাপ্ত হয় ১৪৯৪ শকাব্দে; "তস্মিংশ্চতুর্ন-বতিভাজি তদীয়লীলা-গ্রন্থোঽযমাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ"। মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দে আবির্ভূত হয়ে ৪৮ বৎসরে অন্তর্ধান করেন। সুতরাং তিরোধানের ৩৯ বৎসর পরে এ গ্রন্থ রচিত হযেছে।

কবির 'অলঙ্কার-কৌস্তভ', 'কৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী' প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনা সময়ান্তরে প্রকাশ্য।

অপরূপ

শ্রীশৈলদেব চট্টোপাধ্যায়

তুমি আছ শুধু এই কথা জেনে
　　কেমনে নীরব রহিব ?
না খুঁজিয়া মন বোঝে কি কখন;
　　নীরবে কত বা সহিব ?
কুসুমের মালা গেঁথেছি হে কত,
　　ডেকেছি যে কত ইসারায়;
হয়তো বুঝেছ, সাড়া দাও নাই;
　　তবু কেন প্রাণ তোমা চায় ?

মনোমন্দিরে আছ শুনিযাছি :
　　নিত্য নিয়ত কাজে
আমারি মাঝারে আমি-ময় তুমি
　　রাজো বিচিত্র সাজে।
আমারে করেছ মুগ্ধ মৌন,
　　স্তব্ধ করেছ বাণী,
অপরূপ তব রূপের মাঝারে
　　রূপহীন ছায়াখানি।

অবতার-প্রসঙ্গে 'শ্রীম'

ডাঃ শ্রীশান্তিকুমার মিত্র

['কথামৃত'-কার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথোপকথন হইতে সংকলিত]

জনৈক ভক্ত। মহাশয় গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে শ্রীভগবানের উপদেশ তো দেওয়া আছে, তবে তিনি কষ্ট করে আবার অবতার হয়ে আসেন কেন?

শ্রীম। শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশে আছে। টীকা টিপ্পনী করতে গিয়ে ভাষ্যকারেরা ভগবদ্-বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাব ঢুকিয়ে দেন—শ্রীভগবান যা বলে যান—তাঁর লীলাসংবরণের পর কিছুকালের মধ্যেই সব গোলমাল হয়ে যায়। তিনি না এলে শাস্ত্র কে বোঝাবে? আর গীতাতেও তো তিনি নিজে বলেছেন, 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান হয়, তখনই আমি নিজে আবির্ভূত হই।' অবতার আর কে? Highest manifestation of Divinity in man (মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ বিকাশ)। ফিলিপ যীশুকে বললেন 'Rabbi show me the Father' (গুরুদেব, পিতাকে দেখিয়ে দিন)। যীশু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'Phillip, thou hast seen me and not seen the Father? I and my Father are one' (ফিলিপ, তুমি আমাকে দেখেছ, আর পিতাকে দেখনি? আমি আর আমার পিতা এক)। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলতেন, 'এখন আর এর ভিতরে আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। এক একবার ভাবি আমিই তিনি, আর তিনিই আমি।' ঠাকুর আমাদের বলতেন, ব্যাকুল হয়ে তার জন্য কাঁদলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, ছুটে এসে দেখা দেন। যীশুও শিষ্যদের বলেছিলেন, Knock and it shall be opened unto you, seek and thou shalt find, (আঘাত কর—দরজা খুলে যাবে, খোঁজ—তাহলেই পাবে)।

কাশীপুরের বাগানে একদিন তিনি বললেন, 'কই রামলাল শিবরাম এদের কথা তো মনে পড়ে না। ভক্তদের জন্যই ভাবনা—এরাই আপনার লোক।' যীশুও শিষ্যদের নিয়ে বসে আছেন। একজন এসে বললে, 'আপনার মা ভাই—এঁরা সব এসেছেন' তিনি শিষ্যদের দেখিয়ে বললেন, এরাই আমার বাপ মা ভাই বন্ধু।

জনৈক ভক্ত। মহাশয়, আলবার্ট হলে একজন বক্তৃতা দিচ্ছেন; তিনি নাকি অবতার—সকলে বলছিল। অনেক আশ্চর্য কাজ করতে পারেন।

শ্রীম। ভাল কথার মন্দও ভাল। আজকাল কি যে হয়েছে—একটু হয়তো সাধন-ভজন করেছে, অমনি সে অবতার। অবতার কি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ এত ঘন ঘন আসেন না। They are not so frequent as blackberries. ধর্মের গ্লানি কি অধর্মের উত্থান হলে তিনি আসেন। সাধারণ জীব কর্মফলে দেহাদি ধারণ করে, কিন্তু তাঁর দেহ ধারণ,—কর্মফলের জন্য নয়। "ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি, ন মে কর্মফলে স্পৃহা"। আর সিদ্ধাই-এর কথা যদি বল—অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলেও তাঁকে পাওয়া শক্ত। ওগুলোতে তাঁকে ভুলিয়ে দেয়। কাশীপুরের বাগানে দেহরক্ষার কিছুদিন আগে স্বামীজী উত্তম আধার বলে, ঠাকুর তাঁকে ঐ সব ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজী যেই শুনলেন, ঐগুলিতে তাঁকে পাওয়া যাবে না, বরং ভুলিয়ে দিতে পারে, তখন তিনি ঐ সব ক্ষমতা নিতে অস্বীকার করলেন।

আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, কলকাতা—সব যেন এক হয়ে যাচ্ছে! তিনি এসেছিলেন কিনা—তাই এত! এখন ডাঙ্গায় একবাঁশ জল, যেমন বন্যার সময় হয়—যেখান সেখান দিয়ে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাও—কোনও বাঁধাধরা রাস্তা নেই। The atmosphere is surcharged

with spirituality (বায়ুমণ্ডল আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ) সাঙ্গোপাঙ্গ এখনও অনেকে বর্তমান।

জনৈক ভক্ত। তাই তো বলি, এত সাধুসঙ্গ পেয়েও যদি কিছু না হয় তো আমাদের দুর্ভাগ্য।

শ্রীম। সাধারণতঃ ভোগের শেষ না হলে তাঁর দিকে মন যায় না। তবে সাধুসঙ্গ কি সংকাজের ফল কিছুই নষ্ট হয় না; সব তোলা থাকে, জন্মান্তরে ঠিক ফুটে বেরুবে। আর এখন—সব নিয়ম-কানুনের সীমারেখার বাইরে। যেমন বিশেষ কিছু উপলক্ষ্যে General amnesty (মার্জনা) দিয়ে অনেক কয়েদীকে সরকার একবারে মুক্তি দিয়ে দেন। এই সুযোগ যে নিতে পারবে তার হয়ে যাবে।

জনৈক ভক্ত। মহাশয়, কিছু ত বুঝতে পাচ্ছি না। এক একবার ভয় হয়, মনে হয় মৃত্যু তো আসছে, আর বয়সও হ'ল, এখন না হ'লে আর কবে হবে?

শ্রীম। ওগো! সত্যি বলছি, তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন। গিন্নি জানে—কোন হাঁড়ির উপর কোন সরা রাখতে হয়, কেন ভেবে মরছ? কেমন জান? টিকিট কেটে একজনকে 'কাশী যাওয়ার জন্য ট্রেনে বসিয়ে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ বাদে লোকটির ঘুম এসে গেল। কাশীতে পৌঁছেও ট্রেনে শুয়ে শুয়ে সে মনে করছে কলকাতাতেই রয়েছি, কিন্তু সত্যই সে কাশী পৌঁছে গেছে।

ভক্ত। আজ্ঞে, কাশীতেই যদি পৌঁছে গেলুম, ঘুমটা একটু আগে নেড়েচেড়ে ভেঙ্গে দিলেই তো হয়।

শ্রীম। ঘুমও ভাঙবে, সবই হবে, তাঁর কাছে যে শরণাগত তার আবার ভয়-ভাবনা কি? তবে মন মুখ এক করতে হয়। প্রার্থনা যদি আন্তরিক হয় তিনি একশ বার শুনবেন। ভক্ত আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে ভাবলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, ছুটে এসে তাঁকে দেখা দিতে হয়—তাই তো বলে—তিনি ভক্তাধীন। দেখ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য-মনের অতীত, তাঁকে ধরা ছোঁয়া যায় না, তিনি কিন্তু ভক্তিতে ভক্তের কাছে বাঁধা। তাই তিনি নিরাকার আবার সাকারও বটে।

ভক্ত। এটা কি করে সম্ভব?

শ্রীম। তিনি সাকার নিরাকার আরও কত কি? Intellect was weighed in the balance and found wanting. (বুদ্ধিকে ওজন করা হয়েছে—দেখা গেছে কম পড়ে যায়)। তাঁকে কি গজ ফিতে নিয়ে মাপা যায় গা? অনন্ত কাণ্ড! আর দেখ না স্কুলেও Algebra (বীজগণিত) কষেছ: $x^2 = 16$, সমাধান করলে, $x = +4$ আবার $x = -4$, এটি কি করে সম্ভব—(একই জিনিষের দুরকম এবং বিপরীত সমাধান।)? তিনি অবতার হয়ে এলেও নিজে ধরা না দিলে কি কেহ তাঁকে ধরতে পারে? শুভ সংস্কারও দরকার।

(সহাস্যে) বেগুনওয়ালার গল্পটি মনে পড়ছে। একজন হীরে নিয়ে বেগুনওয়ালার কাছে গেছে। হীরের বদলে সে ন' সেরের বেশি বেগুন দিতে কিছুতেই রাজী হল না। তার পর কাপড়ওয়ালার কাছে গেল, সে ন'শো টাকা পর্যন্ত উঠল।

শেষে এক জহুরীর কাছে গেল। সে কিন্তু একেবারেই একলাখ টাকা দিতে চাইলে, জহুরী না হলে কি হীরে চিনতে পারে? সংস্কারও খানিকটা থাকা চাই।

যীশু যেতে যেতে দেখলেন—কতকগুলি লোক মাছ ধরছে; 'কি করছ?' জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে, 'মহাশয়, মাছ ধরছি।' তাদের অনেকেই যে শুভ-সংস্কারবান্ পুরুষ—যীশু তা বুঝতে পেরেছিলেন; বললেন, 'তোরা চলে আয়, কি করে মানুষ ধরতে হয় আমি তাই তোদের শেখাব।' (I will make you fisher of men) অমনি তারা সব ছেড়ে দিয়ে যীশুর পিছন পিছন চলতে লাগল। এরাই হচ্ছে pillars of Christianity—(খ্রীষ্টধর্মের খুঁটি)। ঠাকুরের

কাছে যারা এল, তাদের সকলেই তো সাধু হয়ে যেতে পারলে না—যারা পারল, তারাই জগৎটাকে তোলপাড় করে দিল। তাদের বিশ্বাস ভক্তি জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য দেখে লোকে অবাক হয়ে গেল!

অবতার না এলে এ সব কথা ধারণা করা যায় না, আর তিনি যখন আসেন সঙ্গোপাঙ্গদেরও সঙ্গে নিয়ে আসেন—তাঁর কাজের সহায়তার জন্য। অবতার যেন সূর্য—পার্ষদরা যেন চন্দ্র। চাঁদের ত আলাদা আলো নেই, সূর্যের আলোতেই চাঁদের আলো। অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করা যায় না,—এক নির্বিকল্প সমাধিতে ছাড়া। Finite (সীমাবদ্ধ) মন দিয়ে কি Infinityর (অসীমের) *ধারণা হয়? একসেরা ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে?* তবে তিনি বলতেন—শুদ্ধ আত্মা ও শুদ্ধ বুদ্ধি এক, তাই দিয়ে তাঁকে ধরা যায়। এ সব বিচার করে বোঝা যায় না, তাই তিনি কৃপা করে অবতার হয়ে আসেন। তাঁকে দেখলে, তাঁকে ভালবাসলে সংশয়শূন্য হওয়া যায়। দেখ না গোপীদের: উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এসেছেন শুনে ছুটে যাচ্ছে—কাঁটায় পা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে, কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে, গা কেটে রক্ত পড়ছে—সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শ্রীমতী নীল রঙের মেঘ দেখে বাহ্যজ্ঞানশূন্য—কেননা শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রঙ এই রকম,—কি টান! এতটা সাধারণ মানুষে সম্ভব না হলেও এর অন্ততঃ খানিকটা টান আর দৃঢ় বিশ্বাস চাই। কিন্তু তার কৃপাও অনেক তপস্যার জোর *না থাকলে হয় না। বিশ্বাস হ'ল last stage* (শেষ অবস্থা)।

কবীর-বাণী

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

("রাগকী চোট লগী হ্যায় তন মে"—ভাবানুবাদ)

প্রেমের রাগিণী গাহিয়া চলেছ
হে মোর প্রেমিক স্বামী,
তনু মন মোর হ'ল যে বিকল
কি আর কহিব আমি!

সুখ নাহি মনে সুখ নাহি ঘরে
সুখ নাহি বন মাঝে।
খুঁজে খুঁজে সারা আমি তোমা হারা
মন নাহি কোন কাজে!

বেদনার লাগি ঔষধ কত
করিনু সেবন প্রভু,
রোগী মম সম বৈদ্য তোমা সম
দেখি নাই আর কভু।

দরশন বিনা বিরহীর প্রাণ
কিরূপে বাঁচিবে আর,
কবীর কহিছে সদ্‌গুরু যিনি
দেখা যদি পাও তাঁর—
নয়ন ব্যতীত দেখাবেন প্রিয়
কিবা সে চমৎকার।

'আমি' কে ?

স্বামী জীবানন্দ

যেদিন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম সেদিন জগৎ তার বিচিত্র রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিল। ধরণীর সেই প্রথম স্পর্শ, আলোর হাসি, বাতাসের সেই আলিঙ্গন কতই না ভাল লেগেছিল সেদিন! চারিদিকে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি—সৌন্দর্যের পূজারী হয়ে হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে—ভুলে গিয়েছি আপনার স্বরূপ। মাটি জল আগুন বায়ু আকাশ—এই পঞ্চভূতের তৈরী পৃথিবীতে পেলাম স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা, প্রাণের বন্ধু, আরো কত কি। মাটিতে গন্ধ, জলে রস, অনলে রূপ, বাতাসে স্পর্শ, আকাশে শব্দ জানিয়ে দিয়েছে তাদের অস্তিত্ব। চক্ষুতে রূপের, কর্ণে শব্দের, জিহ্বায় রসের, ত্বকে স্পর্শের অনুভূতির পর অনুভূতি হয়ে চলেছে। এই পাঁচটি সহজবোধের শক্তি নিয়েই জন্মেছি। মোটামুটি কাজ চালিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে এই বোধের সম্বলই যথেষ্ট। চারিদিকে যা কিছু রয়েছে তার সাধারণ খবর এই সহজবোধের ভিতর দিয়েই পাই—কিন্তু এ সবই তো বাইরের খবর ; তাই ভিতরের খবর জানবার জন্যে বোধের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ক'রে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়েই চলেছি।

বাইরের জগতে তৃপ্ত হয় না মন—প্রশ্ন জাগে : আমি কে? কোথা হতে এসেছি, যাবই বা কোথায়? এ প্রশ্ন শুধু আমারই নয়, যুগ যুগান্তর ধরে—এই হ'ল মানুষের শাশ্বত জিজ্ঞাসা। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত ক'রে কত ভাবে যে এর সমাধান করতে চেষ্টা করেছে তার অন্ত নেই।

ছোটবেলায় ছিলাম যে আমি—বড় হয়েও তো সেই একই আমি—শরীর মনই বড় হয়েছে, 'আমি'র তো কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে এ 'আমি' কে?

ঘরের মধ্যে ছিলাম—বাহির থেকে বন্ধু ডাকল, 'ঘরে কে?' সাড়া দিলাম, 'আমি'। আর একদিন বাহিরে ছিলাম, ঘরে ছিল বন্ধু। ডাকলাম,—ঘরে কে? উত্তর এল—'আমি'। উভয়ের এই সাধারণ 'আমি'টি কে? এই উভয়ের সাধারণ আমি যে সকলেরই সাধারণ 'আমি'! কে এই 'আমি'?

দিনের বেলায় জেগে থাকি—কত কি দেখছি, কত কি চোখে পড়ছে। রাত্রে যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন কোথায় থাকে দিনের বেলার এই দৃশ্য জগৎ? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম—পুষ্পক রথে চড়ে দেশ বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গে পৌঁছে গেছি—সেখানে ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। ঘুম ভেঙে গেল—জেগে উঠলাম—কোথায় মিলিয়ে গেল পুষ্পক-রথ, স্বর্গলোক, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ। তবে স্বপ্নে কে সৃষ্টি করেছিল এই সব? জাগ্রতের জিনিস স্বপ্নে অদৃশ্য হয়—স্বপ্নের জিনিসও জাগরণে হয় বিলুপ্ত, তবে তো দুই-ই সমান অস্থায়ী! আবার যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হই, তখন তো কি জাগ্রতের জগৎ, কি স্বপ্নের জগৎ সবই অন্তর্হিত! গভীর ঘুম থেকে উঠে বলি,—আঃ, কী ঘুমই ঘুমিয়েছিলাম! এই যে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অনুভবিতা কে ইনি? কে জেগে জগৎ দেখেছিল? আমি। কে স্বপ্নে স্বর্গাদি দেখেছিল? আমি। কে সুষুপ্তির সুখভোক্তা? আমি। তিনটি অবস্থারই দ্রষ্টা সাক্ষীস্বরূপ 'আমি'! কে এই 'আমি'?

স্কুলে শিক্ষকতা করি, সেখানে সকলের কাছে মাস্টার মশায় ব'লে পরিচিত। বাড়ীতে হোমিও-প্যাথিক প্র্যাকটিস্ করি—যাদের চিকিৎসা করি তারা ডাক্তার বলে। মাঝে মাঝে ইন্‌সিওরেন্সের কাজও করি—অনেকে তাই ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্ট মনে করে। বাড়ীর ছেলেরা কেউ দাদা বলে, কেউ কাকা। একই 'আমি' কোথাও শিক্ষক, কোথাও ডাক্তার, কোথাও এজেন্ট ; কখনও দাদা, কখনও

কাকা। একই আমি—কারো পিতা, কারো পুত্র; কে এই 'আমি'?

দেখছি দুটি 'আমি' রয়েছে—একটি 'আমি' শরীর-মনকে কেন্দ্র ক'রে কেবল আমার আমার ক'রে মরছে—ধন-জন-মানের চিন্তায় সদাই ব্যস্ত, কাম-ক্রোধ-লোভে পর্যুদস্ত, অনবরত শোকগ্রস্ত, মূঢ় মোহাচ্ছন্ন। আর একটি 'আমি' সর্বদা একভাবে থেকে আগের 'আমি'টি কি করে লক্ষ্য ক'রে চলেছে—কেমন সে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় লাফালাফি করে। কে এই সাক্ষী দ্বিতীয় 'আমি'?

প্রথম 'আমি'টি তো দ্বিতীয় 'আমি'র সঙ্গে মিলতে পারছে না—মিললেই যা-কিছু গোলমাল মিটে যায়. কিন্তু পারছে কই? সময় সময় মেলবার যে চেষ্টা করে না, তা নয়—যখন অতি প্রিয়জন ছেড়ে যায়, কাল যখন ছিনিয়ে নেয় তাকে, তখন মনের টনক নড়ে ওঠে, তখনই সে বুঝ'তে চেষ্টা করে—কে আমি। সে চেষ্টার মূল্য আর কতটুকু? আবার যে কে সেই। মন যেন স্প্রিংএর গদি।

যে শরীরটিকে এত ভালবাসি তা কত দিনই বা থাকবে। আজ হয়তো কোন অঙ্গ বিকল হ'ল, ক'দিন পরে অপর একটি অঙ্গও জবাব দেবে শক্তি নেই ব'লে। একটি একটি ক'রে চোখ কান নাক হাত পা সবই হয়তো শক্তিহীন হয়ে পড়বে কিংবা এক দিনেই একসঙ্গে সব অসাড় হবে। তবু তো শরীরে আমিত্ব-বুদ্ধি যাচ্ছে না। একটি কাঁটা ফুটলে—শরীরটি একটু অসুস্থ হলে সব বিচার গুলিয়ে যায়—আসল 'আমি'কে ধরার চেষ্টা যেন ব্যর্থ হয়। এমনি মায়া!

সুখ-দুঃখ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলার পথে এগিয়ে চলি—উঠে পড়ে থেমে আবার উঠি, জীবনের পথে অবিরাম চলি, কখনো বা কাঁদি কখনো হাসি। বিচারও একবারে থামে না, চলতে থাকে:

স্থানকে মানুষ সীমাবদ্ধ করেছে, স্থানও মানুষকে সীমাবদ্ধ করেছে: এটি আমার বাড়ী, প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখেছি; ওটি তোমার, তুমিও তোমার বাড়ীর সীমানা সম্বন্ধে সচেতন। এটি আমার গ্রাম—আমার প্রদেশ—আমার দেশ। তোমারও এইরকম। সময়েরও মানুষ গণ্ডী টেনেছে নানা-ভাবে—সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা মাস বছর যুগ ইত্যাদি নাম দিয়ে। অনন্তকালের মধ্যে আমার আয়ু মাত্র কয়েকটি বছর—এই বৎসর কয়টির আগে সময়ের কত বছর ছিল জানি না, পরে যে কত আছে তাও জানা অসম্ভব। শুধু আমার জীবনের এই সময়টুকুর সম্বন্ধেই আমার জ্ঞান—এর আগে পরে সবই অন্ধকার! সাক্ষী 'আমি'টি কিন্তু—সব দেশে সব কালে একই ভাবে রয়েছে, দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ হচ্ছে না। সর্বস্থানে সর্বকালে একই প্রকার। দেশে কালে অপরিবর্তনীয় এই 'আমি'টি কে?

সংসারের সব কিছুরই স্রষ্টা আছে, কিন্তু দেশ-কালে অপরিচ্ছিন্ন 'আমি'টির স্রষ্টা কে? যা কিছু দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ তারই সৃষ্টি—তারই স্রষ্টা। তবে তো সাক্ষী 'আমি'র সৃষ্টি হয় নি,—তার সৃষ্টি-কর্তাও নেই। কে এই দ্রষ্টা 'আমি', যার স্রষ্টা নেই?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'আমি কে?' ভালরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় 'আমি' ব'লে কোন জিনিস নেই। হাত পা রক্ত মাংস ইত্যাদি—এর কোন্‌টা 'আমি'? যেমন পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে 'আমিত্ব' ব'লে কিছু পাইনে! শেষে যা থাকে আত্মা—চৈতন্য।

বিচারের ফলে দেখা যায় দেশ-কালে সদা একরূপ—এই সাক্ষী 'আমি'ই আত্মা বা ব্রহ্ম।

তবে এই 'আমি'কে আত্মস্বরূপ ব'লে উপলব্ধি হচ্ছে না কেন? অজ্ঞানে স্বরূপ ঢাকা রয়েছে যে!

আবছা অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে চলেছি—পথে একটি দড়ি পড়ে আছে, লাফিয়ে উঠলাম—সাপ!

কিন্তু যখনই ভ্রম ভেঙে গেল—বুঝলাম—একটা দড়িকে ভুল ক'রে সাপ মনে করেছি, তখন কী লজ্জা! সেইরূপ নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবটিকে ভুলে আজ এই দশা হয়েছে। কবে এই ভুল ভাঙবে?

আত্মা সূর্যের মত সদা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। দেহে আমিত্ববুদ্ধি-রূপ অজ্ঞান-মেঘ সেই স্বয়ং-প্রকাশকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। মত্ত অবস্থায় মাতাল অনেক কিছু দেখে, প্রকৃতিস্থ অবস্থার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। মত্ততা চলে গেলে নেশার ঝোঁকে দেখা সবই মিথ্যা হয়ে যায়। রূপাদি বিষয়ভোগে মত্ত হয়ে কত ভুল দেখে চলেছি—শত্রুকে বন্ধু, আবার বন্ধুকে শত্রু মনে করছি—ত্যাজ্যকে গ্রহণ করেছি, আর গ্রহণীয়কে ত্যাগ করেছি। এ মত্ততা—এ ভ্রম যাবে কবে, ও কিভাবে?

মরুভূমিতে তপ্ত বালির উপর বায়ুমণ্ডলে সূর্য-কিরণের প্রতিসরণের ফলে হয় মরীচিকার সৃষ্টি, বৃক্ষচ্ছায়া দেখে মনে হয়, দূরে ঐ শীতল জল টল টল করছে, ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কত আশায় তৃষ্ণার্ত পথিক ছুটে যায় বুক-ফাটা পিপাসা নিয়ে জলপানের জন্যে। কিন্তু জল কোথায়? রঙীন আশার সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে, যা সত্যই নেই, তার পিছনে এমনিভাবে ছুটে ছুটে পরিশ্রান্ত হয়ে মূর্ছাহত হয়ে পড়ে যায়। জীবন পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী জেনেও এই ছোটার বিরাম নেই! নাম-রূপের পারে, মায়ামরীচিকার পারে শুদ্ধ 'আমি'টিকে উপলব্ধি ক'রে এই ছোটার অবসান হবে কবে?

জ্ঞান

শ্রীকালীপদ কোঙার

জেন্দাবেস্তা অনেক পড়েছ
কোরান করেছ শেষ,
বাইবেল, ত্রিপিটক ও পুরাণ
নাহি কিছু অবশেষ।

বন্ধু, আজকে শোনো:
পুঁথিপাঠ থাক বাকী,
জীবন-বেদের পাতা উল্টাও
'আত্মা'কে জান দেখি।

তোমার সকল জানাজানি জেন
শেষ হয়ে যাবে তবে,
সকল জানার সর্বশ্রেষ্ঠ
নিজেরে জানিবে যবে।

দর্প ছাড় এবার;
জ্ঞান-অগ্নিতে দগ্ধ হউক
তোমার অহংকার।

দৃষ্টি ফিরাও

ওমর আলী

ফিরাও ভ্রান্ত দৃষ্টি তোমার
শূন্য আকাশ হ'তে!
হেথা চেয়ে দেখ—এ মাটির বুকে
কত না ক্ষুণ্ণ মন,
কত সুরম্য খেলার আবাস
ভেসেছে জটিল স্রোতে,
দুঃসহ ব্যথা ভগ্ন জীবনে,
তাপের দুর্দহন।
হে বীর সাধক তোমার দৃষ্টি
নিবদ্ধ হোক হেথা
তোমার দুহাত টানিয়া তুলুক
পতিত সর্বজনে
তোমার শৌর্য বীর্য দেখাও
অত্যাচারীরা যেথা
সুদূর পিয়াসী তোমার ছায়াটি
পড়ুক নিকট মনে।

মহাতপস্বিনী গৌরী-মা

শ্রীসুবোধ রায়

রবীন্দ্রনাথের একটি গান এই প্রার্থনার মধ্যে শেষ হয়েছে—

'বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা, আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা,
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি আশে।'

মহাতপস্বিনী গৌরী-মার কথা যখন ভাবি, তখন কবির উদাত্ত সঙ্গীতের এই প্রার্থনাটি যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ভাস্বর হযে ওঠে। মহাজাগতিক প্রাণ-প্রবাহ অসংখ্য জীবন প্রত্যহ বুদ্বুদের মতই ভেসে উঠে, দুদণ্ড পরে আবার মহাসমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। এরি মধ্যে আবার দু'একজন আসেন, যাঁরা উত্তাল সমুদ্রে বিভ্রান্ত ও বিপন্ন যাত্রীদের দিগ্‌দর্শনে সাহায্য করার জন্য 'আলোক স্তম্ভের' মত আলোক-ধারা বিকীরণ করে, ধর্ম-স্থাপন-কার্যে এঁরাই ভগবানের লীলাসহচর। এঁরাই যুগস্রষ্টা, সমাজকে জাতিকে দেখান নূতন পথ, যুগোপযোগী নবব্রত উদ্‌যাপনে মানুষকে করেন উদ্‌বুদ্ধ।

কিন্তু একাজ তো সুখের নয়। ঘরের আরাম-শয্যা ত্যাগ করে কণ্টক-বন্ধুর দুর্গম পথে এঁদের যাত্রা করতে হয়। বিধাতার যজ্ঞশালায় দুশ্চর তপস্যার হোমকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়ে এঁরা এঁদের জীবনব্রত সমাপন করেন। মহাতপস্বিনী গৌরী-মা আমাদের সামনে, বাংলার নারীকুলের সামনে এই আত্মাহুতির আদর্শই রেখে গেছেন।

সুপবিত্র ভারততীর্থে যুগে যুগে যে সব অবতারের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মহাজীবন-কথা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে—তাঁরা যখন আসেন, তখন তাঁদের লীলা-সহচরদের সঙ্গে করেই নিয়ে আসেন। এই সব শুদ্ধাত্মা বাল্যকাল থেকেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অথচ যেন অনিবার্যভাবে কোন এক অতিলৌকিক জীবনের আকর্ষণ অনুভব করেন। প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার মোহ কিছুতেই তাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। কোন এক মহতী অভীপ্সা তাঁদের ব্যাকুল করে, পাগল করে এবং পরিশেষে তাঁদের অন্তরে অদম্য সাহস ও অচলা নিষ্ঠার সঞ্চারপূর্বক ত্যাগের ব্রতে দীক্ষিত করে।

গৌরী-মার জীবন ও সাধনার মর্মকথা বুঝতে হলে এই আলোকে তাঁর তপস্যা ও কর্মের পর্যালোচনা প্রয়োজন। তাঁর জীবনের আলোচনায় এই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি নজরে পড়ে।

এক নিষ্ঠাবান আদর্শ গৃহস্থের ঘরে ব্রাহ্মণের কুলে তাঁর জন্ম। তাঁর জননী গিরিবালা দেবীর মমতাময় ভক্তিনিষ্ঠ অথচ তেজস্বী স্বভাব তাঁর চারিদিকে একটি উন্নত জীবনের উপযোগী পরিবেশ রচনা করেছিল। অতি অল্প বয়সে বোধ হয় তখন তাঁর বয়স দশেরও কম—মিশনারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী কুমারী মিলম্যানের সহিত ধর্মবিষয়ে তাঁর মতানৈক্য এবং প্রতিবাদে বিদ্যালয় ত্যাগ থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর মনে ইতিমধ্যেই পারিবারিক আদর্শানুযায়ী স্বধর্মনিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন ঘটেছে।

দশ বৎসর বয়সে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে রামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহার আশীর্বাদ 'কৃষ্ণে ভক্তি হউক'—তাঁহার হৃদয়ে মহৎ জীবনের বীজ বপন করে। এক অদৃশ্য মহাভাবের বাঁধনে গুরু শিষ্যার হৃদয়কে বাঁধলেন। তাই এক অলক্ষ্য আকর্ষণে তিনি কয়েকদিন পরে নিমতে ঘোলায় উপস্থিত হয়ে ভাব-সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আবার দেখলেন এবং তাঁর কাছে পরদিন দীক্ষা গ্রহণ করলেন। সেই দিন থেকেই তিনি মহৎ জীবনের জন্য চিহ্নিত হলেন।

তের বৎসর বয়সে বিবাহে অসম্মত হয়ে বিবাহের দিনেই মাতার সাহায্যে তাঁহার গৃহত্যাগ থেকেই

প্রমাণিত হয় মাতা তাঁর ধর্মজীবন-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কত বড় সহায় ছিলেন।

তার কিছুদিন পরেই আবার গঙ্গাসাগর-তীর্থ থেকে যে ভাবে তিনি আত্মীয়স্বজনের দৃষ্টি এড়িয়ে নিঃসম্বল ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় দুঃসাহসিক তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন—তা থেকেই বোঝা যায় ইতিমধ্যেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে—তাঁর স্বভাব ইস্পাতকঠোর সাহস নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসে সুগঠিত ও সুরক্ষিত হয়ে গেছে। দুর্গম পথের অসহনীয় দুঃখকষ্ট, অনাহার, বিপদ প্রভৃতি কিছুই তাঁকে তাঁর সংকল্পচ্যুত করতে পারে নি।

এর পর থেকে অসংখ্য বাধা অতিক্রম করে তপস্যার দ্বারা আত্মসিদ্ধি লাভ এবং দীর্ঘকাল পরে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে আবার গুরুশিষ্যার অভাবিত মিলন সে এক বিস্ময়কর অলৌকিক কাহিনী। এর পর তিনি ক্রমে ক্রমে কিভাবে গুরুর নির্দেশ অনুসারে বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে প্রাচীন ধর্মানুপ্রাণিত আদর্শের ভিত্তির উপরে নারীশিক্ষার যুগোপযোগী ইমারত প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, সে অপরূপ জীবনকথা ঘরে ঘরে যদি আলোচিত হয়, তাহলে আমাদের অশেষ কল্যাণ হবে বলেই মনে করি।

আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি বলে আমাদের মনে একটি মূঢ় বাস্তববোধের অহংকার জেগেছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরে কোনও সত্যকেই আমরা সহজে স্বীকার করি না। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন, জগদীশ বসু, সি. ভি. রামন্ প্রভৃতি সকলেই স্বপ্নদ্রষ্টা। যে সত্য তাঁরা প্রতিষ্ঠা করবেন, প্রথমে তাঁর একটি জ্যোতির্ময় প্রতিভাস জাগে তাঁদের অন্তরে। তাঁরা আহার নিদ্রা ভুলে, কঠোর সাধনা করে সেই অস্পষ্ট নীহারিকা-মণ্ডলী থেকে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার করেন। গৌরী-মার অন্তরে গুরুর আদেশে নারীশিক্ষার যে স্বপ্নাদর্শ জেগেছিল, একক নিঃসম্বল অবস্থায় নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে নীরবে লড়াই করে সেই স্বপ্নকে তিনি বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করেন; শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম সেই মহাজীবন-স্বপ্নের ভাস্বর মূর্ত বিগ্রহ। যুগাবতার রামকৃষ্ণ এবং যুগমাতা সারদামণির দিব্যাশিস্‌দীপ্ত প্রাতঃস্মরণীয়া পূতচরিত্রা মহাতপস্বিনী গৌরী-মাকে আজ বারে বারে প্রণতি জানাই।

গৌরী-মাতা

শ্রীগৌরী সিংহ

এ ভারত তপোভূমি; প্রতি ধূলিকণা
প্রতি জনপদ বন করিছে ঘোষণা,
অমর আনন্দবাণী। গম্ভীর উদার
প্রসন্ন ত্যাগের মন্ত্র প্রেমে বারংবার
উচ্চারে জীবন-যজ্ঞে। ছাড়ি রাজ্যধন
তপস্বী সে বারবার করেছে ভ্রমণ
দুর্গম প্রান্তরে বনে। ভূমানন্দ লাগি
পথে পথে ফিরিয়াছে, নিঃসঙ্গ বৈরাগী।
সঞ্চিত তপস্যা তার রেখে গেছে দান,
গৃহে, পথে, কর্মমাঝে—অমৃত সন্ধান।
যে তপস্যা মূর্তি ধরি এলো আরবার
তোমার জীবন মাঝে। অসীম অপার
কঠিন সাধনা তব। দুর্গম বনানী,
নির্ঝর, প্রান্তর, গিরি, কহিছে কাহিনী;
তোমার তপের কথা। তব পুণ্যব্রত—
অর্জিত তপস্যা তব, রেখে গেছ যত
নারীর কল্যাণ তরে। হোমানল-শিখা
জ্বালিয়াছে গৃহাঙ্গনে কল্যাণবর্তিকা।
অমৃতের বার্তা লয়ে এসেছ জননী,
গৌরী তুমি, মাতা তুমি, মহা তপস্বিনী।

'বিল্বমঙ্গলে' গিরিশ-পরিচিতি

শ্রীকামেশ্বর মিশ্র

উচ্ছৃঙ্খল শিষ্য গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে গুরু রামকৃষ্ণের প্রভাব ক্রমপরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ভক্তির উপ্ত বীজকে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও পুষ্পিত করিয়াছিল। গিরিশ-রচিত 'বিল্বমঙ্গলের' অভিনয় ভক্তিসৌরভে একদিন বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতাকে মাতাইয়াছিল। 'বিল্বমঙ্গল' বাদ দিলে গিরিশচন্দ্রের জীবনীও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

পরমহংসদেব গাহিতেন—

'শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই
শ্যাম বাজালে বাঁশী আমার প্রাণ করে উদাসী।'

বিল্বমঙ্গলে গিরিশচন্দ্রের পাগলিনী গাহিতেছে—

'যাইগো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথপানে চায়
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মান ভরে।'

পাঠকের বুঝিতে বাকী থাকে না এ পাগলিনী কাহার স্বরূপ। এই গান চিন্তামণিকে উদাসিনী করিয়াছিল; আর সেই চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে বলিয়াছিল, 'আমার মত অপদার্থের প্রতি তোমার এই তীব্র প্রেম কৃষ্ণে অর্পণ করিলে তোমার সদ্গতি হইবে।' স্বহস্তে চক্ষু বিদ্ধ করিয়া বিল্বমঙ্গল অন্ধ সুরদাস হইলে তাহার পথপ্রদর্শক হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। রাখাল বালক বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে গাহিল—

'আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব
খেলব কত ছুটোছুটি বাঁশী বাজাব।'

বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে পথ দেখাইয়া সে অন্ধকে বৃন্দাবনে পৌঁছাইয়া দিল। সেখানে সুরদাস সাধনা আরম্ভ করিলেন।

সাধনার প্রতিবন্ধক বলিয়া পরমহংসদেব কামিনী-কাঞ্চন সর্বথা ত্যাগের উপদেশ দিতেন। গিরিশচন্দ্র গুরুর প্রতীক উদাসীন সাধু সোমগিরিকে অবতরণ করাইয়া শিষ্যবর্গকে উপদেশ দেওয়াইতেছেন:

'কামিনী-কাঞ্চন—এক মায়া দুইরূপে করে অন্বেষণ
বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হয়ে।
সেই মহাজন, এ বন্ধন যে করে ছেদন—
অবহেলি কামিনী কাঞ্চন, নিরঞ্জন করে আশ।'

শেষে এই সোমগিরির সহিত বিল্বমঙ্গলের মিলন হইল। বৃন্দাবনে সেই মিলনে অন্ধের দিব্যচক্ষু উদ্ঘাটিত হইল, গোলোকে কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া সশিষ্য গুরুদেব সোমগিরির সহিত সুর মিলাইয়া বিল্বমঙ্গল গাহিতেছেন—নাটকের শেষ দৃশ্যে:—

জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা, জয় গোবর্ধন চেতনশিলা
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।
চেতন যমুনা, চেতন বেণু, গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত ধেনু,
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।
খেলা খেলা, খেলা মেলা, নিত্য নিরঞ্জন ভাবুক ভেলা,
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।

পূর্বে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অভিনয় করিয়া ও রঙ্গমঞ্চে তাহা অভিনীত হইতে দেখিয়া সাধারণ ভাবেই তৎকালে এই গানের ভাব গ্রহণ করিয়াছি।

বৃন্দাবন-লীলা, গোবর্ধন-পর্বত কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ধারণ, বনে ও কুঞ্জে কৃষ্ণের মুরলী বা বেণু ধ্বনির ব্যাপ্তি, তাঁহার বালক সহচরগণের ও কিশোরী গোপিকাগণের সহিত নানারূপ চতুরালী খেলা যেন খেলারই মেলা। গানে এই সমস্ত বর্ণনা করিয়া শেষে, কবি বলিলেন, এ সমস্তই নারায়ণেরই খেলা—তিনিই নিত্য, অব্যক্ত, বিবেকী ভাবুকের ভবার্ণব তরণের তরণী। এই গানটি দ্ব্যর্থবোধক।

তত্ত্বজ্ঞ গুরুর প্রসাদে যখন দ্ব্যর্থবোধক এই গানটির অন্তর্নিহিত মর্ম উদ্ঘাটিত হয়, তখন গিরিশচন্দ্রকে নূতনরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্বগুণান্বিত কোন কোন মানব-শ্রেষ্ঠের বা কোন সম্রাটের জয়গান লোকে করে, সেইরূপ যে অনাম কারণসত্তা বা আধার হইতে জাগতিক এই বিভিন্ন রূপের উদ্ভব হইয়া সৃষ্টি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—সেই উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তিরই জয়গান করা হইয়াছে এই সঙ্গীতে। জীবজগতের মূল বা আধারকে নারায়ণ বলিয়া সাধারণের বোধগম্য করানো হইয়াছে। গ্রামে গৃহস্থদের বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকে, সর্বত্র প্রথমে নারায়ণ বা শালগ্রাম শিলার স্থান। তাহার পার্শ্বে গোবিন্দ, শ্যামসুন্দর, রাধাবল্লভ, গোপাল ইত্যাদি নানা মূর্তিধারী বিগ্রহের সমাবেশ দেখা যায়। মূল কিন্তু সেই নারায়ণই এবং তাঁহারই পূজা আরাধনা হয়। তিনিই চেতন সত্তা-রূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন; অন্যত্র যাইবার অতিরিক্ত স্থান নাই, তাই অচল গোলাকার পাষাণ শিলা তাঁহার প্রতীক। এই অচল কারণ চেতনভাব হইতেই বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ উদ্ভূত হইয়া উৎকৃষ্ট সৃষ্টিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বেদে দেবীসূক্তে বলা হইয়াছে—'মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে'—সমুদ্রস্থ দ্রবপদার্থে আমার যোনি—যেখান হইতে সমস্ত সৃষ্টি প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রথমে জলজ উদ্ভিদ্ রূপ আহার্য ও জলজ প্রাণী সৃষ্ট হইল। তারপর স্থল হইলে, তাবৎ স্থলজ ক্ষুদ্র তৃণ হইতে বৃহৎ বৃক্ষে পরিপূর্ণ বনবৃন্দে যে কারণসত্তা প্রকাশিত হইলেন, তিনিই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে তাঁহারই সৃষ্টি নররূপে রূপান্বিত হইলেন! তাই কবি বলিয়াছেন—'সবার উপর মানুষ সত্য।' নর জন্মেই রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি অবতাররূপে অভিহিত পুরুষোত্তমগণ পূর্ণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গো অর্থে পৃথ্বী। পৃথিবীর মৃত্তিকা হইতেই ক্রমবর্ধনে পর্বতের উদ্ভব তাই গোবর্ধন অর্থাৎ পর্বতও চেতন এবং শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ বন বৃন্দাবন, শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা নর কৃষ্ণও পুরুষোত্তম। এই তিনের জয়গান করিয়া বলিলেন, এই তিনই নারায়ণের বিভিন্নরূপে বিকাশ। যমুনার সলিলও চেতন—কুলু কুলু শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, আর সেই জল হইতেই জীবন্ত উদ্ভিদের জন্ম। তাহার পুলিনের রেণু বা মৃত্তিকার কণাও চেতন, যাহার পরস্পর সংহতিতে কত মূর্তির আবির্ভাব হইয়াছে। কৃষ্ণের বাঁশী বা বেণুধ্বনি যেমন বৃন্দাবনের গহনবনে ও তাহার উপবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ব্যাপ্ত, তেমনি সমস্ত শব্দের শেষ রেশ যে "ওঁ" রাগিনীতে পরিণত হয়, তাহাই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। যেমন সমস্ত বাদ্য যন্ত্র হইতে ও কণ্ঠ হইতে উদ্ভূত শব্দ একতানে লয় প্রাপ্ত হইয়া সুরজ্ঞের কর্ণে সঙ্গীত রূপে শ্রুত হয়, তেমনই সমস্ত উদ্ভিদ হইতে উত্থিত মর্মর-শব্দ সমস্ত প্রাণীর কণ্ঠ হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন রূপ কোলাহল, সমুদ্রের কল্লোল, নদীর কুল কুল ধ্বনি সমস্ত মিলিয়া যে শব্দ তাহাই গহন বনে ও উপবনের কুঞ্জে ধ্বনিত হইয়া ব্যাপ্ত হইতেছে। আর—'মহাসিংহাসনে বসিয়া বিশ্বের পিতা, নিজ ছন্দে রচনা করিয়া সেই মহান গীত শুনিতেছেন।'—তাহাই সাধক নিজের হৃদয়-কুঞ্জে বাজিতে ও শুনিতে পাইয়া থাকেন। 'নাদ' রূপে সমস্ত দেহের শিরা ও ধমনীর রক্ত-প্রবাহ হইতে উত্থিত শব্দ জীবাত্মারূপে—দেহী আত্মারূপী নারায়ণ হইতেই উত্থিত।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নারায়ণের খেলা। যেন এ সবই খেলার মেলা—খেলা ভাঙিলেই মেলা ভাঙে। খেলা শেষ হইলেই জীবের ও জাগতিক পদার্থেরও অন্ত হয়। নারায়ণেরও সেই লীলার শেষ হয়। যাহা পুনঃ পুনঃ যায় তাই জগৎ। তাই কবি গাহিয়াছেন—"খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছেন এ জগৎখানা।" স্থির থাকেন সেই নিরঞ্জন—(অনুজ =ব্যক্তৌ, ব্যক্ত হওয়া) যাহা ব্যক্ত হয় নাই সেই অব্যক্ত নিত্য কাল স্থায়ী নিরঞ্জন নারায়ণ—যিনি বিবেকী ভাবুক বা সাধকের হৃদাকাশে "সচ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং" রূপে প্রতিভাত, তিনিই নরের আধারে নারায়ণরূপে

বিরাজমান। পাঠক গিরিশচন্দ্রের 'ভ্রান্তি' গ্রন্থে দেখিবেন রঙ্গলাল বলিতেছে—'অমন পাথুরে মাকে মানি, না মানি—তাতে বড় আসে যায় না······মানুষ আমার দেবতা—ভগবানের অংশ। আমার দেবতা প্রাণের মানুষ—তাকে সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, যার সেবা করে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না, ভাল করেছি কি মন্দ করেছি।'

একাধারে ভক্তি ও পরমার্থ-তত্ত্বের সমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য গিরিশচন্দ্র এই 'বিল্বমঙ্গল' গ্রন্থে তাঁহার নিজেরই প্রকৃত পরিচয় রেখে গেছেন।

উৎসবের তাৎপর্য

শ্রীহারাধন রক্ষিত

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি' আনন্দ হইতেই সমগ্র জীবজগতের উৎপত্তি, আনন্দেই স্থিতি, আনন্দেই লয়। তাই আনন্দ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং মানুষ সর্বদা সর্বত্র আনন্দ খুঁজিয়া বেড়ায়; সেইজন্যই তার গতানুগতিক জীবনের পথে বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠান। উৎসবের দিনটি বড় মধুর, কারণ ইহা অত্যন্ত নূতনভাবে মানুষের কাছে আসে। জীবনের প্রতিদিনের ধার উৎসবের দিন ধারে না, এই দিনে মানুষের জীবনে স্বার্থের হীন সংঘাত থাকে না, উৎসবের দিন নবীনতা উপলব্ধির দিন। ঘাতমুখর একটানা জীবনের মাঝে মানুষ সামান্য সময়ের জন্য হইলেও চায় দ্বন্দ্বের বিরাম, চায় শান্তি। মানবমনই শুধু নয়, পশুপক্ষী সকলেই উৎসবের অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

দেশে দেশে উৎসবের অন্ত নাই। বাংলা দেশে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। শুধু তেরো নয়, আরও বেশী। এখানে বৎসরের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া নববর্ষ, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, মনসাপূজা, জন্মাষ্টমী, দুর্গা লক্ষ্মী ও কালী পূজা, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, জগদ্ধাত্রী ও কার্তিক পূজা, নবান্ন, সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি, দোলযাত্রা, বাসন্তী পূজা ও চৈত্র-সংক্রান্তি—উৎসবের পর উৎসব চলিতে থাকে। ইহা ছাড়া শনি ও সত্যনারায়ণ পুজা এবং মেয়েদের বিভিন্ন ব্রত উপবাস তো লাগিয়াই আছে। মুসলমানদের ঈদ, সবেবরাত, সবেমেরাজ, মহরম, মিলাদ্ শরীফ প্রভৃতি উৎসব—মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

নববর্ষ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। পারস্যে এই উৎসবটি অত্যন্ত জমকালভাবে উদ্‌যাপিত হয়। পারসীকরা ইহাকে 'নওরোজ' উৎসব বলেন। বাংলায় বর্ষ-বিদায় চৈত্র-সংক্রান্তি, পাশ্চাত্যে বড়দিন: খৃষ্টজন্ম ও নববর্ষকে ঘিরিয়া তাহাদের উৎসব।

জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ—জীবনে এ তিনটিকে ঘিরিয়াও উৎসব। জন্মদিনের উৎসব আজকাল সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে। ব্যক্তিগত জন্মদিন ছাড়া, বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন আজকাল ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে উদ্‌যাপিত হয়। পূজনীয় প্রিয়জনের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধানিবেদনের আয়োজন—যে শ্রাদ্ধ, সেও উৎসব। সকল দেশের সভ্য সমাজেই ইহা প্রকারভেদে বিদ্যমান। সমাজব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিবোধ মার্জিত হইয়া বিবাহ ব্যাপারটিও এখন উৎসবের মধ্য দিয়াই সম্পন্ন হয়। যাঁহারা পূজাপার্বণের উৎসব করেন না—বসন্ত, বর্ষা, শরতে ও শীতে তাঁহারা ঋতু-উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন, কারণ প্রকৃতির উৎসবে সাড়া না

দিয়া মানুষ পারে না। একদিক দিয়া সব উৎসবই ঋতু-উৎসব ; প্রকৃতির রূপান্তরের আনন্দ-উল্লাস।

উৎসবের ছড়াছড়ি দুনিয়া জোড়া। ইহার তাৎপর্য কি? মানুষ যুক্তিবাদী। তাৎপর্যবিহীন কোন কিছু যেন তাহাদের মধ্যে নাই। উৎসবের তাৎপর্য অপূর্ব। উৎসবের দিনে মানুষ আত্মপর ভেদশূন্য হইয়া বিশ্বজনকে আপনার করিয়া লইতে পারে। উৎসব মিলনের সেতু। অন্যদিন গৃহের সীমায় মানুষ মাতা-পিতা, পত্নী-পুত্রকে আপন করিয়া বিশ্বের আর সকলকে পর করিয়া রাখে। কিন্তু উৎসবের দিনে বিশ্বের সকল লোক মানুষের আপন হইয়া যায়। 'উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম।' উৎসবের দিনে মানুষ প্রেমের অপরাজেয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, ছোট-বড় সকলে পরমপিতার প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে। প্রতিদিন মানুষ ঠিক ঠিক তাহা অনুমান করিতে পারে না। মানুষ স্বভাবতঃ সঙ্কীর্ণ পরিবেশে পরিবর্ধিত ; মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টি খুবই সীমাবদ্ধ। উৎসবের দিনে মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া দূরাতিদূরে অনন্তের পানে চলিয়া যায়। সেই দিন তাহারা সেই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে, 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি' ; ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত সর্বত্র এই প্রেমের প্রবাহ। তাই উৎসবের দিনে ধনী দরিদ্রকে সম্মান করিয়া দান করিয়া, পণ্ডিত মূর্খকে স্বীয় আসন ছাড়িয়া দিয়া তৃপ্তি বোধ করে। 'প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে এক হইয়া বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।' এই জন্য মানুষ উৎসবের দিনে সমস্ত কার্পণ্যের অতীত হইয়া থাকে—সেদিন সে মিতব্যয়িতার কঠোর নিয়মকে অতিক্রম করিয়া প্রাচুর্যের আয়োজন করিয়া থাকে। উৎসবের দিনে মানুষ ঘাতমুখর দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, বেদনা, দারিদ্র্য, সহায়-সম্বলশূন্যতা ভুলিয়া —"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এই দিন মানুষের মনুষ্যত্বের শক্তির সম্যকভাবে উপলব্ধির দিন। এই দিনে মানুষ সকল ক্ষুদ্রতা, অজ্ঞতা, অন্ধতা বিসর্জন দিয়া মহামহিমোজ্জ্বল সত্য-শিব-সুন্দরের অভিসারী হইয়া উঠে। তাই উৎসবের দিন মানুষের কাছে, চাতকের কাছে বৃষ্টির দিনের মত উৎসব অবসন্ন জীবনে শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করিয়া মানুষকে করিয়া তুলে চির উদ্ভিন্ন বিকচ কুসুমের মত। মানুষের ছোট ছোট জীবনের বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি উৎসবের দিনে সম্মিলিত হইয়া মহান্ মঙ্গলের দুর্বার গতি প্রাপ্ত হয়।

নববর্ষ আমাদের দেশে মহাসমারোহের মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যেও এই দিবসটিতে উৎসবের মহানন্দে প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠে। পারস্য দেশে এই উৎসবের আড়ম্বর খুব বেশী। এই দিনে মানুষ বিগত দিনের কালিমা হইতে মুক্ত হইয়া সৌন্দর্য ও পবিত্রতায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া লয়। এই দিবসে মানুষের চিত্ত প্রফুল্ল ; হৃদয় পূর্ণ, পবিত্র, সুন্দর। মানুষের শত্রুমিত্র আজকের দিনে লোক-পিতার প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত। আজ মানুষ সমগ্র জীবজগতের জন্যে বাহু বাড়াইয়া দেয়, বক্ষ প্রসারিত করিয়া সকলকে আপন করিয়া লয়। ছোটরা বড়দের প্রণাম করে, বড়রা ছোটদের স্নেহসিঞ্চিত করিয়া উপহার দান করেন ; তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মহাশক্তির দুয়ারে অন্তরের অন্তস্তল হইতে প্রার্থনা জানান। এই দিনে মানুষ প্রতিজ্ঞা করে—অভাবে বিক্ষুব্ধ না হইয়া, দারিদ্র্যে কুণ্ঠিত না হইয়া, সরল ভাবের আড়ম্বরশূন্যতায় লজ্জিত না হইয়া জীর্ণকুটিরে তৃণাসনে বসিয়া উত্তরীয় পরিধানে সহজ সুন্দরভাবে কর্ম করিবার। আজকে তাহারা প্রতিজ্ঞা করে "তিনশত-পঁয়ষট্টিদল বর্ষপদ্মের"

প্রতিটি পাপড়িকে সার্থক করিয়া তুলিতে। আজই তাহারা প্রস্তুত হয় তাহাদের আশা-কুমুদিনীকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে। বাংলা দেশে নানাস্থানে এই দিনে উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে ছোট বড়, সকলে এক হইয়া যায়। এই দিনে তাহারা অনুভব করিতে পারে যে, একই অমৃতের তাহারা সহস্র সন্তান।

বর্ষ-বিদায় উৎসবও আমরা উদ্‌যাপন করি। পুরাতন বৎসর আমাদের কাছে জীর্ণ; কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহা মূল্যহীন? মানুষ সারাজীবন কাজ করিয়া যৌবন হারায়, বার্ধক্যে উপনীত হয়। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। তাই বলিয়া মানুষের জীবনের কর্মপন্থা ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় না। পুরানো বছরের কর্মসূচীর দিকে তাকাইয়া দেখিবার মুহূর্ত—বর্ষবিদায়-উৎসব-দিবস। রাত্রি আগামী দিনের প্রসূতী। অন্ধকার রাত্রির গর্ভজাত উষা কত সুন্দর—কত মনোরম! তেমনি জীর্ণ বর্ষশেষের গর্ভ হইতেই নব বর্ষের জন্ম হয়। যাহাকে পাইয়া আমরা হৃষ্ট হই—সেই নূতনের মাতা এই পুরাতন বৎসর। তাই সে সার্থক। বর্ষাবসান আমাদের আগামী বৎসরের আশা-মুকুলকে লালন পালন করিয়া বিকশিত করিয়া তুলে। এই দিবসে আমরা খতিয়ান করিয়া দেখি আমাদের বিগত বর্ষে জীবনের আয়-ব্যয়. ভাল-মন্দ। এই উৎসবের দিনে আমরা অন্যায়কারীকে ক্ষমা করি। কোন আশাকে যদি বিগত বৎসরে উৎপাটিত করিয়া থাকি, তবে আবার ভগবানে সব অর্পণ করিয়া সেই আশাবৃক্ষের গোড়ায় শত উদ্যমে জল-সিঞ্চন দ্বারা তাহাকে ফলবতী করিয়া তুলিব—এই প্রতিজ্ঞা আমরা বর্ষবিদায় উৎসবের দিনে করিয়া থাকি। দ্বিধাবিহীনচিত্তে সকলে সমবেত হই। বিভিন্ন উৎসবকে অবলম্বন করিয়া বহু প্রাচীনকাল হইতে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সমাজের ক্ষেত্রে ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের ভূমিকায় উৎসবের তাৎপর্য অপরিমেয়।

শুধু আমাদের দেশে নয় সকল দেশেই জন্মোৎসবের রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে। জন্মদিন কতই যায় আসে। কিন্তু তাহা আমাদের জীবনে কোনও আলোক সম্পাত করে না, যদি না আমরা উৎসবের মধ্য দিয়া তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি। জন্মোৎসবের মধ্য দিয়া আমরা উপলব্ধি করিতে পারি আমাদের জন্মের মাহাত্ম্য, মহত্ত্ব। এই উৎসবের দিনে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া মানুষ মনুষ্য-জন্মের একটি অপরিমেয় মূল্য অনুভব করিয়া থাকে। মানুষ বুঝিতে পারে—সে একা নয়, তাহার জন্ম সৌন্দর্যমণ্ডিত, সে নিজে মহান। এই দিনে জীবনের সেই অনির্দেশ্য অনন্ত প্রত্যাশায় মানবচিত্ত বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে। জন্মোৎসবের দিনে মানুষ সবাইকে আপন করিয়া লয়। 'তুমি আমার আপন'—এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের সুরে বলিতে পারে না—এতে সৌন্দর্যের সুর ঢালিয়া দিতে হয়। সৌন্দর্যপ্রসূতী উৎসব। জন্মোৎসবের দিনে বৃদ্ধ বার্ধক্য ভুলিয়া তাহার জন্মমুহূর্তের তারুণ্যে চঞ্চল হইয়া উঠে। জন্মমুহূর্তের সুন্দর দর্শন তাহার উপলব্ধিগম্য হয় জন্মোৎসবের দিনে। 'সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টন হইতে বহুর সাথে মিলনে মানুষের পুনর্জন্ম; তেমনি স্বার্থের আচরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি।' জন্মোৎসবের দিনে কবি বলিয়াছেন, 'দেশলাইয়ের কাঠির মুখে যে-আলো একটুখানি দেখা দিয়েছিল, সেই আলো আজ প্রদীপের বাতির মুখে ধ্রুবতর হয়ে জ্বলে উঠেছে।' জন্মোৎসবের দিনে মানুষ ভাবিতে শিখে—কেন, কোথা হইতে এবং কি জন্তে তাহার জন্ম। আজকের দিনে মানুষ উপলব্ধি করে যে, সে নিখিল মানবের এবং নিখিল মানব তাহার। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সে (বালক) যদি ফল হয়, তার বাপ-মা কেবল বৃন্তমাত্র। সমস্ত মানব-বৃক্ষের সঙ্গে একে-বারে শিকড় থেকে ডাল পর্যন্ত তার মজ্জাগত

যোগ।' উৎসববিহীন জন্মদিনে এই সব অনুভূতি আমাদের হয় না। তাই জন্মোৎসবের এত সার্থকতা।

মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া হিন্দুদের মধ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শ্রাদ্ধ উৎসব নয়, ইহা দুঃখের দিন; কিন্তু ইহা ঠিক নয়। উৎ—সু ধাতুর যোগে উৎসব: যাহাতে ঊর্ধ্বজন্মের বার্তা তাহাই উৎসব। শ্রদ্ধা হইতে শ্রাদ্ধ শব্দের উৎপত্তি। এই দিনে মানুষ মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং তাহাতে তাঁহার আত্মিক উন্নতি হয়। আত্মা অবিনশ্বর—এই উপলব্ধি সার্থক হইয়া উঠে শ্রাদ্ধের দিনে। প্রতিদিন ইহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা যাহাকে মৃত বলিয়া বোধ করি, শ্রাদ্ধের দিনে আমরা তাহার অবিনশ্বরত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারি।

'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধীঃ॥' ইত্যাদি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'এই আনন্দ-মন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের সূর্য পর্যন্ত সব অমৃতে অভিষিক্ত ক'রে, মধুময় ক'রে দেখবার দিন এই শ্রাদ্ধের দিন।' এই দিনে অন্তর্হিত ব্যক্তির গুণাবলী আলোচনা করিয়া আমরা উদার মহৎ হইয়া উঠি। জীবনে যে মানুষকে আমরা আনন্দের মধ্যে দেখি না, মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধের দিনে তাহাকেই আমরা অমৃতের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। তাই শ্রাদ্ধোৎসব এত তাৎপর্যপূর্ণ।

বিবাহ-উৎসবের ব্যাপারটিতে স্বভাবের উদ্দামতাই প্রবল বটে, কিন্তু সামাজিক বন্ধন সেই উদ্দামতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। নারী-পুরুষ প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মানুসারে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সামাজিক বন্ধনের দ্বারা বিবাহে উৎসবের নিয়ম না থাকিলে নরনারীর মিলন পশুপক্ষীর মিলনের চাইতে কিছুই নূতন হইত না, কিছুই উন্নততর হইত না। সকল দেশের সকল লোকেদের মধ্যেই ভাব-সমৃদ্ধ নিয়ম-প্রণালীর মধ্য দিয়া বিবাহ-উৎসবটি উদ্‌যাপিত হয়। হিন্দুদের বিবাহ সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়, এই সময় স্বামী-স্ত্রী ব্রাহ্মণ বিগ্রহ ও অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া যে ভাবে পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা করে তাহাতে নিশ্চয়ই তাহাদের ভাবী জীবন বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সুন্দর ও সুখময় হয়।

স্বাধীনতা দিবসে, খাঁচায় বদ্ধ পাখী খাঁচা হইতে বহু চেষ্টার পর বাহির হইতে পারিয়া যে অনাবিল আনন্দ বোধ করে, মানুষ সেই আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। এই দিনে জাতি তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ হয়; দেশকে সমাজকে সুষ্ঠু সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ করে। এই উৎসবের দিনে মানুষ ব্যষ্টি-স্বার্থ বিসর্জন দিয়া দেশের ও জাতির সমষ্টি-স্বার্থের জন্য জীবন ও সর্বস্ব পণ করে। এই দিনে তাহারা সমবেতভাবে—চিন্তা করে, আনন্দ করে।

বিভিন্ন উৎসবের সম্পর্কে বলিতে গিয়া মিলনের কথাটি বার বার বলিয়াছি। উৎসবের দিনেই শুধু মানুষ একত্র মিলিত হয় তাহা নয়, বাজারেও মানুষ মিলে। কিন্তু উৎসবের মিলন ও বাজারের মিলনের পার্থক্য দিবারাত্রির পার্থক্যের মত। বাজারের মিলনে অন্তরের মিলন হয় না, ইহা বাহিরের মিলন। এখানে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থের পঙ্কিল চিন্তায় মগ্ন থাকে। একত্র মিলিত হইয়াও পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পায় না, স্বার্থ-চিন্তার প্রাচীর উহাদের দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। কিন্তু উৎসবের মিলন অন্য প্রকার। ইহাতে স্বার্থ-চিন্তার লেশমাত্র থাকে না, তাই সেই দিন মানুষ নিজের সঙ্গে সকলকে এবং সকলের সঙ্গে নিজেকে উপলব্ধি করিয়া থাকে।

উৎসবের দিনের ইহাই বড় সার্থকতা যে, এই অন্ততঃ একদিনের জন্য হইলেও মানুষ নিজেকে বড় করিয়া সুন্দর করিয়া জানিতে পারে। এইরূপে

উৎসব মনুষ্য-জীবনকে সুন্দর ও সুগঠিত করিয়া তুলে। উৎসবের আনন্দে মানুষের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। তাই মানুষ উৎসবপ্রিয় বলিয়া গৌরবের ভাগী। উৎসবের তাৎপর্যগুলি জীবনে সার্থক হইয়া উঠিলে মানুষ প্রতিদিনের চিন্তায় ভাবিতে শিখিবে যে, তাহারা সকলে "অমৃতস্য পুত্রাঃ", একই পিতার স্নেহ-চ্ছায়াতলে তাহারা বর্ধিত ; তবেই মানুষ হইবে পূর্ণ, মানুষ হইবে বিরাট্, মহান্।

বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ*

স্বামী গম্ভীরানন্দ

'কথামৃত'-কার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন, "ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাহিলেন। যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন! দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে বসে বসে কাঁদেন; নিজের অন্তরঙ্গ দেখবেন বলে ব্যাকুল। রাত্রে ঘুম নাই! মাকে বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও; মা ওকে এখানে এনে দাও; যদি সে না আসতে পারে, তা হলে মা আমায় সেখানে নিয়ে যাও, আমি দেখে আসি!' তাই বলরামের বাড়ি ছুটে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেমন বলেন, 'বলরামের জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন!' যখন আসেন অমনি নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান। বলেন, 'যাও, নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এসো। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়; এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে।' বলরামের ঘরেই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম বসে আলাপ। এখানেই রথের সময় কীর্তনানন্দ। এই খানেই কতবার প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা হইয়াছে।" ইহা ১১ই মার্চ, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের কথা। (কথামৃত ১ম ভাগ, ২৩ পৃষ্ঠা)

পরম পূজনীয় লাটু মহারাজের মতে ঠাকুর এই গৃহে শতাধিক বার আসিয়াছিলেন।

পরম পূজ্যপাদ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার লিখিয়াছেন, "এই ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ বাটীতে ঠাকুরের যে কতবার শুভাগমন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কত লোকই যে এখানে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীকে ঠাকুর কখন কখন 'মা কালীর কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ করিতেন। কলিকাতার বসু পাড়ার এই বাটীকে তাঁহার 'দ্বিতীয় কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঠাকুর বলিতেন 'বলরামের পরিবার সব একসুরে বাঁধা।' কর্তা-গিন্নী হইতে বাটীর ছোট ছোট মেয়েগুলি পর্যন্ত সকলেই ঠাকুরের ভক্ত; ভগবানের নাম না করিয়া জলগ্রহণ করে না এবং পূজা, পাঠ, সাধুসেবা, সদ্বিষয়ে দান প্রভৃতিতে সকলেরই সমান অনুরাগ; কাজেই এই পরিবারবর্গই যে ঠাকুরের দ্বিতীয় কেল্লাস্বরূপ হইবে এবং এখানে আসিয়া ঠাকুর যে বিশেষ আনন্দ পাইবেন, ইহা বিচিত্র নহে"। (গুরু-ভাব, উত্তরার্ধ, ২৮৩ পৃঃ)

'লীলাপ্রসঙ্গে' আরও আছে—"বসুজ মহাশয়ের

* বলরাম-মন্দিরের গত ১৩.২.৫৭ তারিখের ধর্ম-সভায় পঠিত।

কোঠারে জমিদারি ও শ্যামচাঁদ-বিগ্রহের সেবা আছে, শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ ও শ্যামসুন্দরের সেবা আছে এবং কলিকাতার বাটীতেও ৺জগন্নাথদেবের বিগ্রহ ও সেবাদি আছে। ঠাকুর বলিতেন, 'বলরামের শুদ্ধ অন্ন—ওদের পুরুষানুক্রমে ঠাকুর-সেবা ও অতিথি-ফকিরের সেবা—ওর বাপ সব ত্যাগ ক'রে শ্রীবৃন্দাবনে বসে হরিনাম করে—ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি, মুখে দিলে যেন আপনা হতে নেমে যায়। বাস্তবিক ঠাকুরের এত ভক্তের ভিতর বলরামবাবুর অন্নই (ভাত) তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছি। কলিকাতায় ঠাকুর যেদিন প্রাতে আসিতেন, সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজন বলরামের বাটীতেই হইত। ব্রাহ্মণ-ভক্তদিগের বাটী ব্যতীত অপর কাহারও বাটীতে, অন্নগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ—তবে অবশ্য নারায়ণ বা বিগ্রহাদির প্রসাদ হইলে অন্য কথা"। (ঐ, ২৮১-৮২ পৃঃ)

অতঃপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে আমরা ভক্তপ্রবর বলরাম এবং তাঁহার গৃহ, যাহা পরে ভক্তমহলে বলরাম-মন্দির নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে এবং তীর্থরূপে পূজিত হইতেছে, ঐ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ পাই—

ধীর নম্র বিনয়ী সংসারী ভক্তবর।
বিভূষিত সর্বগুণে গুণের সাগর॥
আস্যে মৃদুমন্দ হাস্য খেলে অবিরাম।
মিতব্যয়ী সন্তোষ-অন্তর বলরাম॥
গোপনে গোপনে আনে প্রভু ভগবানে।
মহাপুণ্যময় তীর্থ নিজ নিকেতনে॥
ভবনে মহিমা কিবা না যায় বর্ণন।
গৌর-অবতারে যেন শ্রীবাস-প্রাঙ্গণ॥
জগন্নাথ-প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ঘরে।
ভোগ-রাগ নিতি নিতি অতি প্রীতিভরে॥
সেই মহাপ্রসাদে প্রভুর সেবা হয়।
শ্রীপ্রভুর অন্নভিক্ষা যথা তথা নয়॥
ভাগ্যধর বলরাম যাঁর এই বাড়ি।
তিনি একজন গোটা প্রভুর ভাণ্ডারী॥
বলরাম জন্ম জন্ম ভক্ত অবতারে।
অন্ন-ভিক্ষা শ্রীপ্রভুর এই তাঁর ঘরে॥
প্রভুর গমনে বহু আড়ম্বর তথা।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রাঁধে ভামিনীর মাতা॥
মহাভাগ্যবতী এই ব্রাহ্মণের মেয়ে।
বড় খুশী প্রভুদেব তাঁর রান্না খেয়ে॥
(৩০৬ পৃষ্ঠা)

পূর্বোক্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি হইতেই বলরাম-মন্দিরের সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়। অতঃপর আমরা যথাসম্ভব বিস্তৃত উদ্ধৃতির সাহায্য-ব্যতিরেকে প্রধানতঃ পূর্বোদ্ধৃত তিনখানি মহামূল্য গ্রন্থ অবলম্বনে এই তীর্থস্থলে সংঘটিত কয়েকটি লীলার আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে আমরা যে পনেরটি চিত্রের সন্ধান পাইয়াছি, তাহার ১ খানি প্রথম ভাগে, ১ খানি দ্বিতীয় ভাগে, ৪ খানি তৃতীয় ভাগে, ৩ খানি চতুর্থ ভাগে, এবং ৬ খানি পঞ্চম ভাগে। ইহার মধ্যে সাতখানি আলেখ্য ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের, একখানি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের, তিনখানি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের এবং একখানি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের। সময়ের পরম্পরা হিসাবে ঐ ছবিগুলির রেখাচিত্র মাত্র অঙ্কন করিতেছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় আমরা বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে প্রথম উপনীত হই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ; সেদিন দোলপূর্ণিমা। রাত্রি আটটা-নয়টায় শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয় বলরাম-মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন রাম, মনোমোহন, রাখাল, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তগণ ঠাকুরকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতেছেন, সকলেই হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে মত্ত হইয়াছেন। কয়েকটি ভক্তের ভাবাবস্থা হইয়াছে। নৃত্যগোপালের

বক্ষঃস্থল রক্তিমবর্ণ, রাখালের দেহ ভূমিতে অবলুণ্ঠিত —তিনি ভাবাবিষ্ট ও বাহ্য সংজ্ঞাহীন। ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত দিয়া বলিতেছেন, "শান্ত হও, শান্ত হও"। মাষ্টার মহাশয়ের মতে রাখালের এই প্রথম ভাবাবস্থা। পরে ভক্তেরা যখন বারান্দায় প্রসাদ পাইতে বসিলেন, তখন দাসের ন্যায় বলরাম করজোড়ে একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন, দেখিলে মনে হয় না যে, তিনি বাড়ির কর্তা; এমনি ছিল তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচেন' দীনভাব। সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুর বলরামের আহ্বানেই ঐ গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের নিকট পূর্বমুহূর্তে সংবাদ পাইয়া এবং তাঁহারই নির্দেশে মাষ্টার মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা প্রথম দিককার কথা। পরে ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহুবার সেখানে আসিয়াছিলেন এবং ভক্তেরাও তখন মুখে মুখে সংবাদ পাইয়া স্বেচ্ছায় অথবা বলরামের নিমন্ত্রণে সাগ্রহে সেখানে উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত 'কথামৃত'-কার উল্লেখ করিয়াছেন যে, এইভাবেই মহাকবি গিরিশচন্দ্র বলরাম-মন্দিরে বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত প্রথম আলাপ করেন। বস্তুতঃ ইহা প্রথম আলাপ হইলেও প্রথম সাক্ষাৎকার নহে, ইহা দ্বিতীয় দর্শন। তিনি ঠাকুরের প্রথম দর্শন পাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত দীননাথ বসুর বাড়িতে। দ্বিতীয় দর্শন সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র নিজে রামকৃষ্ণ মিশনের এক সভায় যাহা পাঠ করিয়াছিলেন তাহার মর্মার্থ:

"ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষ্যে ভক্তচূড়ামণি বলরাম পল্লীর অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, যোগী ও পরমহংসেরা কাহারও সহিত কথা বলেন না; এবং কাহাকেও নমস্কার করেন না, তবে কেহ সাধ্যসাধনা করিলে পদসেবা করিতে দেন মাত্র। এই পরমহংস কিন্তু তাহার বিপরীত। ইনি সাগ্রহে বন্ধুভাবে কথা বলেন, আর দীনভাবে ভূমি স্পর্শ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করেন। পৌরাণিক চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত নাট্যকার দেখিলেন, বাস্তবের নিকট কাল্পনিক চিত্র যেন কেমন মলিন হইয়া গেল—তিনি চমকিত হইলেন। কিন্তু সেই চকিত দর্শন পরিচয়ে পরিণত হইল না! সেইদিন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা ২য় ভাগ—২৫৫ পৃঃ)

সময়-পরম্পরায় কথামৃতে পরবর্তী উল্লেখ পঞ্চম ভাগের ১৮ পৃষ্ঠায়, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বর। ঠাকুর গড়ের মাঠে উইলসনের সারকাস দেখিতে গিয়াছিলেন এবং আট আনার অর্থাৎ সর্বশেষ শ্রেণীর বেঞ্চির উপরে বসিয়া আনন্দে বলিয়াছিলেন, "বাঃ, এখান থেকে বেশ দেখা যায়!" পরে গাড়িতে চড়িয়া তিনি মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি ভক্তের সহিত বলরাম-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

ঠাকুর দোতলায় বৈঠকখানায় বসিয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গে বলিলেন, "এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়। গৌর-নিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন, আচণ্ডালে কোল দিলেন। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়, ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্যজাতি ভক্তি থাকলে পবিত্র হয়।" সেদিন তিনি সংসারীদের জীবনের কথাও বলিয়াছিলেন: "তারা যেন গুটিপোকা। মন করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে; কিন্তু অনেক যত্ন করে গুটি তৈয়ার করেছে, ছেড়ে আসতে পারে না। তাতেই মৃত্যু হয়।" আর দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন—ঘুনির মধ্যে মাছের, "যে পথ দিয়ে ঢুকেছে সে পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু জলের মিষ্ট শব্দ আর অন্য মাছের সঙ্গে ক্রীড়া, তাই ভুলে থাকে; বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে না।…দু একটা দৌড়ে পালায়; তাদের বলে

মুক্ত জীব।" মায়া ও সংসারের বর্ণনাত্মক দুইটি গানও তিনি গাহিয়াছিলেন; আর ভাবভক্তিহীন হইয়া সাধুসঙ্গ করার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাবার জন্য। সাধুরা গাঁজা খায় কিনা, তাই তাঁদের কাছে এসে গাঁজা সেজে দেয়, আর প্রসাদ পায়।"

তারপর চতুর্থ ভাগের ১৬-১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিলের ঘটনা। সেদিন সকালে আসিয়া ঠাকুর বলরাম-ভবনেই দ্বিপ্রহরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন ঠাকুরের আগ্রহে ও বলরামের নিমন্ত্রণে নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এবং আরও দুই একটি ভক্ত সেখানে আহার করিয়াছেন। আহারান্তে বৈঠকখানায় উত্তরপূর্বের ঘরে বসিয়া আলাপ হইতেছে। ঠাকুরের আদেশে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেদিন অনেকগুলি গান গাহিয়াছিলেন, ভবনাথও গাহিয়াছিলেন। গানের পর নরেন্দ্রনাথ যখন সহাস্যে বলিলেন যে, ভবনাথ পান-মাছ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন ঠাকুর সকৌতুকে বলিলেন, "সে কি রে! পান-মাছে কি হয়েছে! ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।" ঠাকুরের শিক্ষাপ্রদ রসিকতায় একটি দৃষ্টান্ত সেদিন পাওয়া গিয়াছিল। ভবনাথের সহিত কথা শেষ করিয়া তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাখাল কোথায়?" তখন উত্তর পাইলেন "আজ্ঞা, রাখাল ঘুমুচ্ছেন।" ইহাতে ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "একজন মাদুর বগলে করে যাত্রা শুনতে বসেছিল। যাত্রার দেরি দেখে মাদুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়লো। যখন উঠলো তখন সব শেষ হয়ে গেছে।"

বিকালে চারিটার সময় ঠাকুর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে আসিয়া বসিলে কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত হইলেন। একজন ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়ের 'পঞ্চদশী' দেখা আছে?" ঠাকুর উত্তর দিলেন 'ওসব একবার প্রথম প্রথম শুনতে হয়—প্রথম প্রথম একবার বিচার করে নিতে হয়। তারপর

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিনী শ্যামা মাকে।
মন তুই দেখ্ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ না দেখে।"

তিনি আরও বলিলেন—"শাস্ত্র শুধু পড়লে হয় না। কামিনী-কাঞ্চন থাকলে শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে দেয় না। সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়।

"সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত।
কালার পীরিতে পড়ে সব হইল হত।"

(সকলের হাস্য)।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন আমরা আর একবার বলরাম-ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যদর্শন পাই। সেদিন শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাড়িতে তিনি মনোহর সাঁই কীর্তন শুনিতে যাইবেন এবং পরে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের গৃহে কথকতা শুনিবেন। অধর-ভবনে যাইবার আগে তিনি বলরাম-গৃহে শুভাগমন করিলেন এবং সেখানে ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন, 'মা, একি দেখাচ্ছ! থাম; আবার কত কি! রাখাল-টাখালকে দিয়ে কি দেখাচ্ছ? রূপ-টুপ সব উড়ে গেল। তা মা, মানুষ তো কেবল খোলটা বই তো নয়! চৈতন্য তোমারই। মা, ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা মিষ্ট রস পায় নাই। চোখ শুকনো, মুখ শুকনো! প্রেমভক্তি না হ'লে কিছু হ'ল না।" (৫ম ভাগ, ৪৮ পৃষ্ঠা)। সেদিনকার লীলা অতি অল্পকাল-ব্যাপী; অতএব কথামৃতের চিত্রও ক্ষুদ্র, যদিও উহা ভাবগম্ভীর।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুনের ছবিখানিও অনুরূপ ক্ষুদ্রায়তন; কিন্তু ইহারও সৌন্দর্য অনুপম। ঠাকুর সেদিনও বলরামভবনে ভাবাবিষ্ট। পার্শ্বে মাস্টার এবং রাখাল বসিয়া আছেন। ভাববিহ্বল ঠাকুর বলিতেছেন, "দেখ, আন্তরিক ডাকলে স্বস্বরূপকে দেখা যায়! কিন্তু যতটুকু বিষয়ভোগের বাসনা থাকে, ততটুকু কম পড়ে যায়।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, "দেখ, সকলেরই আত্মদর্শন হতে পারে।" ক্রমে অবতার-

লীলার কথা উঠিল। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "'নিত্য' দর্শনের পর নিত্য থেকে লীলায় এসে থাকতে হয়—ভক্তি ভক্ত নিয়ে। এইটি পাকা মত। তাঁর নানা রূপ, নানা লীলা—ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎ-লীলা। তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে যুগে যুগে আসেন—প্রেমভক্তি শিখাবার জন্ত। দেখ না চৈতন্তদেব। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেমভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্তলীলা। কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর। অবতার গাভীর বাঁট।" (৫ম ভাগ ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা)

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগস্টের লীলাও স্বল্প-কালস্থায়ী। সেদিনও ঠাকুর বলরামের বাটীতে আসিয়াছেন। সেখান হইতে অধরের বাটীতে কীর্তন শুনিতে যাইবেন। বলরামবাবুর গৃহে পদার্পণ করিয়া তিনি ভগবৎ-প্রসঙ্গে বলিলেন, "অবতার লোকশিক্ষার জন্ত ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকেন। যেমন ছাদে উঠে সিঁড়িতে আনাগোনা করা।" কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "বাগানের মালিককে খোঁজা, আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করা—এইটেই কাজ। ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য।" (৫ম ভাগ, ৬৯ পৃষ্ঠা)

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রার দিনে শ্রীযুক্ত বলরামবাবুর বৈঠকখানায় ভক্ত-পরিবেষ্টিত আনন্দময়মূর্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের নয়নাভি-রাম পুনর্দর্শন আমরা পাই। রথের দিনে এবং পুনর্যাত্রার দিনে ছোট একখানি রথ দোতলায় বহির্বাটীর চকমিলানো বারান্দার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টানা হইত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও ভক্তগণ নৃত্য-গীতাদিসহকারে রথের অগ্রপশ্চাতে চলিতেন। আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে এইরূপ একটি রথযাত্রার বিবরণ দিতেছি, "সকলই ভক্তির ব্যাপার। বাহিরের আড়ম্বর কিছুই নাই। বাড়ী সাজানো, বাদ্যভাণ্ড, বাজে লোকের হুড়াহুড়ি, গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি—এ সবের কিছুই নাই। ছোট একখানি রথ বাহির বাটীর দোতলায় চকমিলানো বারান্দার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টানা হইত, একদল কীর্তনিয়া আসিত, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিত, আর ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণ ঐ কীর্তনে যোগদান করিতেন। কিন্তু সে আনন্দ, সে ভগবদ্ভক্তির ছড়াছড়ি, সে মাতোয়ারা ভাব, ঠাকুরের সে মধুর নৃত্য—সে আর অন্যত্র কোথা পাওয়া যাইত? সাত্ত্বিক পরিবারের বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ ৺জগন্নাথদেব রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে আবির্ভূত—সে অপূর্ব দর্শন আর কোথায় মিলিবে? সে বিশুদ্ধ প্রেমস্রোতে পড়িলে পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া নয়নাশ্রুরূপে বাহির হইত—ভক্তের আর কি কথা! এইরূপে কয়েক ঘণ্টা কীর্তনের পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের ভোগ দেওয়া হইত এবং ঠাকুরের সেবা হইলে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ পাইতেন। এবং পরে অনেক রাত্রে এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিত, এবং ভক্তেরা দুই চারিজন ব্যতীত যে যার বাটীতে চলিয়া যাইতেন।" (গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২৮৭ পৃঃ)

এইটুকু ভূমিকার পর আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে বর্ণিত (৪র্থ ভাগ, ১৮৮ পৃঃ) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের উল্টারথের দিনেই ফিরিয়া যাই। সেদিন বৈঠকখানায় ঠাকুরের পার্শ্বে বসিয়া আছেন—রাম, মাস্টার, বলরাম, মনোমোহন, কয়েকটি ছোকরা-ভক্ত, বলরামের পিতা প্রভৃতি। বলরামের পিতা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। আপনমনে আপনভাবেই থাকেন। পরমত-সম্বন্ধে উদারতা প্রকাশের অবকাশ নাই। ঠাকুরকে দর্শন করাইবার জন্ত বলরাম নিজের পিতৃ-দেবকে পত্রের উপর পত্র লিখিয়া বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছেন। বলরামের পিতাকেই প্রধানতঃ উদ্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে।…যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই

একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি—সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে। যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ।... বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। তারই নিত্য, তাঁরই লীলা। · সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আছে, কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।" (ঐ ১১৯ ২০ পৃষ্ঠা)

ঠাকুর বারান্দার দিকে গিয়া আবার ঘরে ফিরিলেন এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরের ৬।৭ বৎসরের কন্যার সহিত রসিকতা করিয়া গান গাহিলেন, সকলেই হাসিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের ছেলেবেলার সরলতার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "পরমহংস বালকের ন্যায়—আত্মপর নাই, ঐহিক সম্বন্ধেও আঁট নাই। রামলালের ভাইও (শিবু) একদিন বলেছিল, 'তুমি খুড়ো না পিসে?' পরমহংসের বালকের ন্যায় গতিবিধির হিসাব নাই। সব ব্রহ্মময় দেখে। কোথায় যাচ্ছে, কোথায় চলছে, হিসাব নাই।" (১২২ পৃঃ)

ঠাকুরের নির্দেশমত বলরাম ঐ দিন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর অন্তঃপুরে গিয়া ৺জগন্নাথ দর্শনান্তে আবার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলে পণ্ডিত শশধর দুই একজন সঙ্গীর সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঠাকুর পণ্ডিতকে বলিলেন, "জ্ঞানের চিহ্ন—প্রথম শান্ত স্বভাব, দ্বিতীয় অভিমানশূন্য স্বভাব। তোমার দুই লক্ষণই আছে। জ্ঞানীর আর কতকগুলি লক্ষণ আছে। সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে—যেমন লেক্‌চার দিবার সময় সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসপণ্ডিত। বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা—যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ।" (ঐ ১২৬-২৮)

পরে স্বয়ং গান গাহিলেন ও বৈষ্ণবচরণের গান শুনিতে শুনিতে তিনি সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিভঙ্গ হইলে আরও একটু কথাবার্তার পর ছোট রথখানি বারান্দার উপর আনা হইল। ঠাকুর রথের দড়ি ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ টানিলেন; একটু পরে গান ধরিলেন,

"যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে,
তারা, তারা দুভাই এসেছে রে।"

গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও তাহাতে যোগ দিয়াছেন এবং বৈষ্ণবচরণও নিজের সম্প্রদায়ের সহিত উহাতে মিলিত হইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বারান্দা পূর্ণ হইয়া গেল। মেয়েরাও নিকটস্থ ঘর হইতে এই প্রেমানন্দ দেখিতেছেন।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ঠাকুর সকলের সহিত বৈঠকখানায় গিয়া আবার ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর সেই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন, তাই তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া জলযোগ করানো হইল। জলযোগান্তে বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনর্বার কীর্তনে যোগ দিলেন ও পরে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। (ঐ ১২৯ ৩১ পৃষ্ঠা)।

এই প্রসঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গের একটি বিবরণের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ঐ গ্রন্থের গুরুভাব-উত্তরার্ধের ২৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে যে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৺জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ঠন্‌ঠনিয়ায় ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া অপরাহ্ণে পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যান। সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত বলরামবাবুর বাটীতে রথোৎসবে যোগদান করেন এবং ঐ রাত্রি সেখানে কাটাইয়া পরদিন প্রাতে কয়েকটি ভক্তসঙ্গে নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরেন।

কথামৃতের বর্ণনানুসারে কিন্তু ইহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের পুনর্যাত্রার ঘটনা। এই বিষয়ে ৪র্থ ভাগ ১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তবে পার্থক্য এই যে, কথামৃতের মতে ঠাকুর ঐ রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন, লীলাপ্রসঙ্গ-মতে পরদিন। ইহা ১৮৮৪ অথবা ১৮৮৫

খৃষ্টাব্দের ঘটনা হউক বা উভয় বৎসরের বিভিন্ন ঘটনার একত্র মিলনের ফলেই হউক 'লীলাপ্রসঙ্গে' উল্লিখিত আছে যে, শ্রীশ্রীঠাকুর রথযাত্রার পরদিবস নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কালে দুইটি স্ত্রী-ভক্তও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। স্ত্রীভক্ত দুইজনের নামোল্লেখ নাই। তথাপি বর্ণনার ভঙ্গি হইতে স্বতই মনে হয় ইঁহারা শ্রীযুক্তা যোগীন-মা ও গোলাপ-মা।

নৌকা প্রস্তুত আছে জানিয়া ঠাকুর অন্তঃপুরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিতে গেলেন এবং স্বয়ং পুরনারীদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া গোঁ-ভরে বাহিরে আসিলেন। অপর স্ত্রীভক্তেরা অন্দরমহলে থাকিয়া গেলেও একজন যেন আত্মহারা হইয়া ঠাকুরের সহিত বাহির মহলে আসিয়া পড়িলেন। ঠাকুরের দৃষ্টি হঠাৎ ঐ দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি দাঁড়াইলেন এবং "মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী" বলিয়া বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। স্ত্রী-ভক্তটি তাঁহার চরণে প্রতি-প্রণাম করিলে ঠাকুর বলিলেন "চ না গো চ।" সেই আকর্ষণে যোগীন-মা অন্দরমহলে খবর দিয়াই দ্রুত দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। তিনি যাইতেছেন দেখিয়া গোলাপ-মাও তাঁহার সঙ্গ লইলেন। (ক্রমশঃ)

স্বামীজীর কবিতার পটভূমি

অধ্যাপক শ্রীপ্রণব ঘোষ, এম্-এ

শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন করে মহাবিস্ময়ে অর্জুন বলেছিলেন—

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্‌ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।

"আমি দেখছি তোমার আদি-মধ্য-অন্তহীন রূপ, অনন্তবীর্য তুমি, অনন্ত তোমার বাহু, চন্দ্রসূর্য তোমার দুই নেত্র, মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতিঃ, আপন তেজে তুমি নিখিল জগৎ সন্তপ্ত করে তুলেছ। হে বিষ্ণু, নভস্পর্শী অনেকবর্ণ তেজোময় তোমার ব্যাদিত মুখমণ্ডল আর দীপ্ত বিশাল নেত্র দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত, দূরে গেছে আমার ধৈর্য ও শান্তি। মরণের আহ্বানে যেমন করে পতঙ্গেরা মহাবেগে ছুটে চলে প্রদীপ্ত অগ্নির অভিমুখে, তেমনি এই সকল প্রাণী মৃত্যুর জন্যই তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করতে চলেছে।" (গীতা ১১।১৯, ২৪, ২৯)

জগৎ-কারণের এই মহাকালমূর্তির ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য অর্জুনের মনকে অভিভূত করে প্রশ্ন তুলেছিল—"আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো" (উগ্রমূর্তি—কে আপনি আমায় বলুন)। উত্তর এল—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ—আমি লোক-ক্ষয়কারী কাল! তুমি যদি যুদ্ধ নাও কর, তবু বিপক্ষদলে যে বীরেরা আছেন তাঁরা কেউ বেঁচে থাকবেন না।" "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।"—অতএব, তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও, যশোলাভ কর এবং শত্রুবর্গকে পরাজিত করে নিষ্কণ্টক হয়ে রাজ্যভোগ কর।

বৃন্দাবন ও কুরুক্ষেত্র—এ দু'য়ের পটভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ-জীবন পূর্ণাঙ্গ। মনে হয়, চিরায়ত-সাহিত্যেরও এই লক্ষণ; জীবন ও মৃত্যু, প্রেম ও বৈরাগ্য, কুসুম ও বজ্র সেখানে পাশাপাশি দেখা দেয়। তা না হলে জীবনের পরিপূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না। অবশ্য—"রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়, মৃত্যুরূপা এলোকেশী।" কিন্তু রুদ্রের তো বামমুখও আছে। মঙ্গল ও অমঙ্গল—এ দুয়ের মধ্য দিয়েই ভগবান আত্মপ্রকাশ

করেন। দুঃখ থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়, দুঃখের মুখোমুখি হয়েই তার অন্তরালে দুঃখমূর্তি ভগবানকে চিনে নিতে হবে।* তাই জীবনের বেদনা, ব্যর্থতা, সংগ্রামের উপরে মানবাত্মার জয়-ঘোষণাই স্বামীজীর কবিতার ব্যঞ্জনা। "তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ"—"জাগো বীর"—এই তাঁর কবিতার মূল সুর, এর ছন্দ "প্রাণ" এবং দেবতা "মহাকালী।"

বাংলার ঐতিহ্যে অর্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনের মতো ব্যাপ্ত সমগ্রানুভূতি দেখা দিয়েছিল তন্ত্রের ধ্যানে। বাংলা সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ উনিশ শতকের আগে বৃন্দাবন লীলার বাইরে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রই তাঁর জীবন কাহিনী পুনরালোচনা করে, সমগ্র শ্রীকৃষ্ণজীবনকে আমাদের মানসলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকে তন্ত্রের সাধনার মধ্য দিয়ে বাঙালী পরমাশক্তির ধ্যান করে এসেছে—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গ-বামাধোর্ধ্ব করাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃপাণিকাং॥ ২

দুর্গা, চণ্ডী ও কালিকামূর্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি ও সংহাররূপা জগজ্জননীর পালনীশক্তির উদ্দেশে বাঙালী-হৃদয় যুগ যুগ ধরে প্রণাম জানিয়েছে। একদিকে বৈষ্ণব সাধনা, অন্যদিকে শাক্ত সাধনার যুগ্ম ধারায় বাঙালী-হৃদয় অভিসিঞ্চিত।

অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্য দিয়ে যাঁরা মানবকল্পনার ইতিহাস লক্ষ্য করে থাকেন, তাঁরাও বাঙালীর এই কালিকাপূজার মধ্য দিয়ে একটি নূতন সত্যের ইঙ্গিত পাবেন। মাধুর্যমণ্ডনের দিকে বাঙালী মনের সহজাত প্রবণতা রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখ-দহনের মধ্য দিয়ে জীবনের পূর্ণতর সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টাও তার জাতীয় ঐতিহ্য। দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠের মূলকারণটিও এইখানে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যেও আমরা জীবনানুভূতির সকল বিকাশে পরম সত্যের প্রকাশকেই অনুভব করতে চেয়েছি। আমাদের কালিকামূর্তি একদিকে খড়্গ-মুণ্ডধরা বিভীষণা, আর একদিকে বরাভয়করা অপরূপা।

ভগবানের এই মাতৃরূপ-বন্দনার পিছনে আমাদের অতীত ইতিহাসের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা অথবা পারিবারিক জীবনে মায়েদের প্রাধান্য নিশ্চয় কাজ করেছে। তাই আমাদের কবি দেখতে পেয়েছেন—'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি!' এই মাতৃ-সাধনার অগ্রদূত কবি রামপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবকে সূচিত করে গিয়েছেন আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি যেমন 'চৈতন্য'-ভাবনার পরিমণ্ডল রচনা করে গিয়েছিলেন, রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতির গানে তেমনি 'রামকৃষ্ণ'-ভাবনার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকে এই সংগীতের ব্যাকুলতা সাধনার মন্ত্রবলে মূর্ত হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তারপর একে একে সকল মতের পথ পরিক্রমা শেষ করে অদ্বৈতজ্ঞানের সঙ্গে দ্বৈতজ্ঞানের রাখীবন্ধন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতের অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের একটি মাত্র দিক—নিরাকার-সাধনার দিক—শিক্ষিত-সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। অদ্বৈতজ্ঞানের আলোকে সাকার থেকে নিরাকারে, আবার নিরাকার থেকে সাকারে—'ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'-র পরিপূর্ণতা এনে দিলেন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারী। ভগবানের অনন্ত বৈচিত্র্যকে যাঁরা বুদ্ধির নিগড়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাঁরাও অনন্তলীলাময়ের

* ...God manifests through evil as well as through good ...the true attitude of mind and will, that are not baffled by the personal self, was in fact that determination, in the stern words of the Swami Vivekananda, to seek death, not life, to hurl oneself upon the sword's point, to become one with the Terrible for evermore. (The Master as I saw Him—Sister Nivedita.)

মাতৃসত্তাকে প্রণাম জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আসবার পর থেকে।

এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে গীত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতিপ্রিয় সঙ্গীতগুলি স্মরণীয়: যেমন—'আমায় দে মা পাগল করে', 'চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় হে', 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি', 'অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরযামিনী'। সাকার নিরাকার বোঝাতে গিয়ে অপূর্বসুন্দর উপমায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝিয়ে দিলেন—"আমি শুনেছি কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মত হলো। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ; অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোনও বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মত হ'ল।"

(আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী)

সাহিত্যের অনুরাগীমাত্রেই জানেন গভীর অনুভূতি বাক্যমনের অগোচর—'অবাঙ্‌মনসো-গোচরম্।' আমরা তার আভাস পাবার চেষ্টা করি মাত্র। সুতরাং অনুভূতির কোন মৌল সত্যই সাহিত্যানুরাগীর কাছে উপেক্ষণীয় হ'তে পারে না; অধ্যাত্ম অনুভূতি তেমনি একটি সাহিত্যিক উপাদান—শ্রেষ্ঠ এবং দুষ্প্রাপ্য উপাদান। কেবল যে প্রাচীন কালের সাহিত্যেই এই উপাদান পাওয়া যায় তা নয়, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায়ও এর কম বেশি অনুরণন কান পাতলেই শোনা যায়। অধ্যাত্ম-চেতনাপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথই অগ্রগণ্য। তাঁর পরেও রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ, কালিদাস রায়, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নজরুল ইসলাম, দিলীপকুমার রায়, নিশিকান্ত এবং অমিয় চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কল্পনালব্ধ সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুভূতির পার্থক্য থাকবেই।

এই অধ্যাত্ম অনুভূতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরে কতখানি প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে ধরা দিয়েছিল, তার সাক্ষ্য রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের পাঁচটি খণ্ডে। তা ছাড়া আরো বহু জনের স্মৃতিতে তাঁর বাণী চিরমুদ্রিত আছে। শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিতে পাই—"একবার এই প্রসঙ্গ হইয়াছিল, 'মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে জানিতে পারে কি না'। তিনি বলিয়াছিলেন, 'বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও তেমনি আমার গায়ে ঠেকেন'।" এই অনুভূতির গভীরে ডুব দিয়ে তিনি সমাধিমগ্ন হতেন, সমাধি থেকে অভ্যুত্থানের সময় নানা উপমা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে অসীম রাজ্যের সংবাদ পৌঁছে দিতে চাইতেন, সসীম-রাজ্যের কানে।

নরেন্দ্রনাথের সন্দিগ্ধ জীবনজিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবদুপলব্ধির নিশ্চিন্ত অভিজ্ঞান তুলে ধরতে পেরেছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্রনাথের অন্তরের দ্বার চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবু পদে পদে সংশয়, সঙ্কট ও জিজ্ঞাসার ক্ষুরধার পথে নরেন্দ্রনাথকে বিচরণ করতে হয়েছে। অবশেষে একদিন যখন তিনি মহাজীবনের মোহনায় এসে ভূমা-সমুদ্রে মিশে যেতে চাইলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন—"কোথায় কালে বটগাছের মত শত শত লোককে শান্তির ছায়া দিবি, তা না, তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্; এত ছোট আদর্শ তোর!" কিন্তু তবু অনুভূতির স্পর্শ চাই—তা না হলে কল্যাণকর্মের পরিপূর্ণ প্রেরণা জাগে না। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের ব্যাকুল অনুরোধে শেষ অবধি সম্মতি দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—"আচ্ছা যা, নির্বিকল্প সমাধি হবে।"

'একদিন সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আপেক্ষিক জড়পুঞ্জ যেন মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল; দেশ-কাল-নিমিত্তের পরপারে অবস্থিত নিজবোধস্বরূপ আত্মা স্ব-মহিমায়

বিরাজ করিতে লাগিলেন। ····বহুক্ষণ পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব করিলেন, তাঁহার মন ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে কামশূন্য হইলেও একটা অলৌকিক শক্তি তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যজগতে নামাইয়া লইয়া আসিতেছে। অনুভব করিলেন, "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় কর্ম করিব, অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য প্রচার করিব" এই মহতী কামনার সূত্র ধরিয়া তাঁহার মন নির্বিকল্প অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল।'*

ব্রহ্মকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে তিনি সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শন করলেন। উচ্চারিত হ'ল নবযুগের নূতন মন্ত্র—"পড়েছ—'মাতৃদেবো ভব', 'পিতৃদেবো ভব', আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব': দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।' 'And may I be born again and again, and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum-total of all souls

অপরোক্ষানুভূতির গভীরতম গুহা থেকে মন্দ্রিত হ'ল 'প্রলয় বা গভীর সমাধি'র সুর:

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত না থেকে সে ধারা নেমে এল বিশ্বজনের সেবামন্ত্র নিয়ে—

ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর, সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।
(সখার প্রতি)

বেদান্তের এই কর্মপরিণত রূপদানই মানবাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। সমাধিলোক থেকে নেমে এসে যাঁরা মানবকল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করবেন তাঁরা সংখ্যার দিক থেকে মুষ্টিমেয়। সাধারণ মানুষ সেই উচ্চতম অধ্যাত্মসত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যেই নিষ্কাম সেবাব্রত গ্রহণ করতে পারে। এই সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে পার্থিব সত্যের সঙ্গে অপার্থিব সত্যের যোগসূত্র স্থাপন করা চলে। সুতরাং নবযুগের বেদান্ত-সাধনা ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার গুহা ছেড়ে সর্বমানবের কল্যাণব্রত গ্রহণ করলো। এই সাধনার ইতিহাসই স্বামীজীর জীবনের পটভূমি।

* * *

স্বামীজীর কবিতা আলোচনার আগে তাঁর মননধারার উৎস সম্বন্ধে আলোচনায় এতক্ষণ নিবিষ্ট ছিলাম। এবারে তাঁর সময়কার বাংলা কাব্য ও কবিতার প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন।

মধুসূদনের আবির্ভাব যে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কত বড় যুগান্তর—সেকথা তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ মনীষী-মাত্রেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই 'মেঘনাদবধ-কাব্য'কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেকালের সেরা মনীষিবৃন্দ। রাজনারায়ণ বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহারথীদের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু একদিকে এই অভিনন্দনের সমারোহ থাকলেও গতানুগতিকতা-পরায়ণ পণ্ডিতসমাজে এ কাব্যের নিন্দারও অবধি ছিল না। "ছুছুন্দরী-বধ"—রচনা করে জগবন্ধু ভদ্র যে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছিলেন সেটি আসলে বাঙালী জাতির আত্মব্যঙ্গ। সবচেয়ে আশ্চর্য এই, কিশোর রবীন্দ্র-

* বিবেকানন্দ চরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (পৃঃ ৭৭-৭৮)

নাথও 'মেঘনাদবধকাব্যে'র চেয়ে 'বৃত্রসংহারকাব্য'কে বড় স্থান দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যে মত বদলেছিলেন তাতে এই প্রমাণিত হয় যে, মেঘনাদবধকাব্যের রস উপলব্ধি করতে হলে পরিণত মনের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালি-গালাজ।" (জীবনস্মৃতি)

পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে মেঘনাদবধকাব্যের অভিনবত্ব ধরা পড়েছিল এইভাবে—"মেঘনাদবধ-কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। ...তিনি (মধুসূদন) স্বতঃস্ফূর্ত প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। ...এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে, ইহার রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। ..যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন-মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

এখন মেঘনাদবধকাব্য সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত স্মরণ করা যাক্। মধুসূদন-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—"ঐ একটা অদ্ভুত genius (মনস্বী ব্যক্তি) তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙালা ভাষাতে ত নাই-ই; সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।" ..."তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই, তোরা তাকে তাড়া করিস। আগে ভাল করে দেখ্, লোকটা কি বলছে, তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হ'ল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগল। এই মেঘনাদবধকাব্য—যা তোদের বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কি না ছুঁচোবধ কাব্য লেখা হ'ল! তা যত পারিস লেখ্ না, তাতে কি? কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব criticদের (সমালোচক-দিগের) মত ও লেখা কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায়, যে কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বুঝবে?"

মেঘনাদবধকাব্যের কোন্ অংশটি স্বামীজীর সবচেয়ে প্রিয় ছিল, তাও এক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য —"যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী শোকে মুহ্যমানা হয়ে রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী-পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য বহির্গমনোন্মুখ—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা। 'যা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য আমি ভুলবো না, এতে দুনিয়া থাক, আর যাক'—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ওই অংশ লিখেছিলেন।"

মেঘনাদকাব্যের সপ্তম সর্গের ওই অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃতির যোগ্য—

রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষকুলপতি;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল। বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেনকালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।

যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণী মন্দোদরী?

বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শে এমন একটি বলিষ্ঠ প্রতিজ্ঞার সেদিন প্রয়োজন ছিল। আত্মবিশ্বাস—বিবেকানন্দ-জীবনের ভিত্তিভূমি। সমগ্র জাতির জীবনে তিনি এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন।

বেদান্তের আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠা স্বামীজীর মনে যে বলিষ্ঠ আশাবাদ সঞ্চার করেছিল, তার সঙ্গে এসে মিশেছিল দেশপ্রেমের দীপ্তি। বস্তুতঃ যা কিছু চলন্ত ও জীবন্ত তার মধ্য দিয়েই তিনি ব্রহ্মের প্রকাশ দেখতে পেতেন। পত্রাবলীতে তাই তিনি লিখেছেন"—যদি জন্মেছ ত' একটা দাগ রেখে যাও।" "Avalanche-এর মত দুনিয়ার উপর পড়—দুনিয়া ফেটে যাক চড়চড় করে…।" তাই মেঘনাদবধকাব্য স্বামীজীকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার পরিচয় আছে তাঁর কবিতার ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে।

সমগ্রভাবে দেখতে গেলে বিবেকানন্দের তরুণ-বয়সে মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট কবিদের কাব্যে বীররসের প্রেরণাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তখনকার নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ কবিদের কাছে উৎসাহ ও প্রেরণার দাবি ক'রত। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাসত্রয়ী (আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম) এবং নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যত্রয়ী (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস) জাতীয় আদর্শের পুনরুজ্জীবনেরই সাহিত্যিক প্রকাশ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে হিন্দুমেলার জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন 'পুরুবিক্রম', 'অশ্রুমতী' 'সরোজিনী' প্রভৃতি নাটক লিখে চলেছেন। কাব্যে নাটকে উপন্যাসে—বাংলাসাহিত্যের পরিমণ্ডলে সর্বত্র তখন পরাধীনজাতির নব উৎসাহ-সঞ্জাত বীরত্ববোধই স্থায়ী ভাব। বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমিতে এই স্থায়ী ভাবের সঙ্গে এসে মিলেছে তাঁর দৃপ্ত-পৌরুষে সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

মানুষ হিসাবে ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনা-বোধ এবং জাতিগত দিক থেকে অপরিমেয় দৈন্য-দুর্দশার উপলব্ধি তাঁর অনুভূতিকে স্পন্দিত করেছে। আবার আত্মস্বরূপে অচল প্রতিষ্ঠার ফলে সর্ববন্ধন-মুক্ত আত্মার জয়ঘোষণা তাঁকে দেশকালের ঊর্ধ্বে সর্বমানবের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করে তুলেছে। জীবনরহস্যের আলোছায়াসম্পাতে বিবেকানন্দের মানসতরঙ্গ তাই এত সুন্দর, এত মহনীয়।

তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা বলতে জীবনের লাভ ক্ষতির সূক্ষ্ম অংশভাগের কথা বলছি না। সেই বেদনার কথাই বলছি যে বেদনায় সকল যুগের সব মহামানবই আলোড়িত হয়েছেন, যে বেদনার বশে স্বামীজী বলেছিলেন—"যতদিন এ দেশের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততদিন আমার মুক্তি চাই না। সেদিন অলক্ষ্যে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় হাসি বিবেকানন্দের হৃদয়-আকাশকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের আগে রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রমুখ মনীষীরা ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করে ভবিষ্যৎ ভারতকে এই দুই সভ্যতার মিলনকেন্দ্ররূপে গঠন করবার কল্পনা বোধ করি স্বামীজীরই প্রথম। এই

বিশ্ব পরিক্রমার ফলে বিবেকানন্দের কবিতাও সর্ব দেশের সর্ব মানবের বাণী বহন করে এনেছে; সমগ্র মানবজাতি তাঁর কবিতার উদ্দিষ্ট পাঠক।

(৩)

ভাব, ভাষা ও ছন্দ—এ তিনটিই ভালো কবিতার ক্ষেত্রে "অপৃথগ্-যত্ন-সম্পাদ্য" অর্থাৎ আলাদা আলাদা ভাবে চেষ্টা করে এদের যুক্ত করতে হয় না। কবিমানস থেকে সৃষ্টির ঘূর্ণাচক্রে এরা এক সঙ্গেই আকার লাভ করে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তার মধ্যেও ব্যক্তির নিজস্ব মানসভঙ্গী কাজ করে বৈকি—তাছাড়া পূর্বপুরুষাগত ঐতিহ্যও অনেকখানি প্রেরণা জোগায়।

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা কবিতার ভাষা ও ছন্দে তাঁর গভীর আবেগের সঙ্গে সঙ্গে অটল সংযমের পরিচয় রয়েছে। বিলম্বিত পয়ার ছন্দে তিনি "সখার প্রতি" ও "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতা দুটি লিখেছেন। এ দুটি কবিতার ভাষায় তিনি সংস্কৃত শব্দের সুচারু প্রয়োগ করেছেন। ঐ শব্দ সম্ভারের দ্বারা বক্তব্যের গভীর গাম্ভীর্যই ধ্বনিত হয়েছে।

দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম, সঙ্গীত সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুঃখের পার॥
(নাচুক তাহাতে শ্যামা)

ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন,—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
(সখার প্রতি)

উপরের এই দুটি উদাহরণেই তাঁর ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য বুঝা যাবে। সংস্কৃত শব্দের সুগম্ভীর ব্যঞ্জনা ও সংস্কৃত ভাষাসুলভ সংযমেই তাঁর বক্তব্য আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। আর এই ছন্দের মধ্যে যে তরঙ্গিত গতি দেখতে পাই,—তা' মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। চরণের শেষে নির্দিষ্ট যতি থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্য চলমানতা রয়েছে এই ছন্দে। পয়ারের চরণান্তিক যতি অক্ষুণ্ণ রেখে এমন গতিবেগ সঞ্চারের উদাহরণ সেকালে খুব বেশি ছিল না। ভাষার ক্ষেত্রেও স্বামীজী মধুসূদনের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত। যে পৌরুষদৃপ্ত জীবনাদর্শ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল মধুসূদনের কাব্যভাষায় সেই আদর্শের প্রথম প্রকাশ—সে প্রকাশের ফলে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যুগান্তর সূচিত হয়েছিল। মধুসূদনের মহাকাব্যের কল্লোলধ্বনি স্বামীজীর কবিতায় আরও সুগম্ভীর মহিমায় সঞ্চারিত হয়েছে। মিলের প্রতি স্বামীজী যে বেশী মনোযোগী হন নি—তার কারণও ওই অমিত্রাক্ষর।

গিরিশচন্দ্র এই অমিত্রাক্ষরকে ভেঙে নিয়ে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে যে নূতন রূপ দিয়েছিলেন, সেই গৈরিশ ছন্দ 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটিতে প্রযুক্ত। এ কবিতায় যে গীতি-কাব্যের স্পর্শ পাই—ছন্দ ও ভাষা তারই অনুযায়ী। 'সখার প্রতি' ও 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'-র মন্দ্রধ্বনি চিরায়ত সাহিত্যেরই উপযুক্ত। 'সৃষ্টি' এবং 'প্রলয়' মূলতঃ গান—কিন্তু এ দুটি গানের কাব্যসৌন্দর্যের তুলনা একমাত্র উপনিষদেই মেলে। স্বামীজীর ইংরেজি কবিতা "Peace" (শান্তি) ঐ গান দুটিরই সমগোত্র।

স্বামীজীর বাংলা কবিতায় যে বলিষ্ঠ দৃপ্তভঙ্গীর পরিচয় পাই, তাঁর ইংরেজী কবিতায়ও সেই মনোভঙ্গীর পরিচয় মেলে। এ প্রবন্ধে বিশেষভাবে বাংলা কবিতার পটভূমিই আলোচিত হয়েছে। স্বামীজীর ইংরেজী কবিতার পটভূমি মূলতঃ এক হলেও সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্বামীজীর ব্যক্তি-চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রচিত "চৌঠা জুলাইয়ের প্রতি" (To the Fourth of July) কবিতায় তার প্রকাশ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীন মনোবৃত্তির বিকাশসাধন তাঁর আন্তরিক আগ্রহের বস্তু ছিল। পত্রাবলীতে তাই তিনি লিখেছেন—"…স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক। স্বাধীনতা

হরণ করিয়া লও, তাহার ফল অবনতি।" (পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা) To the Awakened India (প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি), The Song of the Free (জীবন্মুক্তের গীতি) প্রভৃতি কবিতায় ভারতবর্ষের ও নিখিল মানবাত্মার চিরস্বাধীন সত্তার জয়গান ধ্বনিত। কিন্তু মুক্তি পথের যাত্রীর হাতে স্বামীজী তুলে দিয়েছেন জীবন-মথিত বেদনাবিষের "পেয়ালা" (The cup) এ কবিতার ঘননিবদ্ধ আঙ্গিক কাব্যোৎকর্ষের দিক থেকেও লক্ষণীয়। "My play is done" (খেলা মোর হলো শেষ) কবিতায় সৃষ্টির উৎসমূলে প্রত্যাবর্তনরত জীবনতরঙ্গের বিলীয়মান ধ্বনিটুকু ফুটে উঠেছে। সমগ্র ইংরেজী ও বাংলাসাহিত্যে তুলনারহিত কবিতা—তাঁর "Kali the Mother" (জননী কালিকা—"মৃত্যুরূপা মাতা")—নবযুগের ঋষিকবির ধ্যাননেত্রে জগজ্জননীর যে চিত্রচেতনাময় রূপ ফুটে উঠেছে তার অপার বিস্ময়রস সাধক ও সাহিত্যিকমাত্রের কাছেই অমূল্য সম্পদ বলে মনে হবে। এর আগে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছি, বিবেকানন্দের কবিতার দেবতা—"মহাকালী"।

"হয়ে বাক্য মন অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।"
(সখার প্রতি)

Kali the Mother কবিতায় বিবেকানন্দের জীবনোপলব্ধির কেন্দ্রচেতনা রূপ পেয়েছে এ কয়টি চরণে—

Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance
To him the Mother comes.

সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।
(মৃত্যুরূপা মাতা—অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

এই সুখদুঃখে সম-অধিষ্ঠাত্রী, জীবনমৃত্যুর লীলা-বিভঙ্গে শাশ্বতরূপিণী, মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমিতে সংস্থিতা। তাই বিবেকানন্দের কাব্যসৃষ্টি, বাংলা কবিতার জগতে এক অভিনব সত্য ও সৌন্দর্যের আদর্শ তুলে ধরেছে,—এ আদর্শ সাহিত্যরসিক পাঠকমাত্রেরই সশ্রদ্ধ অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে।

নিঃসংশয়

শান্তশীল দাশ

সকলের তরে উতলা আমার মন,
শুধু চঞ্চল হই না তোমার তরে;
তুমি কাছে নাই, পাই নাকো দরশন,
তবু বেদনায় আঁখি-বারি নাহি ঝরে।

তুমি তো আমার বড় আপনার জন,
তবু তো তোমায় পাই নাকো কাছে কাছে;
সকলের সাথে কী নিবিড় বন্ধন,
তোমায় বাঁধার মন্ত্রটি জানি না যে।

কত জন আসে—কত হাসি, কত গান;
ভালবাসাবাসি, শেষ হয় নাকো তার।
তুমি আস নাকো, তবু কই অভিমান
জাগে নাতো মনে, ঝরে নাকো আঁখিধার।

সব শেষ হবে, থেমে যাবে কোলাহল,
নীরব রাতের নির্জন পরিবেশে
দেখা দেবে তুমি ওগো চির চঞ্চল,
বক্ষে আমার টেনে নেবে ভালবেসে।

সমালোচনা

মায়াবতীর পথে—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি—৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা—৫৬; মূল্য—১৲ টাকা

সম্প্রতি-পরলোকগত গ্রন্থকার বাংলা ১৩২১ সালে হরিদ্বার হইতে হিমালয়স্থিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম দেখিতে যান। আলোচ্য পুস্তকে তাঁহার ঐ ভ্রমণের মনোজ্ঞ বিবরণ বর্ণিত। প্রবীণ জ্ঞানতাপসের তত্ত্বদর্শী মন রচনার ভিতর একটি সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

মহিমবাবু—ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার প্রণীত। লেখক কর্তৃক ৩৯, দেব লেন, ইটালী, কলিকাতা -১৪ (শ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চনালয়) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১১৮; মূল্য—২৲ টাকা

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম অনুজ বহুগ্রন্থপ্রণেতা বিশিষ্ট দার্শনিক শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের (মহিম বাবু) সহিত লেখকের বারো বৎসরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের স্মৃতি বর্তমান পুস্তকে লিপিবদ্ধ। কলিকাতা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, পাঞ্জাব, অযোধ্যা এবং আরও কয়েকটি স্থানে মহিমবাবুর সঙ্গ করিবার সুযোগ লেখক লাভ করিয়াছিলেন। বর্ণনাগুলি সুখপাঠ্য। শেষের দশ পাতায় শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থাবলীর ও দার্শনিক মতবাদের আলোচনা আছে।

যুগবিপ্লবী বিবেকানন্দ—শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত প্রণীত, প্রকাশক—নবভারতী, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা (ডিমাই) —৪৮৮; মূল্য—সাতটাকা আট আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের জীবন ও চরিত্র চিত্রণে যে মনোযোগ, ধৈর্য, অধ্যয়ন, অন্তর্দৃষ্টি ও মনীষার প্রয়োজন হয় এই বৃহৎ পুস্তকের লেখক তাহার কোনটিরই প্রমাণ দিতে পারেন নাই। স্বামীজীর উপর তাঁহার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাভক্তি নিঃসন্দিগ্ধ, কিন্তু সাহিত্যকীর্তির মাধ্যমে উহার সার্থক রূপায়ণ স্বতন্ত্র কথা। সাময়িক কৌতূহলোদ্দীপক উপন্যাসের আকারে ঐ রূপায়ণের অপচেষ্টা এই বইটিতে দেখিয়া আমরা মর্মপীড়া অনুভব করিলাম। শ্রুতি-মধুর অনেক আধুনিক বাংলা শব্দের সহিত অর্থহীন ব্যাকরণদুষ্ট শব্দের জগাখিচুড়ি লেখকের কাঁচাহাতের পরিচয়কে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

—শ্রদ্ধানন্দ

(১) কিং জ্যোতিঃ? (২) অনাত্ম-শ্রী-বিগর্হনম্ বা তত্তঃ কিম্—আচার্য শঙ্কর-বিরচিতম্। অধ্যাপক শ্রীদেবকুমার দত্ত কর্তৃক অনূদিত। এ, আই, সি, প্রেস্, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। যথাক্রমে পৃষ্ঠা—২২ ও ১২ এবং মূল্য ॥০ ও ।০ আনা।

(১) শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত পূজ্যপাদ আচার্য শঙ্করের "কিং জ্যোতিঃ?" শিরোনামে একটি মাত্র শ্লোকে সংক্ষেপে বেদান্তের মূল তত্ত্ব প্রকাশিত। কি তোমার জ্যোতি? অর্থাৎ কি তোমার দৃষ্টির সহায়ক? দিবসে সূর্য, রাত্রে চন্দ্র প্রদীপ প্রভৃতি। চক্ষুর সাহায্যেই সূর্যাদি দৃষ্ট হয়; চক্ষু মুদ্রিত করিলে বা চক্ষু না থাকিলে বুদ্ধির সহায়তায় বস্তুজ্ঞান হইয়া থাকে। বুদ্ধি আত্মা দ্বারাই প্রকাশিত। অতএব আত্মাই পরম-জ্যোতি। এই শ্লোকে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তত্ত্বজ্ঞ গুরু একান্ত অনুগত উপযুক্ত শিষ্যকে অন্য-নিরপেক্ষ সর্বপ্রকাশক স্বয়ংপ্রকাশ আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন।

(২) অনাত্ম-শ্রী-বিগর্হনম্—মন স্বভাবতই চঞ্চল, চঞ্চল মনকে স্থির করিতে না পারিলে সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সাংসারিক ভোগসুখ, বিষয়-বাসনা, মানযশ—এই অনাত্ম বস্তুগুলি হইতে মন উঠাইতে পারিলে তবেই নিত্য

বস্তু 'আত্মা'র জন্ম ব্যাকুলতা আসে। 'অনাত্ম-শ্রী-বিগর্হনম্'—১৮টি শ্লোকের এই পুস্তিকাখানিতে আচার্য শঙ্কর আত্মা-ব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুর ক্ষণ-স্থায়িত্ব প্রতিপাদন করিয়া সাধক-মনকে আত্মাভিমুখী করিতেছেন।

পুস্তিকা দুইটির বাংলা কাব্যানুবাদ প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। আচার্য-শঙ্কর-কৃত প্রকরণ-গ্রন্থগুলি সহজ অনুবাদের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ায় বেদান্ত জনপ্রিয় হইতেছে—এ বিষয়ে প্রকাশক-গ্রন্থাকারের সাধু প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পথের কথা (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী এম্-এ প্রণীত, প্রকাশক: মেসার্স বি. কে রায় চৌধুরী এণ্ড সন্স, পো: মিহিজাম, জেলা সাওতাল পরগনা। পৃষ্ঠা—১৭৯; মূল্য দুই টাকা।

বিবিধ সমস্যাসঙ্কুল বাঙলার অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রধান। মানুষ যদি অন্নচিন্তার দুঃসহ জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পায় তবে নব নব চিন্তায় অন্যান্য সমস্যারও সমাধান করিতে যত্নশীল হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব। বাঙালী যুবকেরা কি উপায়ে স্বাধীনভাবে অন্নসমস্যার সমাধানে ব্রতী হইতে পারে আলোচ্য পুস্তকটিতে তাহাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। শহরমুখী মনোভাব ত্যাগ করিয়া পল্লীতে থাকিয়া পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ অনাবাদী জমিগুলিতে কিভাবে সোনা ফলানো যায়, পাঁক ও পানায় ভরা খাল-বিল-পুকুরগুলির সংস্কার-সাধন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৎস্য-চাষ করিয়া কিরূপে লাভজনক ব্যবসা করা যায়—তাহার নানা তথ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লেখক এই পুস্তকখানিতে পরিবেশন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধসমস্যা, গোপালন, গরুর খাদ্য, ফলের আবাদ, রেশমশিল্প, স্বাস্থ্য ও খাদ্য, কলকারখানা ও জগতের প্রগতি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বহু কথা ইহাতে আছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বইটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

—জীবানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩০৭, মূল্য ২।৹

স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক রচনা, পত্র, কথোপকথন, বক্তৃতা প্রভৃতি হইতে অনেকগুলি নির্বাচিত অনুচ্ছেদ পর পর নিবন্ধাকারে ছাব্বিশটি বিষয়ানুযায়ী অধ্যায়ে সংগৃহীত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক সামাজিক ব্যক্তিগত জাতিগত নানাপ্রশ্নের সমাধানের সহায়করূপে পুস্তকখানি গ্রথিত।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃ: ১১৯, মূল্য ১।৹

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত প্রথম 'নিবেদিতা লেকচার'। দিবসত্রয়ে পরিবেশিত বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত। ভগিনী নিবেদিতার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত, তৎসহ যথাস্থানে তাঁহার চিন্তাধারার নূতনত্ব এবং ভারতের মুক্তিসাধনায় তাঁহার দান সম্যগ্‌ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা—স্বামী তেজসানন্দ। প্রকাশক স্বামী বিমুক্তানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, সারদা-পীঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃ: ১৬৮, মূল্য ২৲। শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে কয়টি সাধিকার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাঁহাদের কেন্দ্রে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে রাখিয়া গ্রন্থখানি রচিত। বিভিন্ন অধ্যায়ে জননী সারদামণি, রাণী রাসমণি, যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী, গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, গৌরী-মা ও লক্ষ্মী-দিদির জীবন সুন্দর ও তথ্যপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ।

জীবন বিকাস—'জীবন বিকাস' পত্রিকা—নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত নূতন মারাঠী মাসিক পত্রিকা; প্রতি সংখ্যা ।৵০, বার্ষিক ৫৲।

জীবনের উচ্চতর মূল্যমান নির্ণয়ের জন্ম অসাম্প্রদায়িক ধর্মভাব বিকীরণের প্রয়োজন, রামকৃষ্ণ মিশনের এই ভাব মারাঠী-ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রচারকল্পে এই নব উত্তম। আত্মজ্ঞান ও ও সেবার মাধ্যমে মানবের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্বকে ফুটাইয়া তুলিয়া ব্যক্তিগত ও জাতিগত সামগ্রিক উন্নয়নই ইহার লক্ষ্য। ইহাতে খ্যাতনামা মারাঠী-লেখক-লিখিত ধর্ম দর্শন শিক্ষা সমাজবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সাহিত্য ভ্রমণ ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদপটে দক্ষিণেশ্বরের জ্যোতির্ময় পঞ্চবটীর ছবি তাৎপর্যপূর্ণ। সম্পাদকীয় সহ ১৭টী প্রবন্ধে কবিতায়, সমালোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, গীতা, কবীর, রাজা রামমোহন রায়, সাহিত্য, সন্তজীবন প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি-উৎসব—গত ১৯শে ফাল্গুন (৩. ৩. ৫৭) রবিবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম শুভ জন্মতিথি-উৎসব বিপুল আনন্দপূর্ণ ও শুচিসুন্দর অনুষ্ঠান-সহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ভোর ৪-৩০ মিঃ মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ সূচনা হইলে পর একে একে উপনিষদ্‌পাঠ, চণ্ডীপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা ও হোম এবং দশাবতারের পূজা, 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা, 'কথামৃত' পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিন ভক্তহৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামাধুরী সিঞ্চিত হইতে থাকে। বৈকাল ৪ ঘটিকায় স্বামী বোধাত্মানন্দের নেতৃত্বে এক সভায় স্বামী পুণ্যানন্দ বাংলায় ভাবপূর্ণ ভাষায় ও ভঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী বিবৃত করেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ইংরেজীতে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান সভ্যতার সম্মুখে একটি 'চ্যালেঞ্জ'—তাঁহার শিক্ষার দ্বারাই বর্তমান যুগব্যাধির প্রতীকার হইতে পারে। সভাপতি মহারাজ এই পুণ্য তিথির উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জানাইয়া ভারতীয় চিন্তাধারায় সর্বধর্মসমন্বয়ের তাৎপর্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে তাঁহার রূপায়ণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরো বলেন, আধ্যাত্মিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীজাতির জাগরণ একান্ত প্রয়োজন—তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীগুরুগ্রহণ দ্বারা প্রমাণিত। সকাল হইতে প্রায় ৫০ হাজার নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসেন। ভক্তবৃন্দ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া পবিত্র ভাবধারায় বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। প্রায় এগারো সহস্র নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও হোমের পর রাত্রিশেষে পূজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ২৯ জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ২৪ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার ১০ই মার্চ সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এই দিন মন্দিরের পূর্বদিকে গঙ্গাতীরস্থ প্রাঙ্গণে নির্মিত মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ তৈলচিত্র ও তাঁহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র সজ্জিত রাখা হয়। মণ্ডপে ও মঠের অঙ্গনে বিভিন্ন কীর্তনের দল সারা দিন ভজন-কীর্তনের দ্বারা উৎসব-ক্ষেত্র মুখরিত করেন। উষাকাল হইতেই সারাদিন ধরিয়া বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে পাঠ এবং ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা বিদ্যুৎ-সহায়ে সম্প্রচারিত হয়। প্রধান মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তি দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

বিভিন্ন কার্যে বহু স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত থাকেন। সন্ধ্যারতির পর বাজী পোড়ানো হইলে উৎসবের সমাপ্তি হয়। সারাদিনে পঞ্চাশ হাজার নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ পান, তিন লক্ষের উপর লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বর মঠ ঃ ব্রহ্মানন্দ-জয়ন্তী—গত ১৯ মাঘ (১লা ফেব্রুআরি) ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ৯৪তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সকালে মঙ্গলারতি হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন, শ্রীরাম-নামসংকীর্তন, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি অধিক রাত্রি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ওড়িশ্যার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় স্বামী অসঙ্গানন্দ-প্রমুখ বিভিন্ন বক্তা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপূর্ব ভাগবত জীবন সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। শ্রীমহতাব তাঁহার বাল্যস্মৃতি উদ্‌ঘাটিত করিয়া বলেন, ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পূত সান্নিধ্যে আসেন, সেই সময় পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহাকে শরীর সুগঠিত ও শক্তিশালী করিতে উপদেশ দেন। এই উপদেশের তাৎপর্য তিনি তখন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, পরে তিনি উহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীমহতাব তাঁহার আর একটি উপদেশের উল্লেখ করেন, জাতীয় জীবন গঠন করিতে গেলে নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা অপরিহার্য।

বোম্বাই ঃ আশ্রম-ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন—গত ২৭শে জানুআরি খার (বোম্বাই) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী স্মারক-ভবনের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এতদুপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে পূজ্যপাদ মহারাজজী বলেন ; শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি-স্বরূপা ভারতীয় নারীজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীই রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী কল্যাণ-কর্মের বিদ্যুদাধার। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহারই শুভাশীর্বাদে সতত শক্তি ও উৎসাহ লাভ করিতেন।

স্বামীজীর জন্মোৎসব

দক্ষিণেশ্বর ঃ গত ৯ই মাঘ শ্রীসারদামঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব—বিশেষ পূজা, হোম, উপনিষদ্‌পাঠ, চণ্ডীপাঠ এবং ভজনাদি দ্বারা উদ্‌যাপিত হয়। বৈকালে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত মহিলা-সভায় সভানেত্রী হইয়াছিলেন সুলেখিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী সরকার, অধ্যাপিকা বেলা দে এবং মঠের ব্রহ্মচারিণীগণ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভায় প্রায় চারি শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

শিলচর (আসাম) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ২৭শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত রসময় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী জনসভায় স্বামীজীর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী শিবরূপানন্দ প্রভৃতি।

বালিয়াটী (ঢাকা) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পূজা পাঠ ও নারায়ণসেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

নিউইয়র্ক ঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার

স্বামী ঋতজানন্দ প্রতি মঙ্গলবার গীতা ও স্বামী নিখিলানন্দ প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন, এবং রবিবারের বক্তৃতায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিল।

নভেম্বর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, হিন্দুধর্মে আত্মার ধারণা, প্রকৃত সুখলাভের উপায়, ধ্যানের অভ্যাস।

ডিসেম্বর ঃ ভক্তির সাধনা, ঈশ্বরকে খুঁজিও না ; তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর, ঈশ্বর যখন দেবমানব-

রূপে আসেন, শ্রীশ্রীমা : ভারতীয় নারীর আদর্শ, কর্ম ও ধ্যান।

জানুআরি : নির্ভয়ে জীবনের সম্মুখীন হও, সাধু-সন্তের ভক্তি, অহঙ্কার জয় কিভাবে হয়? মুক্তি ও ধর্ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দ।

এতদ্ব্যতীত ২৫শে ডিসেম্বর : 'খৃষ্ট ও বর্তমানে মানুষের অবস্থা' সম্বন্ধে বক্তৃতার পর খৃষ্টম্যাস-সংগীত সমস্বরে গীত হয়।

সানফ্রান্সিস্কো ঃ উত্তর কালিফর্ণিয়ার বেদান্ত সোসাইটি

স্বামী অশোকানন্দ এবং স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ প্রতি রবিবার (বেলা ১১টায়) এবং প্রতি বুধবার (রাত্রি ৮টায়) বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বেদান্তের সাধারণ তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দেন। বিষয়সূচী :—

নভেম্বর : প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মভাব, কর্মের নিয়ম, ঈশ্বরকে খুঁজিও না—তাঁহাকে দর্শন কর, আমাদের কে এরূপ করিয়াছে, শক্তির সাধনা, আত্মার চারি অবস্থা, ঈশ্বর আছেন—তার প্রমাণ, সমাধি বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রকৃতি।

ডিসেম্বর : অনাসক্তি কিভাবে আচরণ করা যায়? অহং ও আত্মা, অন্তরে চেতনা ও তাহার জাগরণ, আমার দেখা মহাপুরুষ, মন পবিত্র করা যায় কিভাবে? সত্য ও মিথ্যা জগৎ, ঈশ্বরাবতারের রহস্য, যীশুর দিব্যজীবন।

জানুআরি : আগামী বৎসর কতটা অগ্রসর হইবেন? চিন্তা বনাম ধ্যান, জীবন ও মৃত্যুর পারের জীবন, মনের রহস্যময় প্রকৃতি, ঈশ্বরে ভক্তি কিভাবে বর্ধিত হয়? ভাগবত ভক্ত ও ভগবান, বিশ্বমানব বিবেকানন্দ, শরণাগতি-ধর্ম।

প্রতি রবিবার সকালে শিশুদের ক্লাস হয়, সেখানে তাহাদের সর্ব ধর্মকে সম্মান করিতে শেখানো হয় এবং বেদান্তের সাধারণ জ্ঞানের ও পৃথিবীর ধর্মগুরুদের জীবনের সহিত পরিচয় করানো হয়।

বিবিধ সংবাদ

নানাস্থানে উৎসব

সালেপুর (কটক) : গত ১লা জানুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 'কল্পতরু' উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে পূজা, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, হোম, কীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুনামগঞ্জ (শ্রীহট্ট) : কলেজ হলে গত ১৮ই মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মুন্সেফ মিঃ সি. এফ. করিমের সভাপতিত্বে একটি সভায় শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক বিনয়কৃষ্ণ দে এবং প্রিন্সিপ্যাল মোঃ দেওয়ান আজরফ্ যুগাচার্য স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

কলিকাতা : কিশোর-কল্যাণ-পরিষদ গত ১১ই হইতে ১৭ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আলোচনা-সভার মধ্য দিয়া স্বামীজীর সপ্তাহব্যাপী জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করিয়াছেন। ১১ই কলিকাতা ট্রেণিং একাডেমিতে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ১২ই কলিকাতা বিবেকানন্দ বালিকা বিদ্যালয়ে স্বামী সাধনানন্দ, ১৩ই কলিকাতা ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতে স্বামী জীবানন্দ এবং ১৪ই সাতরাগাছি কেদারনাথ ইনষ্টিটিউশনে ও আন্দুল ছাত্রাবাসে স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং ১৫ই ভবানীপুরে মাদ্রাজী ন্যাশনাল হাইস্কুলে স্বামী অচিন্ত্যানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

কল্যাণ-ভাবনা

সব্বে সত্তা সব্বে পাণা সব্বে ভূতা চ কেবলা।
সব্বে ভদ্রাণি পস্সন্তু মা কঞ্চি পাপমাগমা॥

* *

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

একটি প্রাণীর প্রকৃত সুখ শান্তি কল্যাণ ও আনন্দ—সব কিছুই নির্ভর করে তাহার চারিপাশের প্রতিটি প্রাণীর সুখ শান্তি কল্যাণ ও আনন্দের উপর। এই সত্য যিনি যে পরিমাণে উপলব্ধি করেন তাঁহার হৃদয় হইতে সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধি সেই পরিমাণে দূর হইয়া যায়; সেই মহৎ হৃদয়ে ক্ষুদ্রত্ব বাসা বাঁধিতে পারে না, সেখানে শুধু একটি বাণীই অহরহ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে—যাহার মূল সুর সকলের কল্যাণ।

সর্বদেশের সর্বকালের উপলব্ধিমান্‌ পুরুষের অনুভূতি একই সত্য বস্তু অবলম্বন করিয়া; তাই একই প্রকার ভাষায় প্রকাশ পায় তাঁহাদের প্রাণের কথা:

কেহ যেন কোনও প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত না হয়, কাহাকেও যেন কোন পাপ স্পর্শ না করে। যে যেখানে আছে সকলে সুখী হউক, নীরোগ হউক। সকলে মঙ্গল দর্শন করুক; সত্য উপলব্ধি করুক।

এই কল্যাণ-ভাবনা যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ভারতের আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়াছে, বর্তমান যুগকেও ইহা অনুপ্রাণিত করুক।

কথাপ্রসঙ্গে

নূতন 'বর্ষ' গণনা

গত ২২শে মার্চ ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ, পুরাতন ৮ই চৈত্র ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ,—নূতন ১লা চৈত্র ১৮৭৯ শকাব্দ হইতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নূতন 'বর্ষ' গণনা শুরু হইল।

১লা বৈশাখ তার পূর্বগৌরব হইতে বিচ্যুত হইল—১লা চৈত্র আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে নববর্ষের উৎসব হইবে ১লা চৈত্র, এবং বর্ষশেষ অনুষ্ঠিত হইবে ৩০শে ফাল্গুন। অনেকের কাছে এ পরিবর্তন অসুবিধাজনক; সাধারণের ধারণা এ পরিবর্তন নিষ্প্রয়োজন।

ঠিক এই কারণেই আমাদের বুঝিতে হইবে—কেন এই পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয়, এবং বুঝিতে হইবে—ইহার অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক রহস্য, জানিতে হইবে—ইহার পিছনের ইতিহাস।

ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী (astrophysicist) ডক্টর মেঘনাদ সাহা বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছিলেন—রাশিচক্রে সঞ্চরণশীল বিষুব-বিন্দু প্রায় ২০।২১ ডিগ্রি আগাইয়া আসার দরুন এখন আর ৩০ চৈত্র বিষুব সংক্রান্তি হয় না, ২০।২১ দিন পূর্বে ৯ই চৈত্র হয়; এই দিনই সূর্যকে বিষুবরেখা লঙ্ঘন করিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিতে দেখা যায়। ৩৬০° ডিগ্রিতে ৩৬৫ দিন হওয়ায় কৌণিক মাপে দিন গণনায় প্রায় ১° ডিগ্রিতে ১ দিন হয়, অতএব সংক্রান্তিদিবস ২০।২১ দিন আগাইয়া আসিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষে এইরূপ আগাইয়া আসার নাম precession of equinoxes, ভারতে ইহাকে বিষুববিন্দুর অয়ন বা গতি বলা যায়। ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়া আসিতে সময় লাগে প্রায় ২৬,০০০ বৎসর, অর্থাৎ আজ ১লা চৈত্র—যে নক্ষত্রে বিষুববিন্দু ধরা হইল—ইহা ক্রমশঃ সরিতে সরিতে ১৩,০০০ বৎসর পরে ১৮০° বা ছয় মাস সরিয়া ১লা আশ্বিনে গিয়া দাঁড়াইবে, আরো ১৩,০০০ বৎসর পরে পূর্ণ আবর্তন করিয়া আবার ১লা চৈত্রে ফিরিয়া আসিবে।

এই বিরাট কাল গণনায় কত ইতিহাস নিশ্চিহ্ন হয়, কত জাতি কত সভ্যতার আদি অন্ত হয়, অতএব আমাদের দৈনন্দিন বা শতাব্দ বা সহস্রাব্দ গণনায় ইহা কোন কাজে লাগে না। তার জন্য বিষুববিন্দুর এই গতি স্বীকার করিয়া মাঝে মাঝে পঞ্জিকা-সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। নতুবা ব্যবহারিক বর্ষগণনায় নানা ভুল আসিয়া যায়।

ইয়োরোপে পোপ গ্রেগরির সময় যে সংস্কার হইয়াছিল তাহাতে লীপ ইয়ার সংশোধন শুরু হয়। ইহা গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার নামে পরিচিত। ভারতেও নানা সংস্কার বহুবার হইয়াছে। বহু পূর্বে ভারতে অগ্রহায়ণ হইতে বর্ষ গণনা হইত, লোকমান্য তিলক তাঁহার বিখ্যাত ORION পুস্তকে এতদ্দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন।

ইহা সর্বজন-বিদিত, বেদের অঙ্গ হিসাবে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ পূর্বকালে অবশ্য পাঠ্য ছিল, কারণ ইহারই সাহায্যে যাগযজ্ঞাদির কাল নির্ণয় করা হইত। বৈদিক জ্যোতিষ প্রাগৈতিহাসিক। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে সূত্রাকারে গণনার নিয়ম পাওয়া যায়: নক্ষত্রের নামে তিথি বা দিনের পরিচয়, চান্দ্র মাস এবং সৌর বৎসর। মকর-সংক্রান্তি হইতেও বৎসর গণনার নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইয়োরোপ-খণ্ডে এখন যে বড়দিন—উহা যীশুখৃষ্টের জন্মদিন কি না—এ বিষয়ে আজকাল গবেষক-মহলে সন্দেহ উঠিয়াছে; উহা প্রকৃতপক্ষে উত্তরায়ণ উৎসব (winter solstice) সূর্য দক্ষিণের যাত্রা শেষ করিয়া উত্তরে আসিতে আরম্ভ করিলে দিন ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে, শীত কমিয়া তাপ বাড়িতে থাকে, নবজীবনের

স্পন্দন অনুভূত হয়—শীতপ্রধান দেশে নব-বর্ষ আরম্ভের ইহাই প্রকৃষ্ট কাল। পরবর্তীকালে নববর্ষের এই জাতীয় উৎসবের সহিত যীশুর জন্মোৎসব মিশিয়া গিয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে ভারতে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষই সমধিক উন্নত হইয়াছে—তন্মধ্যে সূর্য-সিদ্ধান্তই ভারতে সর্বত্র গৃহীত। সূর্য-সিদ্ধান্তীরা বাসন্তী বিষুব সংক্রান্তি (উত্তরায়ণে যে দিন দিনরাত্রি সমান) হইতে বর্ষ-গণনা প্রচলন করেন। ইহারাই লক্ষ্য করেন এক সৌর বৎসরে ১২ চান্দ্র মাস ও ১১ দিন—অর্থাৎ তিন বৎসরে ৩৬ মাস না হইয়া ৩৭ মাস হয়, তাই তিন বৎসর অন্তর মলমাস পরিত্যাগ বিধেয় ; এইভাবে তাহারা চান্দ্র ও সৌর মাসের সামঞ্জস্য রাখিয়াছিলেন। যাহারা তাহা করে না তাহাদের চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসর অপেক্ষা গণনায় ক্রমবর্ধমান।

বিষুববিন্দুর অয়ন জন্য প্রায় ৭০ বৎসর অন্তর বিষুব-সংক্রান্তি (vernal equinox) এক ডিগ্রি বা একদিন করিয়া আগাইয়া আসে—তাহা বিশেষ ধরা যায় না, কিন্তু এই পার্থক্য এক মাস হইলে বেশ ধরা পড়ে। এক মাস, এক রাশি বা ৩০ দিন সরিতে প্রায় ৩০°×৭০=২১০০ বৎসর লাগে। এখন ২০° সরিতে ২০×৭০ মোটামুটি ১৪০০ বৎসর লাগিয়াছে। অর্থাৎ মনে করা যাইতে পারে বঙ্গদেশে প্রচলিত বঙ্গাব্দ ১৩৮৩ এইরূপ পঞ্জিকা-সংস্কারের ফলেই একসময় শুরু হইয়াছিল। কাহারও মতে আকবরের সময় চান্দ্র হিজরি সাল অনুসারেই ইহার শুরু হয়। চান্দ্র সাল বাড়িয়া এখন ১৩৭৬ হিজরিতে পরিণত হইয়াছে।

বিষুব নক্ষত্র-বিন্দু আগাইয়া আসার কারণ মানুষ অনেক দিন ধরিতে পারে নাই। বিষুব অঞ্চলে পৃথিবীর স্ফীত অংশে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহাদির আকর্ষণের ফলেই বিষুববিন্দু বৎসরে ৫০″ আগাইয়া আসে।

ভারতে প্রথম লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এই পঞ্জিকা-সংস্কারের কথা উত্থাপন করেন ; কিন্তু বহু দিন কেহ কর্ণপাত করে নাই। ১৯৫২ খৃঃ কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিক্ষা-গবেষণা-পরিষদ—ডক্টর মেঘনাদ সাহাকে পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি সারা ভারতের প্রচলিত পঞ্জিকা ও অব্দ-গণনা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, প্রায় ত্রিশ প্রকার পঞ্জিকা ও অব্দ গণনা প্রচলিত আছে। সমগ্র ভারতের উপযোগী পঞ্জিকা, নববর্ষ ও অব্দ-গণনা সম্বন্ধে এই কমিটি—১৯৫৫ খৃঃ ভারত সরকারকে এই সিদ্ধান্ত দেন—যে বসন্তকালীন বিষুবসংক্রান্তি হইতে বর্ষ গণনা হউক, (উহা এখন ২২শে মার্চ ৮ই চৈত্র হয়) উহাকে ১লা বৈশাখ না বলিয়া ১লা চৈত্র বলা হউক, আর বিভিন্ন অব্দ-গণনা-মধ্যে শকাব্দই বহুল প্রচলিত, অতএব তাহাই গৃহীত হউক। ভারত সরকার ১৯৫৭ খৃঃ ২২শে মার্চ হইতে ইহা চালু করিয়াছেন। সরকারী ব্যাপারে এখন পাশ্চাত্য অব্দ মাসও চলিবে—আর ধর্ম কর্ম ব্যাপারে নিজ নিজ পঞ্জিকা কিছুদিন চলিবে। অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যায় এই শোধিত পঞ্জিকা এবং সর্ব ভারতীয় অব্দ-গণনা সর্বত্র গৃহীত হইবে।

অসঙ্গত সমালোচনা

পূর্বগামীদের সমালোচনা করার অধিকার লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে—এই আলোচনা সমালোচনার উপরই নির্ভর করে পরবর্তী যুগের অগ্রগতি। ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি সেই সকল দেশের ইতিহাসে—যেখানে চিন্তার, কথা বলার ও লেখার স্বাধীনতা আছে।

বৌদ্ধধর্ম বেদকে অস্বীকারও করিয়া ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল এবং বুদ্ধ ও ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট সংঘ স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে আবার দেখিয়াছি আচার্য শংকর সেই বৌদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিয়া বেদান্তমত ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, পরবর্তী আচার্য রামানুজ আবার

শংকরের অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মত স্থাপন করেন, তাহাও আবার খণ্ডিত হইয়াছে মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ দ্বারা। অদ্বৈতবাদ আবার এই সকল মতের যথাযথ উত্তর দিয়া দার্শনিক ক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শংকরও এক স্থানে অতি সুন্দরভাবে এই সকল বাদ-প্রতিবাদ নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, প্রবলতর যুক্তিসহায়ে আমা-অপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি আমার মতবাদ উড়াইয়া দিতে পারে—কিন্তু অদ্বৈত-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার অনুভূতিকে পরিবর্তন করিতে পারে না।

কি ধর্মক্ষেত্রে, কি দার্শনিক ক্ষেত্রে এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে—মত, মতবাদ, তাহার খণ্ডন মণ্ডন—এই ভারতে চিরদিন আছে ও থাকিবে, সেইজন্য ঐ উভয় ক্ষেত্রে ভারতের এত বৈচিত্র্য, জনমানসের এত সচেতনতা।

যেখানে ইহার অভাব—সেখানে অগ্রগতি স্তব্ধ; সেখানে ধর্ম গোঁড়ামিতে পরিণত, দর্শন মতবাদে। অতীত ভারতে এই খণ্ডন মণ্ডন বা আলোচনা সমালোচনা যথেষ্ট সশ্রদ্ধভাবে হইয়াছে। পূর্ব পক্ষের মত সম্পূর্ণরূপে জানিয়া বুঝিয়া তবে তাহাকে খণ্ডন করা চলে—বা তাহার সমালোচনা করা চলে।

সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করিতেছি, স্বামী বিবেকানন্দকে পূর্ব পক্ষ করিয়া অনেকে সমালোচনা শুরু করিয়াছেন এবং নিজ নিজ সিদ্ধান্তও পেশ করিতেছেন। চিন্তাস্বাধীনতার যুগে ইহা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই, তবে আমাদের মনে হয়—গাড়ী যেন তাহার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ছাড়িয়াছে। দু-একটি সমালোচনা পড়িয়া আমাদের এইরূপই মনে হইয়াছে, তাড়াতাড়িতে সমালোচক স্বামীজীর বক্তব্য ভাল করিয়া পড়িবার বা বুঝিবার সময় পান নাই, পত্রাবলীতে ব্যক্তি-বিশেষকে লেখা পত্র হইতে বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজীর মত সঙ্কলন করা চলিতে পারে, কিন্তু দার্শনিক বক্তৃতাবলীতেই তাঁহার মতবাদের যথার্থ বিকাশ। যে কোন কারণেই হউক স্বামীজীর এই সকল সমালোচক তাঁহার মহদুদার কল্যাণকর বিচিত্র ভাবরাশির মর্ম যেন ধরিতে পারেন নাই, স্বামীজীকে বুঝিবার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন—তাহা তাঁহাদের নাই। স্বামীজী সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা আমাদের চোখে পড়িলে তাহার সমালোচনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য—শুধু সমালোচনার খাতিরেই নয়, স্বামীজীর ভাবরাশি যাহাতে সমাজে যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়—তাহার বিকৃতরূপ যাহাতে প্রচারিত না হইতে পারে—তাহার জন্যও বটে। বিখ্যাত ব্যক্তির বা উক্তির সমালোচনা করিয়া বিখ্যাত হইবার সুলভ পন্থা ও সহজ প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পাইলে কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই হইবে।

যে সকল সমালোচক স্বামীজী সম্বন্ধে লিখিতে বা বলিতে গিয়া সম্প্রতি এক প্রকার পল্লব-গ্রাহিতার এবং গভীর চিন্তার অভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য—সেগুলি একাধিক ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সমাজের এক স্তরে—স্বামীজীর এই ভাব গ্রহণে অনিচ্ছা বা অক্ষমতা রহিয়াছে। ইহার কারণ নিজ নিজ সমাজ বা ধর্মের দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত 'যত মত তত পথ'—কথার অর্থ, সর্ব ধর্মমতই ঈশ্বর লাভের এক একটি উপায়—এ-কথা তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেননা। তাঁহাদের মতে ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি শুভেচ্ছামাত্র, সাধন-লব্ধ কোন সিদ্ধান্ত নয়; পরবর্তী কালে তাঁহার শিষ্যগণ—বিশেষতঃ তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ঐ উক্তিকে সর্বধর্মসমন্বয়ের মূলসূত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ সকল মতকেই সত্য বলিয়া সমান গ্রাহ্য মনে করেন নাই।

এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বক্তব্য,

সত্যের সন্ধানে শুধু মুদ্রিত পুস্তকের অক্ষর-সমষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না—এবং সুবিধামত মনের মত দু-একটি বাক্য উদ্ধৃত করিলেও চলিবে না। শাস্ত্রবচন অপেক্ষা শাস্ত্রের ভাবই গ্রহণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত সহজ কথার সরল অর্থ এই যে, আজ পর্যন্ত মানুষ নানা দেশে নানা ভাবে সত্যকে জানিবার জন্য নানা পথে নানা উপায়ে যাত্রা করিয়াছে। কেহ ভক্তি-পথে, কেহ জ্ঞানবিচারের পথে, কেহ যোগধ্যানের পথে। একাগ্র সাধনাবলে বহু সাধকই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন নিজ নিজ ভাবে; যাত্রাকালের পথের বর্ণনা পৃথক্ হইলেও চরম লক্ষ্যে যাঁহারা পৌছিয়াছেন তাঁহাদের ভাষায় ঐক্যও দেখা যায়, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন 'সেখানে সব শেয়ালের এক রা'—সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ-জীবনে বিভিন্ন মতে ও বিভিন্ন পথে সাধনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন; এবং কত দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন: ছাদে উঠার নানা উপায়, কালীঘাটে কত প্রকারে যাওয়া যায়, এক পুকুরের চারিটি ঘাটের বিভিন্ন ভাষাভাষী একই জলের বিভিন্ন প্রকার নাম দেয়, এক বহুরূপীর নানা বর্ণ। 'অন্ধের হাতী দর্শন' গল্পটিতে বুঝাইয়াছেন আংশিক সত্য উপলব্ধি হইতেই যত বিভেদ। মধ্য পথের এই দ্বন্দ্ববিরোধ অতিক্রম করিয়া আমাদের কর্তব্য যে কোন একটি পথ অবলম্বন করিয়া সরল বিশ্বাসে এবং একাগ্র ভাবে সাধনা করা; শেষ পর্যন্ত যাইলে সত্যানুভূতি বা ঈশ্বরদর্শন হইবেই—মধ্যপথে পথ পরিবর্তন করিলে কখনই সিদ্ধিলাভ হইবে না। দৃষ্টান্ত: কুয়ো খুঁড়ে জল পেতে হলে এক জায়গায় খুঁড়ে যেতে হয়। আজ এখানে, কাল ওখানে খুঁড়লে পরিশ্রমই সার হয়, জল কখনও পাওয়া যায় না। নিষ্ঠা সহকারে যে কোন একটি ধর্ম আচরণ করিলেই ধর্মস্বরূপ ভগবান নিজেই ভক্তকে টানিয়া লন। প্রত্যেক ধর্মই ঈশ্বরসৃষ্ট, অতএব সত্য; এই উদার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে তবেই সর্বধর্মসমন্বয়, 'যত মত তত পথ' প্রভৃতি কথার অর্থ বুঝা যায়। নতুবা ধর্ম-সম্প্রদায় অশান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে শান্তি বিতরণ না করিয়া নূতন অশান্তির কারণ হয়। অনর্থক প্রতিযোগিতা ও বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি করে। যথার্থ সত্যধর্ম যখন জনসমাজে প্রচারিত হয় তখন উহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী সূর্যের মতই অন্ধকার বিদূরিত করিয়া মানব-মনকে জাগ্রত করে, আকর্ষণ করে।

আর একটি ভাবও এই জাতীয় সমালোচনার বিষয়বস্তু, সন্ন্যাসবাদ! সমালোচকদের ধারণা বৈরাগ্য জীবনবিমুখ, এবং স্বামীজী-প্রচারিত সন্ন্যাসবাদ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। শিক্ষাভিমানী ব্যক্তির এই প্রকার ভাব দেখিয়া বিস্ময় ছাড়া আর কি হইতে পারে? ইহাদের অজ্ঞতা শুধু ধর্ম সম্বন্ধেই নয়, —ইতিহাস সম্বন্ধেও!

মানব জীবন দেহ-মন-নিয়ন্ত্রিত; প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয় বৃত্তিই দেহ মনকে চালিত করে। একটানা ভোগ—অনুভূত সত্যও নয়, কাম্যও নয়। ভোগের তৃপ্তি বা সমাপ্তির পর ত্যাগ স্বাভাবিক ও সর্বানুভূত সত্য। ফলটি পাকিলেই গাছ হইতে পড়িয়া যায়; বৎসরান্তে প্রাকৃতিক নিয়মবশতই গাছের পাতা ঝরিয়া যায়—গাছ ফল ও পাতাকে আটকাইয়া রাখে না, এবং ফল বা পাতাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় গাছে সংলগ্ন থাকে না, বা থাকিতে পারে না। গ্রাম্য দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—ঘায়ের মামড়ি জোর করিয়া তুলিয়া দিলে আবার হয়, ঘা শুকাইয়া গেলে মামড়ি আপনি খসিয়া যায়। সংসারবৃক্ষ হইতে সুখ-দুঃখ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া মানব-মন সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়া শান্তি ও জ্ঞান-লাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অনন্তের পথে বাউল দরবেশ ভিখারী ফকিরের বেশে যাত্রী হইয়াছে, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

বুদ্ধ, খৃষ্ট ও বিবেকানন্দ মানুষের এই সংসার-বিমুখ ভাবকে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন। সন্ন্যাস সংসার-বিমুখ বলিয়া জীবন-বিমুখ নয়—জীবনের উদ্দেশ্য সংসারে শুধু স্বার্থ-ভোগেই পর্যবসিত নয়, জীবনের উদ্দেশ্য নিজের মধ্যে সকলকে, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা, এবং তাহার শ্রেষ্ঠ উপায় ত্যাগ বা সন্ন্যাস।

বুদ্ধ ও শংকর

বৈশাখের পুণ্য মাসে আমরা স্মরণ করি বুদ্ধকে, স্মরণ করি শংকরকে—ভারত-আকাশের দুই জ্যোতির্মণ্ডলকে; একজন পূর্ণিমার চন্দ্রের মত পূর্ণ ও স্নিগ্ধ—আর একজন মধ্যাহ্ন ভাস্করের মত উজ্জ্বল ও তেজস্বী।

ভারতেতিহাসের বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা ভারত-কৃষ্টিকে বিশ্ব-কৃষ্টিতে পরিণত করার পথে লইয়া গিয়াছেন—একজন হৃদয়ের পথে, আর একজন মস্তিষ্কের পথে।

যুগপ্রয়োজনে এক এক ভাব এক এক সময় প্রবল হয়, এবং ধর্মে ও সমাজে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য এক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব—স্মরণাতীতকাল হইতে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পরবর্তী মহাপুরুষ বুঝি পূর্ববর্তীর বিপরীত, একজন বুঝি আর একজনের সব নিয়ম নীতি শিক্ষা ধ্বংস করিবার জন্যই জন্মিয়াছেন; কিন্তু গভীরতর দৃষ্টি দ্বারা ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—একজন আর একজনের পরিপূরক।

শ্রুতি বা বেদে ঋষি-অনুভূতির পর ভারতে দর্শনের প্রথম প্রকাশ আমরা পাই কপিলমুনির সাংখ্যে; তাহাতে আছে জগৎ দুঃখময়—এই দুঃখ অতিক্রম করিতে হইবে—জ্ঞানের সহায়ে পুরুষ-প্রকৃতি বিবেক দ্বারা, জড় ও চৈতন্য পৃথক করিয়া।

অতঃপর আসিলেন যোগদর্শনের পতঞ্জলি মুনি। তিনি চিত্তবৃত্তি নিরোধ-দ্বারা মন স্থির করিবার সাধনপন্থা নির্ণয় করিলেন; বহু সাধক সেই পথেই কৈবল্য বা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

গীতাতেও লক্ষ্য করা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—সাংখ্য এবং যোগ পৃথক নয়—একই। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বেদের সকাম কর্মীকে নিষ্কাম কর্মের পথে আনিয়া জ্ঞান ভক্তি কর্ম এবং যোগের মহাসমন্বয় করিয়া গিয়াছেন।

কালক্রমে এই যোগধর্ম নষ্ট হইয়া যায়,—কারণ মানুষ স্বভাবত ভোগপ্রবণ, বেদের পূর্ব-মীমাংসার পথে যাগযজ্ঞ করিয়া যখন স্বর্গলোভে উচ্চবর্ণেরা 'যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ' এই বেদবাক্যকেই সার করিয়াছিল, তখন প্রকৃত ধর্ম কি—বুঝাইবার জন্য আবির্ভূত হইলেন শাক্যমুনি। জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর প্রত্যক্ষ দুঃখ দর্শন করিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় আবিষ্কারের জন্য তিনি বিচার-সহায়ে ধ্যানের সাধনায় নির্বাণ লাভ করিয়া অগণিত মানবের জন্য সদ্ধর্মের দ্বার খুলিয়া দিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষ—সকলের জন্য তাঁহার হৃদয় উন্মুক্ত!

অত্যধিক উদারতার জন্য অভাবনীয় বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সংঘে আর্য অনার্য কৃষ্টি অবাধে আসিয়া মিশিয়া একটা সমোচ্চসীমা প্রাপ্ত হইবার পর ধীরে ধীরে শুরু হইল অবনতি—দর্শনে, কৃষ্টিতে, নীতিতে। শকহূনাদি ভারতবহির্ভূত জাতিরও কৃষ্টি ভারতে আসিয়া বৌদ্ধভাবে প্রভাবিত হইল বটে, সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ কদর্য রীতিনীতিও তাহারা ভারতের প্রবাহে ঢালিয়া দিল।

সর্ববিধ অবনতি রোধ করিবার জন্য, ভারত কৃষ্টির শুদ্ধস্বরূপ রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইল নূতনতর এক শক্তির। আচার্য শংকরই সেই মহাশক্তি—যিনি পুরাতনের যাহা কিছু ভাল গ্রহণ করিয়া—নবাগতের মন্দটুকু বর্জন করিয়া—ভারত-কৃষ্টিকে এক নূতন রূপ দিয়া গেলেন। বুদ্ধের নীতি ও সাধনা তাহার প্রবর্তিত সন্ন্যাসধর্মে গ্রহণ করিয়া, বৌদ্ধ দর্শনের বুদ্ধিপ্রধান মতবাদকে খণ্ডন করিয়া

তিনি তাঁহার অবিরোধী অদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। এই অদ্বৈতভাব দার্শনিক চিন্তাধারার সর্বোচ্চশিখরে অবস্থিত, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই সেখানে যাইবার অধিকারী—সকলে নহে। ইহা শংকরের সংকীর্ণতা নহে—ইহা এই উচ্চতম দর্শনের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার উপায় নির্দেশ।

বুদ্ধের দৃষ্টিতে জগৎ দুঃখময়, ইহা হইতে নির্বাণ লাভ করিতে হইবে—অষ্টাঙ্গিক মার্গে। যুক্তি-নির্ভর বৌদ্ধদর্শন ক্রমশঃ অনাত্মবাদের মধ্য দিয়া শূন্যবাদে আশ্রয় লইয়াছিল।

শংকরের দৃষ্টিতে জীবজগৎ ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম আনন্দময়; অদ্বৈততত্ত্ব শূন্য নয়—পূর্ণ। বৌদ্ধধর্মের ভিত্তির উপর শ্রুতির উপাদান-সহায়ে শংকর তাঁহার দর্শন-সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। তাই শংকরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ না বলিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—বুদ্ধেরই পরিপূরক। বুদ্ধ দিয়া গেলেন নীতি—শংকর দিলেন দর্শন। এই দুই মহামানব ও মহামনীষা—যেন ভারতবর্ষের দুইটি নেত্র; দক্ষিণামূর্তি গুরুর করুণাদৃষ্টিতে তাঁহারা আমাদের দিকে আজও চাহিয়া রহিয়াছেন; আমাদিগকে জ্ঞানে ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। ভারতের কৃষ্টি ও দর্শন বলিতে আজও আমরা বুঝি—বুদ্ধ ও শংকর।

স্বামী অরূপানন্দজীর দেহত্যাগ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অরূপানন্দজী (রাসবিহারী মহারাজ) গত ৫ই চৈত্র, (১৯শে মার্চ) মঙ্গলবার বেলা ৯টা ৩৫ মিনিটের সময় রক্তের চাপজনিত (এপোপ্লেক্সি) রোগে ৭০ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯১৯ খৃঃ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। তিনি শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহার সাক্ষাৎ সেবাধিকার পাইয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ১লা ফেব্রুআরি জয়রামবাটীতে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম পুণ্যদর্শন লাভ করেন—এ বিষয়ে তাঁহার মনোজ্ঞ বিবরণী এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ "শ্রীশ্রীমায়ের কথা"—২য় খণ্ডে তিনি পরিবেশন করিয়াছেন, ঐ পুস্তকের ভূমিকায় শ্রীশ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনকথাও তাঁহারই রচনা। শ্রীশ্রীমায়ের তিরোধানের পরে "শ্রীশ্রীমায়ের কথা"—১ম খণ্ড তাঁহারই উৎসাহে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। মিশনে যোগদান করিবার পরেই কিছুকাল তিনি মিশনের বন্যাসেবাকার্য করেন; পরবর্তীকালে জয়রাম বাটীতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নূতন গৃহনির্মাণ কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্ধানের পর কাশী অদ্বৈত আশ্রমেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা মাতৃ-অঙ্কে পরা শান্তি লাভ করিয়াছে।

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর দেহত্যাগ

গত ২রা এপ্রিল ৫৯ বৎসর বয়সে ফ্রান্সের গ্রেজ শহরে রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী (গোপাল মহারাজ) দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯২০ খৃঃ ২২ বৎসর বয়সে তিনি মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া বেদান্ত-কেশরীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। ১৯২৪ খৃঃ তিনি শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন। মহীশূরে প্রেরিত হইয়া সেখানে তিনি আশ্রম স্থাপন করেন, বাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষ থাকাকালে—১৯৩৭ খৃঃ বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বেদান্ত-প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্সে প্রেরিত হন, তদবধি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সেখানকার কাজকে একটি স্থায়ীরূপ দিয়াছেন। ১৯৪৭ খৃঃ একবার তিনি দেশে ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা চির-শান্তিলাভ করুক।

বোধি-পূর্ণিমা

শ্রীপ্রণব ঘোষ

আবার আসন পাতো বোধিদ্রুমতলে।
বলো দৃপ্তস্বরে :
'অস্থিমাংসময় দেহ হয় হোক লয়,
সুদুর্লভ বোধি যদি লব্ধ নাহি হয়,
এ আসন কোনদিন ছাড়িব না আমি।'
সবিস্ময়ে থামি
মুগ্ধচিত্তে বিশ্ববাসী জানাবে প্রণাম।
তোমার প্রশান্ত ধ্যানে আর বার দীপ্ত হবে
তব জন্মধাম।
এই পুণ্য বৈশাখের প্রাণের পূর্ণিমা
খুঁজে পেয়েছিল ধ্যানে জীবনের সীমা।
অবিদ্যার রূপময় অন্ধকার হ'তে
রোগ শোক জরা মৃত্যু যে তৃষ্ণার স্রোতে
ভাসিতেছে চিরদিন,—তাহারি সন্ধান
এনে দিল চিত্তে তব পরম নির্বাণ।
আজ তাই মনে প্রাণে জানে বিশ্বলোক—
তুমি তো দিশারী নও, তুমিই আলোক।

ধ্যানমগ্ন বোধিদ্রুম। পাশে কলস্বনা
আজো বহি চলে ধীরে নদী নিরঞ্জনা।
সেও তো তোমারি প্রেম নিত্য বহমান,
শ্যামশোভাময় করি' রাখে মর্ত্য প্রাণ।
ঊর্ধ্বে অধে পরিব্যাপ্ত সর্বচরাচরে
জাগায় করুণামন্ত্র নিখিল-অন্তরে।
সর্ব কোলাহল ভেদি' সে করুণা-গাথা—
যখনি অন্তরে শুনি—সে মহা-বারতা
প্রাণে প্রাণে বলে যায় : শুভ জন্ম তব
প্রেমরূপে প্রজ্ঞারূপে নিত্য নব নব।
সে পরম-ক্ষণে তুমি বোধিদীপ জ্বালো,
দুঃখ হয় প্রেম, আর প্রেম হয় আলো।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে তথাগত বুদ্ধ

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

৯ই এপ্রিল, ১৮৮৬ খৃঃ রাত্রি কয়েক দণ্ড হইয়াছে। অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের উদ্যান-বাটিকায় দ্বিতলের বড় ঘরে শয্যায় উপবিষ্ট। নরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন, শশী রাখাল এবং আরও দু একটি ভক্ত আসিয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ কয়েক দিন পূর্বে কালীপ্রসাদ (পরে স্বামী অভেদানন্দ) ও তারকনাথ (পরে স্বামী শিবানন্দ) সমভিব্যাহারে বোধগয়া গিয়া তথায় বুদ্ধদেবের মন্দির, মূর্তি ও বোধিদ্রুম দর্শন করিয়াছিলেন। মূর্তির সম্মুখে ও বোধিদ্রুমতলে তাঁহার গভীর ধ্যান হইয়াছিল, তথা হইতে তিনি সবে ফিরিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে কথা উঠিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(মাষ্টারের* প্রতি সহাস্যে) ওখানে গিছ্‌লো।

মাষ্টার—(নরেন্দ্রের প্রতি) বুদ্ধদেবের কি মত?

নরেন্দ্র—তিনি তপস্যার পরে যা পেলেন, তা মুখে বলতে পারেন নি। তাই সকলে বলে নাস্তিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(ইঙ্গিত করিয়া) নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারেন নি! বুদ্ধ কি জান? বোধস্বরূপকে চিন্তা ক'রে তাই হওয়া—বোধস্বরূপ হওয়া।

নরেন্দ্র—আজ্ঞে হ্যাঁ; এদের তিন শ্রেণী আছে, বুদ্ধ, অর্হৎ আর বোধিসত্ত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ তাঁরই খেলা—নূতন একটা লীলা। নাস্তিক কেন হতে যাবে? যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি-নাস্তির মধ্যের অবস্থা।

নরেন্দ্র—(মাষ্টারের প্রতি)—যে অবস্থায় contradictions meet (বিপরীতের মিলন)। যে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন-এ শীতল জল তৈয়ার হয়, তা'তেই আবার oxy-hydrogen blow-pipe (জ্বলন্ত অত্যুষ্ণ অগ্নিশিখা) উৎপন্ন হয়। সে অবস্থায় কর্ম, কর্মত্যাগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম দুইই সম্ভবে।...যারা সংসারী ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে রয়েছে, তারা বলছে সব 'অস্তি'; আবার মায়াবাদীরা বলছে 'নাস্তি', বুদ্ধের অবস্থা এই 'অস্তি' 'নাস্তি'র পরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ অস্তি নাস্তি প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক, সেখানে অস্তি নাস্তি ছাড়া।

ভক্তেরা কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছে। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(নরেন্দ্রের প্রতি) ওদের কি মত?

নরেন্দ্র—ঈশ্বর আছেন কি—না আছেন, এ সব কথা বুদ্ধ বলতেন না। তবে দয়া নিয়ে ছিলেন।... কি বৈরাগ্য! রাজার ছেলে হয়ে সব ত্যাগ করলেন।... যখন বুদ্ধ হয়ে নির্বাণ লাভ করে বাড়ীতে একবার এলেন, তখন স্ত্রীকে ছেলেকে রাজবংশের অনেককে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে বললেন। কি বৈরাগ্য।... গাছতলায় তপস্যা করতে বসলেন আর বললেন, 'ইহৈব শুষ্যতু মে শরীরম্' অর্থাৎ যদি নির্বাণ লাভ না করি, তাহ'লে আমার শরীর এইখানে শুকিয়ে যাক, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!...

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বুদ্ধদেবের কথা ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(নরেন্দ্রের প্রতি) (বুদ্ধদেবের) কি, মাথায় ঝুঁটি?

নরেন্দ্র—আজ্ঞে না; রুদ্রাক্ষের মালা অনেক জড় করলে সে রকম হয়, সেই রকম মাথায়।

* কথামৃত, ৩য় ভাগ, ২৫।১

শ্রীরামকৃষ্ণ—(নরেন্দ্রের প্রতি) (বুদ্ধের) চক্ষু (কি রকম) ?

নরেন্দ্র—চক্ষু সমাধিস্থ।

* * *

এই ঘটনার কতদিন পরে ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন : বুদ্ধের প্রতি স্বামীজীর অগাধ ভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার সেই বিশ্বমানবের জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলির সহিত তাঁহার গুরুদেবের জীবনের ঘটনা পরম্পরার মধ্যে প্রায়ই তিনি মিল দেখিতে পাইতেন। বুদ্ধের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বুদ্ধকে তিনি দেখিতেন। কখন কখন এই চিন্তাধারা চকিতের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পাইত।

একদিন বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন : শেষ সময় আগত দেখিয়া সেই বিশ্বমানবের শিষ্যেরা একটি বৃক্ষতলে কম্বল বিছাইয়া দিলেন—তাহার উপর শয়ন করিয়া তিনি সিংহের ন্যায় দক্ষিণপার্শ্বে ফিরিয়া রহিলেন। চারিপাশে শিষ্যেরা বিষণ্ণবদনে অবনতমস্তকে বসিয়া আছেন। তাঁহারই ভাষায় কথিত 'নশ্বর দেহের' অবসানের অপেক্ষায়—হতাশ মনে ভগ্ন হৃদয়ে কেহ বা সাশ্রু-নয়নে অপেক্ষমাণ। এমন সময়ে সহসা বহুদূর হইতে এক ব্যক্তি উপদেশপ্রার্থী হইয়া আসিলেন। শিষ্যেরা পথরোধ করিলেন, কিন্তু পুণ্যপুরুষের কাণে তাহার আকুল আবেদন পৌঁছিল। 'না না! পথরোধ করিও না, আসিতে দাও—তথাগত সব সময় প্রস্তুত, কারণ এই কার্যের জন্যই তিনি এ সংসারে আসিয়াছেন'—এই বলিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়া, হস্তের উপর ভর দিয়া তিনি তাহাকে একবার দুইবার করিয়া চারবার উপদেশ দিলেন। এই কার্য শেষ করিবার পরই তাঁহার জীবনের অবসান হইল।

কাশীপুরেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। সে-বার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ক্ষেত্রে। সে অদ্ভুত ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ঐদিনও শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় একব্যক্তি একশত মাইল দূর হইতে আসিয়া উপস্থিত তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে। সাশ্রুনয়নে শিষ্যেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। কাহারও ইচ্ছা নয়—সে ব্যক্তি তাঁহার নিকট যায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সেই নবাগতের পক্ষ লইলেন। তাহাকে নিকটে আসিতে দিবার জন্য ও উপদেশ দিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। সে নিকটে আসিলে তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া হস্তের উপর রাখিলেন এবং তাহাকে শিক্ষা দিলেন।

* * *

তথাগত বুদ্ধ-বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যয়ন ও অনুভূতি-লব্ধ জ্ঞান অপরিসীম। বুদ্ধ ছিলেন তাঁহার চক্ষে—মানবতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। বুদ্ধসম্বন্ধে স্বামীজীর বাণী-সঞ্চয়ন এ বিষয় বুঝিতে আমাদের সহায়তা করিবে। স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন পত্র প্রবন্ধ ও বক্তৃতা হইতে নিম্নলিখিত বাণীগুলি সংকলিত হইল :

গৌতম বুদ্ধ ছিলেন ২৫তম বুদ্ধ ; তাঁহার পূর্বে ২৪ জন বুদ্ধ আসিয়াছিলেন।

তিনি ছিলেন আদর্শ কর্মযোগী, তিনি বলিতেন, 'ঈশ্বর বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ জানিবার প্রয়োজন নাই, অন্যে যাহা 'সৎ' বলে তাহা বিচার করিয়া দেখ, উহা যথার্থই 'সৎ' হইলে গ্রহণ কর, জীবনে প্রতিফলিত কর, মুক্তি লাভ কর, পরে অন্যকে গ্রহণ করিতে বলিও।'

বুদ্ধ ছিলেন সাম্যের প্রচারক, জাতিভেদ-ভঞ্জকারী, অধিকারভেদ ধ্বংসকারী, 'সকল জীবই সমান' এই বার্তা প্রচারকারী ; জনসাধারণের মধ্যে একত্বের প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। বুদ্ধ দুর্বোধ্য ভাষার মাঝে লুক্কায়িত সত্যকে সরল সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার করিয়া জনসাধারণের দ্রুত উন্নতির পথ সুগম করিয়াছিলেন।

বুদ্ধ আসিয়াছিলেন ধর্মের পূর্ণতা-সাধনের জন্য, তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য নহে। হিন্দুরা তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করেন।

কাঙাল, গরীব, পতিত, চণ্ডাল সকলের প্রতি ছিল তাঁহার করুণা; তাঁহার মহান চরিত্র, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার উচ্চতম নৈতিক আদর্শ, তাঁহার নিত্য-সত্যের জ্ঞান—সকলের শৃঙ্খল বন্ধন ও গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়া চারিদিকে সহস্র-বর্ষব্যাপী প্রচণ্ড তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিল।

সর্বত্যাগী বুদ্ধ ত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। "জগতের মধ্যে বাঁধা পড়িও না, স্বার্থের মূলোচ্ছেদ কর, তখনই তুমি যথার্থ মানবতার সন্ধান পাইবে, প্রকৃত মুক্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিবে" এই কথা তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

"কোন ধর্মই বলে না—ঈশ্বর কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হন, কাহারও অনিষ্ট করেন; সব ধর্মই বলে—তিনি মঙ্গলময়, তিনি সৎস্বরূপ, তিনি পরম কারুণিক; এজন্য সকলেরই উচিত—সৎ হওয়া, সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা; সকলের মঙ্গল করা, তাহা করিলেই ঈশ্বরকে জানা সম্ভব" এই কথা বুদ্ধ পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন।

বুদ্ধ বলিতেন, "কেহ কাহারও সহায়তা করিতে পারে না, নিজের সহায়তা নিজে কর, নিজের মুক্তির সাধন নিজে কর। আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞানকে বোধ বলে, আমি গৌতম সেই বোধ লাভ করিয়াছি, চেষ্টা করিলে তোমরা সকলেই সেই বোধ লাভ করিতে পার।" এ কথা তিনি সকলকে বলিতেন।

তিনি এমন কি একটি পশুর জন্যও নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারকে বলিয়াছিলেন, "ছাগসমূহ বলি দিলে যদি আপনার স্বর্গলাভ হয়, নরবলি দিলে আরও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইবে, অতএব উহাদের পরিবর্তে আমায় বলি দিন।" রাজা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া রাজ্যে পশুবলি বন্ধ করিয়া দিলেন।

বুদ্ধ সেই সত্যে পৌঁছিয়াছিলেন—যে সত্যে অপরে ভক্তি, জ্ঞান, বা যোগপথ অনুসরণ করিয়া পৌঁছায়। ইহা ত্যাগের পথ, হৃদয়ের পথ, কর্মের পথ।

যাবতীয় বিধি-নিষেধমূলক ধর্মের পারে—ইন্দ্রিয়-সমষ্টি, পাঞ্চভৌতিক জগৎ, মন প্রাণ বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত ইত্যাদিরও পারে তাঁহার 'প্রজ্ঞাপারম্'—যাহা লাভ করিলে অজ্ঞানের নাশ হয়, মুক্তি ও আনন্দ লাভ হয়।

ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্তি লাভ কর, অশরীরী দেবতাদির উপর নির্ভর করিও না। আত্মার অনুসন্ধান কর, তাঁহারই উপর নির্ভর কর, ইহাই হইল যথার্থ মুক্তি, ইহাকেই বলে নির্বাণ—সকলে এই নির্বাণের দিকে অগ্রসর হও—এই উপদেশ তিনি সকলকেই দিতেন।

বুদ্ধ বলিতেছেন, "আমার উপর নির্ভর করিও না, ইহাও এক প্রকারের বন্ধন; আমার এই নশ্বর দেহ চলিয়া যাইবে ইহাকে মহান মনে করিও না। বুদ্ধ ব্যক্তি-বিশেষ নহেন, অনুভূতি-বিশেষ—নিজের মুক্তি সাধন নিজে কর।"

দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায়—আত্মার বন্ধনমুক্তির উপায়—তিনি জানিয়াছিলেন, জানিয়া ছোট বড় নির্বিশেষে সকলকে জানাইয়াছিলেন, অজ্ঞান দূর হইলে যে শান্তি লাভ হয়—তাহা তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন।

সব মানুষই সমান, সকলেরই ধর্মলাভে সমান অধিকার—ইহাই তিনি শিক্ষা দিতেন।

আমিত্বের স্বপ্ন হইতে স্বার্থের উৎপত্তি, স্বার্থ-ই দুঃখ আনয়ন করে। আমিত্ব স্বার্থ ও দুঃখ—স্বপ্নের ন্যায় আসে ও যায়, চিরস্থায়ী নয়। এই স্বপ্ন ভাঙিলে কষ্টের অবসান হইবে। ইহাও তাঁহার শিক্ষা। তিনি আরও বলিতেন মেঘমুক্ত আকাশেই

সূর্যের প্রকাশ দৃষ্ট হয়, মোহমুক্ত হৃদয়েই সত্যের প্রকাশ হয়। 'আমিত্ব'রূপ, স্বার্থরূপ—মোহ দূর কর, যথার্থ সত্যের সন্ধান পাইবে।

দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য বা পুরস্কার লাভের জন্য কর্ম করিও না। আমিত্বকে নষ্ট করিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা কর।

সকলের প্রতি সেই ভালবাসা অর্জন কর যাহা উদারচরিত্র হৃদয়বান ব্যক্তিগণকেও বিশেষ-রূপে অভিভূত করে এবং সকলের সেবায় নিযুক্ত করে।

সত্যের প্রকাশ অক্ষুণ্ণ থাকিতে দাও। কুসংস্কারের অনুষ্ঠানের বা প্রতিপত্তির প্রভাবে ইহাকে কোমল করিও না, অথবা ক্ষুণ্ণ করিও না।

ঈশ্বরের বিষয়ে যে সকল ধারণা লোককে দুর্বল করে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে, পরনির্ভরশীল অকর্মণ্য ও অলস করে, সে সকল ধারণা তিনি পছন্দ করিতেন না।

মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি নিহিত আছে, সে তাহা অনুভব করিতে পারে। সে তাহার অনন্ত-স্বরূপ জানিতে পারে। ইহাই ছিল তাঁহার মত।

তিনি বলিতেন—স্বাধীনতা মাত্রেই সুখ, অধীনতা মাত্রেই দুঃখ।

সকলকেই কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। অন্তরতম প্রদেশে সে শক্তি নিহিত আছে তাহার সন্ধান লইতে হইবে। কি ধনী, কি দরিদ্র—সকলের মধ্যেই এই শক্তি বর্তমান—ইহা তিনি মনে করিতেন।

তিনি বলিতেন যে আমরা আমাদের শক্তি অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া তাহার কৃপাভিখারী হইয়া ফিরিতেছি। তিনি চাহিতেন, আমরা যেন অপরের অনুগ্রহপ্রার্থী না হইয়া নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াই।

বুদ্ধ শিক্ষা দিয়াছেন—অজেয় সাহস, নিত্য-অভয়, আর জীবের প্রতি অদম্য প্রেম। লোককে সহায়তা করিবার জন্যই যেন একমাত্র চেষ্টা থাকে, ইহাই ছিল তাঁহার ভাব।

তিনি বলিতেন, "করুণায় ভরা হৃদয় লইয়া জগতে বিচরণ কর। ক্ষুদ্র জীবটির প্রতিও করুণা প্রদর্শন কর।"

বুদ্ধ তাঁহার মতবাদ প্রচারের জন্য নানা স্থানে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন।

খৃষ্টের আবির্ভাবের ছয়শত বৎসর পূর্বে ভারত তাঁহার ভাব লইয়াছিল। তখন এদেশের লোকেরা বিশেষরূপে শিক্ষিত ও স্বাধীন-চিন্তা-সম্পন্ন ছিলেন। এ হেন লোকেরা—আপামর সাধারণ—কি রাজা, কি রানী, দলে দলে তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উন্মুক্ত উদারতা ছিল ইহার বৈশিষ্ট্য। ফলে এই ধর্ম স্বল্পকালমধ্যেই তিব্বত, পারস্য, মধ্যপ্রাচ্যে রুশ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যের অনেক দেশে এবং চীন, কোরিয়া, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম ও দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ধর্ম। কারণ জগতের মধ্যে ধর্মের অসাধারণ প্লাবন আনিয়াছিল এই ধর্ম। আবার এই ধর্ম হইতেই আধ্যাত্মিকতার প্রচণ্ড তরঙ্গ মনুষ্যসমাজের উপর প্রবল বেগে আঘাত করিয়াছিল। জগতে এমন কোনও সভ্যতা নাই যাহার উপর ইহা প্রভাব বিস্তার করে নাই।

বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল; আর ছয় শতাব্দী যাইতে না যাইতে সে তাহার সর্বোচ্চ গৌরব-শিখরে আরোহণ করিল।—ইহাই রহস্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শেষ কোথা কাল-আবর্তনে ?

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মঞ্জুল বাতাসে আজি নববর্ষ নিয়ে এলো বাণী,
আনন্দের দোলা লাগে বনে বনে কুসুমে পল্লবে ;
প্রাণের অঙ্গন-তলে বৈশাখের উদয়-উৎসবে,
তোমারে প্রণাম করি ধ্যানে ধবি তব চিত্রখানি,
পরমপুরুষ। মহাকরুণাব হে লীলাসুন্দর !
বিন্দুরে করেছ সিন্ধু পাষাণেরে প্রেমের নির্ঝর।
একটি আয়ুর পাতা গেল ঝরে অনন্তপ্রবাহে,
সন্ধ্যার কবরী-চ্যুত কুসুমের সম। নব আশা-
আকিঞ্চন লয়ে জাগে অন্তরের শত ভাব ভাষা
আশাবরী সুবে সুরে, স্তোত্র তব সুরধুনী গাহে
ভবতারিণীর দিব্য আয়তনে উল্লাসে কল্লোলে,
উষার আলোকে আজি স্মৃতি তব নববর্ষে দোলে !
দুর্গমের পথ বেয়ে চলিয়াছে তীর্থযাত্রীদল,
মানস-বলাকা-শ্রেণী উড়ে যায় মহাশূন্যমাঝে,
সীমা হোতে অসীমেব পানে। তুমি এসো মোব কাছে ,
রাতুল চরণ তব ধুয়ে দেবো ঢেলে অশ্রুজল।
তোমার পরশে প্রভু ! শুদ্ধ হোক চীনাংশুক মন,
নিভৃতে নির্জনে বসি করি আজ তব আবাহন।
ভাববিপ্লবের যুগে যুক্তিবাদী নিখিলজনেরে
দিলে মহাভাব। নানারূপে বিচিত্র আধারভেদে
দাও দেখা। পরম প্রেমের পুরে হৃদিমাল্য গেঁথে
তোমারে পরাবো প্রভু ! পদে তব সঁপিয়া মনেরে।
সংখ্যাতীত প্রত্যূষের অভ্যুদয় তব উদ্বোধনে,
বর্ষ আসে বর্ষ যায়,—শেষ কোথা কাল-আবর্তনে ?

বুদ্ধের ধর্ম

'দীপঙ্কর'

চারিদিকে দুঃখ-বেদনা হাহাকার, জরা-ব্যাধি শোক, হিংসা-দ্বেষ-লোভ প্রত্যক্ষ করিয়া সিদ্ধার্থের কোমল প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছিল; দুঃখের নিবৃত্তির জন্য তিনি ইহার কারণ-সন্ধানে ব্রতী হইয়াছিলেন। কঠোর তপস্যার পর যে জ্ঞান ও অমৃত তিনি লাভ করিয়াছিলেন এবং লোককল্যাণের জন্য অকাতরে যাহা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহাই সদ্ধর্ম বা বুদ্ধের ধর্ম।

এই ধর্মের মূলকথা দুঃখবাদ। বুদ্ধ দেখিয়াছিলেন, জীবন দুঃখময়—জন্মগ্রহণে দুঃখ, জীবনধারণে দুঃখ, অপ্রিয়ের মিলনে দুঃখ, প্রিয়ের বিরহে দুঃখ। দুঃখকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই—দুঃখের জন্য কাহারও উপর কোন অভিযোগ নিরর্থক। আমাদের যত কিছু দুঃখের পশ্চাতে রহিয়াছে আমাদেরই কৃতকর্ম। কিন্তু যত দুঃখই থাক, যত দুঃখই আসুক—সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব। হতাশ হইবার কারণ নাই—আমরা নিজেদের কর্মদোষে বদ্ধ হই, আবার নিজেদের প্রচেষ্টাতেই মুক্ত হইতে পারি। নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়া পুরুষকার-সহায়ে জীবনের পরম শ্রেয়, পরম কাম্য লাভ করিতে পারি—ইহাই বুদ্ধের আশ্বাস।

বুদ্ধ তাঁহার শিক্ষা চারিটি আর্য সত্যের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম আর্য সত্য, দুঃখ আছে—দ্বিতীয় সত্য, দুঃখের কারণ আছে—তৃতীয়, দুঃখের নিরোধ করা যায়, এবং চতুর্থ আর্য সত্য—দুঃখ নিরোধের উপায়।

দুঃখস্বরূপ এই সংসারের কারণ নির্দেশ করিতে গেলে অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বিতীয় আর্য সত্যে ১২টি কারণ বা দ্বাদশ (প্রতীত্য-সমুৎপাদ) নিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়: জরা-মরণ, জাতি, ভব, উপাদান, তৃষ্ণা (তন্‌হা), বেদনা, স্পর্শ (ফস্‌সো), ষড়ায়তন (সলায়তন), নামরূপ, বিজ্ঞান (বিঞ্‌ঞান), সংস্কার (সঙ্‌খার), অবিদ্যা (অবিজ্জা)।

জীবন আমাদের কত না প্রিয়! এই অত্যন্ত প্রিয় জীবনকে ধরিয়া রাখার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, যখন জরা ও মরণ তাহাকে গ্রাস করে। জরা-মরণই ভোগসুখের প্রধান অন্তরায়, জীবনের প্রধান দুঃখ।

জাতি বা জন্মই (যে অবস্থায় ব্যক্তিভাবাপন্ন চৈতন্য ক্রিয়াশীল থাকে) জরা-মরণ বা জাগতিক দুঃখসমূহের কারণ। জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়াই মৃত্যুর কবলিত হইতে হয়—সেই জন্য মরণের কারণ জন্ম।

তাহা হইলে জন্মের কারণ কি? জন্মের কারণ পুনর্জন্মের জন্য প্রখর ইচ্ছা বা 'ভব'। ভবের কারণ পার্থিব জীবনের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বা 'উপাদান'। উপাদানের কারণ 'তৃষ্ণা'—ভোগ করিবার ইচ্ছা বা লালসা।

তৃষ্ণার উদ্ভব হয় কোথা হইতে? 'বেদনা' হইতে। দর্শন শ্রবণ আঘ্রাণ আস্বাদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জ অনুভবের নাম 'বেদনা'। ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্বস্তুর সংযোগকে বলা হয় 'স্পর্শ'—এই 'স্পর্শ' হইতেই 'বেদনার' উৎপত্তি। স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন—অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) ও অন্তঃকরণ। ষড়ায়তনের কারণ নামরূপ। নামরূপের কারণ 'বিজ্ঞান' অর্থাৎ প্রাণের স্পন্দন।

সৎ অসৎ সম্বন্ধে ধারণা এবং বাক্য কর্ম ও চিন্তাপ্রসূত কর্মফলকে বলা হয় সংস্কার। প্রাক্তন

সকাম কর্ম বা সংস্কারই 'বিজ্ঞানের' কারণ। অবিদ্যা হইতেই সংস্কারের উদ্ভব। জ্ঞানের অভাব বা অবিদ্যা—আমাদের বদ্ধাবস্থার এবং এই দুঃখ ক্লেশপূর্ণ সংসারগতির মুখ্য কারণ। অবিদ্যাগ্রস্ত অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন আমরা বারংবার জন্মমৃত্যুর কবলে পড়িয়া কতই না ভুগিতেছি। তাই অবিদ্যা-নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধের সাদর আহ্বান :

'অভিত্থরেথ কল্যাণে পাপং চিত্তং নিবারয়ে।
দন্ধং হি করতো পুঞ্ঞং পাপস্মিং রমতী মনো॥'

কে কোথায় আছ, তোমরা সকলে কল্যাণকর্মের জন্য ছুটিয়া এস। শীঘ্র ধাবমান হও। অসৎকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সৎকর্মের অনুশীলন কর। যে কর্মের ফলে বন্ধন হইয়াছে তাহার বিপরীত কর্ম করিলেই বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ হইবে। আলস্যের সঙ্গে পুণ্য কর্ম করিলে চিত্ত পাপেই রত থাকে, অতএব অনলসভাবে নিরন্তর সৎকার্যে জীবন অতিবাহিত কর।

'সব্বপাপস্‌স অকরণং কুসলস্‌স উপসম্পদা।
সচিত্ত পরিয়োদনং এতং বুদ্ধানুশাসনং॥'

সর্ব পাপ হইতে বিরতি, পুণ্যকর্ম ও চিত্তশুদ্ধি—ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন। বুদ্ধবাণীতে হতাশার সুর নাই। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে—নিজের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে বুদ্ধের উপদেশ অপূর্ব।

দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ—অতি কঠোর নয়, অথচ সহজও নয়—মধ্যপন্থা অবলম্বনীয়; ইহাই বুদ্ধোপদিষ্ট প্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গিক আর্যমার্গ :

১। সম্যক্ দৃষ্টি (সম্মা দিট্‌ঠি),
২। সম্যক্ সঙ্কল্প (সম্মা সঙ্কল্প),
৩। সম্যক্ বাক্ (সম্মা বাচা),
৪। সম্যক্ কর্মান্ত (সম্মা কম্মন্ত),
৫। সম্যক্ আজীব (সম্মা আজীব),
৬। সম্যক্ ব্যায়াম (সম্মা ব্যায়াম),
৭। সম্যক্ স্মৃতি (সম্মা সতি),
৮। সম্যক্ সমাধি (সম্মা সমাধি),

যে দৃষ্টি বা জ্ঞানবিচার সহায়ে দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ ও তাহার উপায় এই চতুরার্য সত্য সম্বন্ধে ধারণা হয় তাহাই সম্যক্ দৃষ্টি বা সদ্দৃষ্টি। প্রকৃত দৃষ্টির অভাবই সকল বিভেদ, সংঘাত ও অনৈক্যের মূলে। যেখানে সত্য দৃষ্টি প্রকাশিত, সেখানে জীবন ও জগতের মিথ্যা দৃষ্টি থাকিতে পারে না।

সম্যক্ দৃষ্টি বা জ্ঞান বিফল হইয়া যায়, যদি জীবনের বন্ধুর পথ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত না হয়। সেই জন্য প্রয়োজন সম্যক্ সঙ্কল্প। শুধু বিচার করিলে কী হইবে?—চাই দৃঢ় সঙ্কল্প। সৎ সঙ্কল্প মনে আনিয়া দেয় দুর্জয় সাহস। 'মার'-রূপী প্রলোভন বা পাপপুরুষ নিরন্তর আমাদের প্রলুব্ধ করিয়া বিপথে টানিতেছে। সন্দেহ ভয় নৈরাশ্যে চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে,—মৃত্যু সর্বদা আয়ুকে গ্রাস করিতে উন্মুখ। দৃঢ় সৎসঙ্কল্প ব্যতীত ইহাদের সম্মুখীন হইতে পারা যায় না। কামনাশূন্যতা, অবিদ্বেষ, অহিংসা প্রভৃতি সংকল্পের নাম সম্যক্ সঙ্কল্প। এই অহিংসা ও অবিদ্বেষ বৌদ্ধধর্মের প্রাণস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বুদ্ধ-উচ্চারিত শান্তির ললিত বাণী :

'অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদারিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং॥'

ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা, অসাধুকে সাধুত্ব দ্বারা কৃপণকে দানের দ্বারা এবং মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় করিতে হইবে।

দৃঢ় সঙ্কল্প কণ্ঠে ধ্বনিত করে সুন্দর ভাষা—সম্মা বাচা বা সদ্বাক্য। সৎসঙ্কল্পের প্রকাশ সদ্বাক্যে। সম্যক্ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে পরনিন্দা, মিথ্যা-কথন, প্রগল্‌ভতা চিন্তাকে কলুষিত করিতে পারিবে না। সম্যক্ বাক্ অর্থে সত্য ও প্রিয় বাক্য বলা এবং অসত্য পরুষ পিশুন ও প্রলাপ-বাক্য পরিহার।

কর্ম বিনা সঙ্কল্প বা বাক্য যেন ফলহীন বৃক্ষ।

সেই জন্য সংসঙ্কল্প ও সদ্বাক্যের সার্থক রূপায়ণে প্রয়োজন কর্মের। সম্যক্-কর্মান্ত হইতে পারিলেই নব নব কর্মধারায় জীবন ও জগৎ সুন্দরতর ও সুখকর হইয়া উঠিবে, চিত্ত নির্মল এবং সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে। প্রাণবিনাশ না করা, অদত্ত বস্তু না গ্রহণ করা, কামভোগ হইতে বিরত থাকা—এইগুলি সম্যক্ কর্ম। সৎকর্ম জীবজগতে হিংসার স্থানে স্থাপন করিবে করুণা, দ্বন্দ্বের পরিবর্তে আনয়ন করিবে মৈত্রী আর দ্বেষের স্থানে বসাইবে প্রেম।

'ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।'

ঘৃণার দ্বারা কখনও ঘৃণার লোপ হয় না, প্রেমের দ্বারাই বিদ্বেষ হয় শমিত—বৈর হয় পরাজিত। ইহাই সনাতন ধর্ম।

জীবিকার সংস্থান জীবজগতের একটি বিশেষ নিয়ম। মানুষ খাদ্যের জন্য কত অসদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। নিষিদ্ধ কর্মের দ্বারা জীবন-ধারণ করিলে চিত্তে কলুষ-ভাব আসে। তাই বুদ্ধের অনুশাসন, আদর্শের অনুকূল কর্মের দ্বারা জীবিকা অর্জন—সম্মা আজীব। সম্যক্ আজীব অর্থে অন্যায় উপায়ে উপার্জন না করিয়া ন্যায়-সঙ্গত ভাবে উপার্জনের দ্বারা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন।

চিত্ত সদা চঞ্চল। অশান্ত অশ্ব বা মদমত্ত মাতঙ্গের মত মন সদাই বিদ্রোহ করে, বাধা মানিতে চায় না। মনের বিক্ষিপ্ত বাসনাসমূহ মানুষকে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। মনকে বশীভূত করিবার জন্য আবশ্যক সম্মা ব্যায়াম। ব্যায়াম অর্থ—চেষ্টা বা শ্রম। সম্যক্ ব্যায়াম—সৎ চেষ্টা। সম্যক্ প্রচেষ্টা মনকে অসৎ চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিয়া তাহাকে সবল উচ্চ চিন্তার অধিকারী করিয়া তুলে ও পূর্ণতার দিকে আগাইয়া দেয়। স্বভাবতঃ নিম্নাভিমুখী মানব-মনে স্বতই অসৎ ভাবের উদয় হয়, অসৎ কর্মে স্পৃহা জাগে—মনকে সদা জাগ্রত রাখিবার জন্য, অন্তরে ধর্মভাব স্থায়ী করিবার জন্য সম্যক্ ব্যায়ামের অনুশাসন।

ইহার পরে আবশ্যক সম্যক্ স্মৃতি। শারীরিক মানসিক—সর্ব বিষয়ে স্মৃতি জাগ্রত রাখার নাম সংস্মৃতি। মনে শ্লথভাব আসিলেই বাসনার তরঙ্গ খেলিতে থাকিবে—কিন্তু 'সম্মা সতি'র অনুশীলনে মনকে পাপপুণ্যের চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিতে পারিলে কোন ভয়ই থাকে না।

ভয়শূন্য চিত্তই লাভ করে 'সম্মা সমাধি'—অষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষ সোপান। সম্যক্ সমাধির জন্য সাধককে পর পর চারটি রূপ-মূলক ধ্যানের অভ্যাস করিতে হয়।

বিতর্ক ও বিচারের দ্বারা ধীরে ধীরে সাধক-চিত্ত সত্যের সন্ধান পাইতে থাকে। ইহাই ধ্যানের প্রথম সোপান—যেখানে আছে নির্জনতামূলক ও অসঙ্গজনিত আনন্দ—'মুদিতা' ভাবনা।

বিতর্ক ও বিচারের রাজ্য অতিক্রম করিয়া প্রীতি-সুখপূর্ণ ভাবে দ্বিতীয় ধ্যান—প্রীতির অতীত অবস্থায় 'উপেক্ষা' অবলম্বনে স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞ হইয়া তৃতীয় ধ্যান—ইহার পরে সুখদুঃখকে অতিক্রম করিয়া চতুর্থ ধ্যান। বৌদ্ধশাস্ত্রে ধ্যানাবস্থায় মৈত্রী-সাধনার কথা আছে। 'মৈত্রী' ভাবনার স্বরূপ :

'মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরকৃখে।
এবংপি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং॥'

স্নেহময়ী মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করেন, সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি হৃদয়ে অপরিমিত ভালবাসা পোষণ করিতে হইবে। বিশ্বের সকল প্রাণীর উপর প্রীতির ভাবই বিশ্বমৈত্রী। ঊর্ধ্বে নিম্নে চতুর্দিকে সমগ্র বিশ্বের প্রতি বাধাহীন অপরিমেয় এই 'করুণা'ভাব। আরও :

'যদা মম পরেসং চ তুল্যমেব সুখং প্রিয়ম্।
তদাত্মনঃ কো বিশেষো যেনাত্রৈব সুখোদ্যমঃ॥'

আমার নিকট সুখ যেমন প্রিয়, অন্যের সুখও

তাহার কাছে তেমনি প্রিয়। অতএব অন্য হইতে আমার পার্থক্য কোথায়? কেন আমি কেবল নিজের সুখের জন্য চেষ্টা করিব? সত্যই অতুলনীয় এই ভাব—এই সাধনা!

মুদিতা উপেক্ষা মৈত্রী ও করুণা-ভাবনা বৌদ্ধ-ধর্মের সাধন-পন্থায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এইবার পাঁচটি অরূপ ধ্যানের প্রসঙ্গ আসে। এইগুলি—পূর্বোক্ত রূপ-মূলক ধ্যান অপেক্ষা উচ্চতর। সাধক যথাক্রমে 'অনন্ত আকাশ', 'অনন্ত বিজ্ঞান' এবং 'অনন্ত শূন্যের' জ্ঞানলাভ করিয়া সেই সেই আয়তনে বিহার করেন। সর্বশেষ অরূপ ধ্যানে সর্বাবস্থাতেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রানুমোদিত এই সকল সাধন-প্রণালী যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে নির্বাণ লাভ হয়। নির্বাণের অর্থ—সংসার-বাসনার নির্বাণ, ব্যবহারিক সত্তা ও উপাধির নির্বাণ। দুঃখ-নিবৃত্তির পর যে অবস্থা হয় তাহাই নির্বাণ—তখন অনিত্য সংসারের সব কিছু হইতেই নিবৃত্তি। নির্বাণই—নিত্যাবস্থা, পরমাবস্থা। যিনি সুখে দুঃখে, নিন্দাস্তুতিতে, আসক্তি-বিরাগে—সকল অবস্থায় সমভাবাপন্ন, তাঁহার তৃষ্ণা রাগ দ্বেষ মোহ—সব ক্ষয় হইয়া যায়। এই নির্বাণপ্রাপ্ত পুরুষের শান্তি ও সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য।

জ্ঞানলাভ ও তৃষ্ণা-ক্ষয় সম্বন্ধে বুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণীয়:—

'অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখারগতং চিত্তং তন্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা॥'

গৃহকারক (শরীররূপ গৃহের নির্মাতা) কে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বার বার এই সংসারে জন্মলাভ করিলাম। দুঃখকর এই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ। হে গৃহকারক, এইবার আমি তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি—আর তুমি গৃহ-নির্মাণ করিতে পারিবে না, গৃহে সকল পঞ্জরাস্থি ভাঙিয়া গিয়াছে, গৃহকূট ধ্বংসপ্রাপ্ত। আমার চিত্ত বিগতসংস্কার হইয়াছে—আর কামনার মোহঘোরে বাঁধা পড়িবে না। আমার সকল তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত।

মানবপ্রেমিক বুদ্ধের ত্যাগ তপস্যা সাধনা ও সিদ্ধির সমুদয় ফল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায়' নিয়োজিত ছিল। তাই তাঁহার কণ্ঠ হইতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া নির্গত হইয়াছিল: অনন্ত আকাশে যত জীবলোক আছে—যতদিন সেই সব জীব মুক্তিলাভ না করে ততদিন আমি তাহাদের সেবা করিব।

'এবমাকাশনিষ্ঠস্য সত্ত্বধাতোরনেকধা।
ভবেয়মুপজীব্যোঽহং যাবৎ সর্বে ন নির্বৃতাঃ।'

দুঃখের পারে

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

দুঃখের তরে বিধাতারে শুধু
মিছে দুষিও না নিত্য;
দোষ তাঁর নয়, হয়তো হয়েছে
তোমারি মলিন চিত্ত।

দুঃখ-পারের দ্বার খোলা আছে
সকলের তরে সতত;
সেই পারে শুধু প্রবেশ করিতে
যত্ন করে যে নিয়ত।

বুদ্ধবাণী

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

(১)

চিত্ত

চিত্ত যাহার মুক্ত বাসনা হতে—
নাহি হয় চঞ্চল,
পাপ ও পুণ্য করে সে অতিক্রম,
হয় চির নির্মল !
প্রশান্তি আর আনন্দ-রসে ডুবে
রহে সে সকল ক্ষণ,
দুঃখ ভুলিয়া করে এ ভুবন মাঝে
নির্ভয়ে বিচরণ ।
চিত্ত যখন বিপথের পানে ধায়,
হয় সে অতীব ক্রূর,
শত্রুর চেয়ে হয় সে ভীষণতর—
নির্মম নিষ্ঠুর !

(২)

নির্বাণ

যে প্রদীপ নিভে যায়, তৈল যায় নিঃশেষে ফুরায়ে,
আলোকের ছটা তার হয় লীন, আর নাহি জ্বলে !
গভীর শান্তির মাঝে আপনারে দেয় সে ডুবায়ে,
অস্তিত্ব থাকে না তার কোন দিকে আকাশে ভূতলে!
সেইরূপ এ ভুবনে যে পুণ্যাত্মা লভেছে নির্বাণ,
নাহি থাকে অস্তিত্বের কোন ঠাঁই—একটু স্পন্দন ।
ক্লেশ তার ধরণীতে ধীরে ধীরে হয় ক্ষীয়মাণ,
পরম-শান্তির মাঝে ডুবে যায় তাহার পরাণ !*

* মহাকবি অশ্বঘোষ রচিত বাক্যাংশের ভাবানুবাদ ।

বৌদ্ধধর্মে সাধনতত্ত্ব

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী এম্-এ, বিদ্যাবিনোদ

ভগবান্ তথাগত রাজগৃহের বেণুবন বিহারে অবস্থানকালে একদা তাঁহার ধর্মের সাধনমার্গ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন,—

> বাচানুরক্খী মনসা সুসংবুতো
> কায়েন চ অকুসলং ন কয়িরা,
> এতে তয়ো কম্মপথে বিসোধয়ে
> আরাধয়ে মগ্গমিসিপ্পবেদিতং । (ধম্মপদ, ২৮১)

বাক্যে সংযম রক্ষা করিবে, মনে সংযত থাকিবে এবং কায়দ্বারা অকুশল কর্ম করিবে না । এই ত্রিবিধ কর্মপথকে বিশুদ্ধ রাখিবে । এইরূপে ঋষিগণ প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিবে ।

বাক্য, দেহ ও মন—এই তিনটি কর্মপথের সম্যক্ পরিশুদ্ধি সম্পাদিত হইলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা নির্বাণ লাভ হয়—ইহাই বুদ্ধদেশিত ধর্মের সারতত্ত্ব । এই তিনটি কর্মপথের বিশুদ্ধিবিধানার্থ তিনি যে সাধনার সুবিন্যস্ত সোপান পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা "আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ" নামে অভিহিত । বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,—"মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো"—নির্বাণগামী যতগুলি পথ রহিয়াছে তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গই সর্বশ্রেষ্ঠ ।

> এসো ব মগ্গো নত্থঞ্ঞো দস্সনস্স বিসুদ্ধিয়া,
> এতং হি তুম্হে পটিপজ্জথ মারস্সেতং পমোহনং । (ঐ ২৭৪)

দর্শন-বিশুদ্ধির জন্য এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র পথ, অন্য পথ নাই । তোমরা এই মার্গই অবলম্বন কর ; ইহাই মার (পাপের অধিদেবতা)কে মূর্চ্ছিত অর্থাৎ পরাভূত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় ।

সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া এই মার্গকে "আর্য" বলা হয়; অথবা নির্বাণকামী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কর্তৃক নিষেবিত বলিয়াও ইহার নাম "আর্য"। আচার্য বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে (বিসুদ্ধিমগ্‌গো) 'আর্য' শব্দের উভয় প্রকার নির্বচনই নির্দেশ করিয়াছেন।

ভগবান্ তথাগত কর্তৃক উপদিষ্ট অষ্টাঙ্গ সাধন-মার্গ প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি বা চিত্ত—এই তিনটি বর্গ বা স্কন্ধে বিভক্ত। সম্যক্ সংকল্প 'প্রজ্ঞা' স্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত; সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত ও সম্যক্ আজীব 'শীল' স্কন্ধ এবং সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি 'চিত্ত' (বা 'সমাধি') স্কন্ধের অন্তর্গত।

'প্রজ্ঞা' স্কন্ধের সাধনা দ্বারা সাধককে জাগতিক বিষয়ের প্রতি লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করিয়া নিত্যানিত্য কুশল অকুশল বিচারপূর্বক সত্যদৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে হয়—ইহারই নাম 'সম্যক্‌দৃষ্টি' (সম্মা দিট্‌ঠি)। তৎপর অনিত্য ও অকুশলকে বর্জনকরত নিত্য ও কুশলকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতে হয়—ইহাই 'সম্যক্ সংকল্প' (সম্মা সঙ্‌কপ্পো)।

শুধু বিচার বা সংকল্প করিলেই হইল না, সাধককে তদনুযায়ী জীবনযাপন করিতে হইবে, বিচারকে আচারে পরিণত করিতে হইবে,—ইহাই 'শীল'স্কন্ধের সাধনা। মিথ্যা কঠোর ও অনর্থক বাক্য পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা সত্য প্রিয় ও সার্থক বাক্যপ্রয়োগ করিতে হইবে,—ইহার নাম 'সম্যক্ বাক্' (সম্মা বাচা)। প্রাণিহিংসাদি অশুভ কর্মত্যাগ ও সতত কুশল কর্মের অনুষ্ঠান,—ইহাই 'সম্যক্ কর্মান্ত' (সম্মা কম্মন্তো) নামে অভিহিত। কাহাকেও প্রতারণা না করিয়া সাধু উপায়ে জীবিকার্জন করার নাম 'সম্যক্ আজীব' (সম্মা আজীবো)। সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত ও সম্যক্ আজীব—এই তিনটি শীলস্কন্ধের সাধনা দ্বারা সাধকের বাক্য ও দেহ-পরিশুদ্ধি সংসাধিত হয়।

তৎপর 'চিত্ত বা সমাধি'স্কন্ধের অর্থাৎ চিত্তদর্পণ মার্জনের সাধনা আরম্ভ হয়। এই সাধনার তিনটি অঙ্গ যথা সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। সর্বদা অকুশল বিষয়ে চেষ্টা পরিহার করিয়া কুশল বিষয়ে দৃঢ় প্রচেষ্টা,—ইহার নাম 'সম্যক্ ব্যায়াম' (সম্মা ব্যায়ামো)। বহির্মুখীন দৃষ্টিকে অন্তর্মুখীন করিয়া দেহ ও মনের স্বরূপ অবস্থা চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ করার যে সাধনা তাহাই 'সম্যক্ স্মৃতি' (সম্মা সতি) নামে অভিহিত। তৎপর 'সম্যক্ সমাধি' (সম্মা সমাধি) বা ধ্যানযোগের সাধনা আরম্ভ হয়। সকল কামনা বাসনা এবং পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধককে ক্রমশঃ ধ্যানের উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে হয়। ধ্যানের নয়টি স্তর। নবম ধ্যানে অধিরূঢ় সাধকই নির্বাণের সাক্ষাৎকার (সচ্ছিকিরিয়া) লাভে সমর্থ হন এবং ঐ অবস্থাতেই সাধকের অন্তরে বোধির দিব্য আলোক প্রকাশিত হয় এবং অবিদ্যার (অবিজ্জা) অন্ধকার চিরতরে নিরাকৃত হইয়া যায়। নির্বাণপ্রাপ্ত অর্হৎ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,

ছন্দরাগবিরত্তো সো ভিক্খু পঞ্ঞাণবা ইধ,
অজ্ঝগা অমতং সন্তিং নিব্বানপদমচ্চুতং। (সুত্তনিপাত, ২০৪)

তৃষ্ণা ও আসক্তি বিবর্জিত প্রজ্ঞাবান্ ভিক্ষু এই জগতেই অক্ষয় নির্বাণের অমৃত শান্তি প্রাপ্ত হন।

পূর্বোক্ত শীলস্কন্ধের সাধনার সহিত (সমাধি বা) চিত্তস্কন্ধের সাধনায় কিরূপ সম্পর্ক, নির্বাণের পথে ইহারা সাধককে কিভাবে কতদূর অগ্রসর করিয়া দেয় তাহা 'মিলিন্দপ্রশ্ন' (মিলিন্দ পঞ্ঞ্হো) গ্রন্থে ভিক্ষু নাগসেন শিষ্য যবনরাজ মিলিন্দকে (Menander) একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত সাহায্যে এই ভাবে বুঝাইয়াছেন,—

"যথা মহারাজ নগরবড্‌ঢকী নগরং মাপেতুকামো পঠমং নগরট্ঠানং সোধাপেত্বা খাণুকণ্টকং অপকড্‌ঢাপেত্বা ভূমিং সমং কারাপেত্বা ততো অপরভাগে বীথিচতুক্ক-সিঙ্ঘাটকাদি পরিচ্ছেদেন বিভজিত্বা নগরং মাপেতি, এবমেব খো মহারাজ যোগাবচরো সীলং নিস্সায় সীলে পতিট্ঠায় পঞ্চিন্দ্রিয়াণি

ভাবেতি সদ্ধিন্দ্রিয়ং বিরিয়িন্দ্রিয়ং, সতিন্দ্রিয়ং, সমাধিন্দ্রিয়ং পঞ্ঞিন্দ্রিয়ং' তি।" (মিলিন্দ পঞ্হো)

—অরণ্য কাটিয়া নগর পত্তন করিতে হইবে। প্রথমতঃ নগরবর্ধকী (ইঞ্জিনিয়ার) বৃক্ষাদি কর্তন করিয়া স্থানটি পরিষ্কার করেন, তৎপর স্থাণু কণ্টকাদি উৎপাটন করিয়া জমিকে সমতল করিয়া প্রস্তুত করেন। এই সকল কার্য শেষ হইয়া গেলে নক্সা অনুযায়ী বীথি, চতুষ্ক, রাজপ্রাসাদ, নাগরিকদের বাসভবন ইত্যাদি নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। শীল-স্কন্ধের সাধনা হইল চিত্তের বনভূমিকে পরিষ্কৃত করিয়া তাহাকে বোধিচিত্তরূপ নগর নির্মাণের উপযুক্ত করিয়া তোলা শীলস্কন্ধের সাধনা দ্বারা পরিষ্কৃত ভূমির উপর সমাধি বা চিত্তস্কন্ধের সাধনা অবলম্বনে বোধিচিত্তরূপ নগর নির্মাণ করিতে হইবে।

সমাধি বা চিত্তস্কন্ধের সাধনার প্রথম কথাই হইল, বহির্মুখীন চঞ্চল চিত্তকে বশীভূত করিয়া অন্তর্মুখীন, একাগ্র, স্থির ও প্রশান্ত করা। বুদ্ধদেব এই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন,—

ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্খং দুন্নিবারয়ং,
উজুং করোতি মেধাবী উসুকারোব তেজনং। (ধম্মপদ, ৩৩)

যেমন তীর নির্মাণকারী তীরকে সোজা করিয়া প্রস্তুত করে, তেমনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্পন্দনশীল, চপল, দুরক্ষণীয় ও দুর্নিবার্য চিত্তকে সরল করেন অর্থাৎ নিজবশে আনয়ন করেন।

চঞ্চল ও অবশীভূত চিত্ত যেমন পরম শত্রুর ন্যায় সর্বনাশ ঘটায়, তেমনি সংযত ও বশীভূত চিত্ত পরম মিত্রের ন্যায় হিতসাধন করিয়া থাকে;—

দিসো দিসং যং তং কয়িরা বেরী বা পন বেরিনং,
মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিয়োনং ততো করে। (ঐ-৪২)

একজন দোষকারী ব্যক্তি অপরের, কিংবা একজন শত্রু অপর শত্রুর যতটা ক্ষতি করিতে পারে, বিপথ-গামী চিত্ত মনুষ্যের তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে। আবার,—

ন তং মাতা পিতা কয়িরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা,
সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে। (ঐ-৪৩)

সম্যক্ নিয়ন্ত্রিত চিত্ত মনুষ্যের যেমন উপকার করে, মাতাপিতা বা অন্য কোন আত্মীয়ই তেমন করিতে পারে না। বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট 'সম্যক্ ব্যায়াম' অভ্যাস-যোগেরই সাধনা, আর 'সম্যক্ স্মৃতি' হইতেছে বৈরাগ্যের সাধনা। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁহার সাধক-জীবনে কি প্রকারে "সম্যক্ ব্যায়ামের" সাধনা করিয়াছিলেন, অগ্নিবেশ নামক জনৈক ভিক্ষুর নিকট তাহা এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন;—

দন্তে দন্তে সংলগ্ন করিয়া তালুতে জিহ্বা সংশ্লিষ্ট করিয়া এমন ভাবে বলের সহিত চিত্তকে নিগ্রহ করিতাম যে, আমার শরীর হইতে ঘর্ম বিগলিত হইত। (মজ্ঝিম নিকায়, মহাসচ্চক সুত্ত)

সম্যক্ ব্যায়ামের সাধনাতে সাধককে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দৃঢ় বীর্য সহকারে লক্ষ্যাভি-মুখে অগ্রসর হইতে হয়। আলস্য, অবসাদ, হীনমন্যতা সর্বতোভাবে পরিবর্জন করিতে হয়। বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে আচার্য শান্তিদেব ইহাকেই 'বীর্যপারমিতা' সাধনা নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'বীর্য' কাহাকে বলে?

কিং বীর্যং কুশলোৎসাহস্তদ্বিপক্ষঃ ক উচ্যতে।
আলস্যং কুৎসিতাসক্তিবিষাদাত্মাবমন্যতা॥
(বোধিচর্যাবতার—৭।২)

বীর্য কি? কুশল বিষয়ে উৎসাহ। বীর্যের প্রতি-বন্ধক কি?—আলস্য, কুৎসিত বিষয়ে আসক্তি, বিষাদ এবং আত্মাবমাননা।

সাধক কোন কিছুতেই মনকে দুর্বল হইতে দিবেন না। মন দুর্বল হইয়া গেলে সামান্য বাধা-বিঘ্নও তাঁহাকে পরাভূত করিবে।

মৃতং ডুণ্ডুভমাসাদ্য কাকোঽপি গরুড়ায়তে।
আপদাবাধতেঽল্পাপি মনো মে যদি দুর্বলম্॥ (ঐ—৭।৫২)

আমার মন যদি দুর্বল হয় তবে সামান্য আপদও আক্রমণ করে, যেমন মৃত ঢোঁড়া সাপকে পাইয়া কাকও গরুড়ের মত বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে।

নির্বাণের সাধককে দিগ্বিজয়ী বীরের সাহসি-কতা ও আত্মপ্রত্যয় অবলম্বন করিয়া সাধন-সমরে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তাঁহাকে অন্তরে এই আত্ম-

প্রত্যয়ের বহ্নি উদ্দীপিত করিতে হইবে যে, আমি জিন (বুদ্ধ)-সিংহসুত, আমিই সকলকে জয় করিব, আমাকে প্রতিহত করিতে পারে এমন কে আছে?

মযা হি সর্বং জেতব্যমহং জেয়ো ন কস্যচিৎ।
মযৈষ মানো বোঢব্যো জিনসিংহসুতোঽস্ম্যহম্॥ (ঐ—৭।৪৫)

'আমাকেই সমস্ত জয় করিতে হইবে, আমি কাহারও দ্বারা জিত হইব না'—এই সম্মান আমাকে বহন করিতেই হইবে—কারণ আমি যে সর্বজয়ী বুদ্ধরূপ সিংহের সন্তান।

এই ভীষণ সাধনসমরে সাধককে বিশেষ সাবধানতা সহকারে কামক্রোধাদি রিপুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে এবং সুযোগ বুঝিয়া প্রতিপক্ষকে আঘাত হানিয়া নিপাত করিতে হইবে।

ক্লেশ-প্রহারান্ সংরক্ষেৎ ক্লেশাংশ্চ প্রহরেদ্ দৃঢ়ম্।
খড়্গযুদ্ধমিবাপন্নঃ শিক্ষিতেনারিণা সহ॥ (ঐ—৭।৬৭)

সুশিক্ষিত শত্রুর সহিত খড়্গযুদ্ধে প্রবৃত্ত যোদ্ধার স্থায় 'ক্লেশে'র প্রহার হইতে আত্মরক্ষা করিবে এবং ক্লেশ সমূহকে দৃঢ় প্রহার করিবে। 'ক্লেশ' সাধন পথের কণ্টক; ইহা পঞ্চবিধ যথা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।

আচার্য শান্তিদেব নির্বাণের সাধককে এই বলিয়া উদ্দীপিত করিতেছেন যে, বুদ্ধদেব প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে কেহ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনা গ্রহণ করিবে সে নিশ্চয়ই বোধিপ্রাপ্ত হইবে। তাঁহার কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, অতএব অবসাদ পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হও।

নৈবাবসাদঃ কর্তব্যঃ কুতো মে বোধিরিত্যতঃ।
যস্মাৎ তথাগতঃ সত্যং সত্যবাদীদমুক্তবান্॥ (ঐ—৭।১৭)

'আমার কিরূপে বোধিলাভ হইবে'—এইরূপ চিন্তা করিয়া অবসন্ন হওয়া কখনও উচিত নহে। তথাগত সত্যবাদী, তিনি যখন বলিয়াছেন—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনা দ্বারা বোধিলাভ হয়, তখন অবশ্যই তাহা লাভ করা যাইবে।

বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী গম্ভীরানন্দ

এবারে আমরা কথামৃত প্রথম ভাগে (২২৩—২৩৩ পৃঃ) উল্লিখিত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চের ঘটনার অনুসরণ করিব। ঐ দিন আন্দাজ বেলা দশটার সময় দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে প্রসাদ পাইয়াছিলেন, আহারান্তে বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় বিদ্যালয়ের অবসরকালে মাষ্টার মহাশয় দ্বিপ্রহরে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অল্পবয়স্ক ভক্তেরা তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "হাঁগা, এটা আমার কদিন ধরে হচ্ছে কেন বল দেখি—ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার যো নাই।" কিছু পরে মাস্টার বিদ্যালয়ে চলিয়া গেলেন।

বিকালে পুনর্বার আসিয়া তিনি দেখেন ঠাকুর পূর্ববৎ বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন—পার্শ্বে রহিয়াছেন শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, সুরেন্দ্র মিত্র, বলরাম, লাটু, চুনিলাল প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথের ধর্মভাব ও তৎকালীন সাংসারিক দুরবস্থা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা হইল। অতঃপর ঠাকুর গান শুনিতে চাহিলে শ্রীযুক্ত তারাপদ গাহিলেন, 'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ-কানন-চারী।'

পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কথা উঠিলে ঠাকুর বলিলেন, 'শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? ···যার সংসারে আসক্তি আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই—মিছে পড়া।' পরে ঠাকুরও গান গাহিলেন। কথা কহিতে কহিতে

সন্ধ্যা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন ও সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছেন। ঠাকুর লোক-শিক্ষার্থ প্রার্থনা করিলেন, "মা, আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত। দেহসুখ চাই না মা! লোকমান্য চাই না; (অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না। কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়—নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী ভক্তি। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই; তোমার মায়ার সংসারের, কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়; মা, তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধন-হীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।" (ঐ ২৩৪ পৃষ্ঠা)। পরে শ্রীযুক্ত গিরিশের নিমন্ত্রণে সেই রাত্রেই তাঁহার বাটীতে গেলেন, পথে নরেন্দ্রনাথও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সেদিন গিরিশভবনে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভগবদ্ভক্তি বিতরণ করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন।

৬ই এপ্রিল, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে (৩য় ভাগ, ১৫০ পৃঃ) ঠাকুর বলরাম-ভবনে আসিয়াছেন। এখান হইতে ভক্তবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের গৃহে যাইবেন। তার আগে বসুপাড়ার ভক্তমন্দিরের বৈঠকখানায় বসিয়া ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। বিশেষতঃ মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। পূর্ণ, ছোট নরেন, বাবুরাম, রাখাল, পল্টু, বিনোদ প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। পরে ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের গৃহে চলিলেন।

কথামৃতের ৩য় ভাগে সংরক্ষিত—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ)-এর বিবরণটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং মনোহর (১৬১—১৮৯ পৃষ্ঠা); ইহার বিষয়বস্তুও বিবিধ। সেদিন রবিবার এবং বৎসরের প্রথম দিন। তাই ভক্ত-সমাগমও বেশ হইয়াছে। সেখানে আছেন—গিরিশ, মাস্টার, বলরাম, ছোট নরেন, পল্টু, দ্বিজ, পূর্ণ, মহেন্দ্র মুখুয্যে প্রভৃতি; ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈলোক্য সান্যাল, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি একে একে অনেকেই আসিয়াছেন। মেয়ে ভক্তেরা অনেকে চিকের আড়ালে বসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর সেদিন নিজের সাধনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। ধ্যানের সময় তিনি দেখিতেন, শূল-হাতে একজন বসিয়া আছে এবং শাসাইতেছে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন না রাখিলে বুকে শূল বসাইয়া দিবে। মন কখনও মায়ের ইচ্ছায় নিত্য হইতে লীলায় নামিয়া আসিত, আবার লীলা হইতে নিত্যে উঠিয়া যাইত। লীলায় অবস্থান-কালে সীতারামের চিন্তা দিনরাত চলিত, আর সীতারামের রূপদর্শন হইত। রাম-লালা (গোপালকে) লইয়া সর্বদা বেড়াইতেন, তাঁহাকে নাওয়াইতেন খাওয়াইতেন। আবার কখন রাধা-কৃষ্ণের ভাবে থাকিতেন—পুরুষ ও প্রকৃতিভাবের এই মিলন অবস্থায় সর্বদা শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন হইত। আবার যখন মন লীলা হইতে নিত্যে উঠিয়া গেল, তখন সজনে তুলসী সমান বোধ হইত। যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলিয়া ফেলিলেন—কেবল সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, সেই আদি পুরুষকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ষট্‌পদ্মের উন্মীলন দেখিয়াছিলেন—মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত সমস্ত পথ কিরূপে উর্ধ্বমুখ হইয়া উঠিল। ধ্যানকালে তিনি নিবাত দীপশিখার আরোপ করিতেন।

এই সব বহু অপূর্ব আত্মকথার পর সেদিন আরও বলিয়াছিলেন (১৬১—১৬৪ পৃঃ): —সিদ্ধাই (অলৌকিক শক্তি)কে মা দেখাইয়াছিলেন বুড়ি বেশ্যার মলত্যাগরূপে। পাপপুরুষ লড়ায়ে গোরার রূপে আসিয়া টাকা, মান, স্ত্রী-সম্ভোগ ও নানা শক্তি দিতে চাহিয়াছিল। ঠাকুর জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা ওকে কেটে ফেল।" মায়ের ভুবনমোহন রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন। ভক্তদিগকে উহা বলিতেও

চাহিলেন ; কিন্তু মা বলিতে দিলেন না। বটতলায় ধ্যানকালে তিনি দেখিয়াছিলেন একজন মুসলমান সানকিতে ভাত লইয়া সামনে আসিলেন। তিনি সানকি হইতে ম্লেচ্ছদের খাওয়াইয়া ঠাকুরকেও দুইটি দিয়া গেলেন। জগদম্বা তাঁহাকে দেখাইলেন, "এক বই দুই নয়। সচ্চিদানন্দই নানারূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।" এই সব দর্শন ও অনুভূতির কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবস্থ হইলেন। ভাবসংবরণ হইলে তিনি পূর্ণকে দেখিতে চাহিলেন। তাই পূর্ণকে আনিতে লোক গেল। (১৬৮ পৃঃ)

ইহার পরে ঠাকুর নিজের মহাভাবের কথা বর্ণনা করিলেন : "আমি এই অবস্থায় তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। নড়তে চড়তে পারতাম না—এক জায়গায় পড়েছিলাম। হুঁশ হলে বামনী আমায় ধরে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার যো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপর হাত দিয়ে আমায় ধরে নিয়ে গিছল। গায়ে যেসব মাটি লেগেছিল পুড়ে গিছল। যখন সেই অবস্থা আসত শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল চালিয়ে দিত। 'প্রাণ যায়, প্রাণ যায়' এই করতাম। কিন্তু তারপর খুব আনন্দ। ···এতদূর তোমাদের দরকার নাই। আমার অবস্থা নজিরের জন্য।"

এইরূপ নানা কথাবার্তার পর ত্রৈলোক্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার গান আরম্ভ হইল। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সন্ধ্যা আগতপ্রায়—এমন সময় গান থামিল। ত্রৈলোক্য আসার পূর্বে তাঁহার রচিত 'কেশব-চরিত' পড়া হইতেছিল। ত্রৈলোক্য লিখিয়াছেন—কেশবের সংস্পর্শে আসিয়া সংসার-সম্বন্ধে ঠাকুরের মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। এখন সুযোগ বুঝিয়া গিরিশ ত্রৈলোক্যকে বলিলেন, "আপনি যা লিখেছেন—যে সংসার-সম্বন্ধে এঁর মত পরিবর্তন হয়েছে, তা বস্তুতঃ হয় নাই।" ত্রৈলোক্য সংসারের নিজস্ব সার্থকতা দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাঁহার মত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বলিলেন যে, সংসার এবং ভগবান দুই একসঙ্গে থাকা অসম্ভব। "ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। ·· তখন ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়, টাকা ফাকা কিছুই ভাল লাগে না।" (১৮৩ পৃঃ)

গিরিশ আবার বিচার তুলিলেন অবতারবাদ সম্বন্ধে। ত্রৈলোক্য ইহা মানেন না। একটু পরে বলরাম ত্রৈলোক্য প্রভৃতিকে মিষ্টিমুখ করাইবার জন্য কক্ষান্তরে লইয়া গেলে ঠাকুর গিরিশকে বলিলেন, "ওদের সঙ্গে বকচো কেন? ওরা দুইই নিয়ে আছে। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ না পেলে সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে না।" অবতারতত্ত্ব লইয়াই সে রাত্রির প্রসঙ্গ শেষ হইল। ঠাকুর বলিলেন, "সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী হয়ে আছে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্চে। তারা কখনও সংসারে বদ্ধ হয় না—বন্দী হয় না। তাদের 'আমি' মোটা 'আমি নয়'—সংসারী লোকদের মত। সংসারী লোকদের অহংকার, সংসারী লোকদের 'আমি'—যেন চতুর্দিকে পাঁচিল, মাথার উপর ছাদ। বাহিরে কোন জিনিস দেখা যায় না। অবতারাদির আমি পাতলা আমি। এ আমির ভেতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে—পাঁচিলের দুইদিকে অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে, পাঁচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হলে আনাগোনাও হয়। অবতারাদির আমি ঐ ফোকর-ওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়—এর মানে দেহধারণ করলেও তারা সর্বদা যোগেতেই থাকে। আবার ইচ্ছা হলে বড় ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোকর হলে আনাগোনা করতে পারে—সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আসতে পারে"। (১৮৮-১৮৯ পৃঃ)

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল গিরিশ-ভবনে উৎসব হইবে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে আসিয়া দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টার মহাশয় আসিলে তাঁহাকে তিনি নিজের গলরোগের আরম্ভের কথা জানাইয়া বলিলেন। "কে জানে বাপু, আমার গলায় বিচি হয়েছে। শেষ রাত্রে বড় কষ্ট হয়। কিসে ভাল হয় বাপু?" (তৃতীয় ভাগ, ৩৮ পৃঃ)। সেদিন সেখানে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র, বাবুরামও ছিলেন। পরে নরেন্দ্র, ছোট নরেন, রামবাবু প্রভৃতিও আসিয়াছিলেন। বেলা পড়িলে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গিরিশ-ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। বোস-পাড়ার গলিতে প্রবেশ করিতে করিতে মাস্টার মহাশয়কে বলিতেছেন, "হ্যাঁগা, কি বলে? 'পরমহংসের ফৌজ আসছে?' শালারা বলে কি?" (সকলের হাস্য)

৯ই মে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ আজও ঠাকুর ভক্তসঙ্গে দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সেখানে আছেন—নরেন্দ্র, মাস্টার, ভবনাথ, পূর্ণ, পল্টু, ছোট নরেন, গিরিশ, রামবাবু, দ্বিজ, বিনোদ প্রভৃতি। কিন্তু বলরাম নাই। তিনি বায়ু-পরিবর্তনের জন্য মুঙ্গেরে গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ঠাকুর ও ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। উপদেশ প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন, "কি জান, একটি কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্মের সূক্ষ্ম-গতি। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছে, কিন্তু সুতার ভিতর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর প্রবেশ করবে না। ত্রিশ বছর মালা জপে; তবু কেন কিছু হয় না?"

কথায় কথায় অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে গিরিশের সহিত নরেন্দ্রের বিচার আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে পল্টু, ভবনাথ ও স্বয়ং ঠাকুর যোগ দিতে লাগিলেন। পরে নরেন্দ্র কয়েকখানি গান গাহিলেন; শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন, "ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা! মনের নাশ হলেই হয়। মনের নাশ হলেই অহংনাশ—যেটা 'আমি' 'আমি' করছে। এটা ভক্তিপথেও হয়; আবার জ্ঞানপথে, বিচারপথেও হয়। ···সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে কি দেখেছে বলতে পারে না"।

সন্ধ্যার পরে ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে—হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে। এখানকার যারা লোক তারা সব জুটে গেছে। আর সব এখন যারা যাবে, তারা বাহিরের লোক। তারাও এখন মাঝে মাঝে যাবে। (মা) তাদের বলে দেবে, 'এই কোরো, এই রকম করে ঈশ্বরকে ডাকো।"

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দিবসে বলরাম-ভবনে যে ক্ষুদ্র অথচ হৃদয়স্পর্শী আনন্দোৎসব হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা পূর্বে পাইয়াছি। এবারে আমরা ১৮৮৫-এর ১৪ই জুলাই-এ অনুষ্ঠিত রথোৎসবের অনুসরণ করিব। বলরামের আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্বদিন ১৩ই জুলাই বলরাম-মন্দিরে শুভাগমন করিয়া সকালে ৯টায় ভক্তসঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। মাস্টার মহাশয়ের সহিত অল্পবয়স্ক ভক্তদের সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন—নরেন্দ্র, ছোট নরেন, পূর্ণ, ভবনাথের বিষয়ে। বলিলেন, "তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ···রণজিৎ রায়ের ঘরে ভগবতী কন্যা হয়ে জন্মেছিলেন।"

সন্ধ্যা ছয়টার দিকে অতুল ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা আসিয়াছেন। কৃষ্ণধন নামক এক রসিক ব্রাহ্মণকে ঠাকুর বলিতেছেন, "কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি দিনরাত ফষ্টিনষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ। ঐটি ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। যে নুনের হিসাব করতে পারে, সে মিশ্রির হিসাবও করতে পারে।" কৃষ্ণধন (সহাস্যে)—"আপনি টেনে নিন।"

ঠাকুর "আমি কি করব ? তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর করছে। 'এ মন্ত্র নয়—এখন মন তোর'।" পাশের পশ্চিমের ঘরে ঠাকুর সে রাত্রি যাপন করিবেন; তাই সাড়ে দশটায় শয্যা গ্রহণ করিলেন।

পরদিন, ১৪ই জুলাই রথযাত্রা। সকালে শ্রীযুক্ত হরিনাথ (পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ) আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "কি গো, তুমি অনেক দিন আস নাই। ···তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদান্তে কি আছে ? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লীলাও সত্য। 'আমি' যখন তিনি পুঁছে ফেলবেন, তখন যা আছে তাই আছে। মুখে বলা যায় না। যতক্ষণ 'আমি' রেখে দিয়েছেন ততক্ষণ সবই নিতে হবে।" হরি মহারাজ তখন একলা ঘরে বসিয়া বেদান্ত চর্চা করিতে ভালবাসিতেন।

বেলা দশটায় কাশীর মণিকর্ণিকার শিবদর্শনের কথায় ঠাকুর বলিলেন, "সেজ বাবুর সঙ্গে যখন কাশী গিয়াছিলাম, মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছ দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ শিবদর্শন। আমি নৌকার ধারে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ। মাঝিরা হৃদেকে বলতে লাগল, 'ধর ধর'—পাছে পড়ে যাই। যেন জগতের যত 'গম্ভীর' নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে দেখলাম দূরে দাঁড়িয়ে, তারপর কাছে আসতে দেখলাম, তারপর আমার ভেতরে মিলিয়ে গেলেন।······ভাবে দেখলাম, সন্ন্যাসী হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটি ঠাকুর বাড়িতে ঢুকলাম—সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন হ'ল।" শালগ্রাম পূজার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবসমাধিস্থ হইলেন। সমাধি-ভঙ্গে বলিলেন, "কি দেখছিলাম, ব্রহ্মাণ্ড একটা শালগ্রাম।"

ক্রমে নরেন্দ্র আসিলেন, কামারহাটির বামনী (গোপালের মা)ও আসিলেন। ঠাকুর বলরামকে লোক পাঠাইয়া বামনীকে আনিতে বলিয়াছিলেন। (পৃঃ ২৫৮) বেলা একটা হইয়াছে। ঠাকুরের কথায় নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন। পরে বৈষ্ণব-চরণের সম্প্রদায় কীর্তন গাহিলেন। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি-ভঙ্গে ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন। কীর্তন চলিতে লাগিল। পরে বনোয়ারীর কীর্তনও হইল। ইতিমধ্যে রথ বাহির হওয়ায় ঠাকুর কীর্তন ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অপরাহ্ণ। দোতলার বারান্দায় রথ টানা হইল। ঠাকুর রথের রজ্জু ধরিয়া নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিলে ভক্তেরাও তাহাতে যোগ দিলেন। ইহার পর তিনি ঘরে আসিয়া বসিলে নরেন্দ্র গান ধরিলেন। রাত্রি নয়টায় আবার বৈষ্ণবচরণের গান হইল এবং দশটা এগরটার সময় ভক্তেরা একে একে বিদায় লইলেন।

পরদিন ১৫ই জুলাই। প্রভাতে ঠাকুর নাম করিতেছেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ, গোপীকৃষ্ণ; গোপী গোপী, রাখাল-জীবন কৃষ্ণ, নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ", তারপর নারায়ণের নাম কীর্তন করিয়া নাচিতেছেন। অবশেষে ভক্ত সঙ্গে ছোট ঘরটিতে আসিয়া বসিলেন। বসিয়া বলিতেছেন, অতি গুহ্যকথা: কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র এদের সব এত ভালবাসি। জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল। জানিয়ে দিলে "তুমি শরীর ধারণ করেছ—এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য বাৎসল্য এই সব ভাব লয়ে থাক।" (২৬৩ পৃঃ)

এইরূপে বেলা আটটা নয়টা বাজিয়া গেলে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাইতে উদ্যত হইলেন। বাগবাজারে ৺অন্নপূর্ণার ঘাটে নৌকা আছে। ঠাকুর দুই একটি ভক্তের সঙ্গে নৌকায় গিয়া বসিলেন। গোপালের মাও ঐ নৌকায় উঠিলেন, দক্ষিণেশ্বরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বৈকালে তিনি হাঁটিয়া কামারহাটি যাইবেন।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, কথামৃত ৫ম

ভাগে ১৭৭ পৃষ্ঠায় এই রথযাত্রায় পরদিবসের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। উহাতে শ্রীমুখকথিত নরেন্দ্রের গুণাবলী স্মরণে মাষ্টার মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন।

কথামৃতের সর্বশেষ বর্ণনার তারিখ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই (৩য় ভাগ, ৮ম খণ্ড ২৩৫-২৫৫ পৃঃ)। সেদিন পূর্বাহ্ণে বলরাম-ভবনে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের সহিত ৺জগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। বিকালে তাঁহার আহ্বানে অনেক যুবক ভক্ত বলরাম-ভবনে আসিয়াছেন। একটু পরেই তিনি পালকি করিয়া নন্দ বসুর বাড়িতে গেলেন। সেখান হইতে সদলবলে শোকাতুরা ব্রাহ্মণী অর্থাৎ গোলাপ-মার গৃহে পদার্পণ করিলেন। ঐ বাড়ী হইতে তিনি আবার গঙ্গুর মার বাড়ীতে গেলেন এবং রাত্রি প্রায় পৌনে এগারটায় বলরাম-গৃহে ফিরিয়া বৈঠকখানার পশ্চিম পার্শ্বের ঘরে বসিয়া ভক্তদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি এক ব্যক্তি।" ঠাকুর সমর্থন করিয়া বলিলেন, "এক এক। এক বই কি।"

ইহার পর আমরা লীলাপ্রসঙ্গের দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। পূর্বেও দুই একটির প্রাসঙ্গিক অবতারণা করিয়াছি। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের পুনর্যাত্রায় ঘটনাটি এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেদিন প্রাতেই ঠাকুর বলরামবাবুর বাটীতে আসিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া ভক্তেরাও কেহ কেহ উপস্থিত হইয়াছেন। অন্দর মহলে জলযোগের সময় তিনি গোপালের মার বিশেষ প্রশংসা করিলেন। বলরাম বাবু তাঁহাকে আনাইতে কামারহাটিতে লোক পাঠাইলেন। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় বলরামগৃহের বৈঠকখানায় উপস্থিত ভক্তগণ দেখিলেন, ঠাকুর অকস্মাৎ বাল-গোপাল-মূর্তি ধারণ করিলেন। দুই জানু ও এক হাত ভূমিতে হামা দেওয়ার ভাবে রাখিয়া ও এক হাত তুলিয়া উর্ধ্বমুখে যেন কাহারও মুখপানে সাহ্লাদে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে ও কি চাহিতেছে।········ঠাকুরের এই ভাবাবস্থা আরম্ভ হইবার একটু পরেই গোপালের মার গাড়ী আসিয়া বলরামবাবুর বাটীর দরজায় দাঁড়াইল এবং গোপালের মা উপরে আসিয়া ঠাকুরকে আপনার ইষ্টরূপে দর্শন করিলেন। উপস্থিত সকলে—গোপালের মার ভক্তির জোরেই ঠাকুরের সহসা এইরূপ গোপাল ভাবাবেশ হইয়াছে জানিয়া তাঁহাকে বহু ভাগ্যবতী-জ্ঞানে সম্মান ও বন্দনা করিলেন। গোপালের মা সসংকোচে বলিলেন, "আমি কিন্তু বাপু, ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালবাসি না। আমার গোপাল হাসবে, খেলবে, বেড়াবে, দৌড়ুবে—ওমা ও কি! একেবারে যেন কাঠ। আমার অমন গোপাল দেখে কাজ নেই।" সে-বারে শ্রীশ্রীঠাকুর বলরাম-গৃহে ভক্তসঙ্গে সানন্দে দুই দিন দুই রাত কাটাইয়া তৃতীয় দিন সকালে আটটা নয়টার সময় নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন; গোপালের মাও তাঁহার সহিত একই নৌকায় গেলেন। এতদ্ব্যতীত গোলাপ-মাও ছিলেন, আর সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত কালী (বা স্বামী অভেদানন্দ)'ও ছিলেন। গোপালের মার সেবার জন্য এদিন বলরামবাবুর বাটী হইতে তাঁহাকে অনেক জিনিসপত্র দেওয়া হইয়াছিল—হাতা, বেড়ি, কাপড় ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গলরোগ বৃদ্ধি হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় লইয়া আসেন। কিন্তু তাঁহার বাসের জন্য দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রীটে যে ক্ষুদ্র বাড়িখানি ভাড়া লওয়া হইয়াছিল উহা দেখিয়া ঠাকুর উহাতে বাস করিতে অস্বীকার করেন এবং তখনই পদব্রজে বলরাম মন্দিরে চলিয়া আসেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতে সপ্তাহকালের মধ্যেই শ্যামপুকুর স্ট্রীটে অবস্থিত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাটী ঠাকুরের জন্য ভাড়া লওয়া হয়

এবং ঠাকুর সেখানে চলিয়া যান। সুতরাং এই মতে ঠাকুর সে-বার এক সপ্তাহের কিছু কম সময় বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। (দিব্য ভাব ও নরেন্দ্র নাথ—২৫৩ পৃঃ)। শ্রীরামচন্দ্র দত্ত কিন্তু তাঁহার রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বলরামবাবুর বাটীতে এক পক্ষের অধিক বাস করিবার সুবিধা হইল না।" (১৬৬ পৃঃ)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতেও লিখিত আছে, "এক পক্ষ হৈল গত বসুর ভবনে" (৫৭৭ পৃঃ)।

যাহা হউক, আমরা লীলাপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ ও এই সময়ে বলরামভবনে সংঘটিত একটি লীলার বিবরণই পরিবেশন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ঠাকুর কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন জানিয়া চারিদিক হইতে পরিচিত ও অপরিচিত বহু ভক্ত সেখানে আসিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের অসুখের কথা ভুলিয়া ঐ বাটীকে উৎসবক্ষেত্রে পরিণত করিলেন। ডাক্তারের নিষেধ এবং ভক্তদের সকরুণ প্রার্থনায় ঠাকুর যথাসম্ভব নীরব থাকিলেও আগতদের আর্তি তাঁহাকে বারংবার বিচলিত করিত এবং করুণায় বিগলিত হইয়া তিনি অকাতরে জ্ঞান, ভক্তি ও কৃপা বিতরণ করিতেন। ঐ সময় একদিন পূজ্যপাদ লীলাপ্রসঙ্গকার বলরামবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঘরখানি লোকে পরিপূর্ণ। পূর্ণ, গিরিশ ও কালীপদ মহোৎসাহে গান ধরিয়াছেন—

আমায় ধর নিতাই।
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।
(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে
উঠল যে ঢেউ প্রেমনদীতে
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভেসে যাই।
(নিতাই) খত লিখেছি আপন হাতে
অষ্ট সখী সাক্ষী তাতে
(এখন) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন।
(আমার) সঞ্চিত ধন ফুরাইল
তবু ঋণের শোধ না হ'ল,
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই।

ঠাকুর ঐ ঘরের পশ্চিমাংশে পূর্বাস্যে বসিয়া আছেন—মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব ছটা। তাঁহার দক্ষিণ চরণ উত্থিত ও সম্মুখে প্রসারিত। একব্যক্তি পরম প্রেমের সহিত সন্তর্পণে উহা বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছেন। গীত সাঙ্গ হইলে অর্ধবাহ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, 'বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।' তিনবার নাম গ্রহণ করাইয়া তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় স্বাভাবিকভাবে কথামৃত বিলাইতে লাগিলেন। সেদিনের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামী। ইনি ঢাকার কোন কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। ঠাকুরের অসুস্থতার সংবাদে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া এই অভাবনীয় কৃপালাভ করেন।

এই সময় লোকসমাগম দেখিয়া ঠাকুর একদিন ভাবাবস্থায় বলিয়াছিলেন —'এত লোক কি আনতে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস্। লোকের ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই না। একটা তো এই ফুটো ঢাক। রাতদিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকবে।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতেও বলরাম-মন্দিরে শ্রীপ্রভুর লীলার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা রহিয়াছে, উহা এখানে সবিস্তারে উপহার দেওয়া সম্ভব নহে। তবু দুই চারি পঙ্‌ক্তি তুলিয়া ধরিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বসুর ভাগ্যের কথা নাহি হয় ইতি।
যাঁহার ভবনে এত প্রভুর পীরিতি॥
শ্রীপ্রভুর আগমন বসুর ভবনে।
সাধারণে রাষ্ট্র কথা হৈল কানে কানে॥

লোকারণ্য হৈল লোকে ভবন-ভিতরে।
অগণন সাধ্য কার সংখ্যা তার করে॥
মঙ্গল-উৎসব-ধ্বনি উঠে দিবারাত্র।
বসুর ভবন ঠিক জগন্নাথ-ক্ষেত্র॥ (৫৭৬ পৃঃ)

পুঁথি হইতে আরও দুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। বলরামবাবুকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন,

"অন্যে দিতে দ্রব্য যদি আনে কোন জন।
সেই দ্রব্য দেয় যদি খাইতে আমারে।
তখন না পারি তাহা স্পর্শ করিবারে॥"

পরীক্ষার জন্য বলরাম একদিন ঠাকুরের জন্য আনীত মিষ্টান্নের সহিত নিজ হাতে অপরের নামীয় মিষ্টান্ন মিশাইয়া দিলেন। কিন্তু আহারকালে দেখিলেন, শ্রীপ্রভু অপরের উদ্দেশ্যে আনীত মিষ্টান্নে মোটে হস্তক্ষেপ করিলেন না—

যে ভোজ্য নিজের তাঁর, তাঁর নামে আনা।
প্রত্যেকের লয়ে প্রায় দুই এক দানা।
খাইলেন প্রভুদেব ভরিল উদর।
বুদ্ধিহারা বলরাম দেখিয়া রগড়॥ (৩০৭ পৃঃ)

পুঁথির আর একটি বর্ণনা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রকে লইয়া। সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুর নন্দ বসুর বাটী হইতে বলরাম-ভবনে যাইতেছেন। সঙ্গে আছেন নারাণচন্দ্র, প্রভু তাঁহার হাত ধরিয়া চলিয়াছেন। গিরিশ স্বগৃহের সম্মুখেই এক রকে বসিয়াছিলেন, ঠাকুর তাঁহার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আগাইয়া চলিলেন। গিরিশের ইচ্ছা হইল, সঙ্গে যাব। কিন্তু অভিমান বাধা দিল। তখনও প্রভুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত আছেন, এমন সময় নারাণচন্দ্র সহাস্যে আসিল।

"অমৃতবরষী ভাবে কহিল তাঁহায়।
দেখিতে তাঁহারে ডাকিলেন প্রভু রায়॥
তিল নহে দেরি তেঁহ চলিল অমনি।
মহামন্ত্রে বিমোহিত যেইরূপ ফণী॥

বসু-ভবনে উপস্থিত গিরিশের মনে এক সমস্যা ছিল "গুরু কে?" ঠাকুর তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "গুরু কি, কেমন জান? যেমন কোটনা।

মিলাইয়া ইষ্ট—গুরু নাহি রহে আর।
তোমার হয়েছে গুরু, কি চিন্তা তোমার॥"

গিরিশের আর এক চিন্তা ছিল—তাঁহার মনের বাঁক যাইবে কবে? ঠাকুর অভয় দিয়া বলিলেন—

"অচিরে হইবে দূর চিন্তা কিছু নাই॥"

পুঁথির আর একটি আলেখ্য সমধিক চিত্তাকর্ষক। সেদিন নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনিতে ঠাকুর হাটখোলায় গিয়াছিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে যাত্রা-দর্শনে আগত ব্যক্তিরা যাত্রা ছাড়িয়া তাঁহাকে দেখিতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। যাত্রার পরিবর্তে তখন হরিনাম কীর্তন আরম্ভ হইল এবং শ্রীপ্রভু আসন হইতে উঠিয়া সমাধিস্থ হইলেন।

দেখিবারে গোলযোগে যাত্রা যায় প্রায় ভেঙ্গে,
ভক্তিমান গায়ক প্রধান।
আপনার দলে দলে সহ খোল করতালে
গায় যুগ্ম রাধাকৃষ্ণ নাম।
শুনিয়া যুগল নাম নিম্নদেশে ভগবান
নামিতে লাগিলা ক্রমে ক্রমে।

তখন ভক্তগণ তাঁহাকে পুনঃ আসনে বসাইলে যাত্রা আরম্ভ হইল। কিন্তু ভাবাবেশে তিনি আবার কৃষ্ণপ্রেমে গাঢ়তর নিমগ্ন এবং বিকলাঙ্গ হইলেন।

সেহেতু লইয়া তাঁয় সত্বর বাহিরে যায়
ভক্তগণে ভীত অতিশয়।
সেবাশুশ্রূষার পরে সুস্থ করি প্রভুবরে
পলাইল শকটারোহণে।
বাগবাজারেতে ধাম ভক্ত বসু বলরাম
ভাগ্যবান্ তাঁহার ভবনে॥

এই পর্যন্ত আমরা তিনখানি প্রধান গ্রন্থ অবলম্বনে বলরাম-মন্দিরে শ্রীপ্রভুর লীলা কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদন করিয়াছি। অন্যান্য গ্রন্থেও আরো কিছু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

শৃঙ্খলমুক্তি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

নব নব বন্ধনে
নিজেরে বাঁধিতে ভব সংসার সনে
তৃষা কামনায় শৃঙ্খল শুধু পরিয়াছি নিশিদিন
শতেকের কাছে খাতক হইয়া করিয়া কত না ঋণ।

শৃঙ্খলে আমি ভাবিনু অলঙ্কার
দিনে দিনে ঐ শৃঙ্খলই মোর হ'ল দুর্বহ ভার।
ভূষণ বলিয়া পরেছিনু যাহা হরিল তা মোর বল,
জীবনেব পথে আগাতে দিল না পায়ে বাঁধা শৃঙ্খল।

আসিতেছে আজ সুদূরের আহ্বান,
ছেড়ে যেতে চাই ছিঁড়ে যেতে চাই পঞ্জরে পড়ে টান।
জানি তুমি দেবে কঠোর আঘাত হানি
সব বন্ধন করিবে ছেদন হে প্রভু বজ্রপাণি।
শিথিল করিয়া দাও বন্ধন, দূর কর মায়া মোহ
করিতে শিখাও বন্দীরে বিদ্রোহ।

সব শৃঙ্খল আপনার হাতে ছিঁড়ে
সম্মুখে ভব-বৈতরণীর তীরে
দাঁড়াইতে যেন পারি
হে আমার কাণ্ডারী—
সেই বল মাগি জুড়ি মোর দুটি পাণি,
বিনা সাধনায় মিলে নাকো তাহা জানি।
তবে যে শুনেছি তোমার কৃপায় সবি সম্ভব হয়,
সেই কৃপা আমি—পাব না করুণাময়?

পথ কই?

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী

সহস্র বাধা বিঘ্ন ও প্রয়োজনের জটিলতার মধ্যে পড়িয়া আমাদের জীবনযাত্রার পথ আজ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। দিনের পর দিন নূতন সমস্যায় পড়িয়া—আদর্শ কি ভাবিয়া দেখিবার সময়ও পাইতেছি না। সর্বদা শুনিতে পাই আগাইতে হইবে। কিন্তু কোথায় যাইব? পথ কই?

পাশ্চাত্য রীতি-নীতির সহিত ভারতের সামাজিক জীবন মিলাইবার সার্থকতা কোথায়? তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবার বহু জিনিস আছে জানি, কিন্তু সামাজিক জীবনে নিজের ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াও তাহা লইতে পারা যায়। তাহাদের সাহস, স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রিয়তা, তাহাদের আত্মনির্ভরতা ও নারীজাতির প্রতি সম্মান, তাহাদের একতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা এ সমস্তই অনুকরণীয়; তাই বলিয়া—যথেচ্ছ বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও আনুষঙ্গিক সামাজিক জীবনযাত্রা গ্রহণ করিলে আমরা আমাদের ঐতিহ্য ও জাতীয় গৌরব হারাইব।

তাহাদের সদ্‌গুণরাশি আয়ত্ত করিয়া আমাদেরই পথে আমাদের আগাইতে হইবে। চরিত্র গঠিত হইলে মনোবল দৃঢ় হয়, মনোবল দৃঢ় হইলেই পথ চলিবার—অগ্রসর হইবার সামর্থ্য আসে। এ সকলের মূল হইতেছে সত্য ও স্বার্থ ত্যাগ। সত্যাশ্রয়ী না হইলে কি চরিত্রবল দৃঢ় হয়? শত শত বৎসরের পরাধীনতার চাপে ও অনুকরণের ফলে জাতির ঐক্যবোধ আজ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, স্বতন্ত্রভাবও বিলুপ্ত। তাহাকে স্বধর্মে ফিরাইতে হইলে বিবেকানন্দের মত নিঃস্বার্থ, নির্ভীক কর্মবীর চাই। সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মচারীই সকলকে আপন আদর্শে আকর্ষণ ও সংহত করিতে পারেন।

সমাজ-জীবন সুসংস্কৃত না হইলে জনসাধারণের চলার পথ সুগম হইবে না, পদে পদে তাহারা বিভ্রান্ত হইবে। ভারতের সমাজ চিরদিন ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে রাজচক্রবর্তীরও হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। প্রজানুরঞ্জক লোকপ্রিয় রাজাধিরাজ রামচন্দ্রকেও ধর্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইয়াছে; অপাপবিদ্ধা লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাদেবীকেও সমাজনীতির শাসনে বনবাসিনী হইতে হইয়াছে।

মহাপুরুষের প্রদর্শিত পথে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্বন্মণ্ডলীর দ্বারা সমাজ পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। ধনীর হাতে নয়, ব্যবসায়ীর হাতে নয়, রাজনীতি-বৃত্তিপরায়ণের হাতেও কোন ক্ষমতা থাকা উচিত নয়,—কারণ তাহাদের স্বার্থপূর্ণ একদেশী দৃষ্টির ইঙ্গিতে সকল মানব মিলিত হইতে পারে না। যাঁহারা অবনতমস্তকে সমাজনীতি মানিয়া চলিবেন—তাঁহাদেরই শাসনপ্রণালী জনসাধারণ মানিয়া চলে। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি পাতায় লিখিত আছে।

আমাদের গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতের বহুল প্রচার ও আলোচনা আজ বড়ই প্রয়োজন। শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও তাহার প্রতি আনুগত্য, সত্যপালন ও স্বধর্মরক্ষা-বিষয়ক অসংখ্য দৃষ্টান্ত সেখানেই আছে। প্রতি পল্লীর মধ্যে ১০।১২টি গৃহকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন সমবেত পাঠে বা আলোচনায় সকলের উপস্থিতি চাই, পল্লীর আস্থাভাজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিই পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন। ঘরে ঘরে আলোচনা সর্বদা সর্বত্র সম্ভব নয়। আদর্শ চরিত্র আলোচনার দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি ও পবিত্র চিন্তার খোরাক জুটিবে, মানসিক শক্তি সঞ্চিত হইয়া চরিত্রবল সুদৃঢ় করিবে।

যুব-সমাজ স্বার্থভোগের পঙ্কেই দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। জীবিকার জন্য স্কুল-কলেজের পরীক্ষা পাশ করাই ছাত্রদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মুখস্থ

করিয়াই হউক, নকল করিয়াই হউক বা যে কোন উপায়ে হউক ক্লাস প্রমোশন ও ডিগ্রি লাভ করিয়া যেন তেন প্রকারে একটি চাকরি সংগ্রহ করিতে পারিলেই সর্বসিদ্ধি লাভ হইল, তারপর গতানুগতিকতার স্রোতে ভাসিয়া চলা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তরুণেরা জনসেবার শিক্ষা না পাইলে জাতির জাগরণ কেমন করিয়া সম্ভব ? ধনী, বিদ্বান ও বলিষ্ঠ সকলে হয় না ; কিন্তু ইচ্ছা করিলে সচ্চরিত্র সেবক সকলেই হইতে পারে। সংসারে স্বার্থের তাড়নায় কতই ঘুরিয়া মরিতেছি। পঙ্কিল চিন্তায় অবিরত মানসিক কালিমায় মলিনতর হইতেছি। ক্ষণিক অবসরে একটু চিন্তাধারা যদি কোনও নিঃস্বার্থ মহৎ প্রচেষ্টায় ব্যয় করিতে পারি, তাহা হইলে সারাদিনের সমস্ত ক্লান্তি নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে, এবং শান্তি ও আনন্দলাভ হইবে।

আমরা ভাবিয়া দেখি না—জীবনের শেষ পরিণতি কোথায় ? সমস্ত দিনের মধ্যে সচ্চিন্তা ও সৎপ্রসঙ্গ কতটুকু করিলাম ? সংসার ও সমাজের সমস্ত দায়িত্ব প্রত্যেকের উপর নির্ভর করিতেছে। আদর্শ পিতা মাতা না হইলে সুসন্তান কেমন করিয়া জন্মিবে ? সুসন্তানের সমষ্টিই তো উন্নত জাতি। তাই আজ শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন দেশের পুণ্যভূমিতে দাঁড়াইয়া আমাদের আত্মবিচার ও আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা নিজেদের সংশোধন করিয়া চরিত্র উন্নত করিতে হইবে। সর্ব স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সন্তানদের জীবনগঠন করিতে হইবে, তাহারাই দেশের ভবিষ্যৎ ও আমাদের গৌরব।

ইংরেজের শাসনে ও অনুকরণে অভ্যস্ত হইয়া নিজেদের ঐতিহ্য ভুলিয়া খণ্ডিত হইতে হইতে আমরা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছি। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছি, ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি। কাহাকেও সাহায্য করিবার মত প্রবৃত্তি নাই, কাহারও সাহায্য পাইবার উপায় নাই। উদার অতিথিবৎসল ভারতের সাধারণ মানবসমাজ আত্মকেন্দ্রিক হইয়া আজ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

আজ আমরা পরশ্রীকাতর ও শ্রমবিমুখ, তাই আমাদের উত্তরাধিকারী সন্তানগণ উচ্ছৃঙ্খল। আমরা আত্মবিস্মৃত, তাই তাহারা বিপথগামী। নিজেদের জীবন গঠন করিতে পারি নাই, তাই ইচ্ছাসত্ত্বেও সন্তানদের সুনিয়ত ও চরিত্রবান করিতে পারি না। সৃষ্টি করিয়া পশু-পক্ষীও সন্তান পালন করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক। সন্তানকে জ্ঞান, বিবেক ও মনুষ্যত্বের সন্ধান দিয়া উন্নতজীবনের অধিকারী না করিলে জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিবার অর্থ কি ?

গীতা, ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের আদর্শ জীবন ও চরিত্রের আলোচনার দ্বারা আত্মবিচার করিয়া ধ্বংসোন্মুখ ব্যক্তিকে ও জাতিকে টানিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের অতীত জ্ঞানগরিমায় সমুজ্জ্বল, সেবা ও পরোপকারের দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। কত বলিব ? কি নাই ? দধীচির অস্থিদান, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যদান, রামচন্দ্রের সত্যপালন ও সীতার পবিত্রতা, কর্ণের কবচ কুণ্ডল দান, পাণ্ডবের ভ্রাতৃত্ব, এ সকল মহারত্নের অধিকারী আমাদের সন্তানগণ। সচ্চিন্তা কোনও প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত না হইলে আদর্শ কেমন করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিবে ? তাই সংঘবদ্ধ আলোচনা প্রয়োজন।

বহু বিলম্ব হইয়া গেলেও এখনও সময় আছে। জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হইয়াও আমরা যদি স্বার্থে ও ভোগে ডুবিয়া থাকি, তবে আমাদের সন্তানগণ মানুষ হইবে কেমন করিয়া ? পিতামাতার আদর্শ—তাহাদের জন্মগত সংস্কার ও অধিকার ; তাহা হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিলে আমরা কর্তব্যচ্যুত হইব, তাহারা আদর্শভ্রষ্ট হইবে। চরিত্র মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। উন্নত চরিত্র গঠিত হইলে আর পতনের ভয় নাই। অতএব আমাদের প্রত্যেক পিতামাতার কর্তব্য হইতেছে মহাজন-সেবিত উপায়ে নিজেদের

জীবন গঠিত করিয়া সন্তানের চরিত্র গঠন করা। শুধু বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়, আদর্শের উত্তরাধিকারী করিতে পারিলেই সন্তানধারণ সার্থক। মহাজন-প্রদর্শিত পথই পথ; সন্তানদের সেই পথ ধরাইয়া দিতে পারিলেই আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত, তাহাদেরও জন্ম এবং জীবন সার্থক।

তারাই তো মানব মহান

বেগম সুফিয়া কামাল

যাহাবা সাম্যেব গানে আনে প্রাণে চেতনার বাণী,
সত্যেব সেবায় যারা মুছে দেয় তুচ্ছতার গ্লানি
তারাই ত মানব মহান—
তাহাদের পুণ্য নামে এ পৃথিবী হয় তীর্থস্থান।
ভঙ্গুর মৃত্তিকা-পাত্রে হয় যবে অমৃত-সঞ্চয়
সে অমৃত-বিন্দু পানে যাহারা হইল মৃত্যুঞ্জয়—
তুচ্ছ করি দেহের বিলাস,
আত্মাব ঐশ্বর্যরাশি পুষ্পসম করিয়া বিকাশ
সুন্দরে সঁপিল যারা সে প্রেম-সুরভি,
তারাই তো কালজয়ী আনন্দ-অমৃত-স্বাদ লভি।
কালচক্র আবর্তিয়া কত যে কীর্তিরে করি লয়
বহিয়া চলিয়া গেছে, হেরিয়াছে অপূর্ব বিস্ময়।
সংসাবের সিন্ধু হতে হংস নভোচারী
উর্ধ্বে আরো উর্ধ্বে ওঠে অলৌকিক আনন্দ বিথারি।
তবু ও মর্ত্যের মায়া আর্ত ক্লিষ্ট ব্যথিতের লাগি
স্নেহার্তা জননী সম অহরহ রহিয়াছে জাগি,—
'সেবা-ধর্ম' বাণী করি দান
অযুত ভক্তেরে দেয় কর্মময় পথের সন্ধান।
বিগত শতাব্দী তবু আজও সেই মৃত্যুহীন প্রাণ
অযুত ভক্তের কণ্ঠে উঠিতেছে সেই নাম-গান।

আচার্য শঙ্করের শিক্ষাপদ্ধতি

অধ্যাপক শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য, এম্‌-এ, বি-টি

প্রাচীন ভারত শ্রদ্ধাভরে বেদের সনাতনত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়াছে। আরণ্যক যুগে উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন ঋষি-কর্তৃক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহর্ষি বাদরায়ণ শ্রুতিসিদ্ধান্ত যুক্তি অনুযায়ী সঙ্কলন করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। তিনি পূর্ববর্তী ঋষিগণের মত সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে বিভিন্ন মতের একটি সুদীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাতময় ইতিহাস রহিয়াছে। বৌদ্ধোত্তর যুগে ভগবান্ শঙ্করাচার্য বেদের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য এক নবজীবন-দর্শনের সূচনা করে।

নীতিপ্রধান বৌদ্ধধর্ম-প্লাবনের পরে জ্ঞানপ্রধান বেদান্তের ভিত্তিতে ভারতে বৈদিক ধর্মের নব-জাগরণ হয়। আচার্য শঙ্কর এই আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া অখণ্ড ভারত গঠন করিবার মহতী প্রচেষ্টা করেন। মৌলিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রস্থানত্রয়ের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা ভারতের ইতিহাসে তথা নিখিলমানব-সংস্কৃতিতে তিনি যুগান্তর আনয়ন করেন। আচার্য যুক্তি ও শ্রুতির প্রামাণ্য গ্রহণ করিয়া স্থির করিলেন যে একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য এবং জীব তত্ত্বতঃ ব্রহ্মই। জীব ও জগৎ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সত্য নহে। ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ এবং সর্ববিধ দ্বৈত-রহিত বিভু বস্তু। ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টদেবকে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিলে বা নিষ্কামভাবে কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখনই শুদ্ধচিত্ত সাধক তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন। সতত পরিবর্তনশীল সংসারের ধন-জন-যৌবনের ভোগবাসনা ত্যাগ করিলে নিত্যবস্তুর ধ্যানেই আত্ম-স্বরূপ লাভ হয়, এই আদর্শ প্রচার করিয়া আচার্য শংকর মানবজীবনকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার্য সর্ব জীবের ঐক্য উপলব্ধি করিলেন, জীবমাত্রের ব্রহ্মরূপতা ও একত্ব-বাদের নীতির ভিতরেই নিহিত রহিয়াছে—সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের সত্যতা। আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন দুইটি প্রাণীর মধ্যে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য কখনও দেখিতে পাই না; অথচ আমরা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানবের সমানাধিকারের কথা শুনিতে পাই। আচার্য শঙ্করের পারমার্থিক ঐক্যদৃষ্টির প্রতি বিশেষ প্রণিধান করিলে জীবের পারমার্থিক ঐক্য ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমানাধিকারের দাবির মধ্যে একটা যোগসূত্র পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যগত শঙ্কর বৌদ্ধধর্মপ্লাবিত উত্তরাপথে বৈদিক ধর্মপ্রচারে বিশেষ সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করেন। শঙ্কর দক্ষিণাপথে ভারতের সনাতন প্রথায় শিক্ষালাভ করেন। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি নূতনভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মপ্রচারে সচেষ্ট হন। শঙ্করের দুর্জয় প্রতিভাশক্তি ও তাঁহার বিভিন্নমতের প্রতি উদার ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, ভারতীয় মনে এক নব-ভাবের উদ্বোধন করিয়া নূতন এক জাতীয়তা-বোধের সূচনা করিল। শঙ্করের প্রবর্তিত আন্দোলনে তাহার পূর্ববর্তী দর্শন ও ধর্মমতগুলির এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইল।

শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত নবধর্মের জাগরণের সহিত প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের শিক্ষা-পদ্ধতিও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। বৌদ্ধযুগে বৈদিক শিক্ষানীতি ও বর্ণাশ্রমধর্ম গ্রামাঞ্চলে কোনরূপে টিকিয়া ছিল, শঙ্করাচার্য কর্তৃক বৈদান্তিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বৈদিক শিক্ষানীতিও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাগ্‌-বৌদ্ধযুগের শিক্ষাপদ্ধতির সহিত বৌদ্ধোত্তর যুগের

শিক্ষানীতির মূল কাঠামো একরূপ হইলেও কালের প্রভাব বৌদ্ধোত্তর যুগের শিক্ষানীতির উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য পরবর্তী যুগের শিক্ষানীতিতে প্রাচীন শিক্ষানীতি ও বৌদ্ধ শিক্ষানীতির একটি সমন্বয়-প্রচেষ্টা সূচিত হইয়াছে। শঙ্কর তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্য-প্রভায় ও বাগ্দক্ষতায় সমস্ত ভারতে বৈদান্তিক ধর্ম প্রবর্তন করিয়া ভারতের চতুঃসীমায় চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার চারজন সন্ন্যাসী শিষ্যের উপর মঠগুলির পরিচালনা-ভার অর্পিত হয়। তিনি দক্ষিণ ভারতে বৃহত্তম 'শৃঙ্গেরী' মঠ, উত্তর ভারতে হিমালয়ে 'যোশী' মঠ, পশ্চিম ভারতে 'সারদা' মঠ এবং পূর্ব ভারতে 'গোবর্ধন' মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় ভারতে বৌদ্ধমত ছাড়া শৈব বৈষ্ণব এবং তান্ত্রিক মতও প্রচলিত ছিল। এই বিভিন্ন বৈদিক মতগুলিকে তিনি একটি অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। প্রত্যেকটি উপাসক সম্প্রদায় যে সম-মর্যাদা-সম্পন্ন এবং পরমতত্ত্বলাভে প্রত্যেকটি উপাসনামতেরই যে প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা তিনি প্রচার করিয়া শৈব বৈষ্ণব শাক্ত গাণপত্য সৌর প্রভৃতি পঞ্চদেবতা-উপাসক সম্প্রদায়ের মিলন প্রচেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য-দেবতাসমূহ যে একই পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, শঙ্কর তাহাই প্রমাণ করেন। প্রতিটি উপাসক-সম্প্রদায়ই যে সম-মর্যাদা-সম্পন্ন শঙ্কর তাহাও স্বীকার করেন। শঙ্করাচার্যের এই সমন্বয়-দৃষ্টি বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠিতে বিভক্ত ভারত-ভূমিতে একটি মহান ভারতীয় বোধ ও ঐক্যের সূচনা করে। শংকরই বর্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্মের ভিত্তি রচনা করিয়া যান। এই উদার সর্বভারতীয় দৃষ্টি অনুসরণ না করিলে মধ্যযুগের ইতিহাসের ধারা অন্যরূপ হইত। হিন্দু ভারত হয়তো ইসলামের আক্রমণে পারস্য প্রভৃতি দেশের মতো সম্পূর্ণরূপে স্বধর্ম হারাইয়া ফেলিত।

শঙ্করাচার্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শূদ্রের বেদপাঠের অধিকার, সাধারণভাবে স্বীকৃত না হইলেও 'মোক্ষধর্মে' শূদ্রের অধিকার তিনি স্বীকার করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও সুললিত শাস্ত্রের মাধ্যমে শূদ্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিত। শঙ্করাচার্য মনুর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮৭ সূত্র উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে শূদ্রের ভজনা উপবাস পূজার্চনাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ হয়। এই উপায়গুলির সাথে বর্ণাশ্রমধর্মের কোন প্রকার সংস্রব নাই, মানুষ মাত্রেই এই সকল সাধনা করিয়া আত্মোন্নতি করিতে পারে। মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির অন্তর্গত আদর্শ-চরিত্র-বহুল আখ্যানগুলি, শূদ্রের জ্ঞানভক্তিলাভের সহায়ক। পরবর্তী যুগে রামানুজাচার্য শূদ্রের মোক্ষধর্মে অধিকার আরও ব্যাপকভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠে অনুসন্ধান করিলে শঙ্করের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি সম্বন্ধে নূতন জ্ঞানলাভ করা যায়। এই যুগের শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধে জ্ঞান—কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের কাব্য হইতেও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আচার্য শঙ্কর তাঁহার প্রচার-কার্য সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই করিয়াছেন। ইহাতে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং নিখিল ভারতীয় একত্ব-বোধ বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষায় দর্শনের চরমতত্ত্ব প্রকাশিত না হওয়ায় ঐ ভাষাগুলি বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য কাব্য ও পুরাণের পথ ধরিয়াছে। শঙ্করবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনে বর্ণাশ্রমধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চবর্ণ দ্বিজ-শ্রেণীসমূহের ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমে শিক্ষা—ধর্মের অঙ্গস্বরূপে গৃহীত হয়। প্রাচীন যুগের যজ্ঞ-প্রথা, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আবির্ভাবে লুপ্ত হইয়া যায়। শঙ্কর-পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণগণ শিক্ষাদান-বৃত্তি গ্রহণ করেন; অধ্যয়ন ও অধ্যাপন পরবর্তী যুগের

ব্রাহ্মণগণের দৈনন্দিন এবং আবশ্যক কর্মের মধ্যে নির্ধারিত হয়।

বর্ণাশ্রমের উর্ধ্বে আচার্য শঙ্কর মোক্ষধর্ম ও সন্ন্যাসধর্মের বিশেষ প্রচার করেন। বর্তমান যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা লক (Locke) এর ভাবপ্রভাবে সম্মোহিত। "মন পরিষ্কার শ্লেট" এই ভাব গ্রহণ করিয়া বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞানদান-বিধির প্রাধান্য হইয়াছে। তাই দিনের পর দিন পাঠ্য তালিকায় ছাত্রের মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। মনীষী কাণ্ট (Kant) মনের সৃষ্টিমূলক স্বভাব স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষাসূচী (Curriculum)-এর প্রতি লক্ষ্য করিলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শিক্ষাবিদের অবচেতন মনে এখনও সেই লক্-এর 'ভূত' বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে। কিন্তু আচার্য শঙ্কর জ্ঞানের পরিসমাপ্তি যে "মোক্ষে," তাহা অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি নহে—পরন্তু প্রাপ্ত বস্তুর উপলব্ধি, তাহা জানিতেন বলিয়াই তিনি তথ্যের জন্য ব্যস্ত না হইয়া চতুরাশ্রমের অন্তর্গত ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দেহ মনের সংযম শৃঙ্খলা ও চরিত্র গঠনের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন। অনেকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে বর্তমান যুগের ছাত্রাবস্থার সহিত এক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বর্তমান যুগের ন্যায় ছাত্রদিগকে তথ্য প্রদান অপেক্ষা তখন তাহাদের চরিত্র ও মানসিক গঠনের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইত, যাহাতে শিক্ষার্থী তাহার অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে উপলব্ধি করে। শঙ্করের মতে চরম জ্ঞান ভিতরে—বাহিরে নহে, এ জন্য জ্ঞানোপদেশের পূর্বে শিক্ষার্থীর চরিত্র সংগঠন করা হইত—যাহাতে সে তাহার অন্তরেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। বহির্জ্ঞানের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়া আত্মজ্ঞানের পারমার্থিক নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে—এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতিতে। শঙ্কর-প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি পরবর্তী ভারতের শিক্ষাধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। হিন্দু ভারত ধর্মকে জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে—তাই শঙ্কর-প্রবর্তিত শিক্ষাধারাই হিন্দু ভারতকে বহুদিন স্বধর্মনিষ্ঠ রাখিয়া তাহার জাতীয় জীবন কৃষ্টি ও ধর্ম রক্ষা করিয়াছে।

ওই সুন্দর আসে!

শ্রীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যভারতী

শালবনে কার আগমনে মন
পুলকিত অনুরাগে,
হৃদয়-বীণার তারে তারে কোন্
মীড়-মূর্ছনা জাগে।

উষার উদার গগন-ললাটে
অরুণ-কিরণ-রাগ—
আম্র-মুকুলে, পলাশে, শিমুলে,
অশোকে ছড়ায় ফাগ।

পিয়াল-কুঞ্জে, মহুয়ার বনে
ও কে সুন্দর আসে?
প্রাণের মধুর গন্ধ ছড়ায়ে
বন-কুসুমের বাসে।

ধরণীর এই প্রাণ-প্রাচুর্যে
রূপ-রস-মধু-গন্ধে,
উলসিছে প্রাণ মধুর লগ্নে
ভাষা-ছন্দের দ্বন্দ্বে।

রবীন্দ্রকাব্যে দুঃখতত্ত্ব

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দুঃখতত্ত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কবিমানসের আনন্দ-বৈচিত্র্যের অন্তরালে রহিয়াছে বিরাট ও গভীর দুঃখের অনুভূতি, যাহা তাঁহার কাব্যে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। এই দুঃখবোধের উৎস—তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ও অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের মত ভাগ্যবান পুরুষ পৃথিবীতে কমই জন্মিয়াছেন; আবার তাঁহার মত ভাগ্যহত ব্যক্তিও অতিশয় বিরল। বহুদিক হইতেই তিনি ভাগ্যবান, কিন্তু সুদীর্ঘ জীবনে তিনি যে কত কঠোর দুঃখদাহন পাইয়াছেন তাহারও ইয়ত্তা নাই। তাহার বিশ্ববিশ্রুত বিপুল খ্যাতি, তথাপি তাঁহাকে কত গঞ্জনা বেদনা পাইতে হইয়াছিল। মর্মান্তিক মৃত্যুশোক তাঁহাকে বারংবার সহিতে হইয়াছে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, নিকটতম আত্মীয়স্বজন বন্ধু—একে একে তিনি হারাইয়াছেন। তারপর আসে নানা ব্যর্থতা, মানুষের কত রকমের কপটতা, কৃতঘ্নতা, নির্মম নিন্দা, গ্লানি, সব রকমের দুঃখই তিনি পাইয়াছিলেন। কোন দুঃখই তাঁহার জীবনে বাদ যায় নাই।

রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই দুঃখকে দেখিয়াছেন সৃষ্টির মূলে। শিশুকাল হইতেই উপনিষদের মন্ত্র নানাভাবে তাঁহার চিত্তকে অনুরণিত করে। তিনি বিশ্বাস করিতেন বিশ্বস্রষ্টা আনন্দময়। বিশ্ব জগৎ সেই স্রষ্টার আনন্দেরই প্রকাশ। জীব-জগতে, প্রকৃতির ফুলে ফলে পল্লবে সর্বত্রই সেই অমৃতধারা প্রবাহিত। বহুর মধ্যে সেই আনন্দময় নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আনন্দতত্ত্বকে স্বীকার করিয়াও দুঃখকে দেখিয়াছেন সৃষ্টির মূলে। তিনি বলেন "দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টিতত্ত্ব একেবারে এক সঙ্গে বাঁধা। কারণ অপূর্ণতাই ত দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।" তারপর তিনি দুঃখতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'অপূর্ণের মধ্য দিয়া না হইলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া? জগৎ অপূর্ণ বলিয়া তাহা চঞ্চল, মানব সমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, চেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম। অতএব মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা, কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে। ...সেই জন্যেই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেই জন্যেই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে।' সুতরাং দুঃখ মায়া বা বিকার নয়। দুঃখ সৃষ্টির অপূর্ণতারই অপরিহার্য অঙ্গ, সৃষ্টির অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রকাশ করিবার জন্য, পূর্ণের অর্থকে প্রকাশ করিবার জন্য এ দুঃখের প্রয়োজন। সৃষ্টি-লীলার সার্থকতাকে প্রকাশ করিতে এ দুঃখের প্রয়োজন।

বিশ্বস্রষ্টার আনন্দের প্রকাশ দুঃখের মধ্য দিয়া। মানবজীবনেও আনন্দের অভিব্যক্তি দুঃখের অভিঘাতে। মানুষের প্রাণের মধ্যে আনন্দকে গোচর করিয়া ধরিয়াছে দুঃখই। তাই রবীন্দ্রনাথ বার বার এই সহজ সত্যের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, 'মিলনের আনন্দ অর্থহীন হ'ত যদি বিরহের দুঃখ না থাকত; মুক্তির আনন্দ নিষ্প্রভ হ'ত যদি বন্ধনের বেদনা না থাকত; অরূপের বার্তা ও অসীমের আকৃতি ব্যর্থ হ'ত যদি রূপের ও সীমার বেদনার মধ্যে তারা ধরা না দিত।'

কবির দুঃখতত্ত্বকে অসামান্য সৌন্দর্যমণ্ডিত

করিয়াছে দুঃখের কল্যাণতম মহিমা। বহুরূপে ও বহুভাবে দুঃখের এই কল্যাণরূপ রবীন্দ্রকাব্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বার বার তিনি বলিয়াছেন, 'মানুষের আত্মা চিন্ময়, যুগে যুগে তার অভিসার অনন্তের পানে সত্য শিব ও অদ্বৈতের পানে। সে দুর্গম পথে মানুষের শ্রেষ্ঠ পাথেয়—তার দুঃখ।' কবি আরও বলিয়াছেন আত্মাকে উপলব্ধি করবার, ভূমাকে স্পর্শ করবার বন্ধুর পথ—দুঃখের মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে, তপস্যার মধ্যে। বলাকার একটি কবিতায় তিনি এই তপস্যার অপূর্ব প্রকাশ দেখাইয়াছেন—

'কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।'

'মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত, বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ। তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ। ...দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ যাহা কিছু নির্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি, সুখের দ্বারা আরামের দ্বারা নয়।' দুঃখের এই কল্যাণতম রূপের প্রকাশ কবি করিয়াছেন তাঁহার গীতাঞ্জলির গানে, 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান।'

'এই করেছ ভালো নিঠুর, এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জ্বালো।'

—এইরূপ বহু কবিতায় ও গানে।

আর একটি অনুভূতি কবির কাব্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, কবির ভাষাতেই বলা যাক: 'মানুষ সত্য পদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়া তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া পায়। আর যত কিছু ধন, সে ত তাহার নহে—সে সমস্ত বিশ্বেশ্বরের। কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিতান্তই আপনার। আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয়, তবে কি দিব, কি দিতে পারি? তাঁহারই ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই—আমাদের একটি মাত্র যে আপনার ধন—দুঃখ ধন আছে, তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়।'

দুঃখের এই কল্যাণতম মহত্তর রূপ যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির কল্পনায়, তাহা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে—দুঃখের অনুভূতিপূর্ণ রবীন্দ্রকাব্যে, তেমনই আবার মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে রুদ্ররূপ কল্পনায়, মানব ও বিশ্বজীবনের বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে। কবি দেখিয়াছেন দুঃখকে 'যেখানে সে আপনার বহ্নির তাপে, বজ্রের আঘাতে কত জাতি, কত রাজ্য, কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে—যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ মারী, অন্যায় অত্যাচার তাহার সহায়......।' কিন্তু এখানেও দেখি দুঃখের কল্যাণরূপ, পাপ-কল্পনা এখনও দুঃখতত্ত্বে স্থান পায় নাই। দুঃখ ও পাপের বাস্তব রূপ সুস্পষ্ট আমরা দেখিতে পাই বিগত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে লিখিত "পাপের মার্জনা" নিবন্ধটিতে। বিশ্বব্যাপী হিংসা ও রক্তপ্লাবনের গভীর বেদনা এই প্রবন্ধের প্রতি ছত্রে ছত্রে। পাপের গ্লানি ও কলুষ আজ প্রথম স্তিমিত করিয়াছে দুঃখের দীপ্ত মূর্তি। সমগ্র মানবের করুণ প্রার্থনার মধ্য দিয়া কবির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দুঃখ ও পাপের চিত্র আঁকিলেন:

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে।...
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষোভ
জাতি-অভিমান।

মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

আবার 'পরিশেষের' "প্রশ্ন" কবিতাটিতেও ভীরুর ভীরুতা, প্রবলের উদ্ধত অন্যায় আচরণ, লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, মানবের দেবতার বহু অসম্মানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন :

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

সেঁজুতি-কাব্যে "প্রশ্নোত্তর" কবিতায়ও পাই :

মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে
ঘটেছে তা বারে বারে।······

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে মানুষের শ্রেষ্ঠ আত্মিক সম্পদ ও ঐশ্বর্য বলিয়া মানিয়াছেন, দুঃখের কল্যাণরূপ দেখিয়াছেন। তারপর ধীরে ধীরে দুঃখের নগ্ন কদর্য রূপ, পাপের কুৎসিত রূপ তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইল। কিন্তু পাপকে স্বীকার করিয়াও সত্যের পূর্ণতা ছিল তাঁহার কামনা, পূর্ণতর সত্যের ও অমৃতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি চির নিবদ্ধ।

মৃত্যুর অন্তরে বসি অমৃত না পাই যদি খুঁজে
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়, আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
অহঙ্কার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে, অন্তরের কি আশ্বাস রবে,
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত ?

কবির শেষ জীবনের আশ্বাস-বাণী—

······তবুও শ্রবণ বধির করিনি কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়াছে সুর আনি ;
পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু,
চির দিবসের শান্ত শিবের বাণী।

কবির শেষ বাণী, অন্তিম জীবন-দর্শনের বিরাট অভিব্যক্তি—নবজাতক-কাব্যে 'জয়ধ্বনি' কবিতার শেষাংশে :

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ,
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু,
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা—
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহা-গহ্বরের ভাঙা-চোরা রেখাগুলো তারে
পারেনি বিদ্রূপ করিবারে,
যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষ কাব্যে আজ তারে দিব জয়ধ্বনি।

দুখ হবে মোর মাথার মানিক
সাথে যদি দাও ভকতি।

—রবীন্দ্রনাথ।

বেদান্তে কাহার অধিকার ?

৺শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

[স্বামি-শিষ্য-সংবাদ-রচয়িতা]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে নিখিল ধর্মমতের সমন্বয় পুনঃপ্রকটিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে বৈদান্তিক সন্ন্যাসিগণের অভ্যুত্থান হইয়াছে, সনাতন ধর্মে নবজাগরণের প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইতেছে; বিবেক-বৈরাগ্যবান্ মেধাবী প্রচারকগণ বেদান্তবিজ্ঞান-বিস্তারকল্পে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই শুভ মুহূর্তে বঙ্গদেশও বেদান্তের ধর্ম বুঝিতে অবশ্যই যত্ন করিবে। এই বঙ্গভূমি পবিত্র করিতে—বঙ্গবাসীর মোহনিদ্রার অবসান করিতে—ভগবান্ শঙ্কর যেন বেদান্তের মহিমা পুনঃ প্রচার করিতে নরশরীরে স্বামী বিবেকানন্দরূপে আবার আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যদি এই শুভমুহূর্তে আমরা শ্রীস্বামীজী-প্রচারিত বেদান্ত-ধর্মের নবীনত্ব উপলব্ধি করিতে না পারি—তবে ব্যক্তিগত, সমাজগত ও সর্ববিধ অকল্যাণ আসন্ন। ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের সারমর্ম আত্ম-বিশ্বাস। আত্মসংবিৎহারা ভারতবাসী—আমরা আমাদের স্বাভাবিক আত্মশ্রদ্ধা হারাইয়া বহুকাল যাবৎ জগতে ধিক্কৃত ও ঘৃণিতপ্রায় দাসজীবন অতিবাহিত করিয়াছি। দাসসুলভ হিংসা-দ্বেষ সমাজের মেরু-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। আত্মপ্রত্যয়ী পাশ্চাত্ত্য দেশ আমাদের উপর অতুল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আত্মপ্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান বেদান্ত-শাস্ত্র যে দেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, সে দেশে ক্লীবতা গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। এই মহামোহ ও ক্লীবতার নিধনসাধনে বেদান্তমূর্তি ভগবান আবার নরদেহে আবির্ভূত হইয়াছেন। আত্মপ্রত্যয়ের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা—জড়তা ও ক্লীবতা দূরীকরণ—সত্য সংযম ও তপস্যা-সাধন—ইহাই নবযুগযজ্ঞের বিধি-বিধান। জীবন ক্ষণস্থায়ী—মহাকালের তুলনায় এক নিমেষও নহে। ব্যক্তিগত, সমাজগত, দেশগত ও জগদ্-ব্যাপী ওজঃশক্তিসঞ্চারে বেদান্তশাস্ত্রের ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন আর কোন শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবের বিবেক বৈরাগ্য উৎপাদন দ্বারা—স্বার্থে যে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও পরার্থে যে নিষ্কাম কর্মপ্রবণতা উৎপন্ন হয়—তাহা জীবহিত-চিকীর্ষায় অমৃত-নিস্যন্দিনী গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় কেবলি পরার্থে প্রবাহিতা। আমরা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী হইলেও আনুষঙ্গিক যোগকর্ম-ভক্তি-তত্ত্বের সামঞ্জস্য-বিধানে যত্নশীল।

বেদান্ত বুঝিবার পূর্বে অন্যান্য দার্শনিক মতেরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানসংগ্রহ আবশ্যক। এইজন্য উপক্রমণিকায় আমরা এই মূলতত্ত্বগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ঋগাদি ভেদে ত্রিধা এবং যজ্ঞার্থে চতুর্ধা সংকলিত বেদ আবার দুই প্রস্থানে প্রবিভক্ত। সংহিতা-ভাগে স্তোত্রমন্ত্রাদি, ব্রাহ্মণভাগে তাহাদেরই প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। উভয় ভাগের শেষ অধ্যায়গুলি যাহা আরণ্যক বা উপনিষদ্ বলিয়া কথিত হয় তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের ও উপাসনার উপদেশাদি বর্ণিত আছে। প্রতি বেদের অন্তভাগে ব্রহ্মজ্ঞানমূলক উপদেশ থাকায় উহা বেদান্ত শাস্ত্র বলিয়া কথিত। উপনিষদ্‌ই বেদান্ত।

ব্রহ্ম ও আত্মা এতদুভয়ের ঐক্য-সাক্ষাৎকার-বিষয়ক প্রমাণাত্মক শাস্ত্রের নাম 'উপনিষদ্'। যাহার অনুশীলন দ্বারা অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া অতি নিকটস্থ অন্তরাত্মাই স্বরূপব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত হয়—তাদৃশ ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ্। উল্লিখিত প্রমাণের অনুকূল বলিয়া শারীরকসূত্রাদিও বেদান্ত বলিয়া কীর্তিত।

যে সকল উপনিষদ্ অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্র রচিত

হইয়াছে তন্মধ্যে দশোপনিষদ্‌ই প্রধান। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের উল্লেখ থাকিলেও নিম্নলিখিত দশখানি উপনিষদ্‌ই প্রধান বলিয়া অবলম্বিত হয়: (১) ঈশ (২) কেন (৩) কঠ (৪) প্রশ্ন (৫) মুণ্ডক (৬) মাণ্ডুক্য (৭) তৈত্তিরীয় (৮) ঐতরেয় (৯) ছান্দোগ্য এবং (১০) বৃহদারণ্যক—এই দশোপনিষদের উপর প্রধানতঃ ভিত্তিস্থাপন করিয়াই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদান্ত-সূত্রের পরিপাটি উত্তুঙ্গ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন, শঙ্করভাষ্য পড়িলে ইহাই বোধ হয়। এই বেদান্ত-সূত্রে উপনিষদ্-উপবনে সংগৃহীত ফুটন্ত কুসুমের মালিকা—মহর্ষি বেদব্যাস যেন অতি সন্তর্পণে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষ্য, টীকা, বৃত্তি, বার্তিক টিপ্পনীতে ইহা সমাবৃত হইলেও, ব্রহ্মসূত্রমালায় চমৎকার রচনানৈপুণ্য ও সুষ্ঠু সিদ্ধান্তগুলি অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

শঙ্করাচার্যের পূর্বেও উপবর্ষ ও বোধায়ন মুনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। রামানুজাচার্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে বোধায়ন মুনির মত উদ্ধৃত করিয়া তৎকথিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। উপবর্ষ মুনি পাণিনির গুরু বলিয়া কথিত হন; এবং তিনিও দ্বৈতাদ্বৈত-মতের সমর্থক বলিয়া অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের পরবর্তী রামানুজ, মধ্বাচার্য বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শুনা যায় ইদানীন্তন কালে রাজা রামমোহন রায়ও ব্রহ্মসূত্রের একখানি ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের গুরু ও প্রবর্তক শ্রীশঙ্করাচার্য এই ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন তাহা 'শারীরক' ভাষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। শরীর শব্দ 'শৄ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'শৄ' ধাতুর অর্থ শীর্ণ হওয়া। যাহা ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া অন্তে শীর্ণ হইয়া যায় তাহার নাম শরীর। তদুত্তর তুচ্ছার্থে 'ক' প্রত্যয় যোগে 'শরীরক' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। 'তত্র ভব' ইত্যর্থে 'শারীরক' ইহাদ্বারা ভাষ্যকার এই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, হে জীব! যে দেহ অবলম্বনে তুমি 'আমি আমি' করিয়া বেড়াইতেছ—ইহা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ-জ্বালায় প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতেছে; এইজন্য এই শরীর অতি তুচ্ছ পদার্থ। এই মানব-শরীর লাভ করিয়া তুমি আত্মজ্ঞানলাভে কৃতপ্রযত্ন হও; নতুবা জন্মমৃত্যুর দুঃখময় পথে তোমাকে বারংবার পরিভ্রমণ করিতে হইবে।

ভারতীয় প্রতি দর্শনেই চারিটি অনুবন্ধ দৃষ্ট হয়। সে অনুবন্ধগুলির নাম (১) অধিকারী (২) বিষয় (৩) সম্বন্ধ (৪) এবং প্রয়োজন। কঠোপনিষদ্ ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন:—"এবমুপনিষন্নির্বচনেনৈব বিশিষ্টোঽধিকারী বিদ্যায়ামুক্তঃ। বিষয়শ্চ বিশিষ্ট উক্তো বিদ্যায়াঃ পরং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মভূতম্। প্রয়োজনঞ্চাস্যা উপনিষদ আত্যন্তিকী সংসারনিবৃত্তির্ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণা। সম্বন্ধশ্চৈবম্ভূতপ্রয়োজনেনোক্তঃ।" অর্থাৎ মুমুক্ষুই এই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। সর্বভূতের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মই উপনিষদের বিষয়। অত্যন্ত সংসার-নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ইহার প্রয়োজন; আর ঐ প্রয়োজনের সহিত উপনিষদের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকত্বই সম্বন্ধ।

অতি-দুরবগাহ ব্রহ্মতত্ত্বে যে সে লোক প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ ব্রহ্মতত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইলে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মপুরঃসর সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হওয়া চাই; মুক্তির তীব্র ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তিই বেদান্ত-সাধনার অধিকারী। সে—যে জাতি, যে সমাজ, যে শাস্ত্রানুশাসন ও যে বিভিন্ন আচারাদি-সম্পন্ন বর্ণাশ্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুযায়ী অনুশাসন মানিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম করিয়া চলিলে প্রত্যেকেই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইতে পারেন; এবং তার পরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়। বেদান্তে দেখা যায় ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকেরই বেদবিদ্যাধিকার আছে।

সমাজ ও স্মৃতিশাসন কালচক্রে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া যায়—ইতিহাসই তাহার প্রমাণ।

গীতামুখে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং"। পরাগতি অর্থে ব্রহ্মজ্ঞতা। ভাষ্যকারের অভ্যুদয়কালে সমাজে শূদ্রাদির অনধিকারিত্ব সূচিত হইলেও তাহা ইদানীন্তন সমাজে প্রযোজ্য কি না বিবেচনার বিষয়। ইতিহাস পুরাণ ও জনশ্রুতি এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, সকল জাতির মধ্যেই মহা মহা ধর্মবীর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছে। যদি এরূপই হয়, তবে বলিতে হইবে—গণ্ডীবদ্ধ অধিকারবাদ সর্বকালে সমানভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। বেদান্তশাস্ত্রেও দৃষ্ট হয় নিতান্ত নির্মলস্বভাব হইলেই তাহার ব্রহ্মবিবিদিষা জন্মে। নির্মলস্বভাবত্বলাভ নানাপথে জন্মাইতে পারে। একদিন স্বামীজী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "অধিকারীবাদের বিতণ্ডায় অনর্থক শক্তিক্ষয় না করে এই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শুনাতে লেগে যা। দেখবি, হয়তো সমাজের অতি নিম্নস্তর থেকেও মহা মহা বীরের অভ্যুত্থান হবে।"

শংকরাচার্য-জীবন-পরিক্রমা

'আনন্দ'

সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে—করুণাবতার ভগবান অমিতাভ বুদ্ধ তাহার সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া মহাপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন। ভিক্ষু ভিক্ষুণী সংঘ আরামে দেশ ভরিয়া গিয়াছে, মহারাজ অশোক আসিয়া প্রচারক ও শিলালিপি সহায়ে ভগবান তথাগতের বাণী চতুর্দিকে বিকীরণ করিয়াছেন। তাহার পরও কতদিন কাটিয়া গেল। কাল-প্রভাবে অমিতাভের অমিত আভাও দূর দিগন্তে ম্লান হইতে লাগিল; ত্যাগ ও অহিংসার উচ্চ আদর্শ ধরিতে না পারিয়া জনসাধারণ বুদ্ধবাণীর বিকৃত অর্থ করিতে লাগিল। সারা দেশ—বৈদিক ও বৌদ্ধ, উভয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া—যেন 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হইয়া—কিম্ভূতকিমাকার কদাচার অনাচারের আবর্জনাস্তূপে পরিণত হইল!

* * *

তখনও ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটি স্তিমিত প্রদীপ-শিখা জ্বলিতেছিল! মালাবর প্রদেশের কালাডি গ্রামে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ-বংশে শিবগুরু নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; এই বংশে প্রাচীন বেদাচার সযত্নে রক্ষিত ছিল। শিবগুরু-পত্নী বিশিষ্টাদেবীও স্বামীর সহিত জপতপেই দিন কাটাইতেন। সন্তানসন্ততি না হওয়ায় এই দিব্যদম্পতী পুত্রলাভের জন্য শিবের আরাধনা করেন। আশুতোষ সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'কিরূপ পুত্র চাও?' পিতা জ্ঞানী পুত্র চাহিলেন, মাতা পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করেন। শিব বলেন, 'দুই প্রার্থনা একসঙ্গে পূর্ণ হইবে না।' মূর্খ দীর্ঘায়ু পুত্র অপেক্ষা জ্ঞানী অল্পায়ু পুত্রই সর্বাংশে শ্রেয়—পত্নীকে বুঝাইয়া শিবগুরু তাহাই প্রার্থনা করিলেন। ৬০৮ শকাব্দ (৬৮৬ খৃঃ) ১২ই বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সেই আকাঙ্ক্ষিত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। শিব-বরে পুত্র হইয়াছে, তাই পিতামাতা নাম রাখিলেন শংকর। শৈশব হইতেই শংকরের অলৌকিক প্রতিভা সকলকে মুগ্ধ করিত। অতি অল্প বয়সেই বালক কথাবার্তা তো শিখিলই, উপরন্তু—পিতামাতার মুখে পুরাণের গল্প শুনিয়া অবিকল পুনরাবৃত্তি করিতে পারিত। শ্রুতিধরত্ব ছিল তাহার জন্মগত গুণ।

শিবগুরু শুধু এইটুকু দেখিয়াই চলিয়া গেলেন। পিতৃহীন বালককে বিশিষ্টাদেবী যথাসাধ্য মানুষ

করিতে লাগিলেন। বংশের রীতি-অনুসারে পঞ্চম বর্ষে উপনয়নের পর বালক বেদপাঠের জন্ম গুরুগৃহে প্রেরিত হইল। গুরু বাল-শংকরের অসামান্ত মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন, অতি অল্প সময়ে শংকর বেদবেদাঙ্গ পাঠ সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিলেন। চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে, সাত বৎসরের বালক অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছে—দেখিবার জন্ম দলে দলে লোক আসিতে লাগিল—কেহ কৌতূহলী হইয়া, কেহ বিদ্যা পরীক্ষা করিতে, কেহ বা ভক্তির অর্ঘ্য লইয়া বালকের কাছে শাস্ত্রার্থ শিখিতে।

কিন্তু একদিন দুঃখের তমসাচ্ছন্ন ছায়া আসিয়া বিশিষ্টাদেবীর জ্যোতির্ময় কুটিরখানি ছাইয়া ফেলিল। শংকরের অপূর্ব প্রতিভার কথা শুনিয়া কয়েকজন জ্যোতিবিদ্ আসিয়া বালকের কোষ্ঠী দেখিতে চাহিলেন, মাতাও এরূপ পুত্রের ভবিষ্যৎ জানিবার আগ্রহে জন্মপত্রিকা বাহির করিয়া দিলেন। জ্যোতির্বিদ্‌গণ মহা উৎসাহে গণনা করিতেছেন, বলিতেছেন, এমন রাশি-নক্ষত্রের যোগাযোগ মানুষের ভাগ্যে ঘটে না। মাতাও উৎফুল্লা। সহসা পণ্ডিতগণ বিমর্ষ ও গম্ভীর হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন। মাতৃহৃদয় ভয়ে ভাবনায় কাঁপিয়া উঠিল। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর জ্যোতিষীরা ভবিতব্য প্রকাশ করিলেন—শংকরের আয়ু মাত্র আট বৎসর, তবে তপস্তায় আরো আট বৎসর বাড়িতে পারে!

যাহার মৃত্যু এত সন্নিকট—তাহার ও তাহার মাতার মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। শংকরও শাস্ত্রাদিপাঠে জানিয়াছেন, আত্মজ্ঞান লাভ না করিয়া দেহত্যাগ—অশেষ দুঃখের হেতু, এরূপ জীবন বৃথা—বিড়ম্বনা। অতএব সন্ন্যাসের সৎসংকল্প লইয়া বাকী জীবনটুকু তপস্তায় কাটাইতে পারিলেই সর্ববিধ কল্যাণ! একদিকে মৃত্যু, অপরদিকে সন্ন্যাস—আর মধ্যে দারুণ উদ্বেগে মাতাপুত্রের দিন কাটিতে লাগিল।

এমন সময়—শংকর একদিন স্নানার্থে নদীতে নামিয়াছেন—এক কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার পা কামড়াইয়া ধরিল, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, —কিন্তু সাহস করিয়া কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে আগাইয়া অসিল না, বিমূঢ়া জননী আসিয়া নিমজ্জমান মুমূর্ষু পুত্রকে দেখিয়া ভাবিলেন—এইভাবেই বুঝি জ্যোতিষীদের গণনার ফল ফলিবে। শংকর তখনও হাত তুলিয়া চীৎকার করিতেছেন—'মা সন্ন্যাসের অনুমতি দাও, অনুমতি দাও।' আর ভাবিবার সময় ও সামর্থ্য নাই, মাতা অনুমতি দিয়া মূর্ছাপন্না হইয়া পড়িয়া গেলেন!

এদিকে শংকর মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবামাত্র কুম্ভীর তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। এ যেন সংসার-মায়া—সন্ন্যাসমন্ত্র স্মরণমাত্র বিদূরিত হইল! কুম্ভীরগ্রাসমুক্ত শংকর তীরে উঠিয়া সেবাশুশ্রূষা করিয়া জননীর মূর্ছাভঙ্গ করিলেন। বিশিষ্টা দেবী পুনরায় পুত্রমুখ দেখিয়া নবজীবন ফিরিয়া পাইলেন, ও শংকরকে লইয়া গৃহে ফিরিতে চাহিলেন। বালসন্ন্যাসী বলিলেন—'না মা, তা আর হয় না, জীবন ফিরিয়াছে, কিন্তু সংকল্প ফিরিবে না।' বিশিষ্টা দেবীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না, শংকর অনেক বুঝাইলেন, শেষে প্রতিশ্রুত হইলেন,

(১) মৃত্যুকালে মায়ের কাছে থাকিবেন,

(২) তখন তাঁহাকে ইষ্টদর্শন করাইবেন,

(৩) স্বয়ং তাঁহার সংকার করিবেন। বৃদ্ধা কিছু পরিমাণে শান্ত হইলেন। শংকরও মাতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শলাভের জন্ম কঠিনতম পথে যাত্রা করিলেন।

* * *

গুরুগৃহে পাঠকালে শংকর শুনিয়াছিলেন—নর্মদাতীরে যোগীদের সাধনার স্থান, এখনও সেখানে বহু সাধক সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। যোগী গোবিন্দপাদ নামে এক সিদ্ধপুরুষ বহু বর্ষ যাবৎ সেখানে এক গুহায় ধ্যানমগ্ন, তিনিই মহর্ষি

পত্রগুলি—এইরূপ কিংবদন্তী। জগৎকল্যাণে তাঁহার সাধনা ও জ্ঞানরাশি উপযুক্ত আধারে অর্পণ করিবার অপেক্ষাতেই তিনি সমাধিস্থ। সেই অলৌকিক আধাররূপী দেবপ্রতিম শিষ্যের স্তবগানেই নাকি তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইবে।

শংকর গোবিন্দপাদকেই মনে মনে গুরুরূপে বরণ করিয়া চলিয়াছেন—নদনদী গিরি কান্তার অতিক্রম করিয়া দক্ষিণভারতের এক প্রান্ত হইতে মধ্যভারতের হৃদয়গুহায়! কত অনিদ্রা অনাহার বিপদ বাধা সহ্য করিয়া শংকর শেষে উপনীত হইলেন তাঁহার বাঞ্ছিত ভূমি নর্মদানদীতটে! দেখিলেন, অনেক সাধক—যোগীর সমাধিভঙ্গের আশায় অপেক্ষা করিতেছেন, সমাধিস্থ যোগীর গুহা প্রদক্ষিণ করতঃ ভিতরে প্রবেশ করিয়া শংকর অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন, 'নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্'—স্থিরজ্যোতির মত যোগিরাজ ধ্যানমগ্ন—দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি হইল না, উদ্বেলিত হৃদয় ছন্দোবেগে আকুল হইয়া গাহিয়া উঠিল—

শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং
যশশ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্?
ষড়ঙ্গাদিবেদা মুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্?

অনাহতধ্বনিসদৃশ সুললিত স্তব শুনিতে শুনিতে গোবিন্দপাদ ব্যুত্থিত হইলেন, শান্তনেত্রে দেখিলেন, বুঝিলেন—'এই সেই, যার জন্য আমি যুগ যুগ ধ্যানমগ্ন'; শংকরও আনন্দে আত্মহারা হইয়া গুরু-চরণে তনুমনপ্রাণ—সব সমর্পণ করিলেন। সমবেত সকলে এই দিব্যদৃশ্য দেখিয়া নিজেদের ভাগ্যবান মনে করিতে লাগিল।

লোকলোচনের অন্তরালে গুরু ও শিষ্যের কি আদানপ্রদান হইল কে তাহা জানিতে পারে? বাহির হইতে শুধু দেখা গেল—শিষ্য গুরু-সেবায় প্রাণ পণ করিয়াছেন, আর গুরু ও শিষ্যকে অধ্যাত্ম বিদ্যার অমৃতসুধা সযত্নে পান করাইতেছেন। পরিশেষে একদিন দেখা গেল গুরু উপদেশ শ্রবণমাত্র শুদ্ধচিত্ত শিষ্য সমাধিমগ্ন; গভীর হইতে গভীরতর সমাধির সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া শংকর আজন্ম পিপাসার বারি নির্বিকল্প সমাধিসুখে নিমজ্জিত। কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন—কে তাহার সংবাদ রাখে? এই আত্মানন্দের আতিশয্যই ঝঙ্কৃত হইয়াছে তাঁহার জীবন বীণার তারে তারে—

অহং নিৰ্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুর্ব্যাপ্য সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বন্ধনং নৈব মুক্তি র্ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

এই অদ্বৈত অনুভূতি, 'অনাদিমধ্যান্তম্' 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' ভাব শংকরকে বিভোর করিয়া তুলিল, তিনি গাহিতে লাগিলেন,—

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞা।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

সমাধি-সাগরে অনন্ত আনন্দ-রসে নিমজ্জিত শংকরের মনকে গুরু গোবিন্দপাদ আবার টানিয়া আনিলেন এই শোকদুঃখময় জগৎপ্রপঞ্চে কি এক নূতন লীলা বিকাশের আশায়। শংকর বোধে বোধ করিতে লাগিলেন—

'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' অতএব কে কাহাকে জ্ঞান দিবে? অজ্ঞান বা বন্ধন কাহার? ধীরে ধীরে গুরু তাহাকে বুঝাইলেন—কি উদ্দেশ্যে তাঁহার শরীর ধারণ, বলিলেন, 'স্মৃতি বুদ্ধি ও ধারণাশক্তির অভাবে উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা লোপ পাইলে ব্যাসদেব বেদবেদান্তের মর্মকথা ব্রহ্মসূত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া শিষ্যদের শিক্ষা দেন—আমি

গুরুপরম্পরা সেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর বেদ উদ্ধারের জন্য তুমি আবির্ভূত! তুমি ব্যাসসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া শিষ্যমধ্যে শিক্ষা দাও, ও নূতন ধর্মভাবে ভারতকে প্লাবিত কর। আমার জীবনোদ্দেশ্য শেষ হইল, তোমার জীবন জয়যুক্ত হউক।'

* * *

গুরুর মহাসমাধি-লাভের পর তাঁহারই আদেশে শংকর কাশীধামে উপনীত হইলেন। বালসন্ন্যাসী শংকর বৃদ্ধপ্রৌঢ়যুবা-শিষ্য-পরিবৃত হইয়া বেদান্ত-ব্যাখ্যা করিতেছেন—এই অপূর্ব অপার্থিব দৃশ্য দেখিয়া কাশীবাসীরা আশ্চর্যান্বিত হইল। বৌদ্ধপ্রভাবে বৈদিক ধর্ম লুপ্ত, তীর্থ পরিত্যক্ত হইয়াছিল; সহসা এ দৃশ্য তাহাদের প্রাণে এক নূতন আশার সঞ্চার করিল। মুখে মুখে এই কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শংকরকে দেখিবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল।

কাশীধামে যে দুইটি ঘটনা শংকরের জীবনে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা আনয়ন করে, তাহা যেমনই মধুর তেমনই মানবিকতায় পরিপূর্ণ। শংকর ভাবিতেন,—নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সব কিছু মিথ্যা, এই যে সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী শক্তি উহাও মায়ামাত্র।

একদিন মণিকর্ণিকার পথে চলিয়াছেন, দেখেন—এক যুবতী স্বামীর মৃতদেহ কোলে করিয়া বসিয়া আছে, শায়িত শবদেহে সরুগলির যাতায়াতের পথটুকু জোড়া। শংকর যুবতীকে বলিলেন—'ওটাকে সরাও, পথ দাও' যুবতী বলিলেন 'তুমি ওটাকেই সরতে বলনা' —শংকর বুঝিলেন, স্বামিবিয়োগ-বিধুরার বুদ্ধিও বিলুপ্ত; বলিলেন 'ওর কি শক্তি আছে?'—তখন যুবতী বলিলেন, 'শক্তি না হলে কি একটুও নড়াচড়া যায় না?' শংকর হাসিয়া উঠিলেন 'কি অসম্ভব কথা!' এবার যুবতীও হাসিয়া উঠিলেন, 'কেন অসম্ভব? শক্তি আবার কি? শক্তি তো মায়া মিথ্যা।'—

শংকর নিজেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনিয়া চমকিত হইলেন, তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল; বুঝিলেন—শক্তি মিথ্যা নয়, মায়া নয়—মহামায়া ব্রহ্মাভিন্না শক্তি অনির্বচনীয়া! আশ্চর্য এই জ্ঞানোন্মেষের পর পথিমধ্যে সেই শব বা যুবতী কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না! জ্ঞানী শংকর ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া চলিলেন অন্নপূর্ণার মন্দিরে, মাকে দর্শন করিতে, মায়ের কাছে জ্ঞান ভক্তি ভিক্ষা করিতে:

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী।

দিব্যভাবে বিভোর হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানগুরু শংকর কাশীধামে বিচরণ করিতেছেন—গঙ্গাতীরে একদিন এক চণ্ডাল তাহার কয়েকটি কুকুর লইয়া আসিতেছে. স্পর্শভয়ে সংকুচিত শংকর বলিলেন, 'দূরমপসর রে চণ্ডাল!'—চণ্ডাল হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, আত্মা ত 'অখণ্ডমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্'—কে কাহাকে স্পর্শ করে—কে কাহাকে অশুচি করে? শংকর লজ্জিত হতবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—সত্যই তো তাঁহার অদ্বৈতবোধ ও দ্বৈত-ব্যবহার অত্যন্ত অসঙ্গত। গুরুজ্ঞানে চণ্ডালকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখেন, সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন রজতগিরিনিভ মহেশ্বর! শংকর দেখিলেন, নিখিল জগৎ শিবময় চৈতন্যময় ব্রহ্মময় 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'—এই ব্রহ্ম ওত এবং প্রোতভাবে—সব কিছু ব্যাপ্ত করিয়া, সব কিছু অতিক্রম করিয়া—তরঙ্গের তলে সমুদ্রের মত, মৃদ্‌জাত পদার্থের ভিতর মৃত্তিকার মত! এই নূতন অনুভবে শংকর আবার আত্মহারা হইলেন। ভাব একটু সংবৃত হইলে মহাদেব শংকরকে আশীর্বাদ করিলেন এবং নিভৃত হিমালয়ে ভাষ্য রচনা করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

কিন্তু বিভিন্ন ভাবাবেগে কাশীধামে আরো কিছু কাটিয়া গেল, শংকর কখন বালকের মত 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকেন—কখন অদ্বৈতব্রহ্মবোধে নিস্তব্ধ থাকেন।

শংকরের আর কোন বাসনা নাই, উদ্দেশ্য নাই—

কোন কার্যে অনুরাগ নাই, বিরাগও নাই—ঈশ্বর-ইচ্ছায় তিনি যেন ভাসিয়া চলিয়াছেন,—তাঁহারই হাতের পুতুল হইয়া, যন্ত্র হইয়া। কত শিষ্য কত ভক্ত আসিয়া জুটিতেছে তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই—অবিরাম তাঁহার কথামৃতপানে তাহারা মুগ্ধ—তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহে না। চিৎসুখ আনন্দগিরি, সনন্দন বা পদ্মপাদ তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিল। কত পণ্ডিত আসিল তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিতে, তাহারা বালকের মাধুর্যে ও গাম্ভীর্যে মুগ্ধ হইয়া বুঝিল—এ বালকের কণ্ঠে সরস্বতী, মস্তকে সদাশিব, হৃদয়ে সাক্ষাৎ জগজ্জননী মহামায়া। দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে আর মানুষ বলিয়া মনে হইত না। বয়সের পার্থক্য ভুলিয়া আবাল-বৃদ্ধবনিতা—সকলেই তাহার চরণে প্রণত হইত।

* * *

গুরু ও মহাদেবের আদেশ শিরোধার্য করিয়া কাশীর কোলাহল ছাড়িয়া সশিষ্য শংকর চলিলেন তপোভূমি হিমালয়ের নিভৃত মণিকোঠা বদরিকাশ্রমে! কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চবর্ষকাল জোশীমঠ ও বদরিকাশ্রমাঞ্চলে থাকিয়া ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও দশখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এদিকে ষোড়শবর্ষ সমাগত, আয়ুষ্কাল নিঃশেষ। কাশীধামে শরীরত্যাগের উদ্দেশ্যে শংকর বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আবার লোকজন, আবার তর্ক বিচার আলাপ আলোচনা।

একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লইয়া তাহার সহিত তর্ক করিতে লাগিল। বালক ও বৃদ্ধের তর্ক ক্রমশঃ জমিয়া উঠিতেছে—উভয়েরই বেদবেদান্ত কণ্ঠস্থ, উভয়েরই বুদ্ধি কুশাগ্র-তীক্ষ্ণ। নিত্যকর্মের সময় ব্যতীত আট দিন এইভাবে চলিতেছে, সকলে শুনিতেছে, ক্রমে তর্ক এমন সূক্ষ্ম হইয়া উঠিল যে—আর কেহই কিছু বুঝিতেছে না।

পদ্মপাদ বুঝিলেন, এ ব্রাহ্মণ সামান্য নহেন—ধ্যানযোগে জানিলেন ইনি ব্যাসদেব, শংকরও তখন ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাসদেব আর আত্মগোপন না করিয়া তাঁহার আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন—শংকরকে স্নেহরসে অভিষিক্ত করিয়া বহু আশীর্বাদ করিলেন, এবং আরো ১৬ বৎসর আয়ুর্বৃদ্ধি করিয়া বলিয়া গেলেন, 'এইবার তোমার নূতন ভাবধারা ভাষ্যসহায়ে প্রচার কর। বৌদ্ধপ্রভাবে বেদমার্গ লুপ্ত, বেদান্তার্থ অপ-ব্যাখ্যাত। কুমারিল ভট্ট বেদের কর্মকাণ্ড দ্বারা বৌদ্ধমতবাদ কিঞ্চিৎ খণ্ডন করিয়াছেন সত্য—তুমি জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা সকল মত খণ্ডন করিয়া শুদ্ধ বেদান্ত-মত স্থাপন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন কর! শুধু তর্কের দ্বারা ইহা সম্ভব নয়, ইহা অনুভূতির জন্য যে মহাশক্তি প্রয়োজন তুমিই তাহা সকলের প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত করিবে! অতএব ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার ও প্রদানের জন্য তুমি আরো কিছুকাল মানবদেহে থাক ও সর্বত্র বিজয়ী হও।' কর্মবিষয়ে শংকরের কোন প্রবৃত্তিও ছিল না, অপ্রবৃত্তিও ছিল না। তিনি দেহত্যাগের জন্য যেমন প্রস্তুত ছিলেন—আবার ব্রহ্মবিদ্যা বিতরণের জন্য তেমনি উদ্যোগী হইলেন।

* * *

কুমারিলের সঙ্গে বিচার করিবার জন্য প্রয়াগে আসিয়া শংকর দেখেন—তর্ক-প্রতিশ্রুতির জন্য গুরুহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কুমারিল ভট্ট তুষানলে প্রাণ বিসর্জন করিতে কৃতসংকল্প। তিনি শংকরের কথা শুনিয়া বলিয়া দিলেন—তাহার মেধাবী শিষ্য মণ্ডনমিশ্রকে পরাজিত করিতে পারিলেই তাহার মত খণ্ডিত হইবে।

ঐ নির্দেশ-অনুসারে আচার্য শংকর মাহিষ্মতী নগরে মণ্ডনগৃহে আসিয়া দেখেন দাসদাসী শুক-পাখীও বেদবিষয় আলোচনা করিতেছে। মণ্ডন পিতৃশ্রাদ্ধে ব্যস্ত, সন্ন্যাসী দেখিয়া একটু বিরক্ত হইলেন। যাহাই হউক মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতীর

মধ্যস্থতায় তর্ক হইবে, স্থির হইল। বেদের তাৎপর্য কর্মকাণ্ড না জ্ঞানকাণ্ড—ইহাই ছিল বিচারের বিষয়। মণ্ডনমতে বৈদিক মন্ত্রে যাগযজ্ঞ করিয়া স্বর্গপ্রাপ্তিই জীবের মুক্তি, জীবনের উদ্দেশ্য। শংকরমতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নাই—মায়ার নানা প্রতীয়মান; 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এবং 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—এই জীবব্রহ্ম অভেদজ্ঞানেই মুক্তি, ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য—ইহাই সমগ্র বেদবেদান্ত উপনিষদের মর্মকথা। সপ্তদশ দিবস ধরিয়া তর্ক চলিল, অবশেষে মণ্ডনের যুক্তি ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতেছে—লজ্জায় ক্ষোভে তাহার মুখ শীর্ণ বিবর্ণ হইল, গলার মালা শুকাইযা গেল। অতঃপর উভয়-ভারতী শংকরকে বলিলেন, আপনার জয় সম্পূর্ণ করিতে হইলে আমাকেও তর্কে পরাস্ত করিতে হইবে। তিনি স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। শংকর এ বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ, তাছাড়া সন্ন্যাসী বলিয়া এ বিষয়ে আলোচনাও তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। যাহাই হউক পরকায়-প্রবেশ দ্বারা তিনি এ প্রশ্নেরও সমাধান করিযা এক মাসের মধ্যে উভয়-ভারতীর হস্তে লিখিত উত্তর দিলেন।

তর্ক-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বামীর সন্ন্যাস নিশ্চিত জানিযা উভয়ভারতী দেহত্যাগ করিলেন, সন্ন্যাসের পর মণ্ডনের নাম হইল সুরেশ্বর।

মণ্ডনের ন্যায় মহাপণ্ডিত এক বালক সন্ন্যাসীর নিকট পরাজিত এবং তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, এই অদ্ভুত সংবাদ ভারতের সর্বত্র ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়া পড়িল। শংকরও চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সকল মত খণ্ডনপূর্বক অদ্বৈত মত স্থাপনে তৎপর হইলেন। শংকর যেখানেই যাইতেন সেখানেই আনন্দের হিল্লোল খেলিয়া যাইত, বেদপ্রথা উজ্জীবিত হইত, পুরাতন তীর্থ নূতনভাবে জাগিয়া উঠিত। অধিকারী ভেদে চরম জ্ঞানের সঙ্গে পরম ভক্তির কথা বলিয়া শংকর পঞ্চদেবতার পূজাও প্রচলিত করিলেন—হিন্দুধর্ম এক নূতন ধারায় প্রবাহিত হইল। কেহ তাঁহার স্পর্শে অদ্বৈততত্ত্বের আস্বাদ পাইল, কেহ 'তত্ত্বমসি' শুনিয়া ইহা বোধে-বোধ করিল, কেহ তর্ক বিচার করিয়া উহা বুঝিবার চেষ্টা করিল, কেহ বা তাঁহার দর্শনেই ইষ্টের সন্ধান পাইল। বহু জিজ্ঞাসুর জন্য শংকর বহুভাবে বিভিন্ন দিক দিয়া সরল করিয়া বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতেন—কখনও বা ভক্তিরস-পরিপূর্ণ স্তবস্তুতি তাহার সুললিতকণ্ঠে বাজিয়া উঠিত—ভক্তেরা সেগুলিও লিখিয়া লইতেন। এইভাবে মধ্যাহ্ন ভাস্করের মত আচার্যদেব ভারতের আকাশে বিরাজ করিতে লাগিলেন। আজন্ম জ্ঞানী হস্তামলক, গুরুগতপ্রাণ তোটক প্রভৃতি শিষ্যগণও তাহার আশ্রয়ে মিলিত হইল। আবার উগ্রভৈরব প্রভৃতি দুর্মতি কাপালিকও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া স্বীয় সিদ্ধাই-সাধনে তাঁহাকেই নিধন করিতে উদ্যত। আচার্য নির্বিকার, স্বেচ্ছায় ঐ দুর্মতির খড়্গাঘাতে মস্তক বলি দিতে যাইতেছেন—এমন সময় পদ্মপাদ নৃসিংহমূর্তি ধরিয়া বাধা দিল এবং উগ্রভৈরবেরই মস্তক ছিন্ন করে।

তুঙ্গভদ্রাতীরে শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গেরিতে মঠ-স্থাপন করিয়া আচার্য শিষ্যগণ সহ শাস্ত্রচর্চায় মগ্ন; এমন সময় একদিন মুখে মাতৃদুগ্ধের আস্বাদ পাইয়া বুঝিলেন, মৃত্যুকালে জননী তাঁহাকে স্মরণ করিতেছেন। যোগবলে আকাশমার্গে তিনি মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। মাতাও দশ বার বৎসর পরে পুত্রমুখ দেখিযা অপরিসীম আনন্দলাভ করিলেন—শংকর ভগবতীজ্ঞানে তাঁহার সেবা যত্ন করিতে লাগিলেন। মায়ের সকল দুঃখ দূর হইল। পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে শংকর তাঁহাকে তাঁহার ইষ্টমূর্তি দেখাইলেন এবং তাহা দর্শন করিতে করিতে বিশিষ্টাদেবী ইষ্টলোকে গমন করিলেন।

জ্ঞাতিদের কাহারও সাহায্য না পাওয়ায় তিনি একাই মায়ের সংকার করিলেন। তাহাদের ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত মর্মাহত হইয়া তাহাদের

দণ্ড দিবার জন্ম অভিশাপ দিয়া গেলেন—গৃহপ্রাঙ্গণে তোমাদের মৃতদেহ সংকার করিতে হইবে। কোনও সন্ন্যাসী কোনদিন তোমাদের অন্নগ্রহণ করিবে না। তোমরা বেদবহির্ভূত হইবে। জ্ঞাতিরা প্রথম ভাবিয়াছিল বালকের কথার কি মূল্য। কিন্তু শংকরাগমন-বার্তা শুনিয়া দলে দলে লোক আসিতে লাগিল, দেশের রাজাও আসিলেন শংকরের অপমানের কথা শুনিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন—এবং শংকরাদেশ শিরোধার্য করিয়া তিনি ঐ জ্ঞাতিদের সাবধান করিয়া দিলেন। শাপ-মোচনের জন্ম তখন তাহারা আসিয়া শংকরের পাদমূলে পতিত হইল। করুণারসের বরুণালয় শংকর তৃতীয় অভিশাপটি মোচন করিয়া তাহাদের বেদাধিকার দিয়া গেলেন, কিন্তু বাকী দুটি দণ্ড এখনও বলবৎ। কেরলদেশে নানা সদাচার প্রবর্তন করিয়া, প্রচারকার্য শেষ করিয়া শংকর শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইলেন।

সেতুবন্ধের নিকট মধ্যার্জুনের এক প্রসিদ্ধ শিবমন্দির ছিল। সশিষ্য শংকর সেখানে আসিয়া স্বীয় মত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, দেশের সকলে শুনিয়া মুগ্ধ ও শ্রদ্ধান্বিত হইতে লাগিল। অকাট্যযুক্তিবলে শংকর সকলের মন অদ্বৈত-মুখী করিতেছেন, কয়েকজন বৃদ্ধ কিন্তু কিছু মানিতেছেন না। অবশেষে একজন বলেন, এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যদি বলেন অদ্বৈতমতই সত্য, উহাই বেদের তাৎপর্য—তবে আমাদের সন্দেহ দূর হয়। শংকর বলিলেন—বিশ্বেশ্বরেরই ইচ্ছায় আমি এই মত প্রচারে উদ্যোগী, যদি আপনাদিগকেও ঐ মতে চালিত করা তাঁহার ইচ্ছা হয়—অবশ্যই তিনি আমার বাক্য সমর্থন করিবেন! এই বলিয়া তিনি মুখে-মুখেই স্তব রচনা করিয়া মধুরকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন, তাহার প্রতিধ্বনিতে মন্দির কাঁপিতে লাগিল, সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মন্দির উজ্জ্বল করিয়া মহাদেব আবির্ভূত হইয়া তিনবার, 'অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সকলে স্তম্ভিত, শংকরের মতের সত্যতা প্রাণেপ্রাণে উপলব্ধি করিয়া সকলে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে করিতে চরণে পতিত হইল।

কর্ণাটরাজ্যে এক কাপালিকদলের নেতা ক্রকচের বিশেষ প্রভাব, আচার্যদেব বিদর্ভ বিজয় করিয়া সেখানে যাইতে চাহিলে সকলে নিষেধ করে। কর্ণাট-রাজ সুধন্বা পূর্বেই শংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি গুরুদেবের ইচ্ছা বুঝিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে নিজরাজ্যে লইয়া আসিলেন। ক্রকচও দলবলসহ আক্রমণ করিলে খণ্ডযুদ্ধের পর উন্মত্ত ভৈরবের মত ঐ কাপালিক নিহত হয় এবং তাহার দলবল ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করে।

উত্তরভারতের পর দক্ষিণভারত বিজয় করিয়া শংকর শুনিলেন, ভারতের পূর্বপ্রান্তে তন্ত্রমত বিশেষ প্রবল। কামরূপে অভিনব গুপ্ত বেদান্তের এক শাক্ত-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শংকর সেখানে আসিয়া তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। অভিনব পরাজিত হইয়া কপটভাবে শংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং অভিচারক্রিয়া দ্বারা আচার্যের নিষ্পাপ শরীরে ভগন্দর প্রবেশ করায়। তোটক প্রাণপণ সেবায় নিযুক্ত, পদ্মপাদ যোগশক্তিবলে জানিতে পারিলেন রোগের কারণ কি। তিনিও মন্ত্রজপ দ্বারা অভিচারকারীর দেহে রোগ ফিরাইয়া দিলেন। অভিনব রোগযাতনায় ছটফট করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আচার্য সুস্থ হইলেন, কিন্তু পদ্মপাদের কাণ্ড জানিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন।

অতঃপর কাশ্মীরে সারদাপীঠের মন্দির-রক্ষক পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়া তিনি উক্ত পীঠে আরোহণ করিলেন এবং 'সর্বজ্ঞ' বলিয়া গণ্য হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কাশ্মীরে তাঁহার মত গৃহীত হইল। এবার ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র তাঁহার মত গৃহীত, চারিকোণে চারিটি মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত, চারিজন শিষ্য উহাদের ভার প্রাপ্ত।

বত্রিশ বৎসর বয়সে সমাগত আচার্য লীলাবসান সন্নিকট বুঝিয়া শিষ্যদের সকলকে সঙ্গে লইয়া কিছু-কাল কেদারধামে কাটাইলেন। সেখান হইতে শিষ্যগণকে চারিটি মঠে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং কৈলাস-ধামে গিয়া মহাসমাধিযোগে শিবস্বরূপে বিলীন হইলেন। আসমুদ্র হিমাচল—নদনদী গিরিপ্রান্তর জনপদ অরণ্য—সর্বত্র ধ্বনিত হইল—'শংকরঃ শংকরঃ সাক্ষাৎ', সে ধ্বনির শেষ নাই, বিরাম নাই—উহা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে যুগ হইতে যুগান্তরে।

মরুযাত্রী

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়

সংসার-মরুর যাত্রী ! দীর্ঘ রাত্রি হও পার,
হও পার দীপ্ত মরীচিকা।
খুলে ফেলো আবরণ, স্তরে স্তরে টুটে যাক
তিমিরের ঘন যবনিকা।

পিছনেতে পড়ে থাক স্বপ্ন-সম এ সংসার
ছুটে চলো অন্ধকার চিরি,
মায়া-মৃগ-রূপে ভুলি ছুটিও না বৃথা আর,
ছুটে চলো মোহজাল ছিঁড়ি।

ধরিত্রীর রূপ-জালে কেন আর মিছামিছি
আপনারে আপনি জড়াও,
মিথ্যারে পাইবে বলে সত্যেরে ঠেলিয়া দূরে
বারে বারে নিজেরে ঠকাও।

বাসনায় লালসায় দগ্ধ হয়ে যাবে দেহ,
অবশেষ থাকিবে যে ছাই,
মিটিবে না কোন ক্ষুধা, হৃদয়ের যত আশা
চিত্তে শুধু জ্বলিবে সদাই।

মরুযাত্রী—হে পথিক ! কেন অবসন্ন মন ?
সংশয়ের নীহারিকা টুটি—
ওই দেখো অবিদূরে উদয়ের মহাক্ষণ
ধীরে ধীরে উঠিতেছে ফুটি !

সমালোচনা

The Philosophy of Truth or Tattwagnana—By V. Subrahmania Iyer. Published by Rukmani Kuppanna, 'Sudha,' Rajagopalachari Road Extension, Salem. Pp—460 ; Price—Rs. 9/-.

মহীশূরের সুপরিচিত প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রী ভি. সুব্রহ্মণ্য আয়ারের (৮১ বৎসর বয়সে মৃত্যু, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯) বক্তৃতামালা ও প্রবন্ধাবলীর এই সঙ্কলন-গ্রন্থ অদ্বৈত বেদান্তের অনুরাগী পাঠকবৃন্দের সমাদর লাভ করিবে। পুস্তকটির সম্পাদনা করিয়াছেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর টি. এম্. পি. মহাদেবন্। শ্রীআয়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর এস্. রাধাকৃষ্ণন্ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

'Truth' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক 'তত্ত্ব' ও 'মতবাদের' পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা দিয়া অসংখ্য মত সৃষ্টি করিতে পারে, এক মত অন্য মতকে খণ্ডন করে, মতবাদের অরণ্যে মানুষ পথ খুঁজিয়া পায় না।

তত্ত্ব কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। ইহা মানুষের কল্পনার অপেক্ষা করে না। উহা 'পুরুষতন্ত্র' নয়—বস্তুতন্ত্র। উহা দেশ, কাল, কার্যকারণেরও অধীন নয়। আত্মবস্তুই তত্ত্ব। আত্ম-ব্যতিরিক্ত আর যাহা কিছু তাহা দৃশ্য, মানুষের কল্পনার এলাকার মধ্যে। আত্মা 'অকল্পম্'। আত্মাই জীব ও জগতের আশ্রয়—সংশয়াতীত সত্য। এই সত্য কিন্তু একটি 'আকাশ কুসুম' নয়, প্রাত্যহিক জীবনে নিত্য অনুভবযোগ্য। ঐ সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিলে মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও কর্মে একটি বিপুল পরিবর্তন উপস্থিত হয়—যাহার মর্মকথা পরমা শান্তি ও বিশ্ব-কল্যাণ।

'Religion and Philosophy'—প্রবন্ধে লেখক পাশ্চাত্যে ঐ দুটি শব্দ কি অর্থে প্রয়োগ করা হয় তাহার বিচার করিয়া উহা হইতে ভারতীয় দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়াছেন। 'Man's interest in Philosophy', 'What is philosophy', 'The Latest and the oldest philosophy' এবং আরও কয়েকটি প্রবন্ধে বেদান্ত-নির্ণীত 'তত্ত্বজ্ঞানে'র মৌলিকতা ও শক্তি কোথায় তাহা পরিষ্কারভাবে লেখক বুঝাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ভারতবর্ষেও বহু 'মতবাদ' আছে। উহাদের প্রত্যেকটিরই স্বকীয় সার্থকতা অনস্বীকার্য, কিন্তু অদ্বৈত-বেদান্ত-নির্ণীত তত্ত্ব—যাহা ভারতবর্ষেই প্রথম আবিষ্কৃত, উহা ঐ সকল মতবাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। উহার মর্যাদা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৈদান্তিক সত্য পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম ও দর্শনে প্রযুক্ত হইতে পারে, কেননা উহা একটি বিশ্বজনীন 'বিজ্ঞান' (Science). বেদান্তের আত্মবিজ্ঞানই সকল মানবজাতির জন্য ভারতের মহত্তম দান। 'Reason and Intuition' এবং 'On Causality' প্রবন্ধে বৈদান্তিক তত্ত্বজ্ঞানের প্রণালী বিশ্লেষিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক, ঐতরেয় এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদে উপলব্ধ 'অবস্থাত্রয়ের' বিশ্লেষণ ও বিচার 'Avasthatraya' নামক প্রবন্ধে লেখক অতি সক্ষমভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ জাগ্রত অবস্থাতেই আমাদের সারা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি। উহার ফলে এই জগৎকে আমরা অতি-বাস্তব মনে করি এবং সংসারের নিত্য পরিবর্তনশীলতার দিকে আমাদের হুঁশ থাকে না। জাগ্রতের ন্যায় স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিও মানুষের একটি সার্বজনীন অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাকে যথাযথ বিশ্লেষণ করিতে পারিলে বৈদান্তিক সত্যলাভে অনেক সহায়তা হইতে পারে। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি

তিন অবস্থার যিনি দ্রষ্টা নিত্যসাক্ষী সেই সনাতন আত্মাকে জানাই তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্য।

সাতটি প্রবন্ধে ('Shankara's Philosophy', 'Shankara and his view of life', 'Shankara: from the modern standpoint of Philosophy', 'Shankara and our times', Shankara and his modern critics', 'Shankara's Philosophy and Action', 'Shankara : Reason or Revelation') লেখক অদ্বৈত-বেদান্তের ব্যাখ্যান ও প্রসারে আচার্য শঙ্করের মহতী কীর্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ঐ কীর্তি পুরাতনের প্রকোষ্ঠে রাখিবার জন্য নয়, বর্তমানকালের যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সর্বজয়ী বিপ্লবের বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্যকে সংহত ও সুসমঞ্জস করিবার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচারযোগ্য। গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'Sri Ramakrishna and the modern outlook' ভূয়োদর্শী দার্শনিক-প্রবরের অদ্বৈত-বেদান্তের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর একটি চমৎকার বিশ্লেষণ।

—শ্রদ্ধানন্দ

পঞ্চদশী-প্রদীপ (প্রথম আবৃত্তি)—স্বামী সত্যানন্দ প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম, হালিসহর (২৪ পরগণা)। পৃষ্ঠা—১৬৭; মূল্য ১৷৷০ টাকা।

স্বামী বিদ্যারণ্য প্রণীত 'পঞ্চদশী' বেদান্তশাস্ত্রের অপূর্ব প্রকরণগ্রন্থ। আলোচ্য পুস্তকে মূল পঞ্চদশী হইতে কতকগুলি শ্লোক নির্বাচন করিয়া অধ্যায়ক্রমে সাজাইয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বেদান্তের তত্ত্বসম্বন্ধে নিজের চিন্তাধারা গ্রন্থকার সরলভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চদশীর নিজস্ব বিভাগ অনুসৃত না হওয়ায় যুক্তি ও বিচার-শৃঙ্খলা দুর্বল হইয়াছে মনে হয়।

জনগণের উপনিষৎ (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত এবং গোরাবাজার (বহরমপুর) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৮৮; মূল্য এক টাকা।

শ্বেতাশ্বতর মুক্তিকা ও কৈবল্য এই তিনখানি উপনিষদের পদ্যানুবাদ আলোচ্য পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। অনুবাদ অধিকাংশ স্থলেই প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য; মূল উপনিষদের ভাব ও তাৎপর্য রক্ষার উদ্যম অনেকাংশে সফল হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা—দশম বর্ষ, ১৩৬৩। সম্পাদক শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী ১০৬, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত এই শিক্ষালয়ের বার্ষিক পত্রিকাটি গল্পে ভ্রমণে প্রবন্ধে কবিতায় ও চিত্রসম্ভারে তাহার পূর্ব মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। রসরচনায় 'মশকস্তুতি' বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। পরিশেষে বিভিন্ন বিবরণী হইতে প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই শিক্ষালয়ের ও পত্রিকাটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

গীতি-অর্ঘ—শ্রীশ্রীমৎ যোগজীবনানন্দ স্বামী —সত্যায়তন-প্রচারক-সংঘ, কলিকাতা-৪০, পৃঃ ১২৪; মূল্য দেড় টাকা।

সাধক-কবি গ্রন্থপ্রকাশে উদাসীন। ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় গীতি-অর্ঘ প্রকাশিত। ১৫১টি গান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। ভাব-সাধনা, দেশপ্রেম ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় অনেকগুলিতেই বিদ্যমান। লেখক প্রাচীন কবিদের সাধন-সঙ্গীতের অনুরাগী এবং তাঁর চিত্ত পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের সুরে। উভয়ের সঙ্গতে বাজিয়া উঠিয়াছে এই গীতি-অর্ঘ।

সাধন-পন্থা (প্রথম বল্লী)—শ্রীশ্রীমৎ স্বামী যোগজীবনানন্দ, প্রকাশক—সত্যায়তন-প্রচারক-সংঘ পোঃ সত্যায়তন, বাঁকুড়া। পৃঃ ১৯৭; মূল্য ৩৲।

সত্যাশ্রয়ী মানবগণকে শান্তির পথে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি রচিত। শাস্ত্রের

অরণ্যে যাহাতে মানব পথহারা না হইয়া যায়—তাই লেখক স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে সহজ সরল পথের ইঙ্গিত দিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত কর্তব্য সংগৃহীত হইয়াছে। সাধন সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ অনেক কথা শিষ্যসম্প্রদায়ের জন্যই সীমাবদ্ধ থাকা সমীচীন, জনসাধারণের জন্য সাধারণতত্ত্বই যথেষ্ট।

সদ্ধর্ম রত্নমালা—শ্রীধর্মপাল ভিক্ষু সঙ্কলিত; প্রকাশক: ধর্মাঙ্কুর বুক এজেন্সী, ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, কলিকাতা-১২; পৃষ্ঠা—২২৯; মূল্য—৩৲ টাকা।

বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক সকল প্রকার নিয়মপদ্ধতি-বিষয়ক বহু তথ্য যথা—বন্দনা, পূজা, দান, ত্রিশরণ, শীল, প্রার্থনা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর অবশ্য করণীয় দৈনন্দিন এই কৃত্যসকল সুযোগ্যতার সহিত পরিচ্ছেদক্রমে সাজাইয়া আলোচ্য পুস্তকখানি সংকলন করা হইয়াছে। প্রত্যেক বৌদ্ধ গৃহস্থের নিত্যপাঠ্য সূত্রসমূহ ও তাহাদের সুখপাঠ্য বঙ্গানুবাদ পুস্তকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

দাও ত্রিশরণ (কবিতা পুস্তক)—শ্রীশশাঙ্ক-মোহন বড়ুয়া প্রণীত প্রকাশক—ধর্মাঙ্কুর বুক এজেন্সি, ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা—২৩, মূল্য—ছয় আনা।

তথাগত ভগবান বুদ্ধের সার্ধদ্বিসহস্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভক্তহৃদয়ের আকুতিসম্বলিত কাব্য; পয়ারের ছন্দে ৯০টি চার-পঙ্‌ক্তি স্তবকে পরিসমাপ্ত। দুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে বৈরাগ্যপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া লেখক ভারতের ইতিহাস পরিক্রমা করিয়া অবশেষে বুদ্ধ-বাণীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারই নিকট 'অপ্রমেয় শান্তিসুধাভরা' ত্রিশরণ মন্ত্র প্রার্থনা করিয়াছেন।

মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

The Cultural Heritage of India—Vol IV—The Religions. শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য দর্শনসাগর সম্পাদিত—ডক্টর শ্রীভগবান দাস 'ভারতরত্ন'-লিখিত ভূমিকা সহ। প্রকাশক স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিট্যুট্ অব্ কাল্চার; ১১১ রসা রোড, কলিকাতা-২৬। পৃষ্ঠা ৭৭৫+১৯, মূল্য ৩৫৲।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর অব্যবহিত পরেই ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই মহাগ্রন্থ (ভারত-কৃষ্টির উত্তরাধিকার) তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে উহারই পরি-বর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ বাহির হইতেছে। প্রতিটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমান খণ্ডে ব্যাপক-ভাবে ধর্মের কথাই আলোচিত হইয়াছে; প্রতিটি অধ্যায় বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত। এই খণ্ড ছয়টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে—ধর্মের সম্প্রদায় ও কৃষ্টিরূপ; তেইশটি সুনির্বাচিত প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। দ্বিতীয় ভাগে—সাধু মহাপুরুগণ ও তাঁহাদের শিক্ষা—ছয়টি প্রবন্ধ। তৃতীয় ভাগে—ব্যবহারিক জীবনে ধর্ম—নয়টি প্রবন্ধ। চতুর্থ ভাগে—ভারত-সীমার বাহিরের ধর্ম—ছয়টি প্রবন্ধ। পঞ্চম ভাগে—আধুনিক কয়েকটি ধর্মান্দোলন—তিনটি প্রবন্ধ। ষষ্ঠ ভাগে—শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ লিখিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ।

এতৎসহ ১০ পৃষ্ঠা পুস্তকসূচী ও ৩৫ পৃষ্ঠা বিষয়-সূচী পুস্তকখানিকে নিত্যব্যবহার্য গ্রন্থে পরিণত করিয়াছে। ধর্ম ও কৃষ্টি ব্যাপারে ইহা একটি তথ্যমূলক প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Maha-narayanopanisad — স্বামী বিমলানন্দ প্রণীত। মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪০২, মূল্য—৫৲ টাকা।

মাদ্রাজ মঠ হইতে ইংরেজীতে প্রকাশিত উপনিষদ্ গ্রন্থমালার পূর্বতন ১১খানি সর্বত্র বহুল প্রচারিত। বর্তমান মহানারায়ণোপনিষদ্‌খানি অন্য রীতিতে সম্পাদিত। ইহাতে হ্রস্ব-দীর্ঘ-পাঠের মাত্রা, ভূমিকা, অনুবাদ, সংস্কৃত ভাষ্য রহিয়াছে। ইংরেজী ব্যাখ্যায় ধর্মজীবনের উপযোগী জ্ঞানভক্তির নানা প্রয়োজনীয় কথা আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামীজীর জন্মোৎসব

কালিম্পঙ্: গত ৩রা ফেব্রুআরি কালিম্পঙ্ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে স্থানীয় টাউন হলে একটি জনসভায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজী, বাংলা হিন্দী ও নেপালী প্রভৃতি ভাষায় বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাশিয়ার খ্যাতনামা পণ্ডিত ডক্টর জর্জ রোরিক্ (Roerich) সভাপতির ভাষণে—রাশিয়ার জনগণ স্বামীজীর লেখা পড়িয়া এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বের প্রতি দিন দিন কিভাবে আকৃষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনা করেন। ডক্টর রোরিক্ সর্বপ্রথম স্বামীজীর কথা শুনেন দক্ষিণ সাইবেরিয়ার অন্তর্গত সুদূর আলতাই উপত্যকার একটি প্রদেশে। তিনি বলেন, বিখ্যাত রুশীয় সাহিত্যিক ইল্যা ইহারুন্‌বার্গ (Ilya Eherunburg) তাঁহার লেখার মধ্যে বিবেকানন্দের গভীর মানবতার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, ইহাই রোমা রঁল্যাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সভাপতি আরও বলেন, যদিও স্বামী বিবেকানন্দ সক্রিয় রাজনীতি হইতে দূরে ছিলেন, তথাপি তিনি ভারতের যুগান্তরকারী একজন মহান্ নেতা। তিনি মানসচক্ষে গভীর দূরদৃষ্টি-সহায়ে জগতের ঘটনাচক্রের ভবিষ্যৎ পরিণতি এবং শক্তির হস্তান্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গৌতম-বুদ্ধের মত স্বামীজী সকলকে জীবনের প্রতিকর্মে আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভীক হইতে উপদেশ দিতেন।

রহড়া (২৪ পরগনা): গত ১১ই হইতে ১৭ মার্চ সপ্তাহব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচী সহায়ে রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পরিপালিত হয়। শিক্ষা-প্রদর্শনী, শিক্ষক-ছাত্র-সম্মেলন, সঙ্গীত ও ক্রীড়ানুষ্ঠান, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পুরস্কার বিতরণ ও ছাত্রদের নাট্যাভিনয় এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রথম দিন পূজা পাঠ হোম অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্বোধন সভায় বহু সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা পরিকল্পনাটির মৌলিকতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। বৈকালের সভায় প্রধান বক্তা শ্রীতামস-রঞ্জন রায় বর্তমান শিক্ষার ধারা বিশ্লেষণ করেন।

দ্বিতীয় দিন সকালে আশ্রম বিদ্যালয়সমূহের সম্মিলিত সভায় ছাত্রবক্তাগণ স্বামীজীর 'জীবন ও বাণী'র বিভিন্ন দিক আলোচনা করে। বৈকালে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 'রামায়ণে ভরত' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

পর দিন শিশু দিবসে প্রাতে ক্রীড়া-প্রতি-যোগিতা হয় ও বৈকালে 'স্বপন বুড়ো'র সভাপতিত্বে শিশু সাহিত্যিকদের এক বৈঠকে শিশুগণ 'রাখাল রাজা' অভিনয় করিয়া সকলকে আমোদিত করে।

১৪ই—কর্মী-সম্মিলনে সকল বিভাগের কর্মী নিজ নিজ পরিকল্পনা পেশ করেন এবং আশ্রম সম্পাদক স্বামী পুণ্যানন্দ কর্মীদের দায়িত্ব বুঝাইয়া দেন।

১৫ই প্রাতে বেতার-কথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথকতা ও বৈকালে সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ই প্রাতে হোলির আনন্দোৎসব এবং নগর সংকীর্তনে সকলে মাতোয়ারা হয়। বৈকালে ধর্মসভায় স্বামী বোধাত্মানন্দ ও সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস—শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও সাধনার তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন।

শেষ দিন রবিবার মাননীয় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভার পর আশ্রম-বালকগণ 'চক্রী' যাত্রাভিনয় করিয়া সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসব সমাপ্ত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

কাশী : শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে গত ৩রা মার্চ হইতে ১১ই মার্চ পর্যন্ত নবদিন-ব্যাপী বিভিন্ন গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

তিথিপূজার দিন অতি প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক, স্তবাদি গান ও ভজন-সঙ্গীতাদির পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা আরম্ভ হয়। আশ্রম-মণ্ডপে পঞ্চবটী-চিত্রিত পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ প্রতিকৃতি পত্র পুষ্প ও মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। আশ্রম-প্রাঙ্গণ ভজন কীর্তন ও বেদ-গানে মুখরিত হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ এবং পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী পাঠ ও আলোচনা হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ২৫০০ শত নরনারী প্রসাদ পান। রাত্রে কালীকীর্তন সকলকে আনন্দ দিয়াছিল।

৪ঠা মার্চ হইতে প্রতিদিন বৈকালে ও রাত্রে গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে 'রামপ্রসাদের' গান, উচ্চাঙ্গের সংগীত, বাংলা ও হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও আলোচনা, তুলসীদাসী রামায়ণ-ব্যাখ্যান, রামায়ণ-কীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনা, কালীকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অষ্টোত্তর শতনামকীর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন মনোরম কার্যসূচী অনুসারে উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছিল।

১০ই মার্চ বৈকালে সাধারণ অধিবেশনে বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় এবং স্বামী ভূতেশানন্দ বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের আলোচনা করেন, শেষ দিন বৈকালে পণ্ডিত শ্রীগিরিধর শর্মার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ শ্রীরামচরিতব্যাখ্যান সকলকে মুগ্ধ করে। রাত্রে 'বাউল কীর্তনের' পরে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

ঐ সকল অনুষ্ঠানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭ শত লোক যোগদান করিয়া উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করে।

ঢাকা : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কেন্দ্রে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী লইয়া স্বামী বিবেকানন্দের ৯৫তম ও শ্রীরামকৃষ্ণের ১২২তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিন পূজা পাঠ ও প্রার্থনার পর শ্রীরাম-কৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়, স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী আলোকচিত্র সহায়ে ঐ বিষয়ে বক্তৃতা দেন, ছাত্রদের 'সিরাজের স্বপ্ন' নাটক এবং সখের দলের যাত্রাভিনয় সকলকে আনন্দ দেয়।

৭ই—ছাত্রসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রীমনোরঞ্জন ধর 'শিক্ষা ও সেবা' বিষয়ের অবতারণা করেন। ডঃ হুসেন, অধ্যাপক গুহ, ছাত্র শ্রীঅমিতাভ মণ্ডল ও স্বামী সত্যকামানন্দ আলোচনায় যোগ দেন। পরিশেষে সভাপতি—তাঁহার ছাত্রজীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শের অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখ করেন।

৮ই—৫০০০ নরনারায়ণ প্রসাদ পান।

৯ই—মিশন স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভার পর পূর্বপাকিস্তান বিধানপরিষদের সভাপতি জনাব আবদুল হাকিমের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্তা আশালতা সেন প্রভৃতি 'বিশ্বকৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দান' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ চিরশিশু, শিশুর সরলতা দ্বারাই তিনি বিশ্বের জটিল রহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জ : গত ২৯শে ফাল্গুন, বুধবার হইতে ৩রা চৈত্র রবিবার পর্যন্ত (১৩ই মার্চ—১৭ই ১৯৫৭ ইং) পঞ্চ-দিবস-ব্যাপী নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক বৈদিক স্তোত্র পাঠ, ভজন, বিশেষ ও নিত্যপূজা, হোম এবং শাস্ত্রাদি পাঠ হয়। অপরাহ্ণে "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পাঠ, শ্রীগীতা আলোচনা এবং সন্ধ্যায় রামায়ণ গানের

ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৪ই মার্চ শ্রীযুক্তা আশালতা সেন মহাশয়ার নেতৃত্বে এক মহিলা-সভায় সহস্রাধিক শ্রোতার উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র জীবন বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচিত হয়। ১৫ই মার্চ ৮ ঘটিকায় 'বালক-সম্মেলনে' শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থি-ভবনের বালক শ্রীপ্রীতিময় কর সভাপতিত্ব করে; শেষে ৫ শত বালক বালিকার মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ হয়। বৈকাল ৪॥• ঘটিকায় এক ধর্মসভায় হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণ সকল ধর্মের মূলবাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন 'আলহাজ্ব মৌলানা' ফজলুল করিম এম, এ. বি, এল। সভায় প্রায় চারি হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ১৬ই মার্চ বৈকাল ৪॥ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাময় বসু এম, এ (সহ অধ্যক্ষ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা) মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ছাত্র-সভায় চট্টগ্রামের শ্রীদেবেন্দ্র দাস চৌধুরী ও কুমিল্লার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্তী শাস্ত্রী মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিয়া সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পরে বেলুড় মঠের স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী আশ্রমে তিনদিবস ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সম্বন্ধে বলেন। প্রতিদিন প্রায় চারি হাজার শ্রোতা সমবেত হইত। উৎসবের শেষ দিবস ৩রা চৈত্র রবিবার (১৭ই মার্চ) প্রায় ছয় হাজার নরনারী বসিয়া এবং হাতে হাতে প্রসাদ পান। সারাদিন সঙ্গীত, ভজন, গীতা-কথামৃত প্রভৃতি পাঠ ও কীর্তনাদি হয়।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, সোনারগাঁ প্রভৃতি মিশনকেন্দ্রের সাধুগণ উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধন করেন।

ময়মনসিংহ : গত ২৫শে হইতে ২৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিবসত্রয় সন্ধ্যারতির পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও স্বামীজীর পুণ্য জীবনী আলোচনা উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

সেবাকার্য ও বিবরণী

মাতৃভবন : ৭এ, শ্রীমোহন লেন (কলিকাতা-২৬)-এ অবস্থিত প্রসূতি-সেবাসদনের ৭ম বার্ষিকী কার্যবিবরণী (১৯৫৬) আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা: নূতন—১৮১২, পুরাতন—৫৬১৫; অন্তর্বিভাগের সংখ্যা: ১১০১। বর্তমানে মাতৃভবনে ১৬টি শয্যা (Bed) আছে, ইহার মধ্যে ৮টি ফ্রি—দরিদ্র রোগিণীগণের জন্য সংরক্ষিত।

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন: বাত্যা-দুর্গতদের সেবা—মাদ্রাজের সাম্প্রতিক ঘূর্ণি-বাত্যায় নিরাশ্রয় ২০০ দুঃস্থ পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন বেদারণ্যমে রামকৃষ্ণপুরম্ নামে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। এখানে প্রার্থনাগার, মন্দির ও শিশু-উদ্যান নির্মিত হইয়াছে। গত ১০ ফেব্রুআরি মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রী এ. জে. জন উপনিবেশের ২০০টি পাকা বাড়ীর মধ্যে ১২৮টির উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, বাস্তুপূজা, নবগ্রহ-হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, হরিকথা, পুতুলনাচ, শোভাযাত্রা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নূতন গৃহে প্রতিষ্ঠিত পরিবারগুলিকে বস্ত্র ও মাদুর প্রভৃতি প্রদত্ত হয়।

এই পুনর্বাসন-কার্যের জন্য মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং মিশনের রিলিফ ফাণ্ড হইতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হইতেছে।

চিঙ্গেলপুট (মাদ্রাজ) শাখাকেন্দ্র: বার্ষিক কার্যবিবরণী—আমরা এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম মুদ্রিত বার্ষিক কার্যবিবরণী (১৯৫৬) পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার

মধ্য দিয়া চিঙ্গেলপুটে সর্বপ্রথম মিশনের কার্য শুরু হয় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯৪০ খৃঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্রে ২টি উচ্চ বিদ্যালয় (১টি বালিকাদের জন্য), ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১টি সম্প্রসারিত প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয়), ১টি ছাত্রাবাস, ১টি গ্রন্থাগার ও ১টি ছাপাখানা নিয়মিতভাবে পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে (১৯৫৬) বিদ্যালয়গুলিতে মোট ১০৬০ (বালিকা ৪৪১)—ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিয়াছে। বিদ্যার্থিভবনে ৩৫ জন ছাত্র ছিল।

বলরাম-মন্দির (কলিকাতা): সাপ্তাহিক ধর্মসভা: নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়—

জানুআরি—'৫৭: ভাগবত ও প্রেমধর্ম, শিবানন্দ-বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ (ছায়াচিত্র-যোগে), বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দান (ছায়াচিত্রযোগে)।

ফেব্রুআরি—'৫৭: ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামীজীর জীবনী ও বাণী, বলরামমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ।

মার্চ—'৫৭: ভক্তিতত্ত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপলীলা, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে মহাপ্রভুর মহাভাব।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী, রামায়ণ, গীতা। বিভিন্ন দিনের বক্তা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ, স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, স্বামী জীবানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, শ্রীগৌরগোবিন্দ গুপ্ত, শ্রীনন্দলাল দে, স্বামী দেবানন্দ।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের আমেরিকা যাত্রা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গত ২৭শে মার্চ বেদান্ত-প্রচারকার্যে আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। রাত্রি সাড়ে দশটায় বি. ও. এ. সি. বিমান দম দম ছাড়ে; তৎপূর্বে বিমানঘাঁটিতে সাধুসন্ন্যাসী ও ভক্ত নরনারীর সমাবেশে বিদায় সংবর্ধনার আনন্দ-বেদনাময় দৃশ্য—উপস্থিত সকলের হৃদয়ে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আমেরিকার প্যাসিফিক উপকূলে ভারতকৃষ্টি ও বেদান্তপ্রচারের বিশিষ্ট কেন্দ্র—সান ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটিতে স্বামী অশোকানন্দজীর সহায়করূপে যাইতেছেন। নূতন দেশে নূতন কর্ম-পরিবেশে 'উদ্বোধনে'র প্রাক্তন ও প্রিয় সম্পাদকের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যলাভের জন্য আমরা আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি।

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্বোধন—গত ২৭শে ফেব্রুআরি কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের নিজস্ব (নদীয়ার মহারাণী কর্তৃক প্রদত্ত) জমিতে নবনির্মিত ঠাকুরঘরের শুভ উদ্বোধন করেন বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ। এতদুপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ, হোম ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩রা মার্চ এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে।

স্বামীজীর জন্মোৎসব

বিবেকানন্দ কর্ম-মন্দিরের উদ্যোগে গত ২৪শে ফেব্রুআরি ৪৫নং সাম্সুল হুদা রোডে স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বাহ্ণেই মাঙ্গলিক ভজনের সুরে একটি পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত স্বামীজীর আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে একটি সভায় ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর পৌরোহিত্যে শ্রীনৃত্যগোপাল রায় 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ'শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ 'স্বামীজীর ভাব-ধারা' সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় শ্রীমেঘনাদ বসাক ও তাঁহার সম্প্রদায় 'লীলাকীর্তন' করেন।

নানাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম জন্মোৎসব পূজা পাঠ ও আলোচনা-সভার মাধ্যমে সুন্দরভাবে উদ্‌যাপনের পূর্ণ বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি :

আজমীর, ঘামাপুর (জবলপুর), ঝাড়গ্রাম ও খেপুত (মেদিনীপুর), সাহেবগঞ্জ (সাওতাল পরগনা), ফলতা (২৪ পরগনা), কদমতলা ও বেলাড়ি (হাওড়া), কুমিল্লা।

মানব-পরিবার চিত্র-প্রদর্শনী

ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইন্‌ফরমেশন স্যার্ভিসের (USIS) উদ্যোগে কলিকাতায় রনজি ষ্টেডিয়ামে 'মানব-পরিবার' (Family of man) নামক নূতন ধরনের এক আলোকচিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে।

পৃথিবীর ৬৮টি দেশের ২৭৩ জন (নর-নারী) শিল্পীর ২০ লক্ষ আলোক চিত্র হইতে প্রথমে নির্বাচিত দশহাজার, পরে তাহার মধ্য হইতে সুনির্বাচিত ৫০৩ খানি চিত্র এডোয়ার্ড ষ্টাইকেন বিষয়ানুযায়ী গ্রথিত করেন—নিউইয়র্ক নগরীর 'মিউজিয়ম অব্ মডার্ন আর্টের জন্য।

বিভিন্ন দেশের ভাষার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সব দেশের মানুষের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ভালবাসা ঘৃণা সুখ দুঃখ যে একই প্রকার, জন্ম জীবন ও মৃত্যুর তালে তালে অখণ্ড মানব-সংহতি যে আগাইয়া চলিয়াছে,—বাহিরের শত বিভেদ সত্ত্বেও মানব-জাতি যে অন্তরে এক ও অবিভাজ্য—নীরব ছবিগুলি তাহারই মুখর সাক্ষী।

জীবিকার জন্য মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা কখনও একক—কখনও সংঘবদ্ধ ; যন্ত্রযুগেও মানুষের কায়িক শ্রমের প্রয়োজনীয়তা, সমাজ-জীবনে মিলনের আনন্দ ও সংঘর্ষের বেদনা চলচ্চিত্রের ভঙ্গীতে প্রকাশমান। যুযুৎসু পৃথিবীতে জিজীবিষু মানব আণবিক শক্তিকে ধ্বংস হইতে কল্যাণের পথে চালিত করিবে, শত বাধা বিপদের মধ্য দিয়া মানুষের অগ্রগতি অব্যাহত, মাঝে মাঝে এই আশার সুর বাজাইয়া 'বাঁশরিয়া' (piper) মানুষের বংশধরকে ভবিষ্যতের পথ দেখাইয়া দেয়।

ভ্রমসংশোধন

উদ্বোধনের গত (চৈত্র ১৩৬৩) সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিল্বমঙ্গলে' গিরিশ-পরিচিতি—প্রবন্ধের লেখকের নাম শ্রীকুঞ্জেশ্বর মিত্র। পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্বক ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

উদ্বোধন

স্ব-রচিত নাট্যে—

ত্বং শক্তিরেব জগতামখিলপ্রভাবা
ত্বন্নির্মিতঞ্চ সকলং খলু ভাবমাত্রম্।
ত্বং ক্রীড়সে নিজ-বিনির্মিত-মোহজালে
নাট্যে যথা বিহরতে স্বকৃতে নটো বৈ ॥

(দেবীভাগবত—১।৭।৪২)

জগজ্জননি ! তুমিই—সৃষ্টি স্থিতি লয়—সকল ক্রিয়ার শক্তিস্বরূপা ; কি জন্মদানে, কি লালন-পালনে, কি ধ্বংস-সাধনে, জীবজগতে সর্বত্র তোমারই প্রভাব অনুভূত হয়। এই অনন্ত বিশ্বে, স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু—সকলই তোমা হইতে তোমারই দ্বারা নির্মিত ; তুমিই একাধারে সব কিছুর উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ ; তুমি মাতা, তুমিই নির্মাতা।

[উর্ণনাভ (মাকড়সা) যেমন স্বনির্মিত স্ব-শরীরজাত জালে থাকিয়া প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি] তুমি তোমারই নির্মিত সংসার-মায়া-জালে থাকিয়া তুমিই খেলা করিতেছ ; যেন নাট্যকার নিজেরই রচিত নাটকে নিজেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়া বিভিন্ন চরিত্রে নানা রূপে, সুখে দুঃখে নানাভাবে অভিনয় করিয়া নিজেও আনন্দ পাইতেছেন, আবার নিজেরই নানারূপ সকলকে আনন্দ দিতেছেন ; সর্বদা কিন্তু স্বরূপে অবিকৃত, স্বরূপ অবিস্মৃত !

কথাপ্রসঙ্গে

জগৎ কি ধ্বংসের পথে?

সম্প্রতি জনৈক ভারতীয় ভূ-পর্যটক দ্বিচক্র-যানে ৫৩টি দেশের মধ্য দিয়া ৮৩,০০০ হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া অবশেষে কানাডায় উপনীত হইয়াছেন। ভারত-প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহার অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছেন, 'যখন যে দেশেই গিয়াছি সর্বত্র দেখিয়াছি সাধারণ মানুষ শান্তি চায়, এমনকি আফ্রিকার জঙ্গলের সিংহও স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়!' মাত্র এক জায়গায় একটি বন্যমহিষ তাঁহাকে অকারণে—হয়তো ভয়ে আক্রমণ করিয়াছিল। নতুবা সর্বত্র মানুষ পশু পাখী সর্বংসহা জননী পৃথিবীর বক্ষে সুখে ও শান্তিতে বাস করিতেই চাহে। অবশ্য জীবন-ধারণের জন্য খাদ্যসংগ্রহার্থে যতটুকু সংগ্রাম প্রয়োজন তাহা একান্তভাবেই জীবের ধর্ম। জীবন-বিস্তারের জন্য, স্বজাতি-প্রসারের জন্য দ্বন্দ্ব-মিলন সংহতি-সংঘর্ষ তাহাও জীবধর্ম! কিন্তু জীবন-রক্ষার্থেই জীবনান্ত করা—নিশ্চয় জীবধর্ম নয়।

অতএব আজ সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্যকুল যখন দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া—পরস্পরকে একই দোষে অভিযুক্ত করিয়া—আত্মরক্ষার নামে একে অপরকে ধ্বংস করিবার অপকৌশলে আত্মঘাতী হইবার উপক্রম করিয়াছে, তখন বিশেষভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে—জীবন-সংগ্রামের সীমা কোথায়? অসহায় মানবের জীবন-সংগ্রামের সার্থকতাই বা কি? আরও প্রশ্ন জাগিতেছে এই 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে' অবস্থিত আমাদেরই বা কর্তব্য কি?

গত দেড় শতাব্দী ধরিয়া ক্রমবিকাশবাদী জীববিজ্ঞানীরা মহামন্ত্রের মতো দুইটি মূলসূত্র শিখাইয়াছেন—'জীবনের জন্য সংগ্রাম' ও 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'। বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ক্রমোন্নতিশীল মারণাস্ত্র সহায়ে মারমুখী সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য-জাতিসমূহকে দেখিয়া তাহাদের প্রচারিত বিজ্ঞানের ঐ সত্যতায় আমরা সন্দিহান হইতেছি। জীবন-ধারণ ও জীবন-বিস্তারকেই একমাত্র উদ্দেশ্য ধরিয়া লইলে কিছুদিন পর পর এই প্রকার আসুরিক সংগ্রাম অনিবার্য, এবং কোটি কোটি জীবক্ষয়ের পর স্বাভাবিক নিয়মেই পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও খাদ্যে একটা সাম্য স্থাপিত হইয়া (equilibrium of food and population) সাময়িক শান্তি দেখা দেয়। কিছুদিন পরে আবার একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী বা মনুষ্যকৃত বিপর্যয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা যুদ্ধ-বিপ্লব আসিয়া লোকক্ষয় করে। ইহারই পুনরাবৃত্তি কি পৃথিবীর প্রকৃত ইতিহাস? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে—বিচিত্র মানবজাতি ও তাহার বিচিত্র কৃষ্টি নানাদেশে নানাভাবে বিকশিত হইত না।

'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'য়—মানবযাত্রী চলিয়াছে পুনরাবর্তনের সর্পিল গতিতে (spiral movement) কখন উঠিয়া কখন নামিয়া। উচ্চতর জীব মানুষের ক্ষেত্রে উদ্বর্তনের উচ্চতর কোনও নীতির প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। বিরামহীন একমুখী ক্রমবিকাশ প্রত্যক্ষ সত্য নয়। আজ তাই চিন্তানায়কদের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে, 'মানুষের উন্নতি হইতেছে, না অবনতি হইতেছে?' আজ সমাজ-বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়: অনন্ত জীবন-যাত্রার পথে মানুষের সঠিক অবস্থান কোথায়? মানুষের নিরপেক্ষ মূল্য—কিছু আছে কি? মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যথার্থ সম্বন্ধ কি? মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রকৃত সম্বন্ধই বা কি হওয়া উচিত?

গত চার শতাব্দী ধরিয়া আমরা শুনিতে শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, খৃষ্টধর্ম গ্রীকো-রোমান

ইওরোপে অন্ধকারযুগ আনিয়াছিল,—এবং ১৬শ শতাব্দীর তথাকথিত স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞান-গবেষণা 'নব জাগরণ' আনিয়াছে। আজ আবার কি দেখিতেছি? ঐ জাগরণ-স্রোত ধর্মচেতনাহীন বৌধ বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-প্রসূত মারণাস্ত্র—রাজনীতি ও অর্থনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ সমগ্র মানব জাতিকে মহামৃত্যুর গহ্বরে টানিয়া ফেলিতেছে। একপ্রকার মতবাদের কুসংস্কারের পরিবর্তে মানুষ আজ আর এক প্রকার মতবাদের কুসংস্কারের গর্তে নিপতিত। কে বলিবে কোন্‌টি ভাল, কোনটি মন্দ? উন্নততর সমাজচেতনা সহায়ে রাজনীতি ও বিজ্ঞানের এই অবৈধ সম্বন্ধ দূর করিতে না পারিলে, বা ঐ সম্বন্ধ কল্যাণজনক মঙ্গলসূত্রে বাঁধিতে না পারিলে এ যুগের মানুষের সম্মুখে যে বিপদ আসন্ন—অনুরূপ ভয়াবহ বিপদ মানবজাতির ইতিহাসে কখনও আসিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

সকল দেশের পুরাণেই অবশ্য পড়া যায় দৈত্য ড্র্যাগন প্রভৃতির অত্যাচার,—পরবর্তী যুগে তাহাই আবার রূপান্তরিত হইয়াছে—অসুর বর্বর প্রভৃতির প্রভৃতির দুর্ধর্ষ আচরণে। যখনই ঐ প্রকারে মানুষের শান্তি বিনষ্ট হইয়াছে—তখনই মানুষের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে বীর্যবান্ অশেষ-কল্যাণমূর্তি, যাহা অলৌকিক শক্তি-সহায়ে ঐ অশুভ শক্তিকে পরাভূত দূরীভূত করিয়াছে! সাধারণ মানবকুল ভয়ার্ত হইয়া দৈবশক্তির আবির্ভাবের জন্য আকুলভাবে ঊর্ধ্বদিকে তাকায়। দিব্যশক্তির আবির্ভাব হয় মানুষেরই হৃদয়ে সুপ্ত শুভ-চেতনার জাগরণ হইতেই! আমরা আজ তাহারই জাগরণের প্রতীক্ষা করিতেছি।

আশার কথা—জাগরণের সূচনা হইয়া গিয়াছে—বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে নয়—তাঁহারই মনোমন্দিরে! পরমাণুতত্ত্বের যাঁহারা স্রষ্টা তাঁহারা প্রথম লক্ষ্য করিলেন—তথাকথিত জড়পদার্থ অনির্দেশ্য গতিশীল হইয়া প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে; তাঁহারা বুঝিলেন জড় ও শক্তির রূপান্তর-লীলাই অহরহ সৃষ্টিপ্রলয় ঘটাইতেছে,—কি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অণুজগতে, কি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড নক্ষত্র নীহারিকার জগতে! বিজ্ঞানী স্তব্ধ বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন বুঝি বা এতদিনে সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল। এই মহা আবিষ্কারের আনন্দেই সেদিন বিজ্ঞানী মগ্ন ছিলেন। তখন কি তিনি জানিতেন—সৃষ্টির 'জীবন কাঠি'র মধ্যেই লুক্কায়িত আছে প্রলয়ের 'মরণ কাঠি'? তিনি কি জানিতেন—এই আণবিক শক্তি একদিন পৃথিবী-ধ্বংসে নিয়োজিত হইবে? জানিলেও তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বুদ্ধিমান্ মানুষ এই মহাশক্তিকে কল্যাণের কাজে না লাগাইয়া আত্ম-ধ্বংসে ব্যবহার করিবে!

তাই ত দেখা যায় মানবপ্রেমিক মহামনীষী আইনস্টাইন জীবনসায়াহ্নে দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, আজ যদি বৃত্তি-নির্বাচন করিবার প্রশ্ন উঠিত—বৈজ্ঞানিক না হইয়া রাজমিস্ত্রী হইতাম। তাই তো তিনি মৃত্যুর পূর্বে (১৮. ৪. ৫৫) আণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে সকল জাতিকে সতর্ক করিয়া একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া যান! আণবিক বোমার অন্যতম আবিষ্কর্তা ওপেনহেমার বিবেকের দংশন অনুভব করিয়াছেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দেই নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ স্বাক্ষরিত-পত্রে ঘোষণা করিয়াছেন:

"বিজ্ঞান মানুষকে আত্মঘাতী পথে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা শংকিত। পরমাণুকে মারণাস্ত্র করিলে রেডিওরশ্মি এরূপভাবে পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিবে যে সমগ্র মানবজাতির বিলোপ ঘটিবে।" (রয়টার: ১৫.৭.৫৫)

বৈজ্ঞানিকগণের এই সকল সতর্কবাণী সত্ত্বেও রাজনীতিকগণ অবোধ শিশুর মত এই আগুন লইয়া খেলা করিতেছেন। আত্মরক্ষার নামে সামরিক অস্ত্রসজ্জার মান আধুনিকতম করিয়া কল্পিত শত্রুর সমতুল হইবার জন্য তাঁহারা বলিতেছেন,—

আণবিক অস্ত্র অপরিহার্য! কেন? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি ইহা এককালে সকলেরই অব্যবহার্য বলিয়া ঘোষণা করা চলে না? না, তা চলে না—কারণ, মানুষ আজ মানুষের প্রতিই বিশ্বাস হারাইয়াছে। একদল মানুষ আর একদল মানুষকে বিশ্বাস করেনা। অতএব দেখা যাইতেছে—আণবিক বোমা নয়, ভ্রান্ত-মতবাদ-মূঢ় দুই দল মানুষের পরস্পরের প্রতি দরদহীন অবিশ্বাসই আজ সর্বনাশের মূল। তাই, প্রতীকার-কল্পে বলা যায় এই মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচাইবার একমাত্র মহামন্ত্র 'মানুষ, নিজেকে বিশ্বাস কর, নিজেকে জানো, নিজেকে ভালবাসো।' আত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মানব-প্রীতিই আজ বিশ্বগ্রাসী মহামৃত্যু রোধ করিতে পারে।

এ কথা অবশ্য সত্য, মানুষ মূলতঃ এক হইলেও জাতি ও প্রকৃতি হিসাবে বিচিত্র, বিভিন্ন। এত দিন এই বিভেদের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে; তাহার ফলস্বরূপ আমরা পাইয়াছি সম্মিলিত জাতি-সংঘ, যাহা শক্তিমান জাতিগুলির সংঘর্ষের মল্লক্ষেত্র। আজ সময় আসিয়াছে, যখন আর এই প্রতীয়মান ভেদের উপর জোর না দিয়া অন্তর্নিহিত একত্বের উপর জোর দিতে হইবে। তথাপি যে প্রকৃতিগত শুভ ও অশুভ শক্তির (forces of good and evil) বিভিন্নতা থাকিবে, তাহা দূরীভূত হইবে—অপরিহার্য ন্যায় যুদ্ধে। নিজেদের স্বার্থে যে কোন যুদ্ধকেই ন্যায় যুদ্ধ বলিয়া চালাইয়া পূর্বে ক্ষত্রিয়শক্তি রাজগণ, অধুনা বৈশ্যশক্তি ব্যবসায়িগণ শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে যুদ্ধে মাতাইয়া পৃথিবীকে রক্তাক্ত করিয়াছে।

বর্তমানের ব্যাপার একটু স্বতন্ত্র, এখন আর স্থানবিশেষে রক্তারক্তি নয়—এ যুদ্ধে বিজয়ী বিজিত উভয়েই নিশ্চিহ্ন হইবে, অথবা নিকৃষ্টতর জীবে বা দুর্বল পঙ্গু মানবে পরিণত হইবে। এই সকল দিক্ চিন্তা করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসী আজ সমস্বরে বলিতেছে, 'এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র সম্বরণ কর।' রাজনীতিকগণ অবশ্য বলিতেছেন, এতটা ভয়ের কিছু নাই—একপক্ষ নিজেরা আণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বিপক্ষকে ঐ সুযোগ না দিবার জন্যই শান্তির নামে এই আতঙ্কের ধুয়া তুলিয়াছেন। কাহাকে বিশ্বাস করিব? রাজনীতিকগণকে, ব্যবসায়িগণকে?—না বৈজ্ঞানিকগণকে, মানব প্রেমিকগণকে?

বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক জোলিও-কুরি বলিতেছেন (রয়টার: ২৩. ৪. ৫৭) 'নাগাসাকি ও হিরোশিমায় আণবিক বোমা যে প্রলয় ঘটাইয়াছে—তাহার ভয়াবহ স্মৃতি আমরা মুছিয়া ফেলিতে পারি না; তদপেক্ষা সহস্রগুণ শক্তিশালী উদজান বোমার পরীক্ষাকালের স্মৃতিও দুরপনেয়।'

তাঁহার মতে এই বিস্ফোরণের ফলে আকাশ বাতাস, জল ও মাটি—সকলই তেজস্ক্রিয়ভাবে দূষিত হইয়া যাইতেছে। বিশেষত ঐ বিস্ফোরণে প্রচুর পরিমাণে জাত ষ্ট্রন্‌শিয়াম-৯০ নামক পদার্থ আকাশে ভাসমান থাকিয়া ধীরে ধীরে, ৩০ বৎসর ধরিয়া ধূলা ও বৃষ্টির সহিত মাটিতে নামিয়া উদ্ভিদ্ জগতে, মানুষের খাদ্যশস্যে, এমন কি দুগ্ধে পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া অস্থিমজ্জায় গিয়া স্থিতিলাভ করিবে; এবং দুরারোগ্য ক্যানসার টিউমার প্রভৃতি রোগের প্রবণতা লইয়াই ভবিষ্যৎ মানব-শিশু জন্মগ্রহণ করিবে।

এই ভয়াবহ চিত্র আঁকিয়া বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন: পরীক্ষার ক্ষেত্র হইতে দূরে আছেন বলিয়া অনেকে এ বিষয়ে উদাসীন, কিন্তু তাঁহারা ভুল। আমরা প্রত্যেকেই এই মহা বিপদের মধ্যেই রহিয়াছি এবং যদি আণবিক অস্ত্রের জন্য এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ এখনই বন্ধ করা না হয়—আমাদের বংশধরগণকে আমরা আরও বিপদের মধ্যে ফেলিয়া যাইব।

অসলো হইতে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ দার্শনিক

ও মানব-সেবক ডক্টর সোয়াইট্‌জার (নোবেল শান্তি-পুরস্কার-প্রাপ্ত)—এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরীক্ষা বন্ধ করার জন্ত জনসাধারণের দাবী তুলিবার আবেদন জানাইয়া বলিয়াছেন : বিস্ফোরণ-তেজস্ক্রিয়তা মানব জাতির পক্ষে এক চরম দুর্ঘটনা। তিনি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন—যে দেশগুলি পরীক্ষা চালাইতেছে সে সকল দেশের জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই পরীক্ষা বন্ধ করার কোন কথা এখনও উঠে নাই। কিন্তু তাহাদের নেতাগণ ইহার ফলাফল সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত।

খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ ইষ্টার-উপলক্ষে তাহার বাণীতে সকল দেশের সকল ধর্মের নেতাদের নিকট আবেদন করিয়াছেন, মৃত্যুর জন্ত ব্যবহার না করিয়া আণবিক শক্তিকে সংযত সংঘত করিয়া মানব-সেবায় লাগানো হউক।

ভারতের প্রবীণ চিন্তানেতা শ্রীরাজাগোপালাচারী সুন্দরভাবে নিষ্ঠুর সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন 'আণবিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধ ত আরম্ভ হইয়াই গিয়াছে। এই যুদ্ধে শুধু শত্রু ধ্বংস হইবে না; শত্রু মিত্র নিরপেক্ষ, এমন কি ভবিষ্যৎ বংশ পর্যন্ত ধ্বংস হইবে। যে পরীক্ষায় সমগ্র বিশ্ব, মানবজাতি ধ্বংসের সম্মুখীন—তাহা বন্ধ করিতে বলার অধিকার—যুদ্ধে অনিচ্ছুক জাতিগুলির আছে কিনা—এ বিষয়ে আইনজ্ঞদের মত জানিতে চাহিয়া শ্রীনেহেরুর যে প্রস্তাব, তাহা তিনি সমর্থন করেন।

আমরা নিরাপদে আছি, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আসন্ন পরীক্ষা বিষয়ে উদাসীনতা সম্পর্কে সাবধান করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এখন আর নিরাপদ এলাকা বলিয়া কিছু নাই—আকাশের বাতাসই ক্রমশঃ বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার ডক্টর ইভ্যাট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, বারংবার প্রশান্ত-মহাসাগরে বিস্ফোরণ দ্বারা ঐ অঞ্চলের জীবন বিশেষ-ভাবে বিপন্ন হইতেছে। অষ্ট্রেলেসিয়ায়, দক্ষিণ আমেরিকায়, জাপানেও সমুদ্রের মাছে তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়িতেছে। সম্প্রতিকালে অস্বাভাবিক উষ্ণতা ও গলিত তুষার-জনিত বন্যা, অসময়ে ঘূর্ণিবাত্যা, অপরিমিত বৃষ্টি, গ্রীষ্মকালে তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করিতেছেন, তদুপরি তেজস্ক্রিয়তার ফলে হিরোশিমার ভাগ্যহত নরনারীর শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—তবে কি আমরা বিশ্ব-নাট্যের শেষ অঙ্কে উপনীত? তবে কি এইভাবেই সৃষ্টি ধ্বংস হইবে? মানুষের সভ্যতার গর্ব আজ ধূলি-ধূসরিত, বিজ্ঞানের দম্ভ আজ চূর্ণ! তাহারা আণবিক শক্তিকে আজ কাজে লাগাইয়াছে, কিন্তু সে আসুরিক স্বার্থ-সাধনে! আজ একান্ত প্রয়োজন মানবিক জাগরণ, মানুষের মন না জাগিলে—মানুষ নিজের মনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হইলে কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। স্পষ্টই প্রতীয়মান, ইয়োরোপের ভোগমুখী স্বার্থান্ধ জড়বাদই আজ মানুষের এই দুরবস্থার জন্ত দায়ী। আত্ম-সচেতন মানুষ জাগিয়া উঠিলেই আত্মঘাতী সকল প্রকার প্রচেষ্টার সার্থক প্রতীকার করিতে পারে এবং সর্ববিধ শক্তিকে সে কল্যাণের উদ্দেশে নিয়োজিত করিয়া মানবজাতির উন্নতির পরবর্তী অধ্যায় শুরু করিতে পারে। আমরা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি, এইরূপই হইবে।

ষাট বৎসর পূর্বে জড়বাদের লীলাক্ষেত্র পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অদূর ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন নেপথ্যে থাকিয়া যে কথা বলিয়া গিয়াছেন—কালপ্রবাহে যবনিকা উত্তোলিত হওয়ায় আজ তাহাই রূঢ়সত্যরূপে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান :

"Materialism and all its miseries can never be conquered by materialism. Armies when they attempt to conquer

armies only multiply and make brutes of humanity Spirituality must conquer the West. ... . . .The whole of the western world is on a volcano which may burst tomorrow, go to pieces tomorrow. They have searched every corner of the world and have found no respite They have drunk deep of the cup of pleasure, and found it vanity. Now is the time to work, so that India's spiritual ideas may penetrate deep into the west."

কাদা দিয়া কাদা ধোয়া যায় না। জড়বাদ-জাত দুঃখকষ্ট জড়বাদ দ্বারা দূর করা যায় না। চৈতন্যবাদ—অধ্যাত্মবাদ দ্বারাই ইহা সম্ভব।

'সমগ্র পাশ্চাত্ত্য দেশ যেন একটি আগ্নেয়-গিরির উপর অবস্থিত, আগামী কাল উহা ফাটিয়া যাইতে পারে—খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য জাতিরা পৃথিবীর কোণে কোণে খুঁজিয়াছে,—কোথাও শান্তি পায় নাই, ভোগের পাত্র পূর্ণমাত্রায় পান করিয়া জানিয়াছে, ইহা বৃথা। এখনই সময়, পাশ্চাত্ত্যের হৃদয়ে ভারতের অধ্যাত্মভাবধারা সঞ্চারিত করিবার।' ইহাতেই কল্যাণ, ইহাতেই অভয়, ইহাতেই শান্তি।

কিন্তু শক্তিমদমত্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রচালকগণ কি সত্যই শান্তির জন্য ব্যগ্র? মতবাদের কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন-দৃষ্টি নেতৃবৃন্দ কি সত্যই জগতের কল্যাণকামী? তবে তাঁহারা মতবাদের মোহ কাটাইয়া, কূটনৈতিক দ্বিমুখী আচরণ ত্যাগ করিয়া ঘোষণা করুন, 'আমরা শান্তি চাই, আমরা কল্যাণ চাই।'

সকল দেশের সকল জাতির প্রতিনিধি লইয়া বিশ্ব-শান্তি-সম্মেলন বা বিশ্ব-কল্যাণ-সংস্থার মাধ্যমে আজ একান্ত প্রয়োজনে এমন একটি কার্যসূচী, যাহা দ্বারা দেশ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে—শুধু মাত্র মানবতার ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল শুভশক্তি সংঘবদ্ধ হইতে পারে। এই মহাশক্তিই অশুভ-বুদ্ধি-চালিত অপর শক্তিকে পরাভূত করিয়া পৃথিবীর শান্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে শরীরে নূতন শক্তির আবির্ভাবে যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়—সংযত না হইলে তাহা ধ্বংসের কারণ হইতে পারে—তাহাই শান্ত সংযত হইয়া কল্যাণময় পৌরুষশক্তিতে পরিণত হয়। মনে হয় মানবজাতি আজ সেইরূপ এক বয়ঃসন্ধিতে উপনীত। জল ও বায়ুর শক্তি কাজে লাগাইয়া মানুষ একদিন ভীত ত্রস্ত পদে সভ্যতার পথে পা বাড়াইয়াছিল; পরবর্তী যুগে বাষ্প ও বিদ্যুৎকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সে দ্রুতপদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছে; আজ আণবিক শক্তির আবির্ভাবে সে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মানুষের অন্তর্নিহিত চৈতন্য-শক্তিতে বিশ্বাস করি, তাই আশা করি—আগামী যুগের মানুষ শুভবুদ্ধি সহায়ে জড়' আণবিক শক্তিকে কল্যাণ-কর্মে নিয়োজিত করিয়া সভ্যতাকে নূতন এক স্তরে উন্নীত করিবে।

প্রশ্ন ও উত্তর

সাংবাদিক : আণবিক শক্তি কি সত্যই মানুষের চরম ধ্বংস টানিয়া আনিবে?

আইনস্টাইন : মনে হয়—মানুষের স্বভাবেরই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বিদ্বেষ, ঘৃণা ও হিংসার স্থানে জয়ী হইবে—শুভেচ্ছা, সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক বুঝাপড়ার প্রচেষ্টা।

ভাবী সভ্যতার দিঙ্‌নির্ণয়

স্বামী বিবেকানন্দ

শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের দুঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারে। অন্য যে কোন জ্ঞান—কিছু সময়ের জন্য মাত্র আমাদের অভাব মিটাইতে পারে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলেই অভাববোধ চিরতরে বিদূরিত হয়।

দৈহিক শক্তির বিকাশ অবশ্যই বড় কথা; বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধী যন্ত্রসমূহের মধ্য দিয়া মনীষার যে অভিব্যক্তি, তাহাও অদ্ভুত বটে; তবুও আত্মিকশক্তি জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার তুলনায় এই সব শক্তি নগণ্য।

যন্ত্র কখনও মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না। যাহারা যন্ত্রসভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার করে তাহাদের মতে যন্ত্রের মধ্যেই সুখ নিহিত। বাস্তবিক কিন্তু সুখের উদ্ভব ও স্থিতি মনেই। মন যাহার বশে, সে-ই কেবল সুখী—অপর কেহ নহে। সমস্ত পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি যদি পাও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পরমাণুকে যদি করতলগত করিতে পার, তাহাতেই বা তোমার কি লাভ?

বাস্তবিক প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই মানুষের জন্ম; পাশ্চাত্ত্য জনগণ 'প্রকৃতি' বলিতে স্থূল অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতিকেই বুঝিয়া থাকে। অশেষ শক্তির আধার নদী, পর্বত, সাগর প্রভৃতি অসংখ্য বৈচিত্র্যের সমাবেশে এই বহিঃপ্রকৃতি সত্যই বিরাট! কিন্তু ইহা অপেক্ষাও এক মহত্তর প্রকৃতি—মানুষের অন্তর্জগৎ! এই অন্তর্জগতের সমীক্ষণেই প্রাচ্য-প্রতিভা সম্যক্‌ বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য-প্রতিভা।

পাশ্চাত্ত্য দেশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্যে অতীন্দ্রিয় জগৎ সেইরূপ। মানবজাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মত প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে; বোধ হয় সে প্রয়োজন আরও বেশী।

পার্থিব ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি ভাবিয়া বসে যে, ঐ শক্তিই একমাত্র কাম্য, উহাই প্রগতি ও সংস্কৃতি; যাহাদের বিত্ত-লালসা নাই, ঐহিক প্রতাপ নাই—তাহারা বাঁচিয়া থাকার অযোগ্য। পক্ষান্তরে অন্য কোন জাতি মনে করিতে পারে—নিছক জড়বাদী সভ্যতা একান্ত নিরর্থক! প্রত্যেকটিরই নিজস্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই দুইটি আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যই হইবে বর্তমানকালের মীমাংসা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(১) বচনসম্বল

কহে পণ্ডিত : "সূর্য যেমন দেয় তাপ আলো সবারে ভবে,
আমাদেরো ঠিক্ তেম্‌নি সবারে জ্ঞান ও শিক্ষা দিতেই হবে।"
পুছে জ্ঞানী : "প্রভু, পরকে জ্ঞান ও শিক্ষা যে দেবে বক্তৃতাতে—
খাসা কথা ; শুধু, পেয়েছ কি তাঁর আদেশ সবারে জ্ঞান বিলাতে ?"
পণ্ডিত করে ভ্রূকুটি : "আদেশ কার নাম ? আমি পেয়েছি প্রাণে
যে-জ্ঞানের আলো—তাকে বিলাতেই হবে পরার্থে শিক্ষাদানে।"
জ্ঞানী হাসে : "হায় ! জোনাকিও চায় দিতে পরার্থে আলো নিয়ত।
শুধু, স্ফুলিঙ্গ নাশে না আঁধার—দেখায় আঁধার গভীর কত।"

(২) ভুল বোঝা

কহিল শিষ্য সহর্ষে : "প্রতি জীবে রাজে হরি কৃপাধার ?
তবে কোথা ভয় ? নির্ভরে তাঁর ভবিব অকূল এ-পাথার।"
ছোটে পথে এক ক্ষ্যাপা হাতী। "পালা পালা"—সবে কহে সভয়ে।
শিষ্য অচল, বলে : "নির্ভর কই রে তোদের হৃদয়ে ?"
মাহুত হাঁকিল : "সাধু ! স'রে যাও—ক্ষ্যাপা হাতী !" সাধু হাসিল।
হাতীর পায়ের তলে সে আহত হ'য়ে দৈবাৎ বাঁচিল।
কাঁদে বিষণ্ণ : "প্রতি জীবে হরি, কেন গুরু তবে বলিলে ?"
"মাহুতেও হরি নাই কি ? তাহার নিষেধ কেন না শুনিলে ?"

(৩) ফোঁস

গুরু কয় : "হিংসারে ত্যজি' সাপ, ধন্য হ সাধি' প্রেম ভক্তি।"
হরি-প্রেমে মজি' সর্পের তাপ ঘুচে যায়—জয় নাম-শক্তি !
বালকের দল তারে পথে হায় বার বার কত কশা হানে যে !
হরিনাম জপি' সাপ স'রে যায়, হিংসারে ভুলেও না মানে সে।
মূর্ছিতে সেবি' আনি' চেতনায় গুরু পুছে : "ও কী দশা তোর ভাই।"
কহে সে : "কিছু না কশা-বেদনায়,—তার তরে গুরু কোনো ক্ষোভ নাই।
শুধু ভাবি—অহিংসা সেবিলাম, তবু কেন হ'ল ব্যথা বরিতে ?"
গুরু হাসে : "হিংসা নিষেধিলাম, মানা তো করি নি ফোঁস করিতে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন এসেছিলেন ?*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

ভগবানের আবির্ভাবের মূল কারণটি কি ? প্রলয়ের পর কিছুই থাকে না, এই সংসার স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে কারণে, কারণ থেকে মহাকারণে লয় হয়। তিনি নিজেকে আবার সৃষ্টি করেন : 'একোঽহম্ বহু স্যাম্ প্রজায়েয়' ; নিজেকে বহুরূপে আস্বাদ করার জন্য বহু রূপ সৃষ্টি করেন। এই হলো সৃষ্টিতত্ত্ব। একলা তৃপ্তি হচ্ছে না। তারপর সৃষ্টি করে কি করলেন ? সকলের মধ্যে রইলেন।

তুমি আমি যা কিছু দেখতে পাচ্ছি সব তাঁরই সৃষ্টি, তাঁতেই স্থিতিলাভ করছে ; আবার অন্তে তাঁতেই লয় পাচ্ছে। তিনি আত্মারূপে সকলের মধ্যে অবস্থান করছেন। তিনি নিজেকে কি ভাবে সৃষ্টি করছেন ? 'সম্ভবামি আত্মমায়য়া'—ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় করে নিজের মায়ার দ্বারা নিজেকে সৃষ্টি করছেন। এই শ্লোকে আগেই বলছেন—'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা'—আমি জন্ম-রহিত, অলুপ্ত-জ্ঞানশক্তি-স্বভাব। এই ভাবটা নিরাকার, নির্গুণভাব। এই থেকেই সব কিছু। তারপর বলছেন—'ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্'—আমি ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সর্বভূতের ঈশ্বর। নিজেই নিজেকে আস্বাদনের জন্য সৃষ্টি করছেন। তাই আমরা বলি—তুমি ঈশ্বর, আমরা জীব।

আর এক ধাপ নেমে এসে বলেছেন, যখনই ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান তখনই আমি আবির্ভূত হই। যিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, তিনিই আবার সগুণ সাকার, তিনিই ঈশ্বর। কোন গোলমাল নেই। ঠাকুর একটা ছোট উপমায় কেমন বুঝিয়েছেন দেখ : বাড়ীতে মাছ এলো, তিন চারটি ছেলে, মাকে নানা রকম ব্যঞ্জন করতে হয় ; যে ছেলের লিভার বেশ ভাল, তার জন্য মাছের কালিয়া পোলাও ; যার লিভার একটু খারাপ তার জন্য হয়তো মাছের ঝাল ; আবার যার লিভার একেবারে খারাপ তার জন্য হলুদ দিয়ে ঝোল ; যার যেমন পেটে সয়। সগুণ রূপেই ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ভগবানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক করে নিতে হয়। তবে অধিকারী ভেদে সাকার নিরাকার সাধন। ত্রিগুণাত্মিকা জগদম্বার সঙ্গে রামপ্রসাদের কেমন একটা সম্বন্ধ ; মার সঙ্গে ঝগড়া করতেন। ভগবান ভক্তদের আপনার করে নেন। ঠাকুর নানাভাবে তাঁকে আস্বাদ করেছেন। ব্রাহ্মরা, আর্যসমাজীরা এ সব মানতো না। খ্রীষ্টানরা তাদের অবতার ছাড়া অন্য আর কিছু মানতো না। এই ঝগড়া মেটাবার জন্যই তাঁর আগমন। 'যত মত তত পথ' এই বাণী দিয়ে গেলেন। স্বামীজী এই বাণীটুকু চিকাগো ধর্মসভায় গিয়ে বলেন। স্বামীজী হলেন বর্তমানের প্রতীক, আর ঠাকুর প্রাচীন ভারতের যত সাধনা আছে বেদ বেদান্ত উপনিষদে—সব তিনি সাধন করেছেন, আবার বর্তমানের যত সাধনা তাও করেছেন। তিনি প্রাচীন ও নবীনের যোগসাধন করলেন। ঠাকুর সেই প্রাচীন কৃষ্টির মূর্ত প্রতীক, আর স্বামীজী এ যুগের দর্শন-বিজ্ঞানের ও বর্তমানের মূর্ত প্রতীক। এই দুই প্রতীকের মিলন করে, ধর্মস্থাপনের জন্য যে তাঁর আবির্ভাব—তাই বোঝালেন।

* লক্ষ্ণৌ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ২২.৯.৫৬ তারিখে প্রদত্ত পূজ্যপাদ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীজয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত।

১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধ হয়, তারপর থেকেই ইংরেজেরা আস্তে আস্তে ঢুকলো ভারতবর্ষে। ১৮৩৬ খৃঃ ঠাকুরের জন্ম হ'ল। এলেন দক্ষিণেশ্বরে তারপর চললো তাঁর সাধনা; এ সাধনার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। Challenge (জোর) করে বলতে পারি সর্বধর্মের সাধনার দ্বারা সত্য অনুভূতি করে সমন্বয় তিনি করে গেছেন। তিনি কোন সম্প্রদায় স্থাপন করতে আসেন নি। বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি কি ছিলেন? পূজারী মাত্র। ৫৲ মাহিনা আর ২ খানা কাপড় বছরে ছিল বরাদ্দ। সভ্য জগতের অপাঙ্‌ক্তেয়—আর আজ দেখ, সভ্যজগতের বড় বড় দার্শনিকরা তাঁর ভাব নিচ্ছেন, তাঁর নাম জপ করছেন। কেউ বিশ্বাস করবে? দেখ, পাগল পূজারী তাঁর মধ্যে কি শক্তির আবির্ভাব। সাক্ষাৎ ভগবান যে কথা বলছেন—লোকে মাথা পেতে নেবে না?

কলিকাতায় সে সময় ধর্মের খুব আন্দোলন চলছে। কলিকাতার মনীষীদের ভেতর খৃষ্টান মিশনারিদের খুব প্রভাব। মিশনারিরা—শুধু ধর্ম প্রচার করতেন না, আবার কলেজে প্রফেসারিও করতেন। যুবকবৃন্দ তাঁদের পড়ানোতে একেবারে মেতে যেত। তাঁরা যা বলতেন ছেলেরা তাই করত। কত ছেলে খৃষ্টান হয়ে গেল। আর তাদের কাছে শিখতো, ভারতের ধর্মে যা কিছু আছে—সব কুসংস্কার। ব্রাহ্ম সমাজে আবার একটা ফরম্ সই করতে হত, ফরমে লেখা থাকত 'আমি মূর্তি পূজা মানি না, ইত্যাদি।' এদিকে আবার আর্যসমাজ। চারিদিকে নানা সম্প্রদায়। খৃষ্টান ডাকছে, মন্দির ছেড়ে এসো আমাদের গীর্জায়, মন্দিরে কিছু নেই। মুসলমানরা ডাকছে, আমাদের মসজিদে এসো। শিখেরা ডাকছে, আমাদের গুরুদ্বারে এসো। যখন ধর্মের এই সব বিরোধ চলেছে, গ্লানি হয়েছে, ঠাকুর এলেন মায়ের পূজারী হয়ে। বলছেন, মা দেখা দে। সরল ভাবে, ব্যাকুলতার সঙ্গে ডাকছেন। বারো বছর সাধনা করে কত দেব-দেবীর দর্শন পেলেন। অদ্ভুত তাঁর সাধনা। যখন যে ভাবের সাধনা চলেছে তখন সেই ভাবের গুরু আসছেন। এত সাধনা করে তিনি কি পেলেন? দেখলেন 'যত মত তত পথ'। কেশব সেনকে বলছেন, এই যে মূর্তিপূজা নিয়ে ঝগড়া, এ সব অজ্ঞানের কথা।

স্বামীজী ঠাকুরের কাছে এসে আগে কত তর্ক করতেন, মতের সঙ্গে মিলত না বলে। প্রথমে এসে বললেন, মশায় এ কথা মানি না—'সব ব্রহ্মময়' ঘটি ব্রহ্ম, বাটি ব্রহ্ম। ঠাকুর চুপ করে আছেন। একদিন ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ করে দিব্যচক্ষু দিলেন, তখন দেখছেন সব চিন্ময়। স্বামীজী মূর্তি-পূজা প্রথমে মানতেন না। পরে দুঃখ করে বলতেন, 'আমি তাঁকে কতবার বলেছি মূর্তি-পূজা ভুল'। কত বক্তৃতায় বলেছেন, 'আমি এমন একজনের পায়ের তলায় বসে শিক্ষা করেছি যিনি মূর্তি-পূজা থেকে সব পেয়েছেন, মূর্তি-পূজা করে যদি তাঁর মত হতে পারি, আমি একটা কেন একশোটা মূর্তি পূজা করতে পারি। স্বামীজী বললেন, 'Man is not travelling from error to truth, but from truth to truth from lower to higher truth'—(মানুষ ভুল থেকে সত্যে যায় না, সত্য থেকে সত্যে, নিম্ন সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে যায়)। ঠাকুর দ্বাদশ বৎসরর সাধনা করে কি দিয়ে গেলেন? শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে কথা বলে গেছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি। ঠাকুরের জীবনই এর দৃষ্টান্ত। তিনি ধর্মের পরিপূর্ণ রূপ।

আমাদের এত কৃষ্টি রয়েছে, কিন্তু বিলেতের একটু ছাপ না হলে আমরা নিই না। মনীষীদের নাম করতে বললে Huxleyর নাম করবে অনেকে। ঋষিদের নাম কেউ করবে? স্বামীজী যখন ঠাকুরের

কথা ধর্ম-মহাসভায় বললেন তখন লোকে আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগলো কে এই সন্ন্যাসী! আগে তাঁর সম্বন্ধে কত রটিয়েছিল। এখন বিবেকানন্দের কথা মাথা পেতে নিল।

ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে সাকার নিরাকার কেমন বুঝিয়ে দিচ্ছেন। চারজন লোক জঙ্গলে গিছলো। একজন দেখলে গিরগিটিটা লাল। আর একজন বললে, ও লাল কেন হতে যাবে? সবুজ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর একজন বললে, তুমি মিথ্যাবাদী, আমি বেশ জানি—লালও নয়, সবুজও নয়, আমি দেখেছি নীল। আর একজন বললে, ও নীল কেন হতে যাবে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি হলদে। এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। সকলে জানে, আমি যা দেখেছি, তাই ঠিক। এই রকম সম্প্রদায়ের নামে কত রক্তপাত হয়েছে। ঠাকুর তো নিজের নাম করবেন না। সেইজন্য বলছেন তাদের ঝগড়া দেখে একজন লোক এসে জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপার কি? সব শুনে বললেন, এই ব্যাপার? আমি ঐ গাছতলাতেই থাকি; আর ঐ জানোয়ারটাকে আমি চিনি। তোমরা তো মাত্র একবারই দেখেছ। তোমরা প্রত্যেকেই যা বলছ, তা সব সত্য; ও গিরগিটিটা কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন আবার কোন রঙ নেই। নির্গুণ। ওই লোকটি কে? স্বয়ং তিনি।

অরূপ থেকে রূপে আসা, কেশব সেনকে কেমন বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বাঁশীর সাতটা ফোকর আছে তা থেকে কত রাগ রাগিনী উঠছে—আর একটাতে কেবল একটি সুরই উঠছে। কেশব সেনকে বলছেন, ওই হ'ল তোমার নিরাকারের ভোঁ। আমার কি ভাব জানো? আমি সাতটা ফোকরে সানাই বাজাই। আমি এক থেকে বহুতে যাই; বহু থেকে একে আসি। আবার এক দুইএর পারেও যাই।

একটা লোক গামলায় রঙ গুলে রেখেছিল তার কাছে কেউ রঙ করাতে আসলে জিজ্ঞাসা করতো তুমি কি রঙে ছোপাবে? সে হয়ত বলতো লাল। অমনি গামলার রঙে ডুবিয়ে লাল রঙ করে ফেরত দিত। আবার কেউ হয়তো বলত, নীল। ওই গামলার রঙে ডুবিয়ে নীল করে দিত। একটি লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি রঙে ছোপাবে? সে বললে, তুমি যে রঙে ছুপেছ, আমায় সেই রঙে ছুপিয়ে দাও। তাঁর কাছে শাক্তরা আসছে, ব্রাহ্মরা আসছে, বৈষ্ণবরা আসছে। তিনি গামলায় রঙ গুলে বসে আছেন, যে যা ভাব চাইছে, যা রঙ চাইছে—তাই দিচ্ছেন।

তাঁর ওই সমন্বয়ের ভাবটি এগিয়ে আসছে। চারিদিকেই একটা আলোড়ন চলেছে। জমি পরিষ্কার হয়ে গেলে সমন্বয়-ভাব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। সকলেই আমরা ভাই ভাই। সকলের ধর্মকে জানতে হবে, মানতে হবে, সহ্য করে নিতে হবে। এখন দিন দিন এই সব হচ্ছে। কেবলমাত্র মুখে, 'আমরা এক' বললে হবে না। শুধু বাহিরে পাতা পেতে একসঙ্গে বসে খেলেও হবে না। ভেতর থেকে এক হতে হবে!

*　　*　　*

তাঁর আর একটি ভাব—"মাতৃত্ব-জাগরণ"। এই মাতৃভাবের জাগরণের জন্য তিনি এসেছিলেন। দেখ প্রথমে 'মা মা' করে কেঁদে অস্থির। জোর করে মাকে দর্শন করলেন। দর্শন করে কত আনন্দ হ'ল। এই আনন্দ যাতে অবাধে থাকে সেই জন্য অস্থির হলেন। সে কি ব্যাকুলতা! চন্দ্রামণির প্রাণ অস্থির হ'ল। তিনি গদাধরকে কামারপুকুরে নিয়ে এলেন। ছেলে 'ধর্ম ধর্ম' করলে অন্যান্য মায়েরা যেমন ছেলের বিয়ে দিতে চান তিনিও তাই চেষ্টা করলেন। মা চারিদিকে পাত্রী খুঁজছেন। তিনি টের পেয়ে বললেন, মা কোথায় খুঁজছ, দেখগে জয়রামবাটীতে রামমুখুজ্জ্যের মেয়ে 'কুটো বাঁধা' আছে।

দেখ ওই পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়ে কত অভিনয় করলেন। বুদ্ধদেব নারীকে ত্যাগ করেছিলেন। তিনি কি করলেন? মেয়েমানুষে মাতৃত্ব-বুদ্ধি জাগালেন। এই ভাবটা চলে গিয়েছিল; কোন জাতির মধ্যে নেই। অভিনয়ে কি করলেন? নিজে সন্তান হয়ে মাকে 'ষোড়শী'রূপে পূজা করলেন। এর উদ্দেশ্য মাতৃত্ব-জাগরণ। ছেলেবেলায় ধনী-কামারনীকে ভিক্ষা-মা করলেন। তারপর ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে গুরু করলেন।

একমাত্র স্বামীজী তাঁর 'ষোড়শী'পূজার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন—নারীশক্তির জাগরণ; তাই নিবেদিতাকে আনলেন। নিবেদিতা মেয়েদের নিয়ে স্কুল করবেন। মা বেঁচে থাকতে থাকতে স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে মার কাছে রেখে শিক্ষা দেবেন। স্বামীজী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। মা গড়ে তুলবেন কতকগুলি আদর্শ ব্রহ্মচারিণী। সমাজ তখন দিলে না এমন মেয়ে। কিন্তু স্বামীজী বলেছিলেন—এমন দিন আসবে যেদিন গঙ্গার অপর পারে মেয়েদেরও একটি মঠ হবে। তিনি সত্য-সঙ্কল্প পুরুষ ছিলেন। এখন সেই মঠ হয়েছে। কত qualified (গুণসম্পন্ন) মেয়েরা এসে যোগদান করছেন। ভবিষ্যতে তাঁরা আত্মনির্ভর হয়ে দাঁড়াবেন। তাঁরাও ভারতে ও বাহিরে বেদান্ত প্রচার করবেন।

ঠাকুর মাকে পূজা করে কুণ্ডলিনী জাগালেন। এই যে স্ত্রীকে পূজা করা, মেয়ে মানুষকে গুরু করা—এর দৃষ্টান্ত আর কোথায়? এই মাতৃত্ব-ভাবটি সকল নারীজাতির মধ্যে জাগানো চাই। আজকাল মেয়েরা বাহিরে এসে অনেক বড় বড় কাজ করছেন, উচ্চ পদও অধিকার করছেন, কিন্তু মাতৃত্ব কোথায়?

* * *

ঠাকুরের তৃতীয় ভাব—"শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা"।

ঠাকুর বঙ্কিমবাবুকে বলছেন, এক হাতে টাকা আর এক হাতে মাটি নিয়ে বলতাম, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা', এই রকম কয়েকবার বলে দুই-ই গঙ্গার জলে ফেলে দিতাম। বঙ্কিমবাবু শুনে বললেন, 'বলেন কি মশায়, চারটা পয়সা থাকলে লোকের কত উপকার করা যায়।' ঠাকুর একটু চুপ করে থেকে ভাবে বলছেন, 'কার উপকার? সর্বভূতে হরি রয়েছেন। সেই হরির সেবা—নিজের উপকারের জন্য। এই সেবার পিছনে যদি নাম-যশ আকাঙ্ক্ষা না থাকে তবেই এতে চিত্ত-শুদ্ধি হয়।' বঙ্কিমবাবু শুনে অবাক!

ঠাকুর আর একদিন বলছেন, 'বৈষ্ণব সেবা, জীবে দয়া'। 'জীবে দয়া! জীবে দয়া! জীবে দয়া?' 'জীবে দয়া' কথাটি তিন বার বললেন, তারপর ভাবে বলছেন—'জীবে দয়া কিরে? শিব-জ্ঞানে জীবের সেবা।' স্বামীজী শুনলেন, বেরিয়ে এসে গুরুভাইদের বললেন, 'আজ একটা নূতন আলো পেলাম। ভগবান যদি দিন দেন জগৎকে দেখাব। তাঁর সত্য সঙ্কল্প দেখ, মিশন সেবাশ্রম সব হ'ল। 'দয়া' কথাটা একেবারে উঠিয়ে দাও। তিনি একটা নূতন আলোক দিয়ে গেলেন,—'সেবা, সেবা'।

ঠাকুর এবার জগৎকে তিনটি ভাব দিয়ে গেলেন—সর্বধর্মসমন্বয়, নারী-জাতিতে মাতৃবুদ্ধি, আর শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা।

এক ঈশ্বর, তাঁর নানা নাম। সকলে এক জিনিসকেই চাইছে—তবে আলাদা পাত্র, আলাদা নাম।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রশস্তি

শ্রীদিব্যপ্রভা ভরালী

কবিতার অর্ঘ্য রচি নিবেদিব চরণে তোমার
নাহি সে শকতি মোর, দুর্বল এ হৃদয়-বীণার
মূর্ছনা অবশ ক্ষীণ, বেদনা-বিধুত সুর-ধ্বনি
চির জনমের রুদ্ধ বাষ্পাবেগ সেথা দিব আনি ?
মূর্ছিত সংগীত সুরহারা মূক নিঃস্বতায়
অনাদি কালের গীতি লুটে যার চরণ-ধূলায় ।
নির্বাক্ যেথানে কবিপ্রাণ, বৃথা যত গুঞ্জরণ
ক্ষণিকের কাব্যোচ্ছ্বাস, ব্যথাহত হৃদয়-স্পন্দন ।
কবি কাব্য শ্রোতা ও উদ্গাতা যেথা এক, বহু নহে—
যেথা শান্তি সুবিমল অক্ষয় আনন্দ-ধারা বহে !

কবি তুমি, প্রথম পুরাণ বাজায়েছ বাঁশী তব
কত তানে, কত সুরে, কত ছন্দে নিত্য নব নব,
এ বিশ্বভুবনে কত অবিরাম সংগীত-হিল্লোল,
অনন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ, অন্তহীন জীবন-কল্লোল !
রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে সৃষ্টি তব স্বরূপ-বিকাশ ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি, উদ্বেলিত আনন্দ-বিলাস !
অরূপ অমৃত ভাতি ! বিরাজিছ স্বীয় মহিমায়
কত রূপে কত স্থলে জ্যোতির্ময় দীপ্ত গরিমায় ।
তব লীলা নৃত্য ছন্দে—জাগে বিশ্ব, নাচে বসুন্ধরা,
তব তেজে দীপ্তিমান্ জ্বলে নভে চন্দ্র সূর্য তারা ।
সে কোন্ বিস্মৃত যুগে আলোকের নব উন্মেষণে
ছুটিল তৃষিত প্রাণ হে অমৃত ! তোমার সন্ধানে ;
কোন্ সেই মন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষির হৃদয়-গুহায়
বিচ্ছুরিলে দিব্যজ্যোতি হে অসীম জ্ঞানের সীমায় ?

তমসার অন্তরালে দেখা দিলে আদিত্যবরণ,
কবে তুমি পুরুষপ্রধান, নিত্য শুদ্ধ সনাতন ?

তনু ধরি এলে পুনঃ এ মরতে যুগ-অবতার,
জেনেছি তোমায় আজি, তুমি প্রেম-করুণা-আধার !
অমৃতের বার্তাবাহী ! জাগাইলে তুমি সুপ্ত প্রাণ
চৈতন্যের দিব্যালোকে, যুগান্তের শোনালে আহ্বান ।
ক্ষুরধারা সম পথে সুকঠিন সাধনায় রত,
বরে নিলে জীবনের দুঃসহ কঠোর তব ব্রত ।
দুখী, তাপী, পাপী কত নিল তব চরণে শরণ
গুরু, ইষ্ট, পিতৃরূপে করিলে করুণা বিতরণ ।
যুগের দেবতা ওগো পরমপুরুষ ভগবান
যুগে যুগে আসিয়াছ জীবরে করিতে পরিত্রাণ ।

অচিন্ত্য অব্যক্ত তত্ত্ব, ওগো দীপ্ত চৈতন্য অদ্বয়,
অখণ্ড জগৎ-সত্তা, পূর্ণ হতে পূর্ণের উদয় ।
জাগো মম হৃদয়-মন্দিরে আজি হে অমর-জ্যোতি !
জাগো জগতের প্রাণে সত্য শিব সুন্দর মুরতি
অনন্ত সংগীত-ছন্দে রন্ধ্রে রন্ধ্রে মানব-হিয়ার—
শোনাও অভয় মন্ত্র 'মাভৈঃ মাভৈঃ'—অমোঘ ঝঙ্কার !
জাগো আলোকের বর্ত্মে সদা জন্ম-জরা-মৃত্যুহীন,
বিশ্বের বিপুল ব্যথা করো আজি ভূমানন্দে লীন !
দূর করো অমানিশা অন্ধকার মানব-হিয়ার,
চির তমসার গ্লানি জীবনের দীন হাহাকার ।

বুদ্ধ

শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী

(সম্পাদক, 'জগজ্জ্যোতি')

শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। এই তিথি ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব, তিরোভাব ও সিদ্ধি এই তিনটি প্রধান ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। এইভাবে পূর্ণিমার সহিত বুদ্ধজীবনের যোগ পূর্ণতারই সংকেত বলিয়া আমরা মানিয়া লইতে পারি। সহজ কথায় বলিতে গেলে, বুদ্ধত্ব সকল প্রকার পারমী বা পূর্ণতারই অভিব্যক্তি। এমন পূর্ণ বিকশিত জীবনের উপলব্ধি সহজসাধ্য নয়। তাই বুদ্ধের সমসাময়িক এক পরিব্রাজক উক্তি করিয়াছিলেন,—

'কোচাহং ভো সমণস্স গোতমস্স পঞ্‌ঞাবেয্যত্তিয' জানিস্সামি, সো পি নূন'স্স তাদিসো যো সমণস্স গোতমস্স পঞ্‌ঞাবেয্যত্তিযং জানেয্য।' (মজ্‌ঝিম নিকায়)

অর্থাৎ বুদ্ধকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্য এক বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন। এইজন্য তিনি মানবসমাজের কাছে এক চিরদুর্জ্ঞেয় মহারহস্য হইয়া আছেন। মানুষের উপলব্ধির অতীত হইলেও মানুষ তাঁহাকে যুগ যুগান্তর ধরিয়া জানিতে চাহিয়াছে। এই জানার আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হইয়াছে—শিল্পে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে, দর্শনে এবং ইতিহাসে। তাঁহাকে জানার এই সমারোহের মধ্যে তাঁহার যে খণ্ড পরিচয় মানুষের মনে বাজে, তাহা তাহার মনকে অভিভূত করে; তাই সে তাঁহাকে জানার আকাঙ্ক্ষা রোধ করিতে পারে না। এই জানার প্রয়াস দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

বুদ্ধ-জীবনের পূর্বে তাঁহার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বুদ্ধাঙ্কুর বা বোধিসত্ত সিদ্ধার্থরূপে। তাঁহার সেই জীবন তাঁহার কথায় স্পষ্ট—

'পুব্বেব মে ভিক্‌খবে সম্বোধা বোধিসত্তস্সেব সত্তো অহম্পি সুদং অনরিয পরিযেসনং অনুযুত্তো বিহরামি।' (অরিযপরিযেসন সুত্ত)।

অর্থাৎ 'সম্বোধি লাভের পূর্বে বোধিসত্তাবস্থায় আমিও অনার্য সন্ধানে রত ছিলাম।' এই বাক্যের তাৎপর্য এই—বোধিসত্ত-জীবনে তিনি সংসারধর্ম মানিয়া সংসারী লোকের মত স্ত্রী-পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও ধনসম্পদ লইয়া বিষয়ভোগে মগ্ন ছিলেন, এই মগ্নভাব বেশীদিন রহিল না; নেশা কাটিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন নিজের কথা, ভাবিলেন বন্ধুবান্ধবের কথা, ভাবিলেন ভোগসম্পদের কথা—আমি তো জন্ম জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন; আবার বন্ধুবান্ধবগণও জন্ম জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-পরিবৃত, এই ভোগসম্পদের পরিণতিও তাহাই; তবে কেন আমি জরা-মৃত্যুর অধীন হইয়া জরা-মৃত্যুর অধীনকেই খুঁজিতেছি—জন্ম-জরা ইত্যাদি হইতে মুক্তির পথ খুঁজিতেছি না কেন? এইখানেই তাঁহার জীবনের মোড় ফিরিয়া গেল। অন্তরে এমন একটি জীবনের ছায়াপাত হইল, যে জীবন জন্ম জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অতীত, নির্মল, নির্ভয় এবং অনুত্তর। তাই তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 'অজাতং অনুত্তরং যোগক্‌খেমং নিব্বাণং পরিযেসিস্সামি·········।' এইখানেই তাঁহার ভোগ-জীবনের উপর যবনিকাপাত হয়।

সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ভারতের তৎকালীন সাধনা-পদ্ধতির সঙ্গে একে একে তাঁহার পরিচয় হইতে লাগিল। তিনি কোনটিকে উপেক্ষা করেন নাই, প্রত্যেকটিকে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করিলেন। উচ্চতম ধ্যানপদ্ধতি হইতে খেচরীমুদ্রা পর্যন্ত তাঁহার সাধনায় কিছুই বাদ পড়ে নাই। এই সমস্ত সাধনাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হইয়া তাঁহার মনে জাগিল—বিশিষ্টতর সাধনা এখনও সম্মুখে। একটির পর একটির সহিত পরিচিত হইয়া তিনি শুধু এই কথা বলিয়াছেন,

'অনলং' অর্থাৎ ইহা যথেষ্ট নয়, আরও চলিতে হইবে। মনের এই উন্নতিশীল ভাব লইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইতে চির-আকাঙ্ক্ষিত শুভ মুহূর্ত আসিয়া পড়িল সেই বৈশাখী পূর্ণিমায়। তাঁহার মনে জাগিল এক অপূর্ব আলোকের অনুভূতি। তিনি চক্ষু মুদিয়া বসিলেন সেই অশ্বত্থ-তরুর ছায়ায়। মন ক্রমশঃ ধ্যানের বিভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইল। তাঁহার সমাহিত চিত্ত পূর্বনিবাসানুস্মৃতির দিকে অগ্রসর হইয়া জন্ম-জন্মান্তরের যবনিকা ছিন্ন করিল। তিনি দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর মত জন্ম-জন্মান্তরের চিত্র দেখিতে লাগিলেন। রাত্রির দ্বিতীয় যামে চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান তাঁহার আয়ত্ত হইল—জন্মমৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। তৃতীয় যামে হইল আস্রবক্ষয় জ্ঞানের উদয়—অন্তরের সমস্ত মারসৈন্য বা রিপু দলকে নির্মূলিত করিয়া চিত্ত হইল মুক্ত, বন্ধনহীন। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে, 'অনুত্তরং যোগক্খেমং নিব্বাণং অজ্ঝাগমং' অর্থাৎ অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ অধিগত হইলাম। এইখানেই তাঁহার বুদ্ধজীবনের বিকাশ, সাধনার পরিপূর্ণতা, কর্তব্যের অবসান—'নত্থি উত্তরি করণীয়ং'। এই অবস্থাকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, ভাষা এইখানে মূক, মানবের চিন্তাধারা এইখানে স্তব্ধ।

বুদ্ধত্ব একা বুদ্ধের জন্য নহে, বিশ্ব-মানবের জন্য। তাঁহার মহাসাধনা শুধু নিজের জন্য নহে, সকলের জন্য। তাঁহার হৃদয় গলিয়াছে বিভ্রান্ত বিশ্বজনের দুর্দশায়। যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া আত্মমুক্তির আবেগে ভাবিয়াছিলেন, 'অনন্ত শান্তির অনন্ত আনন্দের নির্ঝর স্বরূপ যে সত্য আমি কঠিন সাধনায় উপলব্ধি করিলাম, সেই সত্য ভোগবিলাসমগ্ন মানুষের মধ্যে প্রচার করিয়া কি লাভ হইবে? কামনা ও বিদ্বেষে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষ এই দুর্জ্ঞেয় গভীর সত্য কি উপলব্ধি করিতে পারিবে?' তিনিই পরক্ষণে আত্মমুক্তির চেতনা অতিক্রম করিয়া বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, 'অপারুতা তেসং অমতস্‌স দ্বারা' অর্থাৎ তাহাদের জন্য অমৃতের দ্বার উন্মুক্ত হউক। এইখানেই তাঁহার মুক্তি বিশ্ব মানবের মুক্তির সঙ্গে এক হইয়া গেল। সেই হইতে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করিলেন সকলের কল্যাণে। নির্জনে মুক্তির আনন্দভোগ পরিহার করিয়া জনসঙ্ঘের মধ্যে তিনি আপনাকে টানিয়া আনিলেন। যে সন্ধানীরা তাঁহার সান্নিধ্যলাভে আলোকের সন্ধান পাইলেন, তাঁহাদের অন্তরেও সেই উদার চেতনা জাগাইয়া দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিলেন, 'চরথ ভিক্‌খবে চারিকং বহুজন-হিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় ......।' এই নির্দেশের মধ্যে ইহা পরিস্ফুট—মুক্তি শুধু নিজের জন্য নহে, পরকেও মুক্ত করিতে হইবে।

এই বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র পৃথিবীর বুকে আনিয়াছিল এক আলোকময় জাগরণ। দুর্লঙ্ঘ্য গিরি, দুস্তর সমুদ্র তাহার প্রসারকে ব্যাহত করে নাই। সংকীর্ণ দেশাচারের প্রাচীর তাহাকে বাধা দান করিতে পারে নাই। অনায়াসে সমগ্র এশিয়াখণ্ডে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রভাব। এই মহামন্ত্রের উদ্‌গাতা ভগবান বুদ্ধ মানুষের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করেন নাই, সমগ্র মানবগোষ্ঠিকে এক করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষ স্বকৃত কর্মের জন্য উচ্চনীচ হয়; কর্ম মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে এবং কর্ম মানুষকে পশুস্তরে নামাইয়া দেয়। অতএব মানুষের চরিত্রগঠনের ভার মানুষেরই হাতে। এইজন্য তিনি নিজেকে ত্রাণকর্তা বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং স্পষ্ট কথায় ভিক্ষুদের বলিয়াছেন—

> 'অত্তদীপা ভিক্‌খবে বিহরথ, অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা,
> ধম্মদীপা ভিক্‌খবে বিহরথ ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা।
> —(মহাপরিনিব্বাণসুত্ত)

অর্থাৎ 'হে ভিক্ষুগণ, নিজের প্রতিষ্ঠা নিজে গড়, নিজের দীপ নিজে জ্বাল, নিজের মধ্যে আশ্রয় লও, অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইও না; ধর্মকে

ভিত্তি কর, ধর্মের দীপ জ্বাল, ধর্মের আশ্রয় লও।' তিনি মানুষকে শুধু আত্মনির্ভর হইতে বলেন নাই, তাহার যুক্তিবিচারকে—চিন্তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সত্যের পথে অগ্রসর হইতেও নির্দেশ দিয়াছেন। পরের পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতার মায়াজালে আবদ্ধ না হইয়া যথাযথভাবে শাস্ত্রোক্তকে বিচার করিয়া গ্রহণের নির্দেশ 'অঙ্গুত্তর নিকায়ে'র 'কালাম সূত্রে' সুস্পষ্ট।

বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, প্রচারকগণ সাধারণতঃ পরের আদর্শ ও পরের ভাবকে খর্ব করিয়া নিজের আদর্শ ও নিজের ভাবকে বড় করিয়া দেখান; কিন্তু ইহা তথাগত-গর্হিত। তিনি প্রচারকগণের এই মনোবৃত্তিকে অন্ধতা, অজ্ঞতা এবং বিপদের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় এই মনোবৃত্তিকে 'ইদমেব সচ্চং মোঘমঞ্ঞং' বলা হয়; অর্থাৎ আমি যাহা ভাবি, মানি ও অনুসরণ করি, তাহাই একমাত্র সত্য, অন্য সমস্তই তুচ্ছ অর্থহীন। তাঁহার মতে এই হীন মনোবৃত্তি হইতে মানবের মন মুক্ত না হইলে মানবের অন্তরে সত্যের আলোক সম্পাত হয় না। সত্য উদার অনন্ত, সংকীর্ণতার মধ্যে তাহার স্থান নয়। তাঁহার কথায় ধর্ম পন্থা মাত্র, চরম লক্ষ্য নহে। 'মধ্যম নিকায়ে'র 'উল্লুম্পুপম সুত্তে' ধর্মকে তিনি তুলনা করিয়াছেন ভেলার সঙ্গে। যাহা অবলম্বন করিয়া নদী পার হয়। ভেলার উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাবশতঃ লোক যেমন উহাকে কাঁধে বহন করে না। তেমন ধর্মও আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য নহে। মোক্ষলাভই তাহার লক্ষ্য। মোক্ষলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় এবং তখন ধর্মও বর্জনীয়। কারণ, অহংভাব বা 'আমি আমার' ধারণা যখন অন্তর হইতে নিশ্চিহ্ন হয় তখন ধর্ম ও অধর্ম উভয়কে অতিক্রম করিয়া শুদ্ধ মুক্ত পুরুষ মহাশান্তিতে ও মহানন্দে মগ্ন থাকেন।

বুদ্ধ-বাণী উদ্ধৃত করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। বলা বাহুল্য, এইরূপে তাঁহার বাণীর ভিতর তাঁহার বিষয় সন্ধান করিতে গেলে সন্ধানী নূতন নূতন আলোকের সঙ্গে পরিচিত হন বটে, কিন্তু তাহার অন্ত খুঁজিয়া পান না। এই অন্ত না পাওয়ার মধ্যে সন্ধানী তাঁহাকে নূতন নূতন বিশেষণ দিয়া পরিতৃপ্ত হন এবং মনে মনে ভাবেন—তিনি বুদ্ধ।

বিবেকানন্দ

শ্রীজলধর বিশ্বাস

বেদান্তের বহু ঊর্ধ্বে মহা বৈদান্তিক,
অনন্ত জ্ঞানের শুভ্র উজ্জ্বল প্রতীক,
অখণ্ড চৈতন্য শুদ্ধ! তব ভগবান
সবার সম্মুখে সত্য, কোটি কোটি প্রাণ;
নরনারায়ণ সেথা যুক্ত মহাযোগে—
ব্রহ্ম হেথা জীবরূপে সুখ-দুঃখ-ভোগে।

পাপ-পুণ্য, দুঃখ-দৈন্য, অশুচি ও শুচি,
স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, ধনী-দীন, ব্রাহ্মণ কি মুচি,
ইংরেজ, জার্মাণ কিবা আমেরিকাবাসী—
হিন্দু ও অহিন্দু সব এক সঙ্গে আসি
মিলিতেছে তব তীর্থে—পরিপূর্ণতায়,—
'মহামানবের তীরে' শান্তি-কামনায়।

সমাজ-উন্নয়নে বিবেকানন্দ-শক্তি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক টয়েন্‌বীর (Arnold J. Toynbee) A study of Historyর তৃতীয় খণ্ড পড়ছি। এই প্রথিতযশা পণ্ডিতের মতে 'In all acts of social creation the creators are either creative individuals or, at most, creative minorities . . .' সমাজের সৃজনধর্মী সকল ক্রিয়া-কলাপে স্রষ্টার ভূমিকায় দেখা যায়, হয় ব্যক্তিবিশেষকে—নয়তো মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে, যাঁদের মধ্যে জ্বলছে সৃষ্টির আগুন। কিন্তু এইটুকু বলেই টয়েন্‌বী ক্ষান্ত থাকেন নি। সত্যের আর আধখানা তিক্ত অংশ এর সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছেন। টয়েন্‌বী বলছেন: প্রতিভাবান্ পথিকৃতেরা সভ্যতাকে যখন উন্নতি থেকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিচ্ছেন—তখন কিন্তু 'The great majority of the members of the society are left behind'—সমাজের বেশীর ভাগ লোক পিছনে পড়ে থাকে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে, যখন প্রজ্বলিত মশালহস্তে পথিকৃতের দল আগিয়ে যান সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে।

কোন creative personality (সৃজন-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি) যখন সত্যকে উপলব্ধি করেন, তখন সেই উপলব্ধির বিপুল আনন্দকে কেবল নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তিনি খুশী থাকতে পারেন না। প্রাণের প্রাচুর্যে তাঁর চিত্ত কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে যায়। নব নব কর্মোত্তমের মধ্যে সেই প্রাণপ্রাচুর্য সার্থক হ'তে চায়। সূর্য যেমন তার কিরণজালকে গুটিয়ে রাখতে পারে না নিজের মধ্যে, তেমনি তিনিও তাঁর উপলব্ধিগত সত্যকে সকলের মধ্যে প্রকাশ না ক'রে পারেন না। অতি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কণ্ঠ থেকে তখন উৎসারিত হয়:

তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

creative genius (সৃজনী প্রতিভার) এই উদার আহ্বান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু অরণ্যে রোদনের কথা মনে করিয়ে দেয়। কেন? কারণ টয়েন্‌বীর ভাষায়: The creator, when he arises, always finds himself overwhelmingly outnumbered by the inert uncreative mass of his kith and kin, even when he has the good fortune to enjoy the companionship of a few kindred spirits. নয়া সমাজের স্রষ্টা যেন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপরে নিঃসঙ্গ প্রভাতী তারার মতো জ্বল্ জ্বল্ করছেন। কণ্ঠে তাঁর ধ্বনিত হচ্ছে, 'একলা চলো রে'।

যাঁদের আমরা প্রতিভাবান্ বলে থাকি, তাঁরা তো আসলে সাধারণের পর্যায়ে পড়েন না। তাঁদের মগজে নূতনতর চিন্তাধারা, চোখে নূতনতর জগতের স্বপ্ন, কণ্ঠে নূতনতর ভাষা। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সংঘর্ষ অনিবার্য। এই জন্য যখনই সমাজে কোন মহামানবের আবির্ভাব হয় তখনই একটা আভ্যন্তরীণ লড়াই অপরিহার্য হ'য়ে দাঁড়ায়। টয়েন্‌বীর ভাষায়: The emergence of a Superman or a great mystic or a genius or a superior personality inevitably precipitates a social conflict. এই সামাজিক সংঘর্ষকে ভয় করার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মিথ্যা এবং সাঁচ্চায়—এ বিরোধ তো বাধবেই। পুরাতন সংস্কারের সুখতপ্ত কোটরের মধ্যে নিরুদ্বেগে যারা জীবন কাটাচ্ছিল, প্রতিভার কাছ থেকে বৈপ্লবিক

চিন্তার খোঁচা খেয়ে তারা তো তেড়ে আসবেই। যেখানে এই লড়াই নেই, সেখানে বুঝতে হবে জীবনেরই দীনতা রয়েছে। ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালে একটা সত্য খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, মহাপুরুষরা যখনই আসেন লড়ায়ের ঝড়কে তাঁরা সঙ্গে বহন করে নিয়েই আসেন। যীশুখৃষ্টের সেই মৃত্যুহীন বাণী :

> Think not I am come to send peace on Earth : I came not to send peace but a sword.
>
> For I am come to set a man at variance with his father, and the daughter against his mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law.
>
> And a man's foes shall be they of his own household.
>
> "মনে কোরোনা আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি, আমি এসেছি তরবারি দিতে।
>
> আমি এসেছি বাপে-ছেলেতে, মায়ে-ঝিয়ে পুত্রবধূ ও শাশুড়ীতে বিরোধ বাধাতে, আর মানুষের শত্রু হবে তার নিজেরই আত্মীয় স্বজনেরা।"

এ কথা আজও কত সত্য! জড়ের রাজ্যে যারা প্রাণের প্রবাহ আনবার চেষ্টা করবে, আঘাত তো তাদের খেতেই হবে। শরৎবাবুর 'পণ্ডিত-মশাই'কে কি কম আঘাত পেতে হয়েছে? গ্রামকে জাগিয়ে নেবার জন্তে তিনি যখন আপ্রাণ চেষ্টা করছেন প্রবীণ এবং 'পরম পাকা'রা তখন তাঁকে আঘাতের পর আঘাত হানছে আর সাধারণ গ্রামবাসীরা এই সংগ্রামের সামনে একেবারে নিষ্ক্রিয়। এই নিষ্ক্রিয়তা-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে টয়েন্‌বী লিখেছেন : This stagnation of the masses is the fundamental cause of the crisis with which our western civilisation is confronted in our day. (আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে যে সঙ্কট তার মূল কারণ—জনগণের এই নিশ্চলতা)। যাঁরা প্রাচীতে জনসাধারণের মধ্যে উন্নয়নের কাজ করছেন তাঁদের সামনেও প্রবলতম বাধা জনসাধারণের আত্মঘাতিনী জড়তা। আর এই সর্বনেশে জড়তাকে অপসারিত করতে না পারলে প্রগতিমূলক সমস্ত পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পঙ্গু হয়ে থাকবে। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হ'তে হবে শিক্ষাব্রতীদের। 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে শরৎবাবু এই সত্যের প্রতিই অঙ্গুলিসঙ্কেত করেছেন।

যাঁরা গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাব্রতীর কাজ নিয়ে রয়েছেন তাঁদের সামনে সকলের চেয়ে বড় কাজ জড়প্রায় গ্রামবাসীদের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য জাগানো। এই কাজে তাঁরাই হবেন নূতন নূতন আদর্শের পতাকাবাহী সৈনিক। আর এই আদর্শ-প্রচারের কাজে তাঁরা বাধা পাবেন বিস্তর—এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে অসীম ধৈর্যকে সহায় ক'রে তাঁরা যদি গ্রামোন্নয়নের কাজে অবিচলিত থাকতে পারেন—তবেই জয়ের মুকুট শেষ পর্যন্ত উঠবে তাঁদের মাথায়। গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে এইটুকু বুঝতে পেরেছি, জাতির মূল ব্যাধি হচ্ছে Stagnation, জড়তা। এ জড়তা দূর ক'রে জাতির জীবনে প্রাণের গতিবেগ সঞ্চারিত করতে না পারলে জনসাধারণের দুঃখ যাবার নয়। আর এর জন্তে দরকার টয়েনবীর ভাষায় creative minority (মুষ্টিমেয় সৃষ্টিশীল কর্মী) যারা নিজেদের বৈরাগ্যপূত জীবনের প্রোজ্জ্বল হোমানল-শিখার স্পর্শে সৃজনবিমুখ বিরাট জনতার মধ্যে প্রাণোদ্যমের আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন :

"দুর্ভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওটা দেশের

ভূষণ হয়ে পড়েছে। অন্য কোন দেশে দুর্ভিক্ষের এত উৎপাত আছে কি? নেই, কারণ সে সব দেশে 'মানুষ' আছে। আমাদের দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে।"

এ জড়তা যাবে কি ক'রে? স্বামীজী বলছেন: "পচা পুরানো লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মারলে কি হবে? ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। তাকে পুড়িয়ে লাল করতে হবে; তবে হাতুড়ির ঘা মেরে একটা গড়ন করতে পারা যাবে। এদেশে জ্বলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখালে কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। তাদের life আগে তয়ের করে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।"

যারা হবে creative minority (সৃষ্টিধর্মী মুষ্টিমেয়), যাদের জীবনের স্পর্শে জীবন জেগে উঠবে তাদের তৈরী করবার পথ কি?

স্বামীজী এর উত্তরে আবার বলছেন:

"তাঁকে দেখে তাঁকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ করতে শিখুক, তবে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের ঠিক ঠিক চেষ্টা আসবে।"

স্বামীজীর এ কথা যে কত মূল্যবান্ যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি। মানুষ তৈরী করতে হ'লে আগে তার অন্তরে উচ্চ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে হবে। আর এর জন্যে জানা দরকার শ্রীরামকৃষ্ণকে—যিনি নরেন্দ্রের মতো প্রতিভাবান্ তরুণদের ত্যাগের পথে টেনে এনেছিলেন, যাঁর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের স্পর্শে কত জীবন রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

দরকার গ্রামাঞ্চলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রচার, দরকার গ্রামের তরুণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অগ্নিবচনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া; তবেই গ্রামাঞ্চলে তৈরী হবে সেই আদর্শবাদী যুবসম্প্রদায়, যারা নিজেদের জীবনের গতিবেগ দিয়ে জড়প্রায় জনসাধারণকে প্রাণচঞ্চল ক'রে তুলবে।

মা ভবতারিণী

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

নমো ভবতারিণী, তাপ-তমোহারিণী, নমো মা নারায়ণী, নমো জগ-ধাত্রী।
গদাধর-জননী, সন্তানপালনী নমো মা ত্রিনয়নী, নমো জ্ঞানদাত্রী॥
মুনিমনোহারিণী, হৃদিলোকচারিণী, নমো মা মহামায়া, নমো মহালক্ষ্মী।
যোগী-হৃদিবাসিনী, তিমিরবিনাশিনী, নমো মা গায়ত্রী, নমো বিশালাক্ষী॥
এলায়িত কুন্তলা, দিগ্বলয়াঞ্চলা, নমো দিব্যাঙ্গনা, নমো মহাভক্তি।
দনুজ-বিমর্দিনী, দেবাভয়বর্ধিনী, নমো নিস্তারিণী, নমো মহাশক্তি॥
শশধর-ভালিনী, শ্যামরূপশালিনী, মহাযোগেশ্বরী, বরাভয়দাত্রী।
বরতনুধারিণী, অতনুবিদারিণী, নমো মহেশ্বরী, বিশ্ববিধাত্রী॥

কালীমূর্তি-রহস্য

বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার

এ যুগের শক্তিসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন :

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। ব্রহ্ম শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম; সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী; এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়—যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; সূর্য আর সূর্যের রশ্মি; দুধ আর তার ধবলত্ব, মণি ও মণির জ্যোতি। দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা-শক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না, আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। মণি না ভাবলে মণির জ্যোতিঃ ভাবতে পারা যায় না, মণির জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।

লীলাময়ী আদ্যাশক্তি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন, তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। এক সচ্চিদানন্দ—শক্তিভেদে উপাধিভেদ; তাই নানারূপ। যেখানে কার্য সেখানেই শক্তি; কিন্তু জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি (বুদ্বুদ) হলেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ। যিনি শ্যামা তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। একই বস্তু; যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না,—একথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। যতক্ষণ 'আমি' আছে—ভেদবুদ্ধি আছে, ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ পুরাণ তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে। ব্রহ্ম আর কালী অভেদ—ওকেই শক্তি, ওকেই কালী আমি বলি।"

শ্রীরামপ্রসাদের উপলব্ধিও ঐরূপ,—'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।' অবতার ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যুগে যুগে এই ব্রহ্মশক্তি বা কালীকেই জগৎকারণ আদ্যাশক্তি বলে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁদের প্রত্যক্ষানুভূতি ছিল এই আদ্যাশক্তিই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নিরাকার, নির্বিকার, নির্গুণ, মায়াতীত, ভাবাতীত এবং ওতপ্রোতভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত; আর সক্রিয় অবস্থায় সাকার, সগুণ, সর্বদেবদেবীবিভূতিস্বরূপা, ইচ্ছাময়ী, অনন্ত-রূপে বিরাজিতা, অনন্তভাবময়ী ও ভাবগ্রাহী, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া প্রকৃতি ও মায়াধিশ্বরী, সর্বারাধ্যা, সর্বাভীষ্টা এবং ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তাছাড়া দশ-মহাবিদ্যার মধ্যে প্রথমস্থানীয়া হওয়ায় কালীই প্রথমাবিদ্যা বা আদ্যাশক্তি। এই আদ্যাশক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ—উভয়ই।

সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্যের 'প্রাধানিক রহস্যে' জগৎকারণ আদ্যাশক্তির বর্ণনা এইরূপ :

পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী (শিবপুরাণাদিমতে শিবা-শক্তি) ত্রিগুণময়ী ও সকলের আদ্যাপ্রকৃতি। তিনি লক্ষ্যা (সগুণা) ও অলক্ষ্যা (নির্গুণা) এবং জগৎ-প্রপঞ্চ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। এই পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব শূন্য দেখিয়া কেবল তমোগুণ অবলম্বনে অপর এক (নারী) রূপ ধারণ করিয়া মহাকালীরূপে পরিণতা হইলেন। মূলাদেবী মহালক্ষ্মী হইতে অভিন্না সেই মহাকালী অঞ্জনতুল্য গাঢ়নীলবর্ণা, দশনপীড়িতাননা, বিশালনয়না এবং

মধ্যমবয়সা। তাঁহার চারি হাত খড়্গ, পানপাত্র, শির ও খেটদ্বারা অলঙ্কৃত। তিনি বক্ষঃস্থলে কবন্ধ-(শিরোহীন দেহ) মালা এবং মস্তকে মুণ্ডমালা ধারণ করেন।

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সেই তামসী (মহাকালী) দেবীকে মহালক্ষ্মী বলিলেন,—তোমার যে যে কর্ম তৎ তৎ অনুযায়ী তোমার বিভিন্ন নাম দিতেছি :

"তুমি (ব্রহ্মাদিরও মোহক বলিয়া) মহামায়া, মহাকালী, মহামারী (মহামৃত্যুরূপা), ক্ষুধা (সর্ব অবিদ্যাদি ভক্ষণেচ্ছাবতী), তৃষা (সর্ব অবিদ্যাদি পানেচ্ছাবতী), নিদ্রা (যোগনিদ্রা বা সমাধিরূপা), তৃষ্ণা (ভক্তকৃত ভক্তি-ইচ্ছাবতী), একবীরা (প্রপঞ্চ মধ্যে অদ্বিতীয়া ও অলজ্ঘ্যবীর্যা), দুরত্যয়া (বিনাশ-রহিতা), (কালনাশক বলিয়া) কালরাত্রি—যাহাতে ব্রহ্মার লয় হয়, মহারাত্রি—যাহাতে জগতের লয় হয় এবং মোহরাত্রি—যাহাতে জীবের নিত্য লয় হয়। তোমার এই সকল নাম কর্মানুসারে প্রতিপাদ্য (প্রসিদ্ধ)।"

পদ্মাসন ব্রহ্মা মধুকৈটভ বধার্থে যে দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন তিনিই প্রলয়জলধিজলে অনন্ত নাগশয্যায় শায়িত ভগবান বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপা তামসী মহাকালী। ব্রহ্মা ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এই মহাকালীর দশমুখ, দশহস্ত ও দশপদ। তিনি অঞ্জনপ্রভা ও বিশাল ত্রিশটি নয়নমালার (ত্রিনয়না বলিয়া দশটি আননে ত্রিশটি নয়ন) সহিত বিরাজমানা। তিনি দশহস্তে খড়্গ, চক্র, গদা, তীর, ধনু, লগুড়, শঙ্খ, শূল, ভুষণ্ডী ও নরমুণ্ড ধারণ করেন। ইহার সর্বাঙ্গ অলঙ্কারে সুশোভিত এবং নীলকান্তমণিতুল্য প্রভা-বিশিষ্ট।

হিমাচলশৃঙ্গে সিংহোপরি সমাসীনা অম্বিকা-দেবীকে যখন চণ্ডমুণ্ড প্রমুখ দৈত্যগণ আক্রমণ করিয়াছিল তখন সেই শত্রুগণের প্রতি ভীষণ ক্রোধে অম্বিকার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল এবং তাঁর ভ্রূকুটী-কুটিল ললাটদেশ হইতে তৎক্ষণাৎ খড়্গধরা ও পাশহস্তা ভীষণবদনা কালী বিনিঃসৃতা হইলেন। সেই কালিকাদেবী বিচিত্র নরকঙ্কাল-ধারিণী, নরমুণ্ডমালিনী, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, অস্থিচর্ম-মাত্রদেহা, অতিভীষণা, অতিবিশালবদনা, লোল-জিহ্বায় ভয়প্রদা, কোটরগত আরক্তচক্ষুবিশিষ্টা এবং বিকট শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল-পূর্ণকারিণী। অসুর সেনাগণ-সহ চণ্ডমুণ্ডকে বধ করিয়া তিনি চামুণ্ডা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শারদীয়া দুর্গাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে এই চামুণ্ডা কালিকাদেবীরই ধ্যান ও পূজা হয়।

সৃষ্টিপ্রকরণ-সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :

"আদ্যাশক্তি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী ও নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আঁধার; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমলভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়ীতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতি-বৃষ্টি হয় তখন রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশান-কালীর সংহার-মূর্তি—শব-শিবা ও ডাকিনী-যোগিনীর মধ্যে শ্মশানের উপরে থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ-সকল কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন, জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন—যেমন মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপরে থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই-ই।"

উপরি-উক্ত বর্ণনাগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ব্রহ্মশক্তি অথবা পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি প্রলয়কালে একবার চারিহস্তে এবং বারান্তরে দশ

হস্তে খড়্গ, শূল, চক্র, পাশ ইত্যাদি বহুবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া এবং কবন্ধ-মুণ্ডমালাদি পরিহিত হইয়া ভীষণাকারে আবির্ভূতা হইলেও তাঁর নয়নাভিরাম, মনোমুগ্ধকর, কল্যাণময়ী মাতৃভাব প্রচ্ছন্ন ছিল না—যেহেতু তিনি অঞ্জনতুল্য গাঢ়নীলবর্ণা, নীলকান্তমণিতুল্য প্রভা-বিশিষ্টা, বিশালনয়না, উজ্জ্বলদন্তপঙক্তিযুক্তা এবং সর্বাঙ্গে অলঙ্কার-বিভূষিতা মধ্যমবয়সা ছিলেন। আবার ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে মহাকালীর ঐ কল্যাণময়ী মাতৃভাব সম্পূর্ণরূপেই লুকায়িত ছিল—যখন তিনি দ্বিভুজে খড়্গ ও পাশ ধারণ করিয়া চণ্ডমুণ্ড এবং রক্তবীজাদি অসুরবধার্থে অতিভীষণা করালবদনা মূর্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া সৈন্যগণ ও যুদ্ধসম্ভারসহ তাহাদিগকে বিরাট মুখগহ্বরে চর্বণ ও ভক্ষণ করিয়া বিপুল রক্তপানে উন্মত্তা হইয়াছিলেন এবং রক্তদন্তিকা, রক্তকেশা, রক্তনয়না, রক্তাক্ত লোলজিহ্বা ও সর্বাঙ্গ রুধিরচর্চিতা হইয়া অসুরকুলকে সন্ত্রাসিত ও নিধন করিয়াছিলেন। একাধারে এতাদৃশ ভীষণ ও মধুরের সমাবেশ কেন? ইহার রহস্য এবং তাৎপর্যই বা কী?—এই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা সর্বকালে শুধু দেবতাদের নয়, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ঋষিকুলের এবং অবতারাদি সাধক ও সিদ্ধব্যক্তিগণের মনে অবিরাম অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া তাহাদিগকে গভীর চিন্তা, অনুভূতি ও উপলব্ধির রাজ্যে আত্মরতি, আত্মতৃপ্তি ও আত্মসন্তুষ্টিলাভে সমর্থ করিয়াছে ও করিতেছে।

ইতিহাসের যখন জন্ম হয় নাই—জগতের সেই প্রাচীন যুগ হইতেই পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি যুগপ্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নারীরূপে প্রকট হইয়া অতুলনীয়া নারীশক্তিরই নানাভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাই দেবতারা এই মহাশক্তিকে সর্বভূতে উপলব্ধি করিয়া স্তব করেছিলেন:—

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

ভারতের ঋষিরা বহুর ভিতরে একের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আদ্যাশক্তিকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং বাহ্য ও আন্তর জগৎ একই শক্তি-প্রসূত দেখিয়া শক্তিকে শক্তিমানের সহিত নিত্যযুক্ত দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে দেবী নিত্যস্বরূপা, জগৎই তাঁহার মূর্তি, তিনি অখিলব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী, তাঁহা হইতেই জীবজগৎ নিঃসৃত হইতেছে এবং তিনিই সকলের উৎপত্তির কারণস্বরূপিণী হইয়া পরমব্রহ্মে নিত্য বিদ্যমান। কালের আবর্তে প্রগতিশীল মানব এমন এক অবস্থায় উপনীত হইল—যেখানে তাহারা ঋষিদের এই উপলব্ধির কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়া নারীপ্রতিমায় জগদম্বার হ্লাদিনী-শক্তির উপাসনা করিতে শিখিল, এবং ত্রিজগৎ-প্রসবিনীশক্তিকে বিরাট নারীমূর্তিস্বরূপ কল্পনা করিয়া তদবলম্বনে জগন্মাতার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইল। এইরূপে জগৎকারণ ঈশ্বরকে জগজ্জননী, জগদম্বা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া মাতৃভাবের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করা ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। এ যুগে আবার শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার ভিতর দিয়া জগৎ এক নূতন আলোকে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেখিল যে শিশুসুলভ মাতৃগতপ্রাণ ও অনন্যশরণ হইয়া একাগ্রচিত্তে জগজ্জননীকে শুধু 'মা-মা' বলিয়া ডাকিতে পারিলেই মাতৃভাবের উপাসনার চরমসিদ্ধি করায়ত্ত হয়।

সাধনেতিহাসে তন্ত্রসাধনা ভারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধকগণের ধ্যানদৃষ্টিতে মা কালী যে মূর্তিতে প্রতিভাত হইয়াছিলেন তাহা তন্ত্রোক্ত দক্ষিণ-কালিকাদেবীর প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রে বর্ণিত:—

"ওঁ (বীজ) করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং॥
সদ্যশ্ছিন্ন-শিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্ধ্ব-করাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃপাণিকাং॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চিতাং॥
কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্মভয়ানকাং।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত-পয়োধরাং॥

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাং॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং।
শবরূপমহাদেব-হৃদয়োপরিসংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাং
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাং।
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্মকামার্থসিদ্ধিদাম্॥"

এই ধ্যানমন্ত্রপাঠে ইহাই মনে হয় যে ভারতের তন্ত্রকারেরাও প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় অসিমুণ্ডবরাভয়-করা, সৌম্যকঠোর, জীবন-মৃত্যুরূপ সর্বপ্রকার বিপরীতভাবের সম্মিলনভূমিস্বরূপা মাতৃমূর্তিগঠনেই সহায়তা করিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধক শ্রদ্ধা ও সংযম সহায়ে ভক্তিপূরিতচিত্তে ঐ মূর্তির পূজা করিতে করিতে কালে সমাধিস্থ হইয়া দেখিলেন যে বাস্তবিকই সে মূর্তি জীবন্ত, জাগ্রত এবং বিশ্বের সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত। সমাধিসহায়ে তিনি স্থূল বিশ্ব হইতে পরোক্ষভাবে দূরে অবস্থিত হইয়া আরো উপলব্ধি করিলেন যে ঐ মহাশক্তি কালীই অনন্ত স্থূলব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপাকৃতি এক বিরাট শব-শিবা মূর্তিতে সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন। ইত্যাকার প্রত্যক্ষদর্শনের ফলে হর্ষ বিস্ময় ভয় প্রভৃতি বহুভাবে ঐ সাধকহৃদয় এককালে উদ্বেলিত হওয়ায় তাঁহারই মুখ হইতে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল উপরি-উক্ত ঐ গভীর রহস্যপূর্ণ ধ্যানমন্ত্র।

এখন আমরা ঐ মন্ত্রের বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব যে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের প্রতীক ঐ অনন্তভাবময়ী মূর্তি হইতে সাধককুল কীদৃশ অনুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। চিরকালই মায়ের রূপ—'সৌম্যা, অসৌম্যতরা, অশেষ সৌম্যেভ্যঃ তু অতিসুন্দরী'। তাই তান্ত্রিক সাধকেরাও দর্শন করিলেন—সুখপ্রসন্নবদনা, স্মেরাননা, পীনোন্নত-পয়োধরা, মহামেঘপ্রভাবিশিষ্টা, দক্ষিণা, দিব্যা শ্যামামূর্তি—যাহা জগন্মোহিনী মাতৃমূর্তির চন্দ্রকোটি-সুশীতল রূপের দ্যোতক।

শ্যামা রূপটি কেন হ'ল—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন: "সে দূরে বলে, কাছে গেলে কোন রঙই নাই—যেমন দূরের আকাশ নীলবর্ণ, কিন্তু কাছের আকাশের কোন রঙ নাই। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে ততই ধারণা হবে—তাঁর নাম রূপ নাই। পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার আমার শ্যামা মা—যেন ঘাস ফুলের রঙ।"

মায়ের দক্ষিণ করদ্বয়ে বর ও অভয়, এবং বাম করদ্বয়ে অসি ও মুণ্ড। সবল দক্ষিণ হস্তদ্বয় দ্বারা মা জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও পালন করছেন, সুতরাং বিশ্বকল্যাণার্থে একদিকে তাঁর সৃজনী ও পালনী-শক্তির যেমন অপূর্ব সমাবেশ তেমনি অন্যদিকে একই উদ্দেশ্যে বিশ্বের সর্ববিধ দুষ্কৃতিনাশের দ্যোতকস্বরূপ তাঁর বাম হস্তদ্বয়ে অসি ও মুণ্ড ধারণ। জগতের সৃষ্টি ও কল্যাণের জন্য করুণাময়ী মাতৃশক্তির বিকাশ যে পরিমাণ প্রয়োজনীয়, মায়ের পালনী শক্তির সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য নিত্য ধ্বংস বা লয়ের বিধানও সেই পরিমাণেই অপরিহার্য। অসুর-মুণ্ডমালা গলে ধারণ করার তাৎপর্য এই যে—দেবভাবের বিঘ্নস্বরূপ অসুরকুল প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া যখনই শান্তি বিনষ্ট করে তখনই মা অতিভীষণা, ঘোরা করালবদনা মূর্তিতে নির্মমভাবে তাহাদিগকে দলিত, মথিত ও বিধ্বস্ত করিয়া শান্তি সংস্থাপন ও দেবভাবগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং দেবাসুরের নিত্য সংগ্রামস্থল অর্থাৎ দেবত্ব ও পশুভাবের অদ্ভুত সংগ্রাম-ক্ষেত্র মানবহৃদয়ে—তথা মন-বুদ্ধি চিত্তে—মহামায়া অনুরূপ শান্তির প্রতিষ্ঠাই করিয়া থাকেন—যখনই দেবতাদিগের ন্যায় সাধকগণ তাঁদের অন্তর্নিহিত পশুভাবগুলির ধ্বংস সাধন করিয়া দেবভাবগুলির মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল অন্তরে ও আগ্রহে মায়ের অভয়পদে একান্ত শরণাগত হইতে সক্ষম হন।

আমার অন্যান্য ভাবগুলির তাৎপর্যও অতি চমৎকার এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। মা শ্মশানবাসিনী, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, নরকরকটিবেষ্টিতা, উজ্জ্বলদশনপঙ্ক্তি দ্বারা সংযত, রক্তাক্ত লোলজিহ্বা, স্নিগ্ধপ্রভাতসূর্যকরোজ্জ্বলা ত্রিনয়না, শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি দণ্ডায়মানা এবং মহাকালের সহিত বিপরীত রতাতুরা। ভারতের ঋষিগণ সর্বভূতস্থিত চৈতন্যের সহিত শক্তির নিত্যমিলন সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়াই শব-শিবার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বিশ্বব্যাপী বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী পদার্থমাত্রই তাঁহাদের নিকট সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়ীরও প্রতীক-স্বরূপ হইয়া তাঁহার 'সৌম্যাৎ সৌম্যতরা' মূর্তি প্রকাশ করিত। অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার, মৃত্যুর নিষ্ঠুর ছবি, শ্মশানের কঠোর উদাসীনতা, কালের সংহার ছায়া—সকলই আবার সেই করালবদনার ভিতর কোমল কঠোর ভাবের এককালীন একত্র সমাবেশ নয়নগোচর করাইয়া তাঁহাদিগকে মোহিত করিত। শ্মশানে শবসাধনা অথবা শ্মশানকালীর আরাধনা সার্থক হয়—যদি শ্মশানের কঠোর উদাস-ভাব সাধক মানবের মনে তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন করিয়া তাহাকে কামকাঞ্চন-প্লাবিত সংসারের কামনা, বাসনা, আসক্তি হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত করিতে পারে। যেহেতু এতাদৃশ নির্মল ও মায়ামুক্ত মানব-হৃদয়ই শ্মশানবাসিনীর নিত্য আবাসস্থলে পরিণত হইয়া থাকে।

মায়ের দিগম্বরী ও মুক্তকেশী অবস্থা ঘোর দেবা-সুরের যুদ্ধে উন্মাদিনী ভাবের দ্যোতক এবং শান্তিকালে উদাসীনতারই পরিচায়ক। আদ্যাশক্তি নারীমূর্তিতে আবির্ভূতা হইলেও অষ্টপাশ-বিবর্জিতা বলিয়া তাঁর দেহ বসনাবৃত করিয়া রাখার কোন প্রয়োজন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণসাধনেতিহাস-পাঠে জানা যায় যে আহার নিদ্রাদি দেহজ্ঞান-বর্জিত হইয়া যে সাধক তীব্র বৈরাগ্য সহকারে অনন্যশরণ হইয়া অনন্যচিত্ত মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং তদ্ধেতু লোকব্যবহারাদিতে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া বিসদৃশ আচরণাদির জন্য সাধারণতঃ লোকচক্ষে উন্মাদবৎ প্রতীয়মান হয় তাহার পক্ষেও পরিধেয় বস্ত্রের খবর রাখা সম্ভবপর হয় না; উন্মাদ-ভাব ও উদাসীনতা দুটিই তাঁর অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

মা কটিদেশে নরকরমালা কোমরবন্ধের মত পরিধান করিয়াছেন। ইহা কি লজ্জাপটের দ্যোতক, না অন্য কোন গভীর ভাবোদ্দীপক? পূর্বে বলা হইয়াছে যে লজ্জা সহ অষ্টপাশ-বিবর্জিত নারীদেহ আবৃত করিয়া রাখার জন্য কোন বসন বা লজ্জাপট প্রয়োজনীয় নহে। তাহা ছাড়া সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রী-পুরুষ-বোধ রহিত বা কামগন্ধহীন মনোভাবাপন্ন শিশু বালক বালিকাবা একান্ত নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা ও খেলাধূলা করে। তাহাদের সর্বক্ষণ বসনাবৃত থাকার প্রয়োজন হয় না। মা কালীর কটিদেশে নরকরমালা ধারণ লজ্জাপটাবৃতা হইয়া থাকার উদ্দেশ্যে নহে। সদানন্দময়ী কালীর সৃষ্টি ও পালনে যে পরিমাণ আনন্দ ও উৎসাহ, লয়েতেও তদ্রূপ, যেহেতু তিনি কোন কালে কোন অবস্থাতেই নিরানন্দ নহেন, সদা লীলাময়ী।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন জগজ্জননী মহামায়ার স্বরূপ অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া ভাবে দেখিয়াছিলেন—অনুপমা সুন্দরী নারী সর্বাঙ্গ সুন্দর একটি পুত্র প্রসব করেন, লালন-পালনে অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া আবার তাহাকে কিছুকাল পরে সহর্ষে গ্রাস করিলেন। শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিলে শক্তি যে একাধারে প্রসব ও প্রলয়রূপ বিপরীত গুণধারিণী একথাই পরমসত্য বলিয়া অনুভূত হয়। সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে উপরি-উক্ত চিত্র অতীব নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবের পরিচায়ক হইলেও ইহা যে জগৎপ্রপঞ্চ পরিচালনায় মা কালীর সম্পূর্ণ নির্বিকার, অনাসক্ত ও মায়ারহিত ভাবের সুস্পষ্ট দ্যোতক—তাহা সন্দেহাতীত। অতএব গলে লম্বমান সৃষ্টিবীজ

মুণ্ডমালার ন্যায়, নিধনপ্রাপ্ত সন্তানগণের করমালা কটিদেশে ধারণ করিয়া সদানন্দময়ী শ্যামা সাধক মানবকে কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, কর্মফল অনুসারেই তিনি জীবের জন্ম দেন ?

সম্মুখের নয়ন দুইটিতে শ্যামা মা স্থূল-সূক্ষ্মজগৎ পরিদর্শন করেন এবং তদূর্ধ্বে ললাটে স্থিত তৃতীয় জ্ঞাননেত্রটিতে কালী স্বরূপ দেখিয়া থাকেন। তাঁহারই কৃপায় সাধকমানবগণ যখন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট হয়—তখনই তাহারা করুণাময়ী শ্যামার স্বরূপ দর্শনলাভে সমর্থ হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে।

শ্যামা মূর্তির অন্যতম দিক্—দাঁতে জিব কাটিয়া মা শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি দণ্ডায়মানা এবং মহাকালের সহিত বিপরীত-রতাতুরা। কোন কোন মাতৃসঙ্গীতে এই চিত্রটির উপর জাগতিক ভাব আরোপ করা হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে মায়ের ভক্ত উপাসকরা নিজ নিজ রুচি এবং ভাবানুযায়ী এই চিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; যদিও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ইহার অন্তর্নিহিত রহস্য ও তাৎপর্য অন্যরূপ। শ্যামার এই রূপ ও ভাবের ব্যাখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন, শিব শব হয়ে পড়ে আছেন ; কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন, এ সমস্তই পুরুষপ্রকৃতি-যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন।" এই পুরুষপ্রকৃতি-যোগ গীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে যেহেতু স্থাবরজঙ্গম যা কিছু পদার্থ—সবই এই সংযোগে উৎপন্ন হয়। আবার গুণত্রয়বিভাগ-যোগেও শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—'হে ভারত, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি (মহদ্‌ব্রহ্ম) আমার গর্ভাধানের স্থান, তাহাতে আমি সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করি। সেই গর্ভাধান হইতে সর্বভূতের সৃষ্টি হয়।' সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত পরমব্রহ্মের প্রতীক নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত শবরূপী মহাদেবের হৃদয়ই ব্রহ্মশক্তির সৃষ্টিস্থিতিলয়-লীলার একমাত্র উপযুক্ত স্থল। মহাকালের সহিত অভিন্ন হওয়াতে পরস্পরের অতুলনীয় অবিচ্ছেদ্য প্রেমানুরক্তির উন্মাদনা শ্যামাকে বিপরীত-রতাতুরা করিয়াছে ; এই শান্ত অথচ মধুর ভাবের নিত্যলীলা মহাকালের সংযোগে অবিরাম গতিতে পরিচালিত ; ইহা দেখিয়া তিনি যেন অবাক্-বিস্ময় দৃষ্টিতে ঈষৎ সলজ্জ ও সঙ্কুচিতভাবে এই অনাদি অনন্ত লীলায় মুগ্ধ ও মত্ত রহিয়াছেন। সাধক মন এই অদ্ভুত চিত্রের অনুধ্যানে রসনা ও বাক্‌সংযম এবং তাহার ফলে উপস্থ সংযত করিয়া শুদ্ধ শান্ত মনে আদ্যাশক্তির লীলা-রহস্য উপলব্ধি করিবে এবং যুগপৎ প্রেমভক্তিতে বিগলিত হইয়া শ্যামার পাদপদ্মে একান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া মানবজীবন সার্থক করিবে।

কালীমূর্তির ব্যাখ্যা

জগজ্জননী—তাঁকে প্রকৃতি বা কালীও বলা হয়। একটি নারী-মূর্তি একটি পুরুষ-মূর্তির উপর দাঁড়িয়ে আছেন—তার অর্থ, মায়ার আবরণ উন্মোচিত না হলে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি না। ব্রহ্ম স্বয়ং স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নন, তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তিনি যখন নিজেকে অভিব্যক্ত করেন তখন নিজেকে মায়ার আবরণে আবৃত করে জগজ্জননী-রূপ ধারণ করেন ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বিস্তার করেন। যে পুরুষ মূর্তিটি শয়ানভাবে রয়েছেন তিনি শিব বা ব্রহ্ম, মায়াবৃত হয়ে শবরূপ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে নারীর স্থান

শ্রীমতী দীপালী মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর বিচিত্র লীলাময় জীবনে যে সকল পূতস্বভাবা ধর্মপ্রাণা নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন—তাঁদের কথা বলার আগে জানা দরকার শ্রীরামকৃষ্ণ নারীজাতিকে কি চোখে দেখতেন? সবাই বলবেন, মায়ের মতই দেখতেন সকল মেয়েকে। কিন্তু সেই মা-টি কেমন? কোন্ মায়ের ছবি তিনি দেখতে পেতেন সকল মেয়ের মধ্যে?

"মা-মা-মা"—যে ডাকে দক্ষিণেশ্বর মুখরিত হয়ে উঠেছে, যাকে পাবার জন্য অশান্তচিত্তে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন তিনি গঙ্গার কিনারে কাদার উপর পড়ে লুটোপুটি খেয়েছেন—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, ভবতারিণীর সম্মুখে মর্মভেদী কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিয়েছেন—নিদারুণ হতাশায় খড়্গ নিয়ে নিজেকে বলি দিতে গিয়েছেন যে মায়ের চরণে; আর সেই মুহূর্তে যে মা তাঁকে দেখা দিয়ে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন—পরম-কল্যাণময়ী সেই জগন্মাতারই প্রতিচ্ছবি দেখতেন তিনি সকল মেয়ের মধ্যে।

তাঁর বিচিত্র লীলাপূর্ণ জীবনে নারীজাতি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

জননী চন্দ্রামণির নয়নের মণি শৈশবে চঞ্চল ছিলেন—কিন্তু কখনও জননীর অবাধ্য হননি তিনি। গ্রামের মেয়েরা যখন পুকুরঘাটে স্নান করতেন তখন বালকও যেতেন স্নানে—দুষ্টামিও করতেন তাঁদের সঙ্গে। কেহ কেহ তাঁর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন, আসতে বারণ করেছিলেন তাঁদের স্নানের সময়। কিন্তু সে নিষেধ বিশেষ ফলদায়ক হয় নি। চন্দ্রামণি যখন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—স্নানের সময় মেয়েদের দেখতে নেই—তাতে মেয়েদের সম্মানের হানি হয়—সেই সঙ্গে নিজের জননীকেও অপমান করা হয়, তখন থেকে আর কখনও তিনি সে কাজ করেন নি।

আবার উপনয়ন-কালে জননীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা না নিয়ে নিলেন ধনি কামারিনীর কাছ থেকে। সত্যাশ্রয়ী পিতার পুত্র; সত্যভঙ্গ যে তিনি করতে পারেন না। কামার-কন্যা ধনি—তাঁর ধাত্রী মাতা। জীবনে প্রথম সেবা, প্রথম শুশ্রূষা তিনি তার কাছ থেকেই পেয়েছেন। সেই নন্দরাণীর তিনি যে আদরের দুলাল। তিনি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, উপনয়ন-কালে তার কাছ থেকে তিনি প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। জন্ম থেকে নয়টি বৎসর পর্যন্ত মায়ের মতই সে তাঁকে যত্ন করে এসেছে; কোন কিছু ভাল খাবার তৈরী করলে তার গদাধরকে না দিয়ে সে গ্রহণ করতে পারে না। কোন অংশেই সে তার গর্ভধারিণীর চেয়ে কম নয়। সে কি একদিনের জন্যে মায়ের দাবি করতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। কেন, শূদ্রাণী কি মানুষ নয়?

কোন নিষেধই তিনি শুনলেন না। অবশেষে তাঁর মতেই সকলকে মত দিতে হল।

গৈরিক বসন পরে, হাতে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বালক এসে ভিক্ষা চাইল—ভবতি ভিক্ষাং দেহি—ভিক্ষা দাও মা, ভিক্ষা দাও।

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ধনি, নত মস্তকে এগিয়ে এল। দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও এই নয়টি বৎসরে সে যত কিছু সঞ্চয় করেছিল—সবই সে উজাড় করে ঢেলে দিল তার গোপালের ঝুলিতে।

সে-ই ঠিক চিনেছে গদাধরকে। সেই জন্যে তার একান্ত বাসনা—গদাধর তাকে 'মা' বলে ডাকুক, তাকে প্রথম ভিক্ষা দিয়ে সে নিজে ধন্য হোক। কী আনন্দ! আজ তার সকল আশা পূর্ণ করেছে গদাধর।

আর গদাধর সেই ভিক্ষা গ্রহণের সময় তাঁর গর্ভধারিণীকেই প্রত্যক্ষ করলেন ধনির মধ্যে। তাকে মায়ের সম্মানে ভূষিত করে অধিকতর সম্মানিত করলেন নিজের জননীকেই।

পিতৃবিয়োগের পর বালক হলেও অন্তর দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন জননীর ব্যথা। তাই তিনি প্রায় সকল সময়েই থাকতেন মায়ের কাছে—সাহায্য করতেন তাঁর কাজে। তাঁর সেই বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হতেন।

দক্ষিণেশ্বরে যখন তিনি 'রামকৃষ্ণ' নামে পরিচিত হয়েছেন; তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধি-লাভও করেছেন, তখন অদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ তোতাপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প করলেন। বেদান্ত সাধন করতে হ'লে আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ বিধেয়, রামকৃষ্ণ কিন্তু সে কাজটি গোপনে সম্পন্ন করতে অনুরোধ করলেন তোতাপুরীকে। কারণ চন্দ্রামণি তখন দক্ষিণেশ্বরে। শোকতাপ ও দুঃখকষ্টে তাঁর মনে শান্তি ছিল না। গঙ্গাতীরে প্রাণাধিক পুত্র গদাধরের কাছে শেষ কয়টা দিন কাটাবেন মনস্থ করে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণও মথুর বাবুকে বলে তাঁর থাকবার সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই জননীর মনে তাঁর মস্তকমুণ্ডন ও গৈরিক-ধারণে যদি ব্যথা লাগে—তাই প্রকাশ্য সন্ন্যাসগ্রহণ ও বাহ্যচিহ্ন-ধারণে আপত্তি করেছিলেন।

মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণকালে বৃন্দাবনে এসেছেন রামকৃষ্ণ। সেখানে পরম ভক্তিমতী বর্ষীয়সী সাধিকা গঙ্গামায়ীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরও ভাবাবেশ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের মত। সুতরাং অচিরেই উভয়ের মধ্যে অন্তরের যোগ স্থাপিত হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণ আর ফিরবেন না দক্ষিণেশ্বরে—গঙ্গামায়ীও তাঁকে ছাড়বেন না। ভাগিনেয় হৃদয়রামও সঙ্গে গিয়েছিলেন—কোনও মতে মামাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন না, অবশেষে চন্দ্রামণির কথা মনে করিয়ে দিলেন হৃদয়রাম—দক্ষিণেশ্বরে তাঁরই মুখ চেয়ে তিনি রয়েছেন। জননীর মুখখানি স্মরণ করে রামকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তাঁকে দেখবার জন্য ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

সন ১২৮২ সাল, ১৩ই ফাল্গুন ৮৫ বৎসর বয়সে ইহলীলা সংবরণ করলেন চন্দ্রামণি। গঙ্গাতীরে প্রাণাধিক পুত্র গদাধরের কাছেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তাঁকে সেবা করলেন রামকৃষ্ণ। পরমারাধ্যা জননীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ বলে শেষ কার্যাদি করলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল। তবুও তো তিনি মানুষ—তাই তর্পণ করতে নামলেন গঙ্গায়। অনেক চেষ্টা করেও অঞ্জলিতে জল রাখতে পারলেন না; তিনি যে পরমহংস—শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকরণের উর্ধ্বে, সেখান থেকে তো আর নেমে আসতে পারেন না। একদিন ছুটে গেলেন পঞ্চবটীর দিকে, গঙ্গার কিনারে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন।

* * *

অপূর্ব সাধনার স্থান দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত না হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হতেন না, আর শ্রীরামকৃষ্ণ না হ'লে নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দও হতে পারতেন না,—পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্মও প্রচারিত হ'ত না। অতএব সমস্ত ব্যাপারটির গোড়ায় রয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে নির্মিত একটি মন্দির। আর সেই মন্দির ছিল একজন ধনবতী মাহিষ্যজাতীয় মহিলার পরম ভক্তিপরায়ণতার ফল।

প্রাতঃস্মরণীয়া এই রাণী রাসমণি।

গদাধর শিবমূর্তি গড়ছেন। বৃষভে আসীন শিবের শিরে জটারাশি, হাতে ডমরু ও ত্রিশূল, কটিদেশে বাঘছাল। অপূর্ব বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছেন রাসমণি। সহজাত শিল্পপ্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন! প্রশংসার ভাষা খুঁজে পেলেন না রাণী।

রাধাগোবিন্দজীর পা ভেঙে গেছে; পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন—গঙ্গায় তা বিসর্জন দিয়ে নূতন বিগ্রহ এনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাণীমা ছুটে এলেন গদাধরের কাছে।

"তোমার জামাই-এর যদি পা ভেঙে যায়—যথাযথ চিকিৎসায় নিরাময়ের ব্যবস্থা না ক'রে তাঁকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে পারবে?" অপূর্ব বিধান দিলেন গদাধর। আর নিজেই নিপুণভাবে জুড়ে দিলেন সেই ভাঙ্গা পা।

সম্পূর্ণ নির্ভরতা ও বিশ্বাসই যে সব কিছুর ওপর। সেই বিশ্বাসে ভর করেই রাসমণি গদাধরের কাছে এসেছিলেন। তাই ফলও পেয়েছিলেন মনোমত।

ভবতারিণীর সম্মুখে গান গাইছেন গদাধর—রাসমণি বসে শুনছেন সে সুর-লহরী। সহসা তাঁকে একটা চড় মেরে বললেন গদাধর, "ছিঃ এখানেও বিষয়-চিন্তা।" অন্তর্যামী ঠিকই জেনেছেন—ঠিকই বলেছেন! সত্যই রাণী গান শুনতে শুনতে কোন এক ফাঁকে বিষয়-চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

গদাধরের ব্যবহারে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হলেন না। সেই আঘাতকে তিনি তাঁর প্রাপ্য বলেই মেনে নিলেন; এবং এই ব্যাপারের জন্য পূজারী ঠাকুরের উপর অত্যাচার হতে পারে বুঝে কর্মচারীদের বলে দিলেন—ভটচায মশাইয়ের কোন দোষ নেই—তাঁরা যেন তাঁকে কিছু না বলেন।

এমনই কত ঘটনা। শেষ দিনটি পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের পুরোভাগেও আমরা দেখতে পাই আর এক নারীকে। বৈষ্ণব ও তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্না ভৈরবী যোগেশ্বরী তাঁকে আপন সন্তানজ্ঞানে তন্ত্রসাধনায় দীক্ষা দিলেন। আর রামকৃষ্ণ? প্রথম দর্শনেই তাঁকে মাতৃ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করলেন—যেন কত কালের চেনা! বহুদিনের অদর্শনের পর মাতা-পুত্রের প্রথম সাক্ষাৎ। দুই বৎসরের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সেই মহীয়সী নারীর সহায়তায় চৌষট্টি প্রকার তন্ত্র-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন।

ভৈরবী তাঁকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করলেন। এক প্রকাশ্য সভায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সকলে এক-বাক্যে তাঁর সিদ্ধান্তে সম্মতি দিলেন। জগতের কাছে তিনি অবতার-রূপে স্বীকৃত হলেন—বিশ্বের নিকট ছড়িয়ে পড়ল পবিত্র 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম।

* * *

ভক্ত-সমাগম হতে লাগল দক্ষিণেশ্বরে। নারী-ভক্তগণের মধ্যে প্রথমদিকেই এলেন মনোমোহন বসুর জননী শ্যামাসুন্দরী। এই শ্যামাসুন্দরীর জামাতা শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখালচন্দ্র, যিনি পরবর্তী-কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে খ্যাত। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রাখালচন্দ্রের যাতায়াত তিনি অতি প্রীতির চক্ষে দেখতেন—নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করতেন জামাতার এই মহাপুরুষ-সঙ্গলাভে।

জনৈক ভক্তের বিধবা ভগিনী ধ্যান করতে বসেন, কিন্তু মন স্থির হয় না। নিরুপায় হয়ে সেকথা বললেন ঠাকুরকে। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কে? উত্তরে বুঝলেন তাঁর এক শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। তখন ঠাকুর তাঁকে বললেন, "এই শিশুটিকেই তুমি বালগোপাল জ্ঞানে ধ্যান কর।" অচিরেই সেই ভক্তিমতী মহিলা সেই বালকের মধ্যেই তাঁর ইষ্টকে খুঁজে পেলেন।

যোগীন-মা অর্থাৎ যোগীন্দ্রমোহিনী ডাক্তার প্রসন্ন কুমার মিত্রের কন্যা। কিন্তু স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতায় অতৃপ্তচিত্ত হয়ে তিনি ঠাকুরের কাছে ছুটে এলেন। প্রথম দর্শনেই তাঁর সকল জ্বালা জুড়িয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে জপতপের

সাহায্যে সাধনার উচ্চ সোপানে তিনি আরোহণ করলেন।

একদিন যোগীন-মার সঙ্গে এলেন এক সন্তান-হারা ব্রাহ্মণ মহিলা। একটি মাত্র কন্যাকে ধনী সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরেই সে মারা যায়। তাই জ্বালা জুড়াতে এলেন ঠাকুরের কাছে। অর্ধবাহ্যদশায় ঠাকুর তাঁকে বললেন, "পরম ভাগ্যবতী তুমি! সংসারে যার আপনার বলতে কেউ নেই, ভগবান নিজেই তার ভার নেন।" দেবতার অভয়বাণী যেন শুনলেন তিনি—লুটিয়ে পড়লেন দেবতার চরণে। ঠাকুরের কৃপায় আধ্যাত্মিকতার স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে গেলেন তিনি। ইনি হলেন গোলাপসুন্দরী—গোলাপ-মা বলেই পরিচিতা। তাঁর বাড়ীতে যেদিন ঠাকুর পদার্পণ করেন সেদিন নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন তিনি।

*　　*　　*

"ওঃ তুমি এসেছ; দাও দেখি আমার জন্য কি খাবার টাবার এনেছ। এযে দেখছি কিনে এনেছ। কেনবার কি দরকার? নিজেই নারকেলের নাড়ু করে রাখবে; আর যখন এখানে আসবে সেই নাড়ু দু-চারটি সঙ্গে করে আনবে, অথবা নিজের জন্য যা রান্না কর—তা থেকেই একটুখানি নিয়ে আসবে; তোমার হাতের রান্না খেতে আমার বড়ই সাধ যায়।"

কে সেই ভাগ্যবতী নারী—যাঁর হাতের খাবার খেতে ঠাকুরের এত আগ্রহ?

ইনি হলেন অঘোরমণি—শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে 'কামারহাটির বামনি' বলতেন—গোপালের মা বলেই ইনি বিশেষ পরিচিতা।

ষাট বৎসর বয়স। অন্ন কিছুই সঞ্চয় ছিল—তাতেই তাঁর চলে যেত। অতি সাধারণ তাঁর জীবন-যাত্রা। একখানি রামায়ণ ও একটি জপ-মালা—এই দুটিই তাঁর জীবনের পাথেয়। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর জপধ্যান ও এই দুটি নিয়েই তিনি অতিবাহিত করেন। তাঁর ছিল বাৎসল্যের ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি তাঁর গোপালকেই দেখতে পেলেন—তাই যখন আসেন কিছু খাবার নিয়ে আসেন, আর নিজ হাতে গোপালকে খাইয়ে দেন। সারদামণিকে 'বৌমা' সম্বোধন করেন।

একদিন এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করলেন অঘোরমণি—দেখলেন তাঁর ইষ্ট দেবতা শ্রীশ্রীবাল-গোপালকে।

এর পরে একদিন মালা জপ করে ইষ্ট-দেবকে প্রণাম করবেন, এমন সময় সম্মুখে দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। ইষ্টই বুঝি সশরীরে তাঁর প্রণাম নিতে এলেন।

বিস্মিত অঘোরমণিকে বললেন তিনি, 'আর এত মালা জপ কেন? যা পাবার তা কি এখনও পাওনি?'

'আমার কি সাধন ভজন সব সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে?' জিজ্ঞাসা করলেন অঘোরমণি।

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই'—প্রত্যুত্তরে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

তবুও জিজ্ঞাসা করলেন অঘোরমণি, 'তুমি কি ঠিক ঠিক বলছ, আমার সকল কর্ম শেষ হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত বলছি—তোমার নিজের জন্য সাধনার আর কিছুই আবশ্যক নেই।' নিজেকে দেখিয়ে আবার বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ—'তবে এই খোলটার জন্য প্রার্থনা করতে পার।'

ভাগ্যবতী অঘোরমণি স্বয়ং ইষ্টের কাছ থেকেই তাঁর সাধনার অভিজ্ঞান পেয়ে ধন্য হলেন। জপ-মালা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে অঙ্গুলি-পর্বেই শুধু জপ করতে লাগলেন তাঁর গোপালের মঙ্গলের জন্য।

*　　*　　*

প্রসন্নময়ী, ভানুপিসি, গৌরী-মার সম্বন্ধেও কত কথাই বলা যায়। তাঁরাও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-নাট্যে একে একে এসেছেন। তাঁদের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রীশ্রীমাতা সারদামণি সম্বন্ধে কিছু বলে

শেষ করি। রাণী রাসমণি, ভৈরবী যোগেশ্বরী ও জননী সারদামণি—এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগের তীর্থরাজে পরিণত।

রাসমণি সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, যোগেশ্বরী দ্বারা সাধনার সূত্রপাত, সারদামণিতে তার পরিসমাপ্তি। শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী; নারী-ভক্তবৃন্দের মধ্যমণি। জয়রামবাটীতে প্রথম দেখতে পাই তাঁকে পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহের সময়, তার পরে কামারপুকুরে চোদ্দ বৎসর বয়সে।

অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন রামকৃষ্ণ। গুরু তোতাপুরী কর্তৃক পরমহংস উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এতদিনে অবকাশ পেয়েছেন কিছুটা। বহুদিন জন্মভূমি দর্শন করেন নি—তা ছাড়া বৎসরের পর বৎসর কঠোর তপস্যায় শরীর ভেঙ্গে গেছে—স্বাস্থ্যলাভের আশায় স্বগ্রাম কামারপুকুরে বেড়াতে এলেন। জয়রামবাটী থেকে সারদামণিও এসে উপস্থিত হলেন। কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ, স্ত্রীকে কিন্তু গ্রহণ করলেন—সাদরে তাঁর পাশে স্থান দিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পরম বিস্ময় এই দেব দম্পতী। শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বে যত মহাপুরুষ, যত সাধক জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের দেখতে পাই—দাম্পত্য জীবনের পরে তাঁদের সাধক জীবন শুরু। গৃহত্যাগ করে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের অভীষ্ট-সন্ধানে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন একমাত্র ব্যতিক্রম; সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর শুরু হল তাঁর দাম্পত্য জীবন—বিচিত্র, অপূর্ব!

সমস্ত স্নেহ ভালবাসা উজাড় করে তিনি ঢেলে দিলেন সারদামণিকে। সংসারের কত খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন—প্রদীপের সলিতা তৈরী, অতিথি অভ্যাগত পরিচর্যা—এমনকি কেমন করে রাঁধতে হয়, কোন্ তরকারির কি মশলা দিতে হয় তাও তিনি শেখালেন।

রাত্রিতেও শয়ন-কালে কত কথা, কত সদালোচনা। "চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুরই মামা—ঈশ্বরও তেমনই সকলের আপনার। ডাকলেই দেখা দেন। তোমার ডাকেও আসবেন তিনি"—এমনই কতভাবে তিনি শিক্ষা দিলেন তাঁর সহধর্মিণী ভক্তপ্রধানা পরমা শিষ্যাকে।

আর একবার—শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে। জয়রামবাটী থেকে সারদামণি এসে উপস্থিত হ'লেন তাঁর কাছে পথশ্রমে জ্বরে অবসন্ন হয়ে। রামকৃষ্ণ তাঁকে নিজের ঘরে রাখলেন, এবং তিন চারদিনের মধ্যেই সেবা ও পরিচর্যায় তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুললেন।

সারদামণি অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন তাঁর পরমারাধ্যের আন্তরিকতা। জয়রামবাটীতে তাঁকে সকলে 'পাগলের বৌ' বলে ঠাট্টা করত। সেই উপহাসের অসারতা তিনি বুঝতে পারলেন। আরও বুঝলেন—দুর্লভ দেবতাকেই তিনি বরণ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণিকে নহবত-ঘরে জননী চন্দ্রামণির কাছে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিন্তু মনে পড়ে গেল গুরু তোতাপুরীর কথা, স্ত্রীকে কাছে রেখে যে ব্রহ্মচর্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে সেই প্রকৃত সিদ্ধ।

ডেকে পাঠালেন সারদামণিকে। নিজের কক্ষেই তাঁরও শয্যা রচিত হল।

'তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিয়ে যেতে এসেছ?' জিজ্ঞাসা করলেন রামকৃষ্ণ।

'না—তোমাকে ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন সারদামণি।

এ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ পরে বলেছিলেন—'বিবাহের পর মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম—ওঁর মনে যেন পার্থিব ভোগবাসনা স্থান না পায়। কাছে রেখে বুঝতে পারলুম—মা সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন।'

সারদামণি একদিন সরল কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলেন রামকৃষ্ণকে 'আমি তোমার কে?'

তেমনই সরলভাবেউত্তর দিলেন রামকৃষ্ণ, 'তুমি সারদা, সরস্বতী। এবারে রূপ ঢেকে এসেছ—পাছে অশুদ্ধ মনে দেখলে লোকের অমঙ্গল হয়। এসেছ বিদ্যা নিয়ে। তুমি জ্ঞানদা, জ্ঞান দিতে এসেছ।'

আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করছেন, জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা, আমাকে তোমার কী বলে মনে হয়?'

রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'যে মা মন্দিরে রয়েছেন, যিনি এই দেহের জন্ম দিয়েছেন এবং এখন নহবতে বাস করছেন, আর এক রূপে তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সত্যই আমি তোমাকে মা আনন্দময়ীর প্রতিমূর্তি বলে জ্ঞান করি।'

এর পরে এঁদের দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হয় না। মাসের পর মাস এইভাবে কেটে গেল। এক মুহূর্তের জন্য তাঁরা পার্থিব জগতে নেমে এলেন না।

একদিন ভক্ত যোগেন-মাকে দিয়ে সারদামণি শ্রীরামকৃষ্ণকে জানালেন—ঠাকুরের মত তাঁর যদি একটু ভাব টাব হয়—বড় ভাল হয়।

শুনে রামকৃষ্ণ চিন্তামগ্ন। তারপরেই নহবৎ ঘরে হাসছেন সারদামণি, আবার কখনও বা কাঁদছেন। শেষে হাসি নেই, কান্না নেই, সম্পূর্ণ সমাধিস্থা।

সন ১২৮০ সাল, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, অমাবস্যা—ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রি। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠ সাধনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে শ্রীশ্রীমা এক আলিম্পিত পীঠে উপবেশন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেবীজ্ঞানে 'ষোড়শী'রূপে যথাবিধানে পূজা করলেন। পূজা-অন্তে উভয়েই সমাধিমগ্ন; এক হয়ে গেলেন পূজক ও পূজিতা। শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্জিত সমস্ত সাধন-ফল, জপমালা, দেবীর শ্রীপাদপদ্মে চিরকালের জন্য সমর্পণ করে প্রণাম করলেন। শেষ হল তাঁর সাধনা; এক অপূর্ব পূর্ণতায় রূপায়িত হল দেবদম্পতীর দিব্য জীবন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই একটি রাত্রির নবতম পূজানুষ্ঠানে নারীত্বকে যে সম্মান দিলেন, বিশ্বের কোন দেশ, কোন জাতিই তা কল্পনা করেনি কখনও। ধন্য বাংলা—ধন্য তার ক্ষুদ্র গ্রাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটী। আর শত ধন্য দক্ষিণেশ্বর—সেই লীলা-সাধনার নীরব সাক্ষী।

সঞ্চয়ন

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

কবীর

প্রেম ফোটে নাক ফুল-বাগিচায়
প্রেম না বিকায় হাটে।
রাজা আর প্রজা অথচ সবারই
প্রেম পেলে দিন কাটে।
প্রেম প্রেম প্রেম—সবাই চেঁচায়,
প্রেম কে চিনিল হায়!
অষ্ট প্রহর সিক্ত যে জন
প্রেমিক বলিব তায়।

দাদূ

সাধু-সন্তের শুধায়ো না জাতি
শুধাও তাহার জ্ঞান,
খাপ দূরে থাক, তরবারি দেখে
দাম করো অনুমান।

রবিদাস

তুমি যেন প্রভু চন্দন আর
আমি যেন তাহে বারি,
উভয়েরি নাথ নিবিড় মিলনে
সুবাস উঠেছে ভরি।
তুমি যেন প্রভু ঘন অরণ্য,
আমি যেন সেথা কেকী,
চকোর যেমন চন্দ্রকে দেখে,
আমি যে তোমারে দেখি।
তুমি যেন প্রভু অমূল্য মোতি,
গাঁথিবার সুতা আমি
সোনা-সোহাগার শুদ্ধ মিলনে,
দুজনে মিলেছি স্বামী!

'কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাম্…'

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ

গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর প্রিয়সখা অর্জুনকে স্বীয় বিভূতি, অর্থাৎ ঐশ্বরিক ভাবের কথা শোনাচ্ছেন—তখন তিনি কোথাও সম্বন্ধে ষষ্ঠী, আর কোথাও বা নির্ধারে ষষ্ঠী ব্যবহার করেছেন। তিনি যখন বলছেন, 'তেজস্তেস্বিনামহম্,' তখন বুঝতে হবে তিনি সম্বন্ধে ষষ্ঠী ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ 'আমি তেজস্বী পুরুষদিগের অন্তঃকরণস্থিত তেজ।' আবার যখন তিনি বলছেন, 'পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ,' তখন বুঝতে হবে তিনি নির্ধারে ষষ্ঠী ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ, 'আমি পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে মাত্র একজন, যার নাম ধনঞ্জয় বা অর্জুন'।

নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে সর্বত্র সম্বন্ধে ষষ্ঠী ব্যবহার করা হয়েছে :—

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥

'আমি ছলনাকারীদের খেলিবার পাশা, তেজস্বীদের তেজ, জয়শীল ব্যক্তিদের জয়, অধ্যবসায়ী ব্যক্তিদের অধ্যবসায় এবং সত্ত্বগুণী ব্যক্তিদের সত্ত্বগুণ'।

আবার নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে কেবল নির্ধারে ষষ্ঠী ব্যবহার করে গেছেন :—

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥

'আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিদের মধ্যে একমাত্র দেবর্ষি, যার নাম হচ্ছে নারদ ইত্যাদি'।

সুতরাং এই অধ্যায়ের এক স্থানে, শ্রীভগবান যখন আমাদের জানাচ্ছেন, 'কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা', তখন এই শ্লোকার্ধের—দ্বিবিধ অর্থই ব্যাকরণসঙ্গত হতে পারে। প্রথম অর্থ হচ্ছে—আমি নারীদিগের মধ্যে এই সাতটি নারী,—যাদের নাম হ'ল, কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে—আমি নারীদের জন্মগত এই সাতটি গুণ, যথা,—কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা।

প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে কত সন্দেহ ও অসঙ্গতি দেখা দেয়, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্।

এই সাতজন নারীর মধ্যে তিন জন দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা। দক্ষপ্রজাপতির যে কন্যাটির জগৎ-জোড়া নাম, যাঁকে আমরা সতী বা দাক্ষায়ণী বলে সকলেই জানি তাঁকে বাদ দিয়ে অপর তিনটি অখ্যাত অজ্ঞাত কন্যা ভগবানের বিভূতির মধ্যে গণ্যা হলেন; মূলেই যেন ভুল হয়েছে বলে মনে হয় না কি? কেহ শ্রীকে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী এবং বাক্‌কে ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতীরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তা হলে মহেশ্বর-শক্তি—দুর্গা বাদ পড়ল কেন? কি কারণে যে এই সাতজনের মধ্যে ভগবানের ঐশী শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকটিত হয়েছিল তা কেউ বোঝান নি। কেবল নাম কয়টির অভিধানগত অর্থ উল্লেখ করেছেন।

এঁরা সকলেই হচ্ছেন যমরাজের পত্নী—শ্রীভগবান্ স্বর্গ মর্ত্য ছেঁকে অনেক দেবমানবের নাম বাহির করেছেন, কিন্তু তখনকার কালের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রচলিত মহীয়সী মহিলাদের নাম করেন নি।

প্রাণী অপ্রাণী প্রভৃতির বেলায় ভগবান এক এক দল হতে মাত্র এক এক জনকে বা বস্তুকে বেছে নিয়েছেন, যেমন বৃক্ষসকলের মধ্যে একটি মাত্র বৃক্ষ, যথা অশ্বত্থ, সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে একজন মাত্র সিদ্ধপুরুষ, যথা কপিল। কিন্তু নারীর বেলায় একেবারে তিনি সাতজনকে বেছে নিয়েছেন।

কিন্তু যদি দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা যায় তবে কোন দোষ থাকতে পারে না, এবং একটি সোজা

অর্থ আমাদের চিত্তে প্রবেশ করতে পারে। তা ছাড়া শ্লোকার্ধটি যে একবার পড়বে সে-ই বলতে বাধ্য হবে—উহার দ্বিতীয় অর্থই যুক্তিযুক্ত এবং ভগবান দ্বিতীয় অর্থেই ঐ উক্তি প্রয়োগ করেছেন। পুরুষদের বেলায় দেখা যায়, তিনি পুরুষদের নানা দলে বিভক্ত করেছেন এবং এক এক দল হতে এক একটি গুণ বেছে নিয়ে সেই গুণে বিভূতির আরোপ করেছেন, কিন্তু নারীদের আর দলে বিভক্ত না করে সাধারণভাবে—তাদের জন্মগত সাতটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে নারীদের চরিত্রগত এই সাতটি গুণ অতিরঞ্জনের আভাস দিয়েছে কি না। একটু অনুধাবন করলেই দেখা যায় নারীমাত্রেই এই সাতটি গুণের অধিকারিণী। এই সাত্ত্বিক বৃত্তিসকল কারো মধ্যে কম, কারো মধ্যে বেশি পরিমাণে থাকতে পারে, কিন্তু ইহারা কম-বেশিভাবে সকল নারীতেই বর্তমান।

অভিধানে বলে, 'একদিগ্‌ব্যাপিনী কীর্তিঃ অর্থাৎ কীর্তি সমগ্র একটা দিক্ ব্যেপে থাকে। নারীর কীর্তি বা সুখ্যাতি বলতে তার সতীত্বকেই বুঝায়। যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার শিক্ষা দিয়েছেন সেই সময় সীতা সাবিত্রী দ্রৌপদী সুভদ্রা শকুন্তলা অরুন্ধতী প্রভৃতির সতীত্ব-কাহিনী ঘরে ঘরে প্রচারিত, সুতরাং নারীর সতীত্বেই যে ভগবানের বিভূতি বিশেষভাবে প্রকটিত, তাহা ভগবান সর্বাগ্রে উল্লেখ করলেন। তারপর শ্রী। নারীর যৌবনশ্রী বাদ দিলেও, তার বাহ্য আকৃতিতে যে একটা শ্রীর ভাব সর্বদাই ফুটে থাকে, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। ইহার উপর ভাষ্য-টীকার প্রয়োজন নেই। বাক্ অর্থাৎ বাক্যে, ধৃতি অর্থাৎ সহ্য করবার শক্তিতে এবং ক্ষমা অর্থাৎ অপকারীর অপকারকে উপেক্ষা করার শক্তিতে—নারী যে পুরুষ অপেক্ষা এক ধাপ উপরে, একথা বললে বোধ হয় কেহ আপত্তি করবেন না; কিন্তু নারীর স্মৃতি ও মেধা কি সত্য সত্যই পুরুষের স্মৃতি ও মেধা অপেক্ষা বেশি? অনেকের এ বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে, কিন্তু এই স্ত্রীশিক্ষার যুগে আজকাল মেয়েদের লেখা-পড়া ও পরীক্ষার ফল দেখে মনে হয়, স্মৃতিশক্তি ও মেধাশক্তি পুরুষ অপেক্ষা নারীর কম তো নয়ই বরং বেশি। কিন্তু এখানে ভগবান পুরুষ ও নারীর মধ্যে তো কোন তুলনামূলক আলোচনা করছেন না —নারীর চিত্তের যে কয়টি সাত্ত্বিক বৃত্তি লক্ষ্য করেছেন—সেই কয়টির উল্লেখ করেছেন মাত্র।

অনেকে মনে করেন, ভগবান গীতায় নারীকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নি। তাঁরা গীতার আর একটি শ্লোকার্ধ উল্লেখ করে—এই বিষয়ের প্রমাণ দেখাতে চান। শ্লোকটি হচ্ছে—"স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।" অনেকে বলেন, এখানে স্ত্রীজাতিকে বৈশ্য ও শূদ্রের সহিত এক পর্যায়ে ফেলায় নারীর উচ্চাসন অস্বীকার করা হয়েছে। বাহ্যতঃ দেখতে তাই বটে, কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত বিচার করলে এ ধারণাকে খণ্ডন করা যায়। তুলনায় দেখা যায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অবসরযুক্ত জীবন যাপন করে থাকেন, সুতরাং তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের বা সমাধি-সাধনের সুযোগ পান, কিন্তু ব্যবসায়ী বৈশ্য, সেবাবৃত্তিপরায়ণ শূদ্র আর গৃহকর্মে নিযুক্তা নারী অধ্যাত্ম সাধনার বড় একটা সুযোগ পান না। এরূপ স্থলে বৈশ্য, শূদ্র বা স্ত্রীজাতি যদি ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করতে চান, তবে তাঁদের আয়াসসাধ্য যোগ-সমাধি-পথের পরিবর্তে গীতোক্ত সহজ ভক্তিপথ অবলম্বন করতে পারলেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে এবং ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হবে। এই ভাবটিই ঐ শ্লোকের নিহিতার্থ। সর্বজনবন্দিতা সুভদ্রার ভ্রাতা, মহীয়সী দ্রৌপদীর সখা মাতৃজাতিকে অনাদর করতে পারেন না। তিনি দ্রৌপদী প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে নারীহৃদয়ে যে সাতটি গুণ দেখেছেন তাতেই ঐশ্বরিক ভাবের আরোপ করেছেন।

শ্রীভগবান যে এখানে সাতটি নারীর নামোল্লেখ করেন নি, পরন্তু নারী মাত্রেরই সাতটি জন্মগত গুণের বর্ণনা করেছেন—তা আর একদিক দিয়ে প্রমাণ করা যায়। সকলেই জানেন গীতা ও চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয় একই, তবে উপাসনার দ্বারা লক্ষ্যে পৌছিবার পথ উভয়ের পৃথক্ পৃথক্। অনেক সময়ে গীতা পড়তে পড়তে মনে হয়, এ কথা চণ্ডীতে পড়েছি। আবার অনেক সময় চণ্ডী পড়তে পড়তে মনে হয়, এ কথা যেন গীতাতেও পড়েছি। চণ্ডীতেও বহুবার নর-নারীর অন্তঃকরণস্থিত কতিপয় সাত্ত্বিক বৃত্তিতে ঐশী শক্তি বা বিষ্ণুমায়ার বিভূতি আরোপ করা হয়েছে। স্মৃতি, শ্রী, মেধা ও ক্ষমা (চণ্ডীতে ক্ষান্তি) ভাগবতী শক্তির এক এক কলাবিশেষ,—ইহা দেবতাদের স্তবে বহুবার প্রকাশ করা হয়েছে।

'ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তি ক্ষান্তিরেব চ॥'

দেখা যাচ্ছে এখানে নর-নারীর চিত্তস্থিত কতিপয় দৈবীবৃত্তিকে মহামায়ার বিভূতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

'মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।'

এখানেও মেধাশক্তি যে ভাগবতী শক্তির অংশবিশেষ তা বোঝান হয়েছে।

'যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।'
'যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।'

এখানেও স্মৃতি এবং ক্ষমা ভগবতীর অংশবিশেষ বলেই বর্ণিত।

সুতরাং গীতাকারও কীর্তি শ্রী প্রভৃতি নারীর সাতটি উৎকৃষ্ট বৃত্তিতে দেবত্বের আরোপ করে নারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন—ইহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়।

গীতা ও চণ্ডী যখন একই ভাবে অনুপ্রাণিত তখন চণ্ডী নারীকে যে উচ্চাসন দান করবে গীতাও নারীকে সেই পদবী দান করবে—ইহাই স্বাভাবিক। অতএব চণ্ডীতে যখন দেখতে পাই—

'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—অর্থাৎ জগতে যত স্ত্রী আছে সকলেই ভগবতীর অংশস্বরূপ, তখন গীতাতে নারীর যে সাতটি গুণ ভগবানের বিভূতিরূপে বর্ণিত হবে—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

আমাদের বাংলাদেশ সেদিন পর্যন্ত পুরাণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। সুতরাং বিগত শতকে এবং বর্তমান শতকের প্রথমপাদে অনূদিত বহু গীতায় শ্লোকটির পুরাণ বর্ণিত প্রথম অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ কীর্তি প্রভৃতি সপ্ত নারীকে পৌরাণিক দেবীরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাংলার প্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি গীতার সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত, কিন্তু সকলেই পকেট-সংস্করণ পাঠে অভ্যস্ত। ঐ শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ কি তলিয়ে বোঝেন না, পুস্তকে যা আছে তাই মুখস্থ করে যান।

কিন্তু চণ্ডী ও গীতার ঐ দুটি উক্তি অর্থাৎ—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু' এবং 'কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাম্' নারীজাতির পক্ষে magna charta বা মহাধিকার-পত্র বলেই স্বীকৃত হওয়া উচিত।

অন্ধ

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

আমি যারে চাই,
খুঁজে নাহি পাই,
আঁধারে ঘুরিয়া মরি সারাটি জীবন।

হয়তো সে আশে পাশে
নিয়তই যায় আসে
দেখিতে না পাই তায়, নাই সে নয়ন।

প্রকৃতি-সন্ধানী বিভূতিভূষণ

শ্রীনীলকান্ত রায়, এম-এ

'জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখী, উদার মাঠঘাট ....অস্ত সূর্যের আলোর রাঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্যতা..... জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায় .....

সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া। তারা ভগবানের প্রেরণা নিয়ে এই মহতী আনন্দ-বার্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে......এই কাজ তাদের করতে হবেই... তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা ...'

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে ভাগলপুরে 'পথের পাঁচালী' রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সেদিনকার দিনলিপিতে তাঁর উক্তরূপ চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

বস্তুতঃ সাহিত্যিকের এই মহৎ অনুভূতি তাঁর জীবন দিয়েই তিনি অনুভব করেছিলেন। আনন্দ-লোকের বার্তা তিনি দিকে দিকে প্রেরণ করবার আগে আপনার অন্তরলোকেও তা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। চক্ষের সম্মুখে সহস্র আনন্দবস্তু তাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজমান থাকলেও, সবার কাছে সহজে তারা ধরা দেয় না—দৃষ্টির বন্ধনে তাদের বাঁধা সহজসাধ্য নয়। বিভূতিভূষণ তাঁর অনন্যসাধারণ দৃষ্টি-প্রাখর্যে সেগুলি নিজে দেখেছিলেন আর দেখিয়েছিলেন বিদগ্ধ সমাজকে। সেই হিসাবে সাহিত্যিকের কঠোর সাধনা তাঁর জীবনে সিদ্ধির সাফল্য আনতে পেরেছে।

বার্নাড শ তাঁর Sanity of Art গ্রন্থে Montaign সম্পর্কে এক মন্তব্য করেছেন, 'He was the greatest artist of all—he knew the art of living. (তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় শিল্পী—তিনি জানতেন জীবনযাপনের কৌশল)। শরৎ-রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে বিভূতিভূষণের প্রতি এই কথা সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাঁর অন্তরের কবিধর্ম—তাঁর জীবনের অনুভূতি, প্রেরণা ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত ছিল। তাঁর শিল্পায়ন—তাঁর জীবনায়নকে কেন্দ্র করেই গ্রথিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অন্তঃপুরুষের আত্মপ্রকাশ তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এক বিশিষ্ট আসন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। বিভূতিভূষণের চক্ষে, হৃদয়ে ও লেখনীতে ছিল অসীম কৌতূহল—সেই কৌতূহলের দুর্বার আকর্ষণী তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে প্রকৃতির অনন্ত-বিস্ময়ভরা চিরন্তন সৌন্দর্যভাণ্ডারের দিকে। বিশ্বরহস্য সন্ধানের জন্যে অভিযান শুরু হয়েছিল তাঁর মর্মের নিভৃতলোক থেকে। সেই রহস্য-সন্ধান-অভিযানে কী পেয়েছিলেন তিনি?—তাঁর কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের কল্পনা, পরিণত জীবনের উপলব্ধি। সেগুলির প্রত্যেকটিই ছিল তাঁর সমস্ত বিস্ময়-বোধের দৃষ্টির প্রেরণায় কেন্দ্রীভূত। বিভূতিভূষণের কবি-মানস তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এমনই সাবলীলভাবে জড়িত ছিল যে তাঁর জীবনের পূর্ণ প্রকাশ অনবদ্য রসোপলব্ধির মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়েছিল। ব্যক্তি ও কবিমানসের যুক্ত প্রয়াস-প্রেরণা-সাধনার মধ্যে তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবনের চিরজাগ্রত স্বপ্ন ও অসীম কৌতূহলের সঞ্জীবনী-সঞ্জাত পরিবেশ তাঁর কল্পলোকের মূর্ত ছবি নিয়ে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে অক্ষয় স্পর্শ রেখে গেছে।

এমার্সন বলেছেন, 'Every literary man should embrace solitude as a bride—' (প্রত্যেক সাহিত্যিক নির্জনতাকে বরণ করে নেবে বধূর মতো)। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে আছে "এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে, মানুষের সুখ-দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। গ্রামপ্রান্তের সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন বেণুবনশীর্ষের দিকে চেয়ে মনে হ'ল ওদের সঙ্গে কতদিনের কত স্মৃতি যে জড়িত—সেই বর্ষার রাতে দিদির কথা, মায়ের কত দুঃখ, আদুরী-ডাইনীর ব্যর্থতা, পিসিমা, ইন্দির-ঠাকরুণের কথা, · কত সমুদ্রে যাওয়ার স্মৃতি, · · · সেই পিটুলিগোলা পানকারী দরিদ্র বালকের, পল্লী-বালা 'জোয়ানের', কতকাল আগের সে সব ইংরেজ বালক-বালিকার কথা – গাংচিল পাখীর ডিম সংগ্রহ করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল, Cape Wanএর ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরেনি, · · · কত কি, কত কি!" প্রকৃতির অসীম রূপ-রস-লীলা বিভূতি-ভূষণের শিল্পী-কবির চক্ষে এক স্বপ্নমাধুরী-ভরা মায়া-অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছিল। তাই তাঁর সাহিত্য-তীর্থযাত্রায় তাঁর লেখনীর প্রসন্নতা ও রসমধুরতা এক অপরূপতার আবেশে ভরপুর। আধুনিকতার চলার পথে তাঁর ব্যতিক্রম এইখানেই—তাঁর তীর্থযাত্রা ছিল শাশ্বত-সন্ধানী। তার মধ্যে বিতর্কের অসিখেলার রোমাঞ্চ নেই, বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংশয় নেই, জীবন-সমস্যার বিরাট জিজ্ঞাসা নেই, আছে শুধু প্রকৃতির লীলা-নিকেতনের দ্বার-বাতায়নের উন্মুক্ততার মধ্যে রহস্য-স্তর বিন্যাস, চির বিস্ময়ের রসপাত্র দুরধিগম্য আনন্দলোকের প্রাণপ্রাচুর্য। প্রকৃতি-প্রেমের সুরলোকের আনন্দ-সঙ্গীতের ঝঙ্কার তাঁর জীবনরসে মুক্তির আস্বাদ এনেছে, তাঁর অনুভূতির জগৎকে কানায় কানায় পূর্ণ করে রেখেছে।

মূর্ছিত মানবাত্মাকে জাগ্রত করতে প্রকৃতির চেয়ে শক্তিময়ী আর কেউ নেই। প্রকৃতির সাথে পরিচয়ের ছত্রে ছত্রে শুধু আপন আত্মার, অন্তরের সত্তার বোধই যে জেগে উঠে তা নয়, প্রকৃতি প্রেমের মাধুরী-স্পর্শ জীবনে অনন্তের উপলব্ধি আনতেও সক্ষম। বিভূতিভূষণের জীবনেও তার সম্যক্ সংঘটন হয়েছিল। তাঁর কবিদৃষ্টির সামনে প্রকৃতি তার অতিপ্রাকৃত-লোকের রহস্য-মহলের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। একদিন আকাশে কালবৈশাখীর ঝড় দেখে ইছামতীর জলে তিনি তরঙ্গের উল্লাস উপভোগ করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল, —"এমনি কত ঝটিকাময় অপরাহ্ণ ও নীরন্ধ্র অন্ধকার-ময়ী রাত্রির কথা—প্রকৃতির মধ্যে এমনি মিশে হাত ধরাধরি করে চলা, ঐ শ্যামল ডালপালা-ওঠা শিমুল গাছ, সাই-বাবলা গাছ—এই তো আমি চাই। · · · নদীজলে নেমে কেমন একটা ভক্তির ভাব এল। সমস্ত দেহমন যেন আপনা আপনি নুইয়ে পড়তে চাইল। এই ধরনের ভক্তি একটা বড় Bliss, জীবনে হঠাৎ আসে না। · · · · · আমি ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই তাঁর ঐ লক্ষ বিরাট রূপের মধ্য দিয়ে।" আবার তিনি সূর্যের প্রখর দীপ্তির মাঝে, অনন্ত আকাশের নীল শূন্যতার মাঝে অসীম অখণ্ডের সন্ধান পেয়েছিলেন। 'মাথার ওপরকার ঐ ময়ূরকণ্ঠী রঙের আকাশ, ঘাসের নিচে এই বিচরণশীল পোকামাকড়, ছোট ছোট ঘাসের ফুল, ঐ উড়ন্ত চিল, বটের ডালে লুকানো ঐ 'বউ-কথা-কও' পাখীর ডাক, কত বিচিত্র বনলতা, বনফুল—ঐ সূর্য থেকে পাচ্ছে এদের জীবন, রঙ ও আলো। কিন্তু এই সবের পিছনে, সূর্যেরও পিছনে এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীর সব রূপ-রস-গন্ধের পিছনে যে বিরাট অতিমানস শক্তির লীলা—তার কথা কেবলি এমনই দুপুরে নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে। · · · · · তখন যেন মনে হয়, এই বিশ্বের সঙ্গে আমি এক তারে গাঁথা · · · · · · অদৃশ্য যে লতার এই সব ফুল নিয়ে মালা গাঁথা হয়েছে, আমি

তাদের দল থেকে বাদ পড়িনি, তাদেরই একজন, বিশ্বের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপিত হয় মনে মনে।"

প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে একেবারে লীন করে দেওয়ায় যে অসীম অব্যক্ত আনন্দ আছে, তা' তিনি মর্মের নিভৃত লোকেই অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে পল্লীতে, গ্রামে—বাংলার শ্যামল পরিবেশের মধ্যে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ তিনি গভীরভাবে পেয়েছিলেন বলেই তাঁর সাহিত্যদৃষ্টির প্রয়াস অকৃত্রিমভাবে মানবহৃদয়কে মুগ্ধ করতে পেরেছে। বিভূতিভূষণ তাঁর ইছামতীকে ভালবাসতেন; সে ছিল তাঁর বাল্য কৈশোরের এবং বোধ করি বা যৌবনেরও খেলার সাথী। ইছামতীর প্রবাহধারার কলধ্বনিতে মুগ্ধ বালক, কৈশোরের অবিরাম কলোচ্ছ্বাস-মুখরিত তীরভূমি তাঁর সৃষ্টি-প্রবাহে স্থিতি আনতে পেরেছে—প্রশান্তি আনতে পেবেছে। পল্লীর জীবনধারা তাঁর সাহিত্যের জীবনবেদ; প্রকৃতির বহুপ্রকাশ, তরুলতা ফল ফুল, পাখীর কূজন, বন জঙ্গল, শান্ত পরিবেশ তাঁর সৃজনী শক্তির মন্দাকিনী। পরিণত জীবনে 'পথের পাঁচালী'র 'অপরাজিত' পথিক 'ইছামতী'র তীরে তীরে বেড়িয়েছেন, বনপ্রান্তে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে কবিচিত্তের তৃষা মিটিয়েছেন, কঠোর নিষ্ঠাচারীর ব্রত নিয়ে 'হে অরণ্য কথা কও' বলে 'আরণ্যকে'র ন্যায় 'বনে পাহাড়ে' অনুনয় করে ফিরেছেন, তাঁর 'দৃষ্টিপ্রদীপ' প্রকৃতি-রচিত মনোরম ব্রততী-বিতানের তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ রশ্মির আলোকমায়া রচনা করতে পেরেছে, 'তৃণাঙ্কুর'ও কবি-দৃষ্টিতে মনোহারিত্বের অমরাপুরী সৃষ্টি করেছে।

বিভূতিভূষণের কবিমানস সর্বতোভাবে ছিল প্রকৃতির রূপ-রস-সন্ধানী। তাঁর এই সন্ধানী মানস-ধর্ম তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য-তীর্থ পরিক্রমার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে আর এক প্রকৃতির সন্ধান ক'রে। সে অনুসন্ধানের কেন্দ্র হচ্ছে শিশুর প্রকৃতিবোধ, শিশুর মানসিক গতি-প্রগতি-পরিবেশ-বোধ। তাঁর অপরিসর জীবনের বহু অধ্যায় এই রসে ভরে রয়েছে। শিশুর মনের গভীর কোণে তিনি প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিশুর হৃদয়রাজ্য তাঁর কাছে অনধিকৃত ছিল না। শিশুরা কী ভাবে, কী বোঝে, কী বুঝতে চায়, তার তত্ত্ব তাঁর কাছে দুরধিগম্য ছিল না। অসম্ভাব্যতার অবিশ্বাস—শিশুর মনে কখনও সংশয় আনতে পারে না—তার বহুদূর-প্রসারী কল্পনার তীব্রালোকে সবকিছুই তার কাছে সম্ভব বলে ধরা দেয়। পাখী-ডাকা গ্রামের মুগ্ধমতি বালক 'অপু'র রামায়ণ মহাভারতের দেশের পথ-পরিচয় তাই নিছক কবি-কল্পনা নয়। শিশুমনের কাছে তা' একান্ত বাস্তব বলেই তার অনুভূতির মধ্যেও রোমাঞ্চ আছে। মনোজগতের 'নিশ্চিন্দিপুরে' অপু, পটু, রাণী, সুনীল, নীরেন ও দুর্গা নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে।

বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনের কর্মধারার মধ্যে শিশুর সান্নিধ্য ছিল। সে নৈকট্যের মধ্যে থেকেই তিনি পরম বিস্ময় ও আনন্দ আহরণ করতে পেরেছিলেন। শিশুদের সঙ্গে মেলা-মেশা তাঁর জীবনে আনন্দের স্পর্শ সঞ্চার করেছে, সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে প্রেরণা যুগিয়েছে। অতি সাধারণভাবে তিনি তাদের সঙ্গে মেশেন নি—অতি অসাধারণ-ভাবে তিনি নিজেকে তাদের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তিনি শিশু-মনোরাজ্যের গভীর গহনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন—এটা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে—তার প্রধান কারণ শিশুর প্রতি তিনি ছিলেন দরদী, অপরিসীম সহানুভূতির প্রকাশে উচ্ছ্বসিত। শিশুর মনের ভীরুতা দূর করার জন্যে, চিত্তে সাহসিকতা সঞ্চারের জন্যে, নিবিড় নির্মল আনন্দ সৃষ্টির জন্যে—তিনি তাঁর শিশু-সাহিত্যে বহু খোরাক রেখে গেছেন। জানিয়েছেন তিনি তাদের স্নিগ্ধশ্যামল পল্লীগ্রামের আনন্দবারতা, শহর-জীবনে সে সরল সাবলীলতার একান্ত অভাব।

নাগরিক জীবনকে স্বাভাবিক করতে গেলে অধিক পরিমাণে মুস্কিল বাঁধে, কল্পনায় বাস্তবের প্রলেপ দিয়ে 'চাঁদের পাহাড়' পাওয়া সম্ভব, 'হাজরি খুড়ির টাকা'কে কেন্দ্র কেমন গ্রাম্য মানুষগুলি ঘুরেছে, সাহসের উত্তেজনায় শিশুমন সতেজ হয়ে কেমন বিপদ হতে উদ্ধার পায়,—এমনই বহু সরস তথ্যের 'হীরামাণিক' শিশুর মনের মণিকোঠায় ভরে দিয়েছেন,—যেগুলি চিরদিন চিরন্তন শিশুমনের কাছে নিরন্তর জ্বলজ্বল করবে। শিশুর প্রকৃতি-বোধের প্রয়াসে তিনি কোথাও অলীক কল্পনার আশ্রয় নেন নি। শিশুমনকে বৃহত্তর কিছুর দিকে অনুপ্রাণিত করবার বাসনা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ছত্রে ছত্রে, এইখানেই শিশুদের প্রতি তাঁর অপূর্ব নিবিড় আন্তরিকতা। মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে দিতে, সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাহায্য করতে তিনি সব সময়েই তাঁর শিশু-সাহিত্যে এক রহস্যময় উন্মাদনা ও প্রেরণার সন্ধান দিয়েছেন। বালকমন বোঝে—যা কিছু অভিনব, যেটা তার অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই বালক-মন যাতে জগতের কল্যাণমুখী প্রবৃত্তিতে সার্থকভাবে রূপান্তরিত হতে পারে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের বিস্ময়কর স্পর্শ যাতে লাভ করতে পারে, তার জন্যে তাঁর সাধনা ছিল ক্লান্তিহীন। অতি সহজে, অতি স্বাভাবিকভাবে, শিশুর পরিচিত অভিজ্ঞতা-লব্ধ পরিবেশের মধ্যে তার মনে অনুভূতির তীব্রতা জাগিয়ে তোলবার জন্যে যে বিন্যাস সেটাই হচ্ছে বিভূতিভূষণের শিল্পতুলিকার রঙের বর্ণচ্ছটা। এই পৃথিবীটা যে আশাতীত সুন্দর, অত্যন্ত প্রিয়, অতিশয় মধুর—এই উপলব্ধির ব্যাকুলতা, ব্যাপকতা, মনের কোণে এই গোপন সত্য, যাতে সঞ্চার হ'তে পারে তারই ইঙ্গিত তাঁর লেখনীর ছত্রে ছত্রে। এই জগতের আশ্চর্য লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হ'লে বাইরের পরিচয়-পত্রের দরকার নেই—অন্তরের পরিচয়-পত্র পেলেই হ'ল। আর সেই পরিচয় শিশুর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে যেমন হয়, তেমনি বড় বয়সে ঘটে না। সৌন্দর্য-শিল্পের মোহনরূপকে যদি নিজের চৈতন্যের সঙ্গে একাত্মীভূত করতে হয় তাহলে শৈশবই মানবজীবনের আদি পীঠস্থান। অপরের মনে অনুভূতি জাগিয়ে তোলবার সত্যি-কারের শিল্পী মনোভাব বিভূতিভূষণের ছিল বলেই তাঁকে প্রকৃত আর্টিষ্ট বলা যেতে পারে। প্রকৃতি-প্রেমের সঙ্গে মানবহৃদয়ের ভালবাসা—পাশাপাশি থাকলেই মানুষের জীবনের রথ স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলে। শান্ত সরল ও সাবলীল শিশুর মানসপ্রকৃতি, কিন্তু তবুও তাকে ঠিকভাবে গড়তে হ'লে প্রয়োজন—প্রকৃতির প্রেম এবং মানবহৃদয়ের ভালবাসা। বিভূতিভূষণের সৃজনী প্রতিভা এদের থেকে বঞ্চিত ছিল না।

বিশ্বপ্রকৃতির নিসর্গশোভা আর মানবপ্রকৃতির আন্তর সৌন্দর্য সন্ধান করে বিভূতিভূষণ তাঁর অনেক পরিচয়ের মধ্যে আপন পরিচয়কে দৃঢ় ও সুসমঞ্জস করে গেছেন। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার বিশ্লেষণ সমাজ-জীবনের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন হ'তে ভিন্নতর—তাই সে বিতর্ক অকথিত থাকুক। মানুষের হৃদয়বীণার তন্ত্রীতে আনন্দের লহরী তুলতে তিনি পেরেছিলেন, সেই সত্যটাই চিরজাগ্রত হয়ে থাকুক। অধিকাংশ মানুষের জীবন তার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়, কিন্তু অল্পসংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে তার দেহাতীত জীবন নূতন পরিচয়ের সূচনা দেয়। সেই সব মনীষীদের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের, প্রতি পরিচয়ের, প্রতি পদক্ষেপের জীবনে যা দেখা যায়, যাকে চেনা যায়—তাকে অতিক্রম করে আরও এক নব পরিচয় ফুটে উঠে। মৃত্যুর আলোক জীবনের অপ্রকাশিত অন্ধকারের দিককে উদ্ভাসিত করে তোলে। বিভূতিভূষণের তাই মৃত্যু ঘটেনি, তাঁর নশ্বর জীবনের অন্তে মৃত্যু তাঁর অতি পরিচিত সত্যকার মানুষকে প্রকাশ করে দিয়েছে। সম-

সাময়িক সাহিত্যিকগণের সমকক্ষতাকে ছাড়িয়ে তিনি আজ মুক্ত মনের ধ্রুবলোকের যাত্রী। তাঁর সাহিত্যে তিনি রেখে গেছেন আনন্দ-চঞ্চল প্রাণবন্তা, এক আলোকোজ্জ্বল আদর্শ, অনেক বেদনা-দুঃখ-বিরহের মাঝে আনন্দের জ্যোতি ও সুখের বার্তা। তিনি যে সম্পদ দিয়ে গেছেন—বাংলার মানুষ চিরদিন তা' বুক ভরে রেখে দেবে ; তবু তাঁর অবাধ মুক্ত সৃষ্টি যেভাবে আকস্মিকরূপে ব্যাহত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের কাছে তা অপূরণীয় ক্ষতি। সেই জন্যেই তাঁর কথা স্মরণ করে গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে এক দুঃখের সুরও প্রাণে বেজে ওঠে :

'আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীতরূপে আপনারে ক'রে গেলে দান
দূর কালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য গাওয়া গান
মূর্তিহীন। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তা'রা যা হারাল তা'র সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা ?'

গরলামৃত

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

আছে তো কলুষ-কল্মষজাল এই ধরণীরে নিয়ত ঘেরি,
আছে মিথ্যার মধুর ছলনা বাজে শাঠ্যের বিজয়-ভেরী।
মহাদানবের প্রতারণা-জালে দুর্গত সীতা পায় না ত্রাণ—
ছিন্নপক্ষ জটায়ু হতায়ুঃ ব্যর্থ কি তার আত্মদান ?
ভুলিনি তো আজো বারণাবতের কলঙ্কময় সে ইতিহাস,
জতুগৃহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—কুরুকুল-কালি হয়নি নাশ।

মন্ত্রণাদাতা শকুনিও ছিল—তারি পাশে ছিল বিদুর ধীর,
জীবন-মৃত্যু পাশাপাশি যেন—একই নদীর দুইটি তীর।
লভে ব্যর্থতা জটায়ু বিদুর—তবু ধর্মেরই হয়েছে জয়,
বল-দর্পীর প্রবল ঘাতেও ন্যায়ের শক্তি হয়নি ক্ষয়।
সোনার লঙ্কা পুড়ে হ'ল ছাই—মহাভারতের শ্মশান-মাঝে
মহাজীবনের সন্ধান দিতে জীবনেশ্বর নীরবে রাজে।
প্রলয়ের মাঝে তাই যেন বাজে উদার মধুর গভীর তান
শব-সাধনার মাঝে জাগে শিব, রুদ্র জাগায় নূতন প্রাণ।

কোন্‌টি প্রশস্ত ?

স্বামী জীবানন্দ

মস্তিষ্ক না হৃদয় ?

মস্তিষ্কের মর্যাদা বেশি, না হৃদয়ের ? মানুষের মস্তিষ্ক এমন একটি জিনিস—যার সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে বড় বড় বৈজ্ঞানিকও কূলকিনারা পান না। একটি ছোট শিশু শশিকলার মতো বড় হতে থাকে ; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার আগ্রহও তার বাড়তে থাকে। দিনের পর দিন কত যে নতুন জিনিস সে শেখে তার ইয়ত্তা নেই। কিছু শুনলে বা দেখলে মনের মধ্যে একটি ছাপ পড়ে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে এক একটি রেখা অঙ্কিত হতে থাকে। সারা জীবনে অজস্র জিনিস দেখা শোনা ও শেখা হয় এবং তাদের প্রত্যেকটি মস্তিষ্কের মধ্যে নিজস্ব ছাপ রেখে যায় ; ভাল মন্দ সব কিছুরই রেখা মস্তিষ্কের মধ্যে স্থান পায়।

শৈশব থেকে শুরু করে একটি মানুষের জীবন শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, তার মস্তিষ্কের মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ জিনিস স্থান পেয়েছে—সেই পরিমাণে কিন্তু মস্তিষ্কটির আকার বা আয়তন বৃদ্ধি পায়নি। কোন একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মস্তিষ্কের আয়তন বাড়ে, কিন্তু বহু বৎসর অবধি মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা অব্যাহতই থাকে। স্বদেশের বিদেশের বহু শিক্ষণীয় বিষয়—রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, ললিতকলা, সঙ্গীত, ধর্ম, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি আজীবন শিক্ষা চলতে পারে ; কারণ 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।'

শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা সকলেই সচেতন, তাই মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্ত চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যের দিকে যেন আমাদের লক্ষ্য নেই ! শিক্ষার প্রচলিত মাপকাঠি ডিগ্রি বা বহু বিষয়ে জ্ঞানসঞ্চয় অথবা অভিজ্ঞতা অর্জন—সন্দেহ নেই, কিন্তু ইহাই একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়। হৃদয়ের প্রসারতাই প্রকৃত শিক্ষার পরিমাপক হওয়া উচিত। যিনি যে পরিমাণে হৃদয়বান্‌ তিনি সেই পরিমাণেই শিক্ষিত বলা যেতে পারে। দেবশিশুর মত সুন্দর যে ছোট্ট ছেলেটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত—সদা সত্যকথন, মধুর ব্যবহার, সহানুভূতি, পরোপকার-স্পৃহা, দয়া প্রভৃতি মহৎ গুণে বিভূষিত ছিল—সেই-ই তো এখন ব্যারিষ্টার হয়েছে—হাঁ-কে না করছে, আইনের তর্কজালে সত্যকে মিথ্যা করতে পারদর্শী প্রসিদ্ধ আইনজীবী বলে পরিচিত, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তার ব্যক্তিত্ব সংকুচিত—এখন তার হৃদয়বত্তার কোন বালাই নেই, যত দিন যাচ্ছে ততই যেন সে হৃদয়হীন ও শুষ্ক যুক্তিপরায়ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে !

ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট মস্তিষ্কের অদ্ভুত ধারণক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের বিস্ময় হওয়া স্বাভাবিক, কারণ এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা সক্রিয়, কিন্তু হৃদয়েরও যে এইরূপ ধারণক্ষমতা রয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা ক'জন অবহিত ? হৃদয় যেন একটি শেওলা-ঢাকা বদ্ধ জলের ছোট ডোবায় পরিণত হয়েছে ! সংকীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধির আকর এই হৃদয়টি কেবল 'আমি, আমার' ভেবেই আকুল। কোন সৎচিন্তার স্থান যেন এখানে নেই ! যে হৃদয়ের আজ এই অবস্থা তাকেই যদি উপযুক্ত সৎভাব ও পরের কল্যাণ-কামনায় পূর্ণ করতে চেষ্টা করা যায়—তা হলে সে-ই ক্রমে ক্রমে বিশাল হতে বিশালতর হবে। বদ্ধ জলের ক্ষুদ্র জলাশয়—স্বচ্ছ সরোবরে, সরোবর সাগরে, সাগর যেন মহাসাগরে রূপান্তরিত হতে থাকবে ; প্রশান্ত নির্মল অক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র !

আমিত্ব বুদ্ধির বহু উর্ধ্বে গিয়ে ক্ষুদ্র হৃদয়ই একদিন মহৎ হৃদয়ে পরিণত হবে—যখন সকলেই আপনার জন—'বসুধৈব কুটুম্বকম্', 'স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্'—এই অনুভূতিতে মন প্রাণ ভরপুর হয়ে উঠবে। তাই উপনিষদের ঋষি বললেন—'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। অনন্ত পথের যাত্রী আমরা, ঝড়ঝঞ্ঝায় দুর্গম দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে। পিছন ফিরে না তাকিয়ে 'স্বর্গাৎ স্বর্গম্', উন্নতি থেকে ক্রমোন্নতিতে আরূঢ় হব—এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।

মস্তিষ্ক ও হৃদয়—উভয়েরই উৎকর্ষ প্রয়োজন মানবমনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য। একদিকে ক্ষুরধার মেধা ও অপরদিকে আকাশ-উদার হৃদয়, উভয়ের শুভ মিলনে যে অনুভূতি - তাই মর্ত্যবাসীকে অমরত্বের সন্ধান দেয়—তাকে স্মরণীয় বরণীয় করে।

উর্বর মস্তিষ্ক ও ক্ষুরধার বুদ্ধি—সকলের হয় না ; বহু চেষ্টার দ্বারাও মস্তিষ্কের সেরূপ উন্নতি দেখা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের প্রসারতার জন্য কিছুই ব্যয় করতে হয় না। মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি, দুঃখে সমবেদনা, অন্তরে অপরের কল্যাণকামনা—সকলের পক্ষেই সম্ভব। তাই মানবজীবনে সর্বোপরি এবং সর্বাগ্রে হৃদয়বত্তাই কাম্য।

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এই রকম মানুষ যার থাকবে ক্ষুরধার মস্তিষ্ক, অনন্ত হৃদয়বত্তা এবং প্রচণ্ড কর্মশক্তি।

হাসি না অশ্রু ?

হাসি ও অশ্রু, দুই-ই মানুষের সুখদুঃখের সাথী। সুখের সাধারণ সহচর হাসি, দুঃখের অশ্রু। আবার সুখের সময়ে—আনন্দের সময়েও অন্তরের অমিয়-ধারা অশ্রুরূপে নয়নকোণে প্রবাহিত হয়। আমরা হাসিরই মূল্য দিই বেশী, অশ্রুর তত দিই না। অশ্রুর মূল্য কিন্তু কম নয়। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা—মর্মভেদী শোক লাঘব হয় অশ্রুর বন্যায়। অনুতাপের অনলে যে হৃদয় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে তার প্রায়শ্চিত্তের পরিসমাপ্তি চোখের জলে। পাপে, অকৃতকার্যতায়, ব্যথা-বেদনায় যখন পদে পদে লাঞ্ছনা গঞ্জনা, তখন তো মুখে হাসি ফোটে না—দুনিয়ার সব বন্ধু পরিত্যাগ করে চলে যায়,—জগৎ শূন্য বলে মনে হয়, তখন রক্ষা করে কে ? অশ্রু। অশ্রুই তখন সব কালিমা মুছিয়ে দিয়ে হৃদয় মন শুদ্ধ পবিত্র করে দেয়। যখন সংসারের সব কিছু অসার—মায়ামোহে আর মন বদ্ধ হতে চায় না—সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে শিক্ষালাভ করতে করতে এমন একটি জিনিসের জন্য ব্যাকুলতা আসে—যা না পেলে যেন আর কিছুতেই শান্তি নেই—তখন সেই ব্যাকুলতার বাহ্য প্রকাশ নয়নের অশ্রুধারা। যার জন্য এত ক্রন্দন তখন আর তা দূরে থাকে না, কাছে এসে ধরা দেয়—দীর্ঘ তিমির রাত্রির অবসানে উষার আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, অরুণোদয়ে পূর্বাকাশ রক্তরাগে রঞ্জিত হয়।

যার অধরে অবিরত মধুর হাসির রেখাটি লেগে আছে—সকলে যে তার সাহচর্য কামনা করে তাতে কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু যার ঐকান্তিকতা অশ্রুকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয় তার আবেদন হৃদয়কে স্পর্শ করে—চিত্তকে অভিভূত করে, তার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা দুঃসাধ্য। ছেলের কান্না শুনে তাই মা ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নেন। সংসারের সুখেস্বপ্নে পরম নিশ্চিন্ততায় যতদিন সন্তান হাসির আনন্দে ভুলে থাকে ততদিন যেন মাতৃকৃপা দুর্লভই থেকে যায়, কিন্তু যে মুহূর্তে নিশ্চিন্ততার মোহ কাটিয়ে জগন্মাতার জন্য ব্যাকুলতায় ক্রন্দনে বুক ভরে ওঠে তখন মা তাঁর অশেষ কল্যাণকর পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিয়ে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার চিরতরে অবসান করে দেন। অভাব বা দুঃখই অশ্রু আনে, আর অশ্রু

টেনে আনে মাকে। তাই হাসি অপেক্ষা ব্যাকুলতার অশ্রু, প্রেমের অশ্রুই কাম্য।

ভোগ না ত্যাগ?

ভোগ করতে গেলে ত্যাগ হয় না; আবার ত্যাগী হতে হলে ভোগ করাও যায় না। ভোগ আর ত্যাগ—দুটি বিভিন্নমুখী ভাব। একটিতে আছে সংসারের যা কিছু সুন্দর ও সুখময় তার দিকে দুর্বার আকর্ষণ—অপরটিতে সকল আকর্ষণীয় বস্তু হতে সম্পূর্ণ উপরতি। একটিকে বরণ করে সুখের হিন্দোলে গা ভাসিয়ে দেওয়া—অন্যটিকে আশ্রয় করে সুখ দুঃখ সর্বাবস্থায় উদাসীন হওয়া ও স্রোতের গতিকে বিপরীত মুখে ধাবিত করবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। ত্যাগের প্রয়োজন কি? বেশ তো আছি—সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটছে। মন যা চায় তাই নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকি না কেন? কেন তাকে অনর্থক বিব্রত করা? সংসারের আরও দশ জন যা করছে—ধন জন মান নিয়ে সদা ব্যস্ততার মধ্যে দিন যাপন—সেই তো বেশ। কেন মিছা-মিছি বিপরীত পথে যাওয়া—যেখানে আছে নিরন্তর অন্তরে দ্বন্দ্ব আর বাহিরে ব্যর্থতা!

কিন্তু সহজ সরল ভোগের পথ মনের একান্ত কাম্য হলেও সেইটিকেই সব সময় মন মেনে নিতে চায় না—এমনি আশ্চর্য তার গঠন। যখন দেখা যায় ইন্ধন পেতে পেতে ভোগাগ্নির লেলিহান জিহ্বা অবাধগতিতে বেড়েই চলেছে—থামতেই চাইছে না—একশ হ'ল তো সহস্রের জন্য ভাবনা, সহস্র মিলল তো লক্ষের জন্য উন্মাদনা, আরো চাই আরও—তখন আর মন নিজেকে বাসনা-অনলে দগ্ধ হতে দিতে চায় না, বিদ্রোহ করে ওঠে,—পিছন ফিরে তাকিয়ে পর্যালোচনা করে—কতদূর এসেছি, কোথায় চলেছি, কেন? এই কী শান্তির পথ? তখনই ক্লান্ত মন যেন ঘরে ফিরতে চায়—বলে: না না অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, পথ ভুলে অনেক দূর তো এসেছি, আর না। দেখে শুনে ঠেকে অনেক শিক্ষা হয়েছে, এইবার প্রকৃত শান্তি চাই; সুখ চাই না, ভোগ চাই না।

ত্যাগের শক্তি অসীম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক কর্মের মধ্যেই তা উপলব্ধি করি। সংসারের কেউ কোন কিছুর অধিকার ত্যাগ করলে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ছোট ছোট শিশু বা বালকের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বা ব্যবহারের জিনিস যখন নিজেদের ভোগাংশ থেকে অপরের জন্য ছেড়ে দেয় তখনই তাদের একটি আত্মতৃপ্তির অনুভূতি হয়। উপযুক্ত পরিবেশে অনুকূল আব-হাওয়ায় এই ত্যাগের ভাবটি সযত্নে লালিত হলে ভবিষ্যৎ জীবনে বৃহত্তর ক্ষেত্রে—সমাজে বা রাষ্ট্রে নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ জীবন যাপন করা সম্ভব হতে পারে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনধারণ ও সামাজিকতা রক্ষার জন্য যতটুকু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন ততটুকুর জন্যই আমাদের ভোগ সীমাবদ্ধ থাকা কর্তব্য। কোন এক জায়গায় গণ্ডী না টানলে উপায় নেই, কোথায় নিয়ে গিয়ে যে ফেলবে কে জানে? এক ব্যক্তি শত জনকে বঞ্চিত করে প্রচুর ধন, প্রচুর খাদ্য, অপরিমিত বিলাস-সামগ্রী ভোগ করবে এ শুধু দৃষ্টিকটু নয়, অনুচিতও। প্রত্যেক মানুষের ভালভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ পেতে হলে বাল্যকাল থেকেই দেশের ভাবী নাগরিকদের মধ্যে যাতে স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি জন্মায় তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত কিনা—অবশ্যই চিন্তনীয়।

ঐহিক ভোগসুখের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝলে জীবনের কতটুকু ত্যাগ করব—যখন প্রশ্ন জাগে তখন সংসারের সীমার সংকীর্ণতা ত্যাগ করে একমাত্র অনন্ত বিস্তারের পথ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সাংসারিক পরিবেশে সব সময় পরিপূর্ণ ত্যাগের পথ বরণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য বৈরাগ্য যখন তীব্র হয় তখন কি অনুকূল কি প্রতিকূল যে কোন

অবস্থার সঙ্গেই অক্লেশে যুদ্ধ করে পথ সহজ করে নিতে পারা যায়। অন্তরে এবং বাহিরে পরিপূর্ণ-ভাবে যে ত্যাগ তা শ্রেষ্ঠ, তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে : 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।

ঠিক ঠিক ত্যাগ হচ্ছে মনে, অন্তরে অনাসক্তি। এই আন্তর বৈরাগ্য বহু তপস্যার ফলে হয়। বাহিরে অনন্ত ভোগসামগ্রীর মধ্যে থাকলেও অনাসক্ত পুরুষের অন্তরে পূর্ণ বৈরাগ্য সদা বর্তমান। কিন্তু তপস্যাবিহীন ব্যক্তির পক্ষে ভোগবিলাসের মধ্যে থেকে অনাসক্ত হওয়া অসম্ভব—বামনের চাঁদ ধরার ইচ্ছার মতো হাস্যকর। তপস্যা ব্যতীত অনাসক্তি-লাভ অসম্ভব।

প্রকৃত ত্যাগীই অনলস নিষ্কাম কর্মী, তিনিই প্রকৃত কর্মী। যিনি নিজে মনে প্রাণে ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করেছেন তিনিই দেশের দশের ও সকলের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন। কারণ নিজের স্বার্থ বলতে যে তাঁর কিছুই নেই! ত্যাগ জীবনবিমুখতা নয়—জীবনকে পূর্ণ করবার উপায়।

একটি শরীর দিয়ে ও একটি মন দিয়ে মানুষ কতটুকুই বা ভোগ করতে পারে? বসুন্ধরার বিপুল সম্পদ—রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ—তিনিই বিচিত্র-ভাবে সকলের মধ্যে উপভোগ করতে পারেন যিনি প্রকৃত ত্যাগী—সব ছেড়ে যিনি সব পেয়েছেন। ভোগীর চিন্তাধারণার বাহিরে এ জিনিস! স্বামী বিবেকানন্দের কর্মবহুল জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় কথাটির তাৎপর্য কি তা বোঝা যায় :

আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে একবার বলেন,—'এই জগৎটা থেকে যতদূর লাভ করা যেতে পারে তার চেষ্টা সকলের করা উচিত—এই আমার বিশ্বাস। কমলা-লেবুটাকে নিংড়ে যতটা সম্ভব রস বের করে নিতে হবে—যেন এক ফোঁটা রসও বাদ না যায়—কারণ, আমরা এই জগৎ ছাড়া অপর কোন জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নই।' স্বামীজী তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন,—'আমি আপনার চেয়ে এই জগৎরূপ কমলা-লেবুটাকে নিংড়াবার উৎকৃষ্টতর প্রণালী জানি—আর আমি তাই এ থেকে বেশী রস পেয়ে থাকি। আমি জানি, আমার মৃত্যু নেই, সুতরাং আমার ঐ রস নিংড়ে নেবার তাড়া নেই। আমি জানি, ভয়ের কোন কারণ নেই—সুতরাং বেশ করে ধীরে ধীরে আনন্দ করে নেংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার স্ত্রী-পুত্রাদি ও বিষয়-সম্পত্তির কোন বন্ধনও নেই, আমি সকলকে সমভাবে ভালবাসতে পারি। সকলেই আমার পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ। মানুষকে ভগবান বলে ভাল-বাসলে কি আনন্দ—একবার ভেবে দেখুন দেখি! কমলা-লেবুটাকে এইভাবে নেংড়ান দেখি—অন্যভাবে নিংড়ে যা রস পেতেন, তার চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশী রস পাবেন—এক ফোঁটাও বাদ যাবে না।'

এই হ'ল প্রকৃত ত্যাগী অনাসক্ত পুরুষের ভোগ!

ত্যাগের অসীম শক্তির কথা ভেবেই সত্যদ্রষ্টা ঋষি ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলেছেন :

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

'জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, সবই আত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন কর, অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য, জগৎ তাতে কল্পিত—মিথ্যা, এই জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা-বুদ্ধি বিলুপ্ত করবে। (তাতেই তোমার হৃদয়ে আসক্তি-ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস আসবে) সেই ত্যাগ বা সন্ন্যাস দ্বারা অদ্বৈত নির্বিকার ভাব রক্ষা কর; কারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করো না।'

অভিজ্ঞতা-দ্বারা মানুষ শেষে বোঝে, আপাত-সুখকর ভোগের পথ পথ নয়—ত্যাগের পথই পথ, অনন্ত বিস্তারের পথ, অনন্ত শান্তির পথ। তাই ত্যাগই কাম্য—ত্যাগই বরণীয়। সংসারের সর্ব বিষয়ে সকল অবস্থায় যতটুকু ত্যাগ করিতে পারা যায় ততটুকুই কল্যাণজনক।

যাত্রীর চিঠি

[ব্যাঙ্ককের কথা]

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

গত রবিবার (৭ই এপ্রিল) স্যানফ্রান্সিস্কো পৌঁছেছি; দেখতে দেখতে সাত দিন কেটে গেল। ভারতবর্ষ ছাড়বার পর আঠারোটি দিন অতীতের গর্ভে মিলিয়ে গেছে। এখানকার বেদান্ত-সমিতির পরিচালক শ্রদ্ধাস্পদ অশোকানন্দজী মহারাজ মাঝে মাঝে হেসে জিজ্ঞাসা করছেন, দেশের জন্যে মন হু হু করছে কি না। জবাব দেওয়া মুস্কিল। তবে এটা তো সত্যিকথা, মানুষের ব্যক্তিগত উল্লাস-বেদনা বেগবান কালের অব্যর্থ অগ্রগতির কাছে একান্তই অকিঞ্চিৎকর। কালপ্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে যদি কিছু বলতে বা করতে পারা যায় উত্তম, নতুবা নিজেকে প্রকাশ করতে যাওয়া মূঢ়তা।

আমেরিকার মাটি ধরবার আগে পথের কয়েক-দিনের অভিজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাতাশে মার্চ রাত সাড়ে দশটার কিছুক্ষণ আগে দমদম বিমানঘাঁটিতে সকলের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ে বি. ও. এ. সি-র প্রশান্ত মহাসাগরগামী বিমানটির সিঁড়ি বেয়ে যখন ভিতরে ঢুকলাম সেই যাত্রা-শুরুর মুহূর্তটি এক নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মনে হয়েছিল সমগ্র মানবজাতির সাধারণ ধর্ম—যাত্রা। চলো চলো চলো। পিছনে তাকিয়ো না, সামনের অনিশ্চয়তায় মুষড়ে প'ড়ো না। সমস্ত মানুষ চল্‌ছে। সমস্ত মানুষের সাধারণ ধর্মের অতিরিক্ত অভিনব কিছু এই মুহূর্তে তোমার পক্ষে ঘটছে—এমন মিথ্যা ভাবনা রেখো না। মনে হয়েছিল এই বৃহৎ পৃথিবীতে সংযোগ-বিয়োগ একটা গণ্ডীবদ্ধ সত্য মাত্র। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ দেশ ও কালের দ্বারা সীমায়িত হতে পারে না। সমগ্র মানবজাতির কথা ভাবলে মানুষ কখনো মানুষ থেকে আলাদা হয় না, দূরে যায় না। অতএব মানুষ কখনই একা নয়। সকল কালের সকল মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে—অতীত মানুষ, বর্তমান মানুষ, আবার অনাগত মানুষ। মানুষের শক্তি ব্যষ্টিতে নয়, সমষ্টিতে।

মহাশূন্যে উড়ে চলবার আবেশের মধ্যে কখন যে চোখ বুজে গিয়েছিল খেয়াল নেই, নিশ্চয়ই রাত্রে কিছুটা ঘুমিয়েছিলাম, কেননা হঠাৎ জেগে উঠে ঘড়িতে দেখলাম রাত প্রায় দু'টো। দুই কানে সূচ বেঁধার মতো প্রখর যন্ত্রণায় জেগে উঠেছিলাম। আঙুল দিয়ে কান চেপে ধরলাম, তুলো গুঁজে দিলাম কিন্তু যন্ত্রণার উপশম নেই। তখন স্টুয়ার্ডকে বলতে তিনি বললেন, 'Blow your nose' (নাক থেকে হাওয়া বের করে দিন)। ঐরূপ কিছুক্ষণ করায় উপকার পাওয়া গেল। ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন আমরা ব্যাঙ্ককে নামছি।

টাইম টেবলে ছিল ভোর ৪টায় ব্যাঙ্কক, তবে যে এত আগে? ক্যাপ্টেন বললেন, 'ব্যাঙ্কক টাইম'। বুঝলাম, পূবে চলেছি, সময়ও এগিয়ে গেছে। কলকাতার ঘড়ির রাত দুটো মানে ব্যাঙ্ককে রাত সাড়ে তিনটা। দেড় ঘণ্টার তফাৎ। তবুও প্লেন বেশ কিছুক্ষণ আগেই ব্যাঙ্কক পৌঁছে গেছে। কাস্টমস্-এর পরীক্ষাদির পর মালপত্র নিয়ে বি. ও. এ. সি-র বাসে উঠে ১৮ মাইল দূরে শহরে যখন পৌঁছুলাম তখনও বেশ রাত রয়েছে। থাই-ভারত লজে আমার থাকবার ব্যবস্থা আগে হতে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, কথা ছিল ওঁদের কেউ বি. ও এ. সি-র শহরের অফিস থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন। অতএব বি. ও. এ. সি-র অফিসেই নামা গেল। বেশ লম্বা চওড়া গোলগাল এক ব্যক্তি আমাকে সন্ন্যাসী দেখে করজোড়ে নমস্কার করে হিন্দীতে

বলে উঠল, আইয়ে মহারাজ। ইনি বি. ও. এ. সি. অফিসের দারোয়ান। (পরে জেনেছিলাম ব্যাঙ্ককে যত অফিসে বা বড় বড় বাড়ীতেও দারোয়ানের কাজ এবং শহরে দুধের ব্যবসা—গোরখপুরের এই হিন্দুস্থানী লোকদেরই প্রায় একচেটিয়া। এদের স্থানীয় নাম 'ভাইয়া'। এরা দেশের মতই কাপড় পরে—তবে শ্যামদেশের ভাষা শিখে নিতে হয়েছে)।

দারোয়ানজী আমার জিনিসপত্র বাস্ থেকে নামিয়ে ঘরের এক পাশে রাখলো এবং আমাকে 'পঙ্খাকে নীচে' বসতে বললো, কেননা সেই শেষ রাত্রেও দস্তুরমতো গরম বোধ হচ্ছিল। ইতিমধ্যে অফিসের একটি কর্মচারী—আমি থাই-ভারত লজে যাব শুনে—বাসের ড্রাইভারকে ঐ স্থানের নির্দেশ দিয়ে আমাকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসতে বললেন। তখনও আমাকে নিতে থাই-ভারত লজ থেকে কেউ বি. ও. এ. সি-র অফিসে আসেন নি। অনির্দিষ্ট কালের জন্যে এই অফিসে বসে না থেকে তাড়াতাড়ি ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়াই সমীচীন মনে হল। দারোয়ানজী আমার মালপত্র আবার বি. ও. এ. সি-র বাসে তুলে দিল।

ঘুমন্ত ব্যাঙ্কক শহরের সুদৃশ্য অট্টালিকাশোভিত অনেকগুলি বড় রাস্তার মোড় ঘুরে প্রায় ২০ মিনিট পরে বাস্ সিরিংফওস্ রোডে প্রশস্ত ময়দানযুক্ত একটি বৃহৎ ব্যারাকের মতো দ্বিতল বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। বাড়ীর গায়ে লেখা দেখলাম—'থাই-ভারত কালচারাল লজ'। তখনও ভোর হয় নি। ড্রাইভার আমার জিনিসপত্র নিয়ে গেটের ভিতর ঢুকে ময়দানে দাঁড়ালো, পিছনে আমিও এলাম। কিন্তু কোন লোকজনের সাড়াশব্দ নেই—কেবল দূরে দোতলায় একটি ঘর থেকে অস্পষ্ট একটি বাজনার সুর ভেসে আসছিল। ড্রাইভারের কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর একতলার ঘর থেকে একজন 'ভাইয়া' বেরিয়ে এল—এখানকার দারোয়ান। করজোড়ে নমস্কার করে সে আমায় হিন্দীতে অভ্যর্থনা জানালো। বললো, আপনি আসবেন আমরা জানি, আপনার ঘরও ঠিক আছে, তবে চাবি পণ্ডিতজীর কাছে (পণ্ডিতজী অর্থাৎ লজের সেক্রেটারী), তিনি শীঘ্রই এসে পড়বেন। আপনি বরং ততক্ষণ উপরে চলুন শাস্ত্রীজীর কাছে।

দোতলার সিঁড়ি উঠে প্রশস্ত বারান্দা এবং অনেকগুলি ঘর পেরিয়ে একটি কক্ষে নীত হলাম। আলো জ্বলছিল, মেজেয় মাদুর পেতে একটি ভদ্রলোক হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন। আমায় দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং অতি অমায়িকভাবে হিন্দীতে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন। কাপড়-পরা, খালি গা, গলায় উপবীত, মুখে লম্বা গোঁফদাড়ি। বুঝে নিলাম ইনিই শাস্ত্রীজী। ঘরের দেওয়ালে অনেক দেবদেবীর ছবি। মেজেতে এক কোণে আসন পাতা রয়েছে, তার সামনে কোশাকুশি। বুঝলাম এই ঘর থেকেই বাজনার শব্দ নীচে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

শাস্ত্রীজীর সঙ্গে গল্প বেশ জমে উঠলো। ইনি ব্যাঙ্কক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক। থাই ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব সম্বন্ধে ভদ্রলোক অনেক তথ্যপূর্ণ কথা বললেন।

সকাল হল। স্নান সেরে নিলাম। ইতিমধ্যে লজের সেক্রেটারী পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা এসে হাজির হয়েছেন; বললেন, আপনাকে আনতে বি. ও. এ সি-র অফিসে একটি বাঙালী ভদ্রলোককে পাঠিয়েছি, প্লেন আগে এসে গেছে বলে তিনি আপনাকে ধরতে পারেন নি। ক্ষমা চাইলেন। বাঙালী ভদ্রলোকটিও কিছু পরে এসে উপস্থিত হলেন। ইনি বহু বৎসর ব্যাঙ্ককে রয়েছেন। স্ত্রী থাই মহিলা। ওঁদের একটি মাত্র মেয়ে—বাংলা নাম রেখেছেন 'অরুণা'। মেয়েটি বাংলা বলতে পারে না, কিন্তু বাংলা দেশের উপর তার একটা টান আছে, চেহারাও আধা ভারতীয় আধা থাই।

লজের সেক্রেটারী পণ্ডিতজী এবং ঐ বাঙালী ভদ্রলোক তিন দিন আমার ব্যাঙ্কক এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অনেক জায়গা দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। থেল-ল্যাণ্ড বা শ্যামদেশ প্রধানতঃ বৌদ্ধদেশ। ব্যাঙ্ককের শত শত মন্দিরের মধ্যে প্রধান কয়েকটি দেখলাম। মন্দিরগুলির একটি স্বকীয় স্থাপত্য আছে। কাঠের তৈরী সৌধ যেমন বিরাট, তেমনি উঁচু। সমগ্র মন্দির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এবং বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে অনেকগুলি স্তর পার হলে তবে প্রধান মন্দিরে পৌছানো যায়। দক্ষিণদেশের মন্দিরের কথা মনে পড়ে। তিনটি বুদ্ধ-মূর্তি এখানে বিখ্যাত—দণ্ডায়মান বুদ্ধ, শয়ান বুদ্ধ এবং পান্নার তৈরী বুদ্ধ-মূর্তি (Emerald Buddha)। ভগবান বুদ্ধের দাঁড়ানো এবং শায়িত—দুটি মূর্তিই অতি প্রকাণ্ড, মুখের ভাবও খুব প্রশান্ত। শেষোক্ত পান্নার বুদ্ধমূর্তিটি রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন একটি মন্দিরে রক্ষিত। মূর্তিটি খুব বড় নয়, কিন্তু দেখতে ভারী সুন্দর। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন মন্দিরে পাঠ হচ্ছিল; শত শত নরনারী সশ্রদ্ধভাবে বসে শুনছিলেন। ঠিক আমাদের দেশের মন্দিরের পরিবেশ। এই মন্দিরের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বস্থ দালানে রামায়ণের চিত্রাবলী আঁকা রয়েছে। রামায়ণের অনেক নাম থাই ভাষায় কিছু কিছু রূপান্তরিত হয়েছে, ঘটনাবলীও কিছু কিছু বিকৃত হয়েছে, তবে মোট কাঠামোটি ঠিক আছে।

দু তিনটি বৌদ্ধ মঠেও গিয়েছিলাম। নানা বয়সের শত শত ভিক্ষুক দেখলাম। শ্যামদেশে গৃহস্থকেও জীবনের কোন একটা সময়ে কিছুকালের জন্য ভিক্ষু হতে হয়। বৌদ্ধ মঠে অনেক বিদ্যার্থী এবং ব্রহ্মচারীও নজরে পড়ল। এদেরও ভিক্ষুদের মতো বেশ, তবে সাদা কাপড়। বৌদ্ধধর্ম শ্যামদেশে বেশ জাগ্রতই রয়েছে।

ব্যাঙ্কক শহরটি দ্রুত পাশ্চাত্য শহরে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তায় রাস্তাঘাটের বহু উন্নতি ঘটেছে শহরের পরিচ্ছন্নতা এবং যানবাহন ও যাত্রীদের নিয়মশৃঙ্খলা দেখে মুগ্ধ হলাম। মনে পড়লো আমাদের রাজধানী কলকাতার কথা। শ্যামদেশবাসী তাদের রাজধানীকে কি করে এত পরিষ্কার রেখেছে, আমরা পারি না কেন? বার বার এই প্রশ্নটি মনে তোলপাড় করতে লাগলো।

ব্যাঙ্ককে বহু চীনা অধিবাসী আছে! চীনা এবং থাইরা পাশাপাশি বেশ প্রীতির সঙ্গে বাস করছে—স্বার্থের সংঘর্ষ বাধছে না; তবে চীনারা থাইদের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রমী, দোকানপসার চীনাদেরই হাতে। চীনা এবং থাইন বৈবাহিক আদানপ্রদানও কিছু কিছু চলে। শহরের উপান্তে একটি থাই পল্লীও একদিন দেখতে গিয়েছিলাম।

শ্যামদেশে অন্নকষ্ট নেই। ভাত এবং মাছ প্রধান খাবার। থাইবাসীদের মধ্যে জাতিভেদ নেই। এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম জাতীয় সংহতির দিক দিয়ে এ একটা মস্ত বড় কথা। পুরুষরা বাইরে কাজকর্ম করে। গৃহস্থালী, বাজার হাট সব মেয়েরাই করে। থাই মহিলারা সাজপোষাকে দ্রুত পাশ্চাত্ত্যদেশের অনুকরণ করে চলছেন। ব্যাঙ্কক বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখে আনন্দ হল। একদিন ব্যাঙ্কক থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলেও বেড়াতে গিয়েছিলাম। ধানক্ষেত এবং নানা গাছপালার মাঝে ছোট ছোট বাড়ীগুলি দেখে বাংলা দেশের গ্রামের কথা মনে পড়ে। ব্যাঙ্ককের নদী, নদীর বুকে শ্যামদেশীয় নৌকার আনাগোনা এবং নদীর তীরে বৃহৎ বৌদ্ধমন্দির ওয়াট-অরুণ (অরুণ বা সূর্যোদয় চিহ্নিত মঠ) দেখে ভারী আনন্দ লাভ করলাম।

শ্যাম এবং ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাকৃতিক, ভাবাগত এবং ধর্মীয় সাদৃশ্য উপেক্ষার বস্তু নয়। থাই-ভারত কালচারাল লজ এই সাদৃশ্যকে পুরোভাগে রেখে উভয় জাতির মধ্যে প্রীতি ও সাংস্কৃতিক

সংযোগ দৃঢ় করবার চেষ্টা করছেন। এঁদের কাজ যে খুব ব্যাপক প্রসারলাভ করেছে তা বলা চলে না, তবে এঁদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। জনৈক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। দীর্ঘকাল ব্যাঙ্ককে থেকে তিনি থাই ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন এবং থাই সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থও লিখেছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি দেহত্যাগ করেছেন, কিন্তু ব্যাঙ্ককের অভিজাত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁর নাম এখনও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। সঙ্ঘের লাইব্রেরীতে ভারতীয় ও থাই সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক বই রয়েছে দেখলাম। সঙ্ঘ একটি বিদ্যালয়ও পরিচালনা করেন।

ব্যাঙ্ককে ভারতীয়ের সংখ্যা কয়েক হাজার। এঁদের অধিকাংশই পাঞ্জাবী (শিখ ও হিন্দু উভয়ই)। এঁরা বেশীর ভাগ কাপড়ের ব্যবসা করেন। উত্তর প্রদেশের 'ভাইয়া'দের কথা আগেই বলেছি। একদিন পূর্বোক্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহে তাঁর নির্বাচিত ভারতীয় বন্ধুদের একটি সম্মেলনে উপস্থিত হতে হয়েছিল। বহুদিন ভারতবর্ষ ছাড়া হলেও এঁদের মনে ভারতের প্রতি টান এবং ভারতের সুখদুঃখের সহিত তাদাত্ম্যবোধ কথাবার্তায় ফুটে উঠছিল; দেখে বড় আনন্দলাভ করলাম। এঁদের কেউ কেউ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছিলেন। নেতাজীর ব্যাঙ্ককে থাকার সময়ের কথা এঁদের কাছে কিছু শোনা গেল।

ব্যাঙ্ককের তিনটি দিন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিবেশ বহুলভাবে অনুভব করেছিলাম। শ্যামের নরনারীর সমাজ এবং জীবনরীতি ভারতীয়দের থেকে অবশ্য অনেক আলাদা। কিন্তু জগৎ ও জীবনের প্রতি এশিয়ার যে একটি স্বকীয় উদার অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী আছে—তার ছাপ থাইদের ভিতর আবিষ্কার করতে দেরি হয় না। আমেরিকার ক্রমপ্রসারণশীল সংযোগ থাই-জীবনকে দ্রুত আচ্ছন্ন করতে থাকলেও সেই ছাপ মুছে যেতে বোধ করি এখনও বহু বিলম্ব আছে।

শ্রীশ্রীমায়ের অদোষ-'দর্শন'

শ্রীমতী বীণাপাণি ঘোষ

'শ্রীশ্রীঠাকুরের এক একটি কথা নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন লেখা যায়'—পূজ্যপাদ স্বামীজী এক সময় তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন। বন্ধুটি আশ্চর্য হয়ে কিছু বুঝিয়ে বলতে বলায় শ্রীরামকৃষ্ণের 'হাতি-নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ' গল্পটির অন্তর্নিহিত ভাব স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়েছিলেন তিন দিন ধরে।

শাস্ত্রসমূহের সত্যতা যেন প্রমাণ করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় প্রায় নিরক্ষর হয়ে এসে নিজ জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেলেন—সকল মত এবং সকল শাস্ত্রবাক্য সত্য—স্থানকাল পাত্রভেদে।

বড় বড় পণ্ডিত তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করে শান্তিলাভে ধন্য হয়েছিলেন। এসব তবু বুঝতে পারা যায়, কিন্তু শ্রীশ্রীমার এক একটি ছোট্ট কথায় কত তত্ত্ব আছে আমরা কি তার কিছু বুঝতে পারি?

মা জনৈকা শিষ্যাকে বললেন, "মা দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করো"; আরও বললেন, "মানুষের নিজের মনটি আগে দোষ করে, তবে সে পরের দোষ দেখে। পরের দোষ দেখলে অপরের কি ক্ষতি হয়? নিজেরই ক্ষতি, আমারও আগে লোকের দোষ চোখে ঠেক্‌তো, তারপর ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে 'ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারি না' বলে কত প্রার্থনা করে, তবে দোষ দেখাটা গেছে। দোষ তো মানুষ করবেই, ও দেখতে নেই, ওতে

নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষ-কালে দোষই দেখে।”

যোগেন-মাকে মা বল্লেন, ‘যোগেন, দোষ কারুর দেখ না, শেষে দূষিত চোখ হয়ে যাবে।’

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর ত্যাগের পর মা বৃন্দাবনে রাধারমণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, ‘ঠাকুর, আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও, আমি যেন কারুর দোষ না দেখি।’

নহবতে বাসকালে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে চাঁদের দিকে চেয়ে মা বললেন, ‘তোমার জ্যোৎস্নার মত আমার অন্তরটি নির্মল হোক্।’

কিন্তু আমরা সাধারণত: কি করে থাকি? কারুর দোষ যদি চোখে পড়ল, আবার সে যদি নিজ-জন বা সন্তানাদি হয় তবে তো বেশ করে শাসন করে ছাড়ি, আর যদি তত নিকট সম্বন্ধ না হয়, তবে তার দোষের নিন্দা করি, সমালোচনা করি। তারপর দৈবাৎ যদি সে দোষটা নিজের না থাকে তবে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ বা একটু গর্বও অনুভব করে ফেলি। আর মায়ের কথা মনে করে হয়ত বা বলি—যাঁরা সাধুসন্ত, লোকসঙ্গ-বর্জিত, অরণ্য-পর্বত গুহাবাসী তাঁদের দোষদৃষ্টি না থাকার সুযোগ থাকতে পারে; কিন্তু আমরা সংসারী মানুষ, নিয়ত ছেলেপুলে লোকজন নিয়ে চলতে হয়, আমরা কি করব? যেন দোষদৃষ্টি থাকাটা খুবই সঙ্গত।

মাকে আমরা কিভাবে দেখেছি? আমাদের বলবার কোনও উপায় নেই যে, মা আমাদের মতো সংসারের জ্বালা ভোগ করেন নি। মা আমাদের মতই হয়ে রাধু-নলিনী-মাকু-ভূদেব প্রভৃতি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যেন কতই জড়িয়ে রয়েছেন, তাদের জন্য কত ভাবনা, কত চিন্তা। নিজে মহামায়া *হয়েও আমাদের দেখিয়ে গেলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে* তাদের জন্য কত ভাবনা চিন্তায় মায়ায় জড়িয়ে থাকা। মা মহামায়া, মায়াতীতা; গুণময়ী হয়েও গুণাতীতা, নির্লিপ্তা, বায়ুর মতই নির্বিকার; সুজন দুর্জন সকল সন্তানকেই সমভাবে কোলে ঠাঁই *দিয়েছেন। আমাদের চোখের সামনেই সংসার* চিত্র ধরে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, অরণ্য-পর্বতবাসী না হয়েও দোষদৃষ্টি ত্যাগ করা যায় এবং কেমন করে করা যায়—আমাদের তাই শেখাতেই মায়ের শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কেঁদে বলা ‘ঠাকুর দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও।’ আমরা যদি মনে বুঝি দোষদৃষ্টি দোষীর চেয়ে আমার নিজেরই বেশী ক্ষতি করে এবং সেটি ছাড়তে ঠাকুরের কাছে কেঁদে প্রার্থনা করি—তবে তা যাবেই যাবে। আমাদের প্রতি মায়ের এই শিক্ষা এবং আদেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছিলেন, ‘ওরে আমি যোল টাং করে গেলুম তোরা এক টাংও তো *করবি।’ ঠাকুরের কাছে মা আমাদের সহজসাধ্য* প্রার্থনাটুকু করেই নির্মল হবার ছাঁচ তৈরী করে গেছেন, যাতে আমরা তাতে ঢেলে সহজে নিজেকে গড়তে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সব ভাবসমাধি ভক্তজনের নিত্য প্রত্যক্ষ ছিল, মার আমাদের সবই গোপন। পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী বলেছিলেন, ‘মাকে কে বুঝবে? রাজরাণী হয়ে ঘর নিকুচ্ছেন, আমরা যা হজম করতে পারি না, সব মার কাছে চালান করি, মা সব বুকে তুলে নিচ্ছেন।’

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মায়ের রূপ পাঠ করি, ‘বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্’; মা আমাদের বিশ্বাত্মিকা হয়েই বললেন, *‘মা, জগৎ তোমার’*।

মায়ের কাছে সদসৎ সবাই সমান। চিরদিনই মা সেবাবুদ্ধিতে আমাদের বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করতে—সবার সেবা নিজে হাতে করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, এবং ছোট্ট একটি কথা বললেন, ‘তুমি জগতের’।

বিশাল মহীরুহ যেমন ছোট্ট একটি বটবীজের মধ্যে লুকানো থাকে, মায়ের এই ছোট্ট ছোট্ট কথাগুলির উপরও ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন লেখা যায়।

সমালোচনা

Kumbba (কুম্ভ)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত, প্রকাশক—ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বাই। পৃষ্ঠা—২৯৪+২৮; মূল্য—১৸০ আনা।

১৯৫০ খৃঃ প্রয়াগে অনুষ্ঠিত সর্বভারতের জাতীয় ধর্মমহামেলা সম্পর্কে লেখা ইংরেজী বই। কে. এম্. মুন্সী-লিখিত মুখবন্ধে যথার্থই উক্ত হইয়াছে, কুম্ভে সমাগত প্রকৃত সাধুসন্ন্যাসীর সহিত বহু প্রতারকও মানুষের মনে দাগ রাখিয়া যায়; লেখকদ্বয়ের দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় নাই। এগারটি অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে তাঁহারা কুম্ভের পৌরাণিক ইতিহাস, সাধুদর্শনে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা নিপুণভাবে শিল্পীর তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কয়েকটি চিত্র পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কুম্ভ সময়ের কথা ছাড়াও অন্য সময়ের অনেক সাধুসন্তের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ঈশ্বরদর্শন—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত ও ফাঁশীতলা, নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৪২; মূল্য দশ আনা।

ঈশ্বরদর্শন অতি দুর্লভ এবং অপ্রকাশ্য। তাহা হইলেও ঈশ্বরদর্শন সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে আছে। লেখক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার যৌবনে বিপ্লবপথে ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে কিরূপে তিনি সাধনপথে অগ্রসর হন, তাহা এই বইটিতে প্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মযোগে ঈশ্বরদর্শন, তথা প্রণাম ও গায়ত্রীমন্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। নাম ও ভাবের মহিমা বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন; এমন অনেক কথা পরিবেশন করিয়াছেন যাহা লিপিবদ্ধ না করাই সমীচীন—ব্যক্তিগত সাধনপ্রণালী প্রকাশ করা অনাবশ্যক। পুস্তিকাটিতে অনেকগুলি ত্রুটি পাঠকবর্গের চোখে পড়িবে; গীতা হইতে শ্লোকাংশের উদ্ধৃতি এবং গায়ত্রী মন্ত্রটিও নির্ভুল নয়।

—জীবানন্দ

ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা—১০০; মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রবীণ চিন্তাশীল লেখক। সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আলোচ্যমান গ্রন্থখানির সঙ্গে তাঁহার সে পরিচয়ের সম্বন্ধ নাই।

এই গ্রন্থে তিনি ভারতের শাসনপদ্ধতির একটা ঐতিহাসিক আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভারতের দশাবিপর্যয়ের পর প্রবর্তিত নব শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত ইহাতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই আলোচনায় কোন উষ্মা নাই—শান্তসংযতভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন—তাহা অনন্যসাধারণ। সবচেয়ে লক্ষ্যের বস্তু—স্বদেশের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিক ও অকপট উদ্বেগ। গ্রন্থখানি ছাত্রগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারে ইহার স্থান হওয়া উচিত মনে করি।

—শ্রীকালিদাস রায়

আরাবল্লীর আড়ালে—শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রণীত, প্রকাশক—জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা—১১৪, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি রাজস্থানের অন্তঃপুরের কাহিনী সম্বলিত ছয়টি গল্পের সমষ্টি। পাত্রপাত্রী কাল্পনিক হইলেও কাহিনীগুলিতে ঘটনার ছায়া বিদ্যমান। প্রহরী-বেষ্টিত রাজস্থানের অন্তঃপুরে বাল্যকালে লেখিকার আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণে যাতায়াত ছিল। সেই সময়ের স্মৃতি পুস্তকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্তঃপুরের বিলাস বৈভব ও ঐশ্বর্যের পথে তিনি সেখানকার নারীদের যে করুণ কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে পাঠকের হৃদয় সমবেদনায় দ্রবীভূত হয়।

শ্রীদেবেশ দাশের 'রাজোয়াড়া'য় পড়িয়াছিলাম রাজস্থানের বহির্বাটীর কথা ও রাজনীতি, আর এই পুস্তকে পাওয়া যায়—সেখানকার অন্তঃপুর ও রাজ-পরিবারের কথা, তাহাদের আচার-ব্যবহার ও জীবন-মরণের চিত্র।

—বিদেহানন্দ

আশ্রম—(একাদশ বর্ষ, ১৩৬৩)—সম্পাদক —শ্রীশিশিরকান্তি ভট্ট, প্রকাশক—স্বামী পুণ্যানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা—৮৪।

বালকাশ্রমের সুমুদ্রিত এই বার্ষিক পত্রিকাখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধ ও কবিতায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটিতে শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে লিখিত রচনাগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আশ্রম-সংবাদ এবং আলোক-চিত্রগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী উন্নতি ঘোষণা করিতেছে।

বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন্ পত্রিকা (স্বামী শিবানন্দ স্মরণে)—ত্রিংশ সংখ্যা, ১৩৬৩। ছাত্র-সম্পাদক—শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী ও শ্রীজগন্নাথ আঢ্য; ১০৭ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া—হইতে শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৬৪।

২৯টি প্রবন্ধ ও কবিতার সমাবেশে মাঝে মাঝে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর কথা সন্নিবেশিত করিয়া এই পত্রিকাটি তাঁহার স্মৃতি-অর্ঘ্য রূপে রচিত হইয়াছে। আচার্য নন্দলাল বসুর লেখা-চিত্র অবলম্বনে একটি ছাত্রের অঙ্কিত ভাবে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিখানি উল্লেখযোগ্য। অনেকগুলি আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কর্মধারার পরিচয় দিতেছে।

অণুব্রত—(২য় বর্ষ, ৪র্থ অঙ্ক, ১৯৫৬)— সম্পাদক—দেবেন্দ্রকুমার সত্যনারায়ণ মিশ্র, ৩নং পর্তুগীজ চার্চ, শ্রীপ্রতাপসিং বৈদ দ্বারা প্রকাশিত।

অখিল ভারত অণুব্রত সমিতির এই হিন্দী মুখ-পত্রে সন্তবাণী, নৈতিক পথ, বিশ্বশান্তি ও আধ্যাত্মিক সমস্যা-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ অহিংস জৈনধর্মের দৃষ্টিকোণ হইতে লিখিত হইয়াছে।

কল্যাণ—(তীর্থাঙ্ক, ৩১তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) গোরখপুর গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা— ৭০৪, সূচী ৩২ ; মূল্য ৭॥০ টাকা।

ভারতের চতুর্দিকে বিরাজিত আঠারো শতের উপর তীর্থের সচিত্র বিবরণ পাঠকের মনকে অজ্ঞাত-সারেই তীর্থযাত্রীতে পরিণত করে। ২১টি প্রধান গণপতি-ক্ষেত্র, ১০৮টি দিব্যশিব-ক্ষেত্র, ২৭৪টি পবিত্র শৈবস্থল, ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ ; ১০৮টি দিব্য বিষ্ণুস্থান, ১০৮টি বৈষ্ণবস্থল ; ১০৮ দিব্য শক্তিতীর্থ, ৫১টি শক্তিপীঠ এবং ১২টি প্রধান দেবী-বিগ্রহের বর্ণনা গ্রন্থটিকে অসাম্প্রদায়িকতার মহান্ ভাবে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বহু রঙীন ও একবর্ণের চিত্র, মানচিত্র, স্তব ও স্তোত্র, এমনকি তীর্থ-বিশেষের পূজাপদ্ধতি পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। হিন্দীভাষায় অভিজ্ঞ তীর্থযাত্রীদিগের পক্ষে ইহা একখানি অমূল্য অপরিহার্য গ্রন্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব

আসানসোল ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার পুণ্য-প্রাতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি হস্তিপৃষ্ঠে সুসজ্জিত সিংহাসনে এবং দেবী সারদামণি ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিদ্বয় সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। শোভাযাত্রায় আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ব্যতীত স্থানীয় আরও চারিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ যোগদান করিয়া ইহার সৌষ্ঠব বর্ধন করে। শোভাযাত্রা আশ্রমে আসিয়া সমাপ্ত হইবার পর মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ভোগারতি ও হোম সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও অমৃতময়ী বাণীর আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এস্. শার্ঙ্গপাণি। সাহিত্যিক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ও হিন্দী বক্তা শ্রী এস্. তায়াল বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শ্রীভগবানের জীবনবেদ পর্যালোচনা করেন।

২০শে এপ্রিল বিশ্বজননী দেবী সারদামণির স্মরণবাসরে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর রমা চৌধুরী, অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। এই দিনের সভার বিশেষ আকর্ষণ ছিল সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীগৌরী-কেদার ভট্টাচার্যের মাতৃসঙ্গীত।

২১শে এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ-মহোৎসবে প্রভাত হইতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে ভাগবত-পাঠ, স্থানীয় শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম-প্রচার-সমিতির পালা-কীর্তন উৎসবে সমবেত অগণিত ভক্ত নর-নারীর প্রাণে বিমল আনন্দ দান করে। এই দিবস বেলা ১১টা হইতে ৩টা পর্যন্ত প্রায় তিন সহস্রাধিক নর-নারায়ণকে বসাইয়া যত্ন সহকারে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় স্বামী রঙ্গনাথানন্দের ইংরাজী বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে এবং স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ স্বামীজীর বাণী বিশ্লেষণ করিয়া বর্তমান ভারতের নবরূপায়ণে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান এবং যুবকবৃন্দের প্রতি তাঁহার উদাত্ত আহ্বান সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। উৎসব উপলক্ষ্যে ২২শে এপ্রিল পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

কাঁথি ঃ গত ৬ই, ৭ই ও ৮ই বৈশাখ কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১২২তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিবস পূর্বাহ্নে পূজা চণ্ডীপাঠ ও সন্ধ্যায় স্বামী সুশান্তানন্দ কর্তৃক ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা এবং স্থানীয় শিল্পিগণ কর্তৃক ভজন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হয়। দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্নে লোকসভার সদস্য শ্রীপ্রমথ-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভায় অধ্যাপক শ্রীভুবনমোহন মজুমদার এবং উদ্বোধনের সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দ 'ধর্ম কি, ও কেন প্রয়োজন ?' বুঝাইয়া বলেন। তৃতীয় দিবস প্রাতে ভজন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠের পর মধ্যাহ্ন হইতে বৈকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীহরিনাম সংকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ হয়। সংকীর্তনে বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলের অন্যূন দশটি কীর্তন দল অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সম্মিলিত মৃদঙ্গবাদন, নৃত্য ও মধুর কীর্তনে আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। কয়েকটি বালকের মৃদঙ্গবাদন এবং দুইটি বালকের মধুর কীর্তন সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। সন্ধ্যায় অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীযশোদাকান্ত রায়ের সভাপতিত্বে একটি সভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেন শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ। বক্তৃতান্তে সভাপতি রচনা-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন।

মনসাদ্বীপ (২৪ পরগনা) ঃ গত ৫ই এপ্রিল রবিবার, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে পূজাপাঠের পর মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের এক শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। বৈকালে কথামৃত পাঠের পর স্বামী নিরাময়ানন্দজীর সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভায় আশ্রম-সম্পাদক স্বামী রঘুবীরানন্দ, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধীরকুমার মাইতি প্রভৃতি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও বাণী আমাদের জাতীয় জীবন গঠনে অপরিহার্য। বেতার-কথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বক্তৃতা ও কথকতার মাধ্যমে সরল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য আবির্ভাব কাহিনী-বিবৃত করিয়া পল্লীবাসীদের মুগ্ধ করেন।

সভাপতি বলেন, কর্মী বা কর্মের প্রতি নয়—রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতের আদর্শের প্রতি অনুরাগ জন্মিলেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ধরিতে পারিব। উৎসব-কমিটির সম্পাদক শ্রীজগন্নাথ মাইতি কার্যবিবরণীতে ব্যক্ত করেন—গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কি-ভাবে এই দ্বীপে শিক্ষা বিস্তারের কার্য চালাইতেছেন, এই আনন্দ-উৎসব তাহারই একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

প্রায় দুই সহস্র পল্লীবাসী পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ ধারণ করিয়া রাত্রে প্রাক্তন ছাত্রগণ-কর্তৃক অভিনীত 'শিবাজী' যাত্রাভিনয় দর্শন করে।

রাঁচি : রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১০ই ও ১১ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উপলক্ষ্যে স্থানীয় বাংলা স্কুলে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা এবং স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজীর সভাপতিত্বে দুর্গাবাটীতে একটি সভায় শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্তগুপ্ত সুললিত কণ্ঠে একটি গান গাহিবার পর অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নারায়ণ ওঝা হিন্দীতে ও স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী বাংলায় ওজস্বিনী ভাষায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বৈশিষ্ট্য ও সমাজে উহার সার্থক রূপায়ণ সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। জন্মতিথি-দিবসে আশ্রমে পূজাপাঠ ও হোমের পর ২২০০ ভক্ত আদিবাসী প্রসাদ পান।

ময়মনসিংহ (পূর্ব পাকিস্তান) : গত ২৫শে মার্চ সোমবার হইতে ৩১শে মার্চ রবিবার (বাংলা ১১ই হইতে ১৭ই চৈত্র, ১৩৬৩ সন) সপ্তদিবসব্যাপী ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম সেবাকেন্দ্রে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ-জন্মোৎসব মহানন্দে উদ্‌যাপিত হইল।

২৫শে হইতে দিবসত্রয় প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সঙ্গীতাদি অনুষ্ঠিত হয়, সান্ধ্য আরাত্রিকের পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী—স্বামী প্রণবাত্মানন্দ কর্তৃক আলোচিত হয়। ২৮শে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় এক মহতী জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও তাঁহার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়।

২৯শে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ভজন, মধ্যাহ্নে ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পূজার্চনা ও ভোগরাগ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্যন্ত জাতিধর্মনির্বিশেষে চারি সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৩০শে ও ৩১শে ছায়াচিত্রযোগে 'শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র' ও 'আর্যসভ্যতা' সম্বন্ধে বিপুল জনসমাবেশের সম্মুখে মনোজ্ঞ বিবৃতির পর এই আনন্দোৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

বাগেরহাট (পূর্ব পাকিস্তান) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব গত ২২শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৬৩ (৫.৪.৫৭ ইং) মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভোর ৪॥টা হইতে ১২টা পর্যন্ত মঙ্গলারতি, ভজনসঙ্গীত, বিশেষ পূজা, হোম গীতা ও চণ্ডী পাঠ এবং ১॥টা হইতে প্রসাদ বিতরণ হয়। তিন সহস্রাধিক ভক্ত নর-

নারী জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। বৈকাল ৫টায় সাধারণ সভায় সভাপতি হন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ। সভার প্রারম্ভে আশ্রমের বাৎসরিক কার্য-বিবরণী পাঠ করা হয়। পরে বক্তৃতা করেন— স্বামী শর্মানন্দ, শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস (উকিল), শ্রীভূপেশচন্দ্র আইচ (উকিল), মৌ কে. নওয়াজ (প্রফেসর, বাগেরহাট কলেজ), শ্রীশিবনারায়ণ রায় (ঢাকা)। সন্ধ্যা ৭॥টায় স্বামী প্রণবাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ-বর্ধন করেন। রাত্রি ৯টায় রামায়ণ গান হয়।

পরদিন ২৩শে চৈত্র শনিবার বৈকাল ৫টায় গীতাপাঠ করেন পণ্ডিত হৃষীকেশ বিত্তারত্ন। সন্ধ্যা ৭॥টায় স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে আর্য সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে ফল মিষ্টি প্রসাদ বিতরণান্তে উৎসবের কার্য সমাপ্ত হয়।

স্বামী অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতি-পূজা—সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত (৯ ৪.৫৭) ২৫শে চৈত্র ১৩৬৩—শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজাদিবসে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের স্মৃতিপূজা-উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ৺চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদি-মাধ্যমে সারাদিন আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে স্বামী অন্নদানন্দজী স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের জীবন ও সেবাব্রত বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। অপরাহ্নে একটি জনসভায় শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দজী, স্বামী অন্নদানন্দ ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বামী অখণ্ডানন্দজীর পুণ্য জীবনী অবলম্বনে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। প্রায় ৬০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শাখাকেন্দ্রের কার্যবিবরণী

লক্ষ্ণৌঃ লক্ষ্ণৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫১-৫৫ সালের কার্যবিবরণীতে পাঁচ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মব্যাপৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

চিকিৎসাঃ এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় বিভাগে এই পাঁচ বছরে যথাক্রমে ১,৪১০০৮; ২,০২,৫৭৮; ১,৬৪,৭৫৭; ১,১২,০১১; এবং ১০৯,৭৪২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে অস্ত্র-চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৫ খৃঃ গুঁড়া দুধ এবং মাখন শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিতরিত হয়।

শিক্ষাঃ এই বিভাগে একটি লাইব্রেরি ও একটি অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়। গ্রন্থাগারে ৬২১০ খানি বই আছে, পাঠাগারে ৬টি দৈনিক ও ২৯টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্যা ২১২; পাঠাগারের দৈনিক উপস্থিতি ২৪। নিয়মিত ধর্মসভার অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন।

পাটনাঃ পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৬ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি।

আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৯,৬৮৭ (নূতন ৭,৭৫২) এবং ৪০,৬৬৩।

প্রধানতঃ অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য স্থাপিত 'অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিত্তালয়ে' ছাত্র ছিল ১৬০ জন। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ২৪২৬, পঠনার্থে প্রদত্ত সংখ্যা ২০২৭। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক এবং ২২টি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত আসিয়াছে। ২৫০টি ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থাগারের একতলার নির্মাণ-কার্য আলোচ্য বর্ষে শেষ হয় এবং ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ মার্চ মাসে তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। দ্বিতল নির্মাণ করিয়া গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৬০,০০০ টাকা দিয়াছেন, নির্মাণকার্য চলিতেছে।

মায়লাপুর, মাদ্রাজঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী আমরা

পাইয়াছি। এই বৎসরের শেষের দিকে দাতব্য চিকিৎসালয় বিভাগের 'শ্রীশ্রীমা-শতবার্ষিকী স্মারক ভবন' শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত হয়। এখানে বিশেষভাবে চোখ, কান-নাক-গলা [E-N-T] এবং অস্ত্রোপচার-শাখাগুলি বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই বিভাগ এতদঞ্চলের বহুদিনের অভাব দূর করিয়াছে।

এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয়ভাবে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা গত বৎসর অপেক্ষা দশ হাজার বাড়িয়া একলক্ষ একুশ হাজারের উপর উঠিয়াছে। রোগী ব্যতীত অপুষ্ট শিশু ও নারীদিকে নিয়মিতভাবে দুধ দেওয়া হয়।

গৃহাদি নির্মাণ ব্যাপারে সরকারের যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেলেও দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহের জন্য জনসাধারণের দানের উপরই নির্ভর করিতে হয়। দরিদ্র রোগীর সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে আয় সেরূপ না বাড়ায় প্রায় ২,০০০ টাকা ঘাটতি হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা : বিবেকানন্দ সোসাইটি

২১শে এপ্রিল, রবিবার সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে স্বামী বিবেকানন্দের ৯৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে তাঁহার আদর্শ অনুসরণের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান।

সভাপতির ভাষণে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বলেন, যিনি এই নবভারতের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার কাজ যাহাতে পূর্ণতা পায় সেই জন্যই আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি কি করিয়া গিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলে তাহার সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই যে, স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সর্বত্র। তিনি আসিয়াছিলেন বৈদান্তিক পথে ভারতকে আগাইয়া লইতে। ভারতের মুক্তির পথ তিনি উপনিষদের মন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখাইয়াছিলেন, আধ্যাত্মিকতার উপর তিনি স্বদেশপ্রেমকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা আজ আবার প্রয়োজন। কারণ, তিনি যে দুর্দিনে আসিয়াছিলেন আজ ভারতের তদপেক্ষাও দুর্দিন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন যে, একদিন তাঁহাকে বলা হইয়াছিল দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ। এই কথার ভিতর দিয়াই তাঁহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ভারতের চিন্তার সহিত জগৎকে তিনি পরিচিত করিয়াছিলেন। মায়ের পূজার জন্য তিনি ছিলেন সকলের পূজারী। ধর্মের সঙ্গে তিনি মানব-সেবার সংযোগ সাধন করিয়াছেন।

শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসের এক নূতন ধারা প্রবর্তন করেন। দুঃস্থ দরিদ্রকে নারায়ণ মনে করিয়া সেবার আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

নানাস্থানে রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

ঢাকুরিয়া : (কলিকাতা-৩১)—গত ৭ই এপ্রিল ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দোৎসব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ প্রাতঃকালে নগরকীর্তন বাহির হয় ও ঢাকুরিয়া পল্লীর বিভিন্ন অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে। বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ নিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ন হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় তিন হাজার ভক্ত পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও সাধনা সম্বন্ধে

আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় হাওড়া কাসুন্দিয়া মায়ের মন্দিরের সভ্যগণ 'ভগবান যুগে যুগে' গীতি-আলেখ্য পরিবেশনের দ্বারা সমবেত ভক্তবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দান করেন।

সিঁথি : (কলিকাতা-২) — রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৪ঠা বৈশাখ হইতে ৮ই বৈশাখ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। একটি বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি নানাবিধ পুষ্প ও উপাচারে সুশোভিত করিয়া রাখা হয়। প্রতিদিনই পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন ও ধর্ম-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই কয়দিনে স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী বীত-শোকানন্দ, স্বামী দেবানন্দ, স্বামী শান্তিনাথানন্দ, স্বামী জীবানন্দ এবং ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীশৈল কুমার মুখার্জি, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয় সেন, শ্রীতামসরঞ্জন রায়, ডঃ রমা চৌধুরী ও ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী—শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক সুললিত ভাষায় বর্ণনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দাশ্রমের বালিকাগণ, চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও করুণাময়ী আশ্রমের ভক্তবৃন্দ ভজন ও কীর্তন করেন। বিখ্যাত রামায়ণ গায়ক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী রামায়ণ গান করেন এবং শ্রীমতী কান্তিলতা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন কথকতা ও গান সহ ব্যক্ত করেন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রবন্ধ, আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছিল। উৎসবের শেষ দিন একটি বিরাট শোভাযাত্রা সিঁথি পরিক্রমা করে। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৩০০০ হাজার ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধকভাব সঙ্গীতসহ বর্ণনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পদরেণুপূত সিঁথি এই কয় দিবস এক স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে।

রাণাঘাট—রামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে গত ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় রাণাঘাট পিপল্‌স্ ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্ম-সভায় স্বামী জীবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ২০শে প্রাতে স্বামী প্রেমরূপানন্দ পূজাহোম সম্পন্ন করেন এবং সান্ধ্য সভায় স্বামী ওঁকারানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বহুসমস্যা-কণ্টকিত বর্তমান কালের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও সাধনার আলোকসম্পাত করেন।

কাটোয়া (বর্ধমান)—গত ৮ই বৈশাখ কাটোয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্যাবির্ভাব উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শোভাযাত্রা, পূজাপাঠ, হোম ও প্রসাদ বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বেলুড় মঠের স্বামী অচিন্ত্যানন্দের পৌরোহিত্যে একটি জনসভার অধিবেশন হয়।

আমতলা (২৪ পরগণা)—গত ১৪ ও ১৫ই বৈশাখ আমতলা রামকৃষ্ণ সেবক-সংঘের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন পূজা, চণ্ডীপাঠ, কীর্তন ও ভাগবতপাঠ হয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত একটি ধর্মমহাসভায় বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা হয়; স্বামী জীবানন্দ সভাপতিত্ব করেন। রেভাঃ সুধীরকুমার চট্টো-পাধ্যায় খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে বলেন। বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুধর্মের বিষয়ে বলেন ডক্টর রামচন্দ্র পাল ও অধ্যাপক পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়। সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সর্বধর্ম সমন্বয় ও 'যত মত তত পথ' এই যুগবাণীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

বলরামপুর (মেদিনীপুর)—গত ৬ই বৈশাখ বলরামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা সম্পন্ন হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি

সহ সংকীর্তন করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে অপরাহ্নে একটি সভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বক্তৃতা করেন।

কৃষ্ণনগর (নদীয়া): গত ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল (১৯৫৭) কৃষ্ণনগরের নবনির্মিত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন সন্ধ্যায় আশ্রমপ্রাঙ্গণে বৃহৎ জনসভায় শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (প্রথম মুন্সেফ) মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বেলুড় মঠের স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

পরদিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, গীতা পাঠ, হোম ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। আশ্রমের বৃহৎ প্রার্থনা-মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বৃহৎ প্রতিকৃতি পুষ্প ও মাল্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় ও তথায় সারাদিনব্যাপী ভজনকীর্তন গানে আশ্রম মুখরিত হইয়া উঠে। দ্বিপ্রহর বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৭॥টা পর্যন্ত প্রায় ২৫৯০ শত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান।

গোরক্ষপুর: স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর উদ্যোগে বিগত ২৩শে মার্চ শনিবার হইতে ২ দিন ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বারাণসী কেন্দ্র হইতে আগত স্বামী অপূর্বানন্দ প্রমুখ সাতজন সন্ন্যাসী যোগদান করিয়া এখানকার এই প্রথম উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। প্রথম দিন বৈকাল ধর্ম-সম্মিলনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা করার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কানপুর শাখার স্বামী চিদাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে হিন্দীতে মনোরম ভাষণ দেন। ২৪শে মার্চ বিশেষ পূজা ও হোমাদির পর সন্ন্যাসিবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ নামকীর্তন ও ভজন করেন। দ্বিপ্রহরের পরে প্রায় ১২০০ নরনারীকে ভোজন করান হয়। সন্ধ্যাকালে এক সভায় বাংলায় স্বামী অপূর্বানন্দ এবং হিন্দীতে অধ্যাপক কমলা-প্রসাদ সিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

খামারিয়া (জব্বলপুর)—শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ দ্বারা গত ৬ই ও ৭ই এপ্রিল, বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। উভয় দিবসই বৈকালে সভায় স্বামী সমুদ্ধানন্দ মহারাজ, বিচারপতি মাননীয় শ্রীচতুর্বেদী, অধ্যক্ষ ডঃ নেরুলা প্রভৃতি ভাষণ দেন।

রেডিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র

নক্ষত্রমণ্ডলকে জানতে মানুষ এতদিন নির্ভর করে এসেছে আলোক-রশ্মি ও বৃহদাকার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ওপর। আলোক যে জ্ঞান বহন করে এনেছে কোটী মাইল দূর থেকে—তাকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানী এতদিন ব্রহ্মাণ্ডের রূপ কল্পনা করার চেষ্টা করেছেন।

সম্প্রতি কেম্ব্রিজ-এর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আর এক রকম যন্ত্র তৈরী করেছেন, তার নাম রেডিও দূরবীক্ষণ (radio telescope); এর সাহায্যে নভোমণ্ডলের বিভিন্নস্থান থেকে ক্ষীণ রেডিও রশ্মির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে radio star বা রেডিও নক্ষত্র। আজ পর্যন্ত অন্ততঃ ২০০০ রেডিও নক্ষত্রের অস্তিত্ব জানা গেছে।

যে রশ্মির সাহায্যে বেতার বার্তা প্রেরণ করা হয় তাকেই রেডিও রশ্মি বলে—এই রেডিও-রশ্মি ও আলোক-রশ্মির মধ্যে প্রকারগত ভেদ নেই, পার্থক্য শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে; সেজন্য সাধারণ নক্ষত্র ও রেডিও নক্ষত্রকে এক জাতীয় নক্ষত্রেরই বিভিন্ন অবস্থা বলে মনে করা হয়।

এই নবনির্মিত যন্ত্রের আবিষ্কার যেমন আমাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু নূতন জ্ঞান দেবে, তেমনই আভাস দেবে আমাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে আরও বহু নক্ষত্রের—যাদের জানবার মত যন্ত্র আমরা এখনও তৈরী করতে পারি নি। সৃষ্টিকে জেনে বিজ্ঞানী যে কোনদিন ইয়ত্তা করতে পারবে বলে মনে হয় না—তবে একদিন না একদিন তার মন সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার দিকে ফিরে তাকাবে।

—(Science and Culture)

ভ্রম সংশোধন:

গত বৈশাখ সংখ্যা পৃঃ ১৭৫; স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ-সংবাদে: ১৯২৪ খৃঃ তিনি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন।

উদ্বোধন

শ্রীগুরুর দক্ষিণামূর্ত্তি

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমান-নগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষীকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে॥

* * *

নিদ্রাকালে স্বপ্নের প্রভাবে গৃহপরিজন শত্রুমিত্র অশ্বগবাদি যানবাহন বৃক্ষলতা দেশবিদেশ সম্ভব অসম্ভব নানা ভাব অনুভূত হয়—নানা পদার্থ যেন দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহারা তো বাহিরে নাই—তাহারা মন হইতে উদ্ভূত, মনেই অবস্থিত; অবশেষে মনেই লয় পায়।

সেইরূপ অজ্ঞানকালে অনির্বচনীয় মায়াশক্তি-প্রভাবে যে বিচিত্র বিশ্বজগৎ বহির্ভাগে বিস্তৃত বিরচিত বলিয়া বোধ হয়—তাহার উৎপত্তিও অন্তরের অন্তরে। দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর ন্যায় এই বিশ্বজগৎ চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত।

নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল প্রতীতি-প্রবাহ—অপরিবর্তিত সাক্ষীর মত দর্শন করিয়া জ্ঞানী অনুভব করেন, একই আত্মা নানারূপে প্রতীয়মান। পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি নিজের এই শাশ্বত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' স্বরূপ উপলব্ধি করেন—সেই শ্রীগুরুর রূপধারী পরম করুণাময় জ্ঞান ও প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে প্রণাম করি। তিনিই করুণাপরবশ হইয়া জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া আমাদিগের অজ্ঞান-দুঃখ দূর করিতে পারেন।

কথাপ্রসঙ্গে

আণবিক যুগ ও বিশ্ব-শান্তি

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সিংহল সফরের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রথমে কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে, পরে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ কেন্দ্রে ও সিংহলের বৌদ্ধ ছাত্র-সংসদে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার যে চিন্তা ব্যক্ত করিয়াছেন—তাহাতে ভারতের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে; এই কথাই ভারত চিরদিন নানা ভাবে নানা ভাষায় বলিয়া আসিতেছে।

তিনি গভীর উদ্বেগের সহিত বলিয়াছেন, 'আজ আমরা লক্ষ্য করিতেছি, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ। আমার কর্মপরিধি আমার দেশের মধ্যেই নিবদ্ধ, কিন্তু আমরা বাধ্য হইয়াই আন্তর্জাতিক সমস্যাতেও আগ্রহান্বিত, কারণ ভারত বিশ্বব্যাপার হইতে বিচ্ছিন্ন নয়; আজ যখন সমগ্র মানবজাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনা তখন আমাদের নিজের যতই বিশেষ সমস্যা থাক—আমরা সাধারণ সমস্যায় উদাসীন থাকিতে পারি না।'

সেবার ভাব লইয়া দুঃখ দুর্দশা বিপদের সময় বন্ধুর মত সাহায্য করিতে আগাইয়া আসার ভাবটি বর্তমানে একান্ত প্রয়োজন, এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানে এইরূপ করা হয়, সেখানেই মানুষে মানুষে প্রীতির সম্বন্ধকে দৃঢ় করিয়া একদল মানুষ যথার্থ বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করিতেছেন।

এই ভাব লইয়াই দুই বৎসর পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বৌদ্ধ জীবননীতির রাজনৈতিক সংস্করণ পঞ্চশীলের প্রস্তাব করা হয়। অনেকেই এ বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই নীতি অনুযায়ী কাজ কতটুকু হইয়াছে? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তির জন্য আজ শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতাই একান্ত প্রয়োজনীয়,—এ কথা স্বীকার করিলেও, শতবার মুখে বলিলেও কেন এই পথে কাজ করা সম্ভব হইতেছে না, ইহাই আজ প্রধান বিচার্য।

সিংহলে ছাত্রদের সভায় শ্রীনেহেরু যাহা বলিযাছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য,—কারণ আণবিক যুগের সমস্যার সমাধান করিতে গেলে পূর্বে সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন:

'এই সমস্যাগুলি যে শুধু কঠিন তাহা নয়, গুণগতভাবে বর্তমান সমস্যাগুলি—পৃথিবীর পূর্ব সমস্যাগুলি হইতে পৃথক, মনে হয় বিভিন্ন স্তরে ইহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

'আমরা আণবিক শক্তি, আণবিক বোমা প্রভৃতির কথা বলি। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহারা সম্পূর্ণ নূতন, মানব সমাজে এগুলি মহা কল্যাণও বহন করিয়া আনিতে পারে।'

সর্ব সমস্যার সমাধানের জন্য পরিশেষে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে—মানুষেরই মনুষ্যত্বের কাছে। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন:

'মনে হয় বর্তমানে আমরা যে প্রধান সমস্যাগুলির সম্মুখীন—নিছক অর্থনীতি বা রাজনীতির উপায়ে সেগুলির সমাধান হইবে না। পরিচিত রাজনৈতিক-আর্থনীতিক ক্ষেত্র হইতে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে নৈতিক-মানসিক জগতে।'

বর্তমান বিশ্বসমস্যা-সমাধানে ইহাই ভারতীয় সমাধান, এবং মনে হয় একমাত্র সমাধান। তত্ত্বের দিক দিয়া সমাধানে উপনীত হইলেও—সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহাকে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে মানুষের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির উপরই আজ তাহার শান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

পৃথিবী আজ মহামৃত্যুর ছায়ায় প্রহর গণিতেছে।

বিজ্ঞানসহায়ে সুনিয়ন্ত্রিত আণবিক অস্ত্রযোগে আগামী কোনও যুদ্ধের পরে যে সামগ্রিক ধ্বংস পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিবে তাহাতে এক পক্ষ হয়তো একেবারে ধ্বংস হইবে, অপর পক্ষও বিধ্বস্ত হইবে।

মনুষ্যকুল একেবারে নিশ্চিহ্ন হইবে কি না কে জানে? তবু, মনুষ্য-সমাজ ও সভ্যতা বিনষ্ট হইতে পারে ভাবিয়াই মানুষ আজ আতঙ্কগ্রস্ত; তাই আজ শান্তির জন্য সকলের এত আগ্রহ।

যে প্রধান 'শক্তি'গুলি পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া সমরায়োজন বাড়াইতেছে—তাহাদেরও মূল লক্ষ্য হইল যুদ্ধকে এড়ানো। তাহাদের মত, যদি উভয় পক্ষ সম-সমান যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত হয়, তবে আণবিক যুদ্ধ কখনই হইবে না। তাই তাহাদের মতে বিপক্ষ শক্তিকে আণবিক অস্ত্র ব্যবহারে নিরুৎসাহ করার জন্যই এই আণবিক অস্ত্র-নির্মাণ, এবং উহার ক্রমোন্নতির জন্যই এই বিনাশধর্মী পরীক্ষা-পরম্পরা; বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে ইহা একান্ত প্রয়োজন। শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীর পক্ষে এ যুক্তি বোঝা কঠিন। কিন্তু ইহাই আজ বিশ্ব-পরিস্থিতি, এবং ইহারই জন্য আজ ঘন ঘন পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ, যাহা প্রতিবারে পৃথিবীর নানাস্থানে ৫০,০০০ ব্যক্তির জীবনে ধীরে নীরবে অলক্ষিতে মৃত্যুর বীজ বহন করিয়া আনিতেছে।

একটি মুমূর্ষু মানবকে কয়েক দিনের জন্য, কয়েক ঘণ্টার জন্য বাঁচাইতে চিকিৎসাবিজ্ঞান কত গবেষণা করিয়াছে! মানুষের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিকগণ কত না চেষ্টা করিতেছেন! ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়—সেই জ্ঞান ও কল্যাণের সাধক-পুরোহিতগণের সমগোত্রীয় একদল বৈজ্ঞানিকই আজ সমষ্টি-মৃত্যুযজ্ঞের হোতা হইয়াছেন!

আশার সংবাদ—প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছে। আমেরিকার দুই হাজার বিবেক-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের স্বাক্ষর সংগৃহীত হইয়াছে, আরও হইতেছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, 'আণবিক বোমার পরীক্ষা বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, বৈজ্ঞানিকগণ যেন শান্তি ও কল্যাণের জন্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তি লইয়া পরীক্ষা না করেন।' ভারতের বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি ডক্টর রামন্‌ও বলিয়াছেন, জীবিকার জন্য আণবিক মারণাস্ত্র লইয়া পরীক্ষা করা অপেক্ষা বৈজ্ঞানিকগণের অনাহারে প্রাণত্যাগও শ্রেয়।

পাশ্চাত্ত্য মন পরীক্ষায় বিশ্বাসী, অভিজ্ঞতায় নয়। 'শান্তির জন্য যুদ্ধ', 'যুদ্ধ শেষ করিবার জন্য যুদ্ধ'—এ ত বহু পুরাতন ও ব্যর্থ নীতি। ইওরোপীয় রণাঙ্গনেই, আমাদের চক্ষের সমক্ষেই দুইবার ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। আবারও কি ঐ ভ্রান্ত নীতির পরীক্ষার জন্য কোটি কোটি অনিচ্ছুক নিরপরাধ যুবকের জীবন বিসর্জন দিতে হইবে? তদপেক্ষা ইহাই কি যুক্তিযুক্ত নয়, অন্য কোন নীতি পরীক্ষা করা হউক? সে নীতিও নূতন নয়, বহু পুরাতন পরীক্ষিত নীতি—মানুষকে মানুষ ভাবিয়া লইয়া পারস্পরিক বোঝাপড়ার নীতি,—ধর্মের নীতি, বুদ্ধের নীতি, খৃষ্টের নীতি! প্রেম ও প্রীতির নীতি, ত্যাগ ও সেবার নীতি!—প্রাচ্য-দেশের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জীবন-নীতি। যখনই মানুষ ইহার অনুশীলন করিয়াছে তখনই দেখা গিয়াছে মনুষ্য-সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এ কথা কি ঐতিহাসিক সত্য নয় যে বুদ্ধের পরই আসমুদ্র হিমাচল ভারতের জনসাধারণ ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে?—ভারত জগতের তীর্থে পরিণত হইয়াছে? এ কথাও কি সত্য নয় যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পরই বর্বর জাতিগুলি ধীরে ধীরে সভ্যতার স্তরে উঠিতে শুরু করিয়াছে? বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করিয়া ভারতে এবং বৃহত্তর ভারতে শিল্পকলা সাহিত্য ও স্থাপত্যের উন্নতি জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে। খৃষ্ট-ধর্মকে ঘিরিয়া ইওরোপেও কি অনুরূপ উন্নতি হয় নাই?

ধর্মনীতির সূক্ষ্ম শক্তি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ বচন:

'আলেকজাণ্ডার সীজার ও নেপোলিয়নের রাজ্য তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে—আর সূত্রধর পুত্রের (খৃষ্টের) রাজ্যসীমা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে !'—ধর্মপ্রাণ অশোকের রাজ্য যতই বিস্তৃত হউক তাহাও সংকুচিত হইয়া ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে; কিন্তু আজও বিরাজমান তাঁহার কীর্তি—প্রেম ও প্রীতির মাধ্যমে পূর্বে ও পশ্চিমে প্রচারিত প্রসারিত তাঁহার 'সদ্ ধর্ম'। বৌদ্ধধর্মের প্রতীকস্বরূপ অশোকস্তম্ভ অন্ধকার পৃথিবীতে আজও সমুন্নতশীর্ষে আলোক-স্তম্ভের কাজ করিতেছে।

গত তিনশত বৎসরের বিজ্ঞানের সাধনা নানা-বিধ উন্নতির মধ্য দিয়া চরম সাফল্যের শেষ মুহূর্তে যেন আজ মানুষকে চরম অকল্যাণের মাঝে—অবধারিত মহামৃত্যুর সম্মুখে আনিয়া ফেলিয়াছে; এ যেন পর্বতারোহণের শেষ ধাপে উর্ধ্বমুখী চালু পথের বাঁকের সীমায় আসিয়া বিকট খাদের মুখে যন্ত্রযান চালকের আয়ত্তের বাহিরে গিয়া যাত্রীদের জীবন বিপন্ন করিয়াছে! এই চরম মৃত্যু-ভয়-জনিত অশান্তির মধ্যে মানুষ আজ নূতন করিয়া চিনিতেছে জীবনকে, নূতন করিয়া চাহিতেছে শান্তি।

কিন্তু অমৃতময় জীবনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার শক্তি কি বিজ্ঞানের আছে? কিংবা সামাজিক, পারিবারিক, শারীরিক, মানসিক কোনও প্রকার শান্তি স্থাপন করিবার ক্ষমতা কি বর্তমান রাজনীতির বা রাষ্ট্রনেতাদের আছে?

তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন সত্য—কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়—এ চেষ্টা ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক হইলেও সমষ্টিগতভাবে আন্তরিক নয়; কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন আণবিক বোমা-বিস্ফোরণই গত যুদ্ধের যবনিকাপাত করিয়াছে। তাঁহারা ইহার ভয়াবহ মহাশক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত! তাঁহারা মুখে শান্তির কথা বলিলেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আপোষ-মীমাংসার বৈঠকের প্রথম উদ্দেশ্য কালক্ষেপ ও শক্তিবৃদ্ধি করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বিপক্ষকে দোষী প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের ন্যায়ের পক্ষ বলিয়া ঘোষণা করা।

আণবিক অস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে করিতে উহা আজ এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, যখন উভয় পক্ষ দ্বারা প্রচণ্ড আক্রমণই সম্ভব, আত্মরক্ষার উপায় এখনও অনাবিষ্কৃত। উভয় পক্ষই ধ্বংস-বিশারদ, তাহারা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিতেই জানে, সংবরণ করিতে জানে না; অতএব প্রলয় আসন্ন। আজ এই বিশ্বব্যাপী বিভীষিকার জন্যই বিশ্বশান্তি-প্রচেষ্টা।

কিন্তু বিজ্ঞানের বলে এক পক্ষ আত্মরক্ষামূলক আবিষ্কার একটা করিতে পারিলেই আবার আসিবে ভয়প্রদর্শনের পালা। তাই মনে হয়, এ শান্তি-প্রচেষ্টা আন্তরিক নয়, নিতান্ত সাময়িক। আবার একথাও ঠিক—বর্তমানে যখন ভয়ার্ত সাধারণ মানব শান্তির প্রয়াসী, এই পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বব্যাপী স্থায়ী শান্তির ভিত্তি রচনা করিতে না পারিলে হয়তো পরে আর ইহা সম্ভব হইবে না। হয় এখন, নহিলে কখনও নয়।

আমাদের বিশ্বাস—মানুষের, তথা মানুষের প্রিয় কৃষ্টি সমাজ ও সভ্যতার উদ্বর্তনের জন্য আজ একান্ত এবং একমাত্র প্রয়োজন মানুষের মনের উন্নয়ন, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন; ব্যক্তিগত জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলের সচেতনতা! জড়বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি মানুষকে অত্যধিক যন্ত্রনির্ভর করিয়া, তাহাকে যন্ত্রাংশে পরিণত করিয়া—'মন' সম্বন্ধে তাহার চেতনা নষ্ট করিয়াছে। শারীরিক ভোগের বাহুল্য ও বৈচিত্র্যই জড়বাদী জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য! যন্ত্র ও বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষকে যন্ত্রাংশবৎ ব্যবহার করিয়া, কোথাও তাহাকে অবমানিত করিয়া, কোথাও তাহাকেই নিশ্চিহ্ন করিয়া প্রভূত ভোগ্য-পণ্য উৎপন্ন হইল—কিন্তু ভোক্তা কই? সে ঐ

যন্ত্রেরই পার্শ্বে জড়পদার্থের মত নিঝুম হইয়া, যন্ত্রেরই মত প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া আছে, বুঝি বা বিশ্রাম লইতেছে ; তাহার ভোগ করিবার অবসর নাই, শক্তি নাই—কোথাও বা উপায় নাই। বর্তমান বিশ্ববিপদের মূল কারণ এই বিপথে পরিচালিত অপরিমিত যন্ত্রায়ণ, যে কারণে সাধারণ মানুষ অবমানিত, অবহেলিত !

তাই আজ শান্তির জন্য বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর নেতাদের বৈঠক বা বিবৃতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে চলিবে না, তাহা হইলে কল্পিত সমষ্টি-কল্যাণের নামে পুনশ্চ ব্যষ্টির স্বার্থ, ব্যক্তির জীবন বলি দেওয়া হইবে। ব্যষ্টি বিনষ্ট হইলে সমষ্টি থাকে কোথায় ? ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিলুপ্তির ভয়ই আজ মানুষকে শান্তির জন্য ব্যগ্র করিয়াছে—আজ মানুষ সমষ্টি-মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া সমষ্টি-শান্তি প্রার্থনা করিতেছে। বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধ যাহাতে না ঘটে তাহারই শেষ চেষ্টা করিতেছে।

এই চেষ্টা সফল করিতে গেলে বর্তমান বিজ্ঞান-পুষ্ট সভ্যতার মূলে যাইতে হইবে ; যে সভ্যতা এই মহামৃত্যুর বিভীষিকার কারণ, তাহা এক প্রকার রোগ-বিশেষ। এ রোগের বীজাণু সমাজ-শরীরে প্রবেশ করিয়াছে শিল্প-বিপ্লবের সময় হইতেই। তাহার পর হইতে ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, জনতন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রকার তন্ত্র-চিকিৎসার পর মানুষ আজ এই দুরবস্থার সম্মুখীন—যখন দুই শক্তিগোষ্ঠী পৃথিবীকে তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে গিয়া মনুষ্যজীবনকে লইয়াই ছিনিমিনি খেলিতেছে। শত প্রতিবাদসত্ত্বেও খ্রীষ্টম্যাস দ্বীপে নির্বিঘ্নে এবং সবিক্রমে বোমার পর বোমা বিস্ফোরিত হইল। আবার ফ্লোরিডা হইতে অত্যদ্ভুত রেডিও-চালিত ঘণ্টায় ২২০০ মাইলগামী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া জগৎকে চমকিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কল্পিত শত্রুকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল।

আণবিক বোমা একদিনেই আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহার পরই উদজান বোমা—তাহার পর এই রেডিও-চালিত ক্ষেপণাস্ত্র ! সাধারণের অজ্ঞাত আরও কত গোপনাস্ত্র প্রতিদিন আবিষ্কৃত হইতেছে, যাহা জনসাধারণের জানিবার উপায়ও নাই ; যুদ্ধকালে তাহাই নিরপরাধ জনসাধারণেরই জীবন-হানির কারণ হইবে—যেমন হইয়াছে নাগাসাকি ও হিরোশিমায়। সেই মহাদুর্দিনের পুনরাবৃত্তি ব্যাহত করিবার অধিকার মানুষমাত্রেরই আছে। কিন্তু কি উপায়ে ?

এই যে সব আণবিক আবিষ্কার কেন হইতেছে—কাহারা করিতেছে—জানিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। গবেষণা করিয়া আবিষ্কার করিতেছেন অবশ্যই বৈজ্ঞানিকেরা, তাঁহাদের উৎসাহদাতা অন্নদাতা মন্ত্রণাদাতা রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন-মতবাদী বিরুদ্ধমতবাদী রাষ্ট্রনেতাগণ প্রতিযোগিতার আবর্তে পড়িয়া একই প্রকার কার্য করিতে বাধ্য হইতেছেন, একই পথে চলিতেছেন—ইহাই আশ্চর্য, ধ্বংস-কার্যে তাঁহাদের মতবিরোধ নাই ! ভয় ও বিদ্বেষজনিত এই অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাবই বর্তমান বিজ্ঞানপুষ্ট আর্থনীতিক সভ্যতার অভিশাপ। বলিতে গেলে ইহাই বর্তমান সমাজশরীরে রোগবীজাণু—যাহা মহামারী-রূপে পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া মানুষের স্বাভাবিক শান্তি ও আনন্দ নষ্ট করিয়াছে, রাজনীতি সমাজনীতি সব কিছু আচ্ছন্ন করিয়া মনুষ্য-জীবনকেই বিপন্ন করিয়াছে, অহরহ তাহাকে মৃত্যুভয়ে কণ্টকিত করিতেছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পিছনে যে এষণা কাজ করিতেছে—তা শক্তি ও সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতা। বিংশ শতাব্দীর শিল্প-সভ্যতার জীবন এই প্রতিযোগিতায়, মরণও এই প্রতিযোগিতায়।

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির নামে মানব নির্বিচারে স্বতঃসিদ্ধের মতো মানিয়া লইয়াছে—জীবনে

যোগ্যতমেরই উদ্‌বর্তন, অতএব প্রতিযোগিতায় 'যোগ্যতম' হওয়ার জন্য যে কোনও প্রকার নীচতা নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে তাহার বিবেক কুণ্ঠিত হয় না, যথা ব্যক্তিগতভাবে—তথা জাতিগতভাবে।

ইহার দৃষ্টান্ত সমসাময়িক ইতিহাসে এত রহিয়াছে যে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রতিযোগিতার চরমাবস্থায় এক মল্লকে নিহত করিয়া অপর মল্ল নিজে আহত হইয়াছে—এ তো সে-দিনের সচিত্র সংবাদ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ হিংসার পথ, প্রতিযোগিতার পথ, যুদ্ধের পথ, মৃত্যুর পথ; সহযোগিতার পথ প্রীতির পথ, জীবনের পথ, শান্তির পথ।

মানুষ বুদ্ধিবলে এবং সহযোগিতার বলেই বন্যজন্তুর আক্রমণ হইতে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, নিছক শারীরিক শক্তিতে নয়। একথা অবশ্য সত্য—মানুষে মানুষে যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ মানবজাতির মতই পুরাতন। একদিন পেশীর বলই ছিল শৌর্যের পরিচায়ক, বীর্যের মাপকাঠি; কিন্তু আজ মানুষ এমন এক অবস্থায় উপনীত—যখন আর জাতি-উপজাতির প্রশ্নে নয়, দেশ-বিদেশের প্রশ্নেও নয়, মতবাদের ভিত্তিতে মানব বিভক্ত! তাই যদি হয়, তবে মতবাদের লড়াই মানসিক স্তরেই হউক; তাহার জন্য ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র লইয়া খেলা এবং তজ্জনিত সামগ্রিক ধ্বংস বা সভ্যতার বিলোপ নিশ্চয়ই কোন মতবাদীর অভিপ্রেত নয়। পরিশেষে বক্তব্য—যে মত-প্রভুত্ব ও ভোগের প্রতিযোগিতার ভাব হইতে এ যুগের রোগ সংক্রামিত হইয়া প্রসারিত হইয়াছে, প্রতিষেধক দিয়া সেই মহামারী প্রতিরোধ করিবার সময় এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। প্রথম ও প্রধান প্রতিষেধক চিন্তা এই যে—মানুষের উন্নতির জন্যই মতবাদের প্রয়োজন, মতবাদের বিস্তারের জন্য মানুষ নয়।

জড়বিজ্ঞান মানুষকে সুখ দিয়াছে, সম্পদ দিয়াছে, মৃত্যুর বিভীষিকা দিয়াছে, শান্তি দিতে পারে নাই। তাহার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দূর করিয়া সহযোগিতামূলক জীবনাদর্শ রচনা করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে হয়তো এক-জনের ভাগে ভোগের কিছুটা কম পড়িবে,—'ত্যাগের ভিতর দিয়া ভোগ করা'র নীতি গ্রহণ করিতে হইবে; তবেই আজ মানুষের মহতী বিনষ্টি ব্যাহত হইতে পারে। প্রকৃতি ভোগমুখী, স্বার্থমুখী; সংস্কৃতি ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, বহুজনহিতায়।

যে মানুষ একদিন একা এক প্রস্তর খণ্ড সহায়ে বন্যপশুর আক্রমণ ব্যাহত করিয়াছে—পরদিন যে তীরধনুর সহায়ে দূর হইতে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তার পরদিন সেই আবার দলগঠন করিয়া অন্য এক দলকে প্রতিরোধ করিয়াছে, এক সবল জাতি দুর্বল উপজাতিকে জয় করিয়াছে, তারপর ক্রমশঃ-উৎকর্ষশীল অস্ত্রসহায়ে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যও সে স্থাপন করিয়াছে। সে কি আজ মূর্খের মত এই প্রচণ্ড আণবিক অস্ত্রের দ্বিমুখী ব্যবহারের প্রতিযোগিতায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া শত্রুকে ধ্বংস করার নামে নিজেকেও ধ্বংস করিবে? অথবা—বুদ্ধিবলে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া কল্পিত শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করিয়া, সমগ্র মানবজাতিকে এক মহাজাতিতে ঐক্যবদ্ধ করিয়া, বিশ্ব-শাসন-তন্ত্র প্রবর্তিত করিয়া নূতন যুগের সূচনা করিবে?—যেখানে দেশ-জাতি-ধর্ম-ভাষার বিভেদে বিভ্রান্ত না হইয়া সর্বপ্রকার শান্তি ও স্বাধীনতার অধিকার লইয়া মানুষ আগাইয়া চলিবে উত্তরোত্তর কল্যাণের পথে;—যেখানে সমবেতভাবে গবেষণা করিয়া আণবিক শক্তিকে মানুষ কাজে লাগাইবে কৃষিকার্যে ও খাদ্য-উৎপাদনে, রোগ নির্ণয়ে নিবারণে ও নিরাময়ে; পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন প্রান্ত নিকটতর করিয়া দেশবিদেশের সীমা দূর করিবে; সহজ বিদ্যুৎ-শক্তির সরবরাহ দ্বারা মানুষের কায়িক শ্রম লাঘব করিয়া তাহাকে সুখ, শান্তির ও উচ্চতর জীবন-বিকাশের অবসর দিবে;—

যেখানে পারস্পরিক ভয় ও কলহের পরিবর্তে বিরাজ করিবে শান্তি ও মৈত্রী!

অভাব ও ভয়কে অতিক্রম করিতে না পারিলে মুক্তি কোথায়? শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্থাপিত না হইলে শান্তির মূল্য কি? প্রীতি-বিবর্জিত কল্যাণ কি সম্ভব? মানুষ পেশীর সমষ্টি নয়, মানুষ বোমা বারুদের ভোজ্য পদার্থ নয়, মানুষ কলকব্জার অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নয়; মানুষ মননশীল প্রাণী—ক্রমোন্নতিশীল জীব! তাহার শ্রেষ্ঠ ধন ঐশ্বর্য অস্ত্র যন্ত্র তাহার মন,—তাহারই শক্তিতে সে এতদিন চলিয়াছে, চিরদিন চলিবে—উন্নতি হইতে উন্নতির পথে। আণবিক যুগের অভ্যুদয়ে, মনে হয় তথাকথিত শিল্প-যুগের প্রতিযোগিতামূলক দেশজাতি-পরিচ্ছিন্ন স্বার্থ-কেন্দ্রিক সভ্যতা হইতে নূতনতর উন্নততর সহযোগিতামূলক শান্তিপ্রীতিপূর্ণ উদার এক বিশ্ব-কৃষ্টির ভিত্তিস্থাপনার মাহেন্দ্রক্ষণ সমুপস্থিত!

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি হইতে শুরু হইয়া তাঁহার দিব্য জন্ম ও জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে উৎসবের ধারা উৎসারিত হয়—ফাল্গুন চৈত্রকে প্লাবিত করিয়া বৈশাখের পরেও তাহা নিঃশেষিত হইতে চায় না।

কলিকাতায় ও শহরতলীর প্রায় প্রতি মহল্লায়, জেলা ও মহকুমা শহরে, তারপর পল্লীর প্রান্তরে—যেখানেই পাঁচজন মিলিত হইয়াছে, অথবা একজন মাত্র অনুরাগী ভক্তের শুভ বাসনা হইয়াছে সেখানেই বিচিত্র অনুষ্ঠান-সহায়ে উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজন; সেখানেই পূজা পাঠ ভজন কীর্তন, ভক্ত জনগণের সম্মিলিত প্রসাদধারণ, সভায় প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর আলোচনা, পরিশেষে কোথাও ছায়া চিত্র, কোথাও কথকতা বা যাত্রাগানের পর উৎবের পরিসমাপ্তি।

এ বৎসর ১৯৫৭, ৩রা মার্চ—বাংলা ১৩৬৩, ১৯শে ফাল্গুন হইতে কয়েক মাস ধরিয়া সর্বত্রই উৎসবের সরল সতেজ অথচ অনাড়ম্বর ভাব ও অনুরাগ আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে। এমন সময় ১৩৬৩ ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারী) সংখ্যার 'প্রবর্তকে'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় আলোচনা চোখে পড়িল: "বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হইল, কিন্তু তাহাতে বড় ভাবের অভাব, আন্তরিকতার অভাব।"

ভারতের নানা স্থানে এবং ভারতের বাহিরেও সারা বৎসর ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব স্বতই অনুষ্ঠিত হয়—জনসাধারণ তাহা বিশেষভাবে অবগত।

'যুগের ভাব বিগ্রহে'র জীবন ও বাণী বুঝিবার এবং জীবনে তাহা পরিণত করিবার আকুল আগ্রহ সর্বত্র দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সাময়িক উৎসব ব্যতীত মাসিক ও সাপ্তাহিক আলোচনা বা পাঠচক্রের মাধ্যমে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা নিত্যই পাইতেছি। তবে 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'—অতএব সহসা চমকপ্রদ কিছু আশা না করিয়া শ্রদ্ধানত চিত্তে 'মহাজনগত পন্থা'র অনুসরণ করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হওয়াই যথার্থ সাধনা।

মানব-জাতির ভাগ্যরচনায় যে সকল শক্তি কাজ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে—তাহাদের মধ্যে কোনটিরই প্রভাব সেই শক্তি অপেক্ষা নিশ্চয় অধিক নয়—যাহার বাহ্য প্রকাশকে আমরা 'ধর্ম' বলি। —স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী রাঘবানন্দজীর দেহত্যাগ

স্বামী রাঘবানন্দ কলিকাতার উপকণ্ঠে বড়িশার সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৮৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। সীতাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (তাঁহার পূর্বনাম) প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ঐ কলেজ হইতে 'ঈশান স্কলারশিপ' পাইয়া তিনি বি. এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' প্রণেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—পূজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার জীবনের গতিধারা আধ্যাত্মিক পথে চালিত হইলে তিনি বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসহচরগণের পদপ্রান্তে উপনীত হন ও সংসার ত্যাগের বাসনা ব্যক্ত করেন।

যথাসময়ে কৃতিত্বের সহিত এম. এ. ও বি. এল. পরীক্ষা পাস করিয়া ১৯১৩ খৃঃ ২৫ বৎসর বয়সে তিনি মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে গিয়া যোগদান করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯১৮ খৃঃ তাঁহারই নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে ১৯১৩ খৃঃ শেষভাগে তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে প্রেরিত হন—'প্রবুদ্ধ ভারতে'র তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানন্দজীর সহায়করূপে। পরে স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গলাভ করিবার জন্য তিনি আলমোড়ায় কিছুকাল অবস্থান করেন এবং শ্যামলাতালেও স্বামী বিরজানন্দজীকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-রচনায় কিছুকাল সাহায্য করেন। ১৯১৮ খৃঃ স্বামী প্রজ্ঞানন্দজীর দেহত্যাগের পর তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। হিমালয়ে অবস্থানকালে তিনি কৈলাস ও মানস-সরোবর এবং কেদার-বদরী প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া তপস্যা ও বৈরাগ্যের ভাবটি জীবনে দৃঢ় করিয়া লন।

১৯২৩ খৃঃ স্বামী রাঘবানন্দ ইওরোপ হইয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। নিউইয়র্ক বেদান্ত কেন্দ্রের স্বামী বোধানন্দজীর সহায়করূপে যোগদান করিয়া সেখানে এবং ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি স্থানে বেদান্ত প্রচার করেন। প্রায় চার বৎসর আমেরিকায় কাটাইয়া ১৯২৭ খৃঃ তপোভূমি ভারতে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় পূজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কিছুকাল থাকার পর হিমালয়ে ও দক্ষিণেশ্বরে তপস্যায় জীবন কাটাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ প্রবল হয়। সংঘের নির্দেশে মাঝে মাঝে এবং পর পর তিনি পুরী, এলাহাবাদ ও গদাধর আশ্রমের কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। শেষদিকে আবার হিমালয়ে চলিয়া যান। গড়োয়াল জেলায় তপস্যাকালেই তাঁহার শরীর অপটু হইয়া পড়িলে তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন।

১৯৫৪ খৃঃ রক্তচাপ-জনিত ব্যাধির প্রথম আক্রমণে তাঁহার অঙ্গের একদিক অবশ হইয়া যায়, গত অক্টোবরে দ্বিতীয় আক্রমণে বাক্‌শক্তি ব্যাহত হয়। ১৭.৪.৫৭ তারিখে তৃতীয় আক্রমণের পর তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ করেন। এই সুদীর্ঘ রোগভোগকালেও তাঁহার সহিষ্ণুতা ও বৈরাগ্য ভাব, তৎসহ বালকসুলভ সরলতা, আনন্দময় ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার সকলকে—বিশেষত সেবকগণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিত। গত ১০ই জুন সন্ধ্যার পরই সেরিব্র্যাল থ্রম্বোসিস-রোগ দ্বারা শেষবার আক্রান্ত হইয়া ৮-৩৩ মিঃ সময় গুরু ও ইষ্টনাম শ্রবণ করিতে করিতে এই তপঃপরায়ণ প্রবীণ সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করিয়াছেন। বেলুড় মঠে পুণ্য গঙ্গাতীরে ঐ রাত্রেই তাঁহার দেহের সৎকার করা হয়।

ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

মনুষ্যত্ব-বিকাশে বেদান্ত*

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথমে আমাদের জানতে হবে বেদান্ত কি? বেদের অন্ত—বেদান্ত। আবার প্রশ্ন আসে বেদ কি? 'বিদ্' ধাতু থেকে বেদ; 'বেদ' অর্থে জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানের শেষ কথা বেদান্ত। বেদের শেষ ভাগ উপনিষদ্‌কেই বেদান্ত বলা হয়। যে জ্ঞান লাভ হলে মানুষের আর কিছু লভ্য থাকে না—সেই যে জ্ঞান—তাকেই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়। ব্রহ্ম কি? বৃহত্তম বিশ্বব্যাপী বস্তু—যার থেকে আর কিছু বড় হতে পারে না,—তাই ব্রহ্ম, তাঁকেই পৃথিবীর ২৮০ কোটি মানব নানাভাবে সম্বোধন করে থাকে। যেমন—হিন্দুরা ঈশ্বর বা ভগবান, মুসলমানেরা খোদা বা আল্লাহ, আবার খৃষ্টানেরা বলে গড্। কিন্তু বস্তু সেই একই ব্রহ্ম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে—জল; কেউ তাকে 'ওয়াটার' বলে, কেউ বলে পানি, কেউ বা অব্ বলে থাকে। কিন্তু যে যাই বলুক না কেন—পান করলে সকলেরই পিপাসা সমভাবেই নিবারিত হয়।

বেদান্ত-সূত্রের প্রথম সূত্রই হলো—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। ব্রহ্ম সম্বন্ধে যার জানবার ইচ্ছা হয়েছে সেই তাঁকে জানতে পারবে। তাঁকে জানলে সকলেরই জ্ঞানের পিপাসা মিটে যায়; আর এই জ্ঞানলাভই—মনুষ্যত্ব-বিকাশই—মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ব্রহ্ম যে এক, সে সম্বন্ধে বেদান্ত বলেছেন :

(১) 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি—বস্তু একই, পণ্ডিতগণ তাকে নানাভাবে ব্যক্ত করছেন।

(২) 'একং জ্যোতির্বহুধা বিভাতি'—জ্যোতি একই, নানারূপে ফুটে উঠছে।

(৩) 'একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি'—সত্তা একই, বহুরূপে কল্পিত হচ্ছে।

সকল বেদ তাঁকে 'এক' বলেছেন। সৃষ্টি-স্থিতিলয়ের সেই বৃহত্তম শক্তি—তাকে আমরা ঈশ্বর বলি, কেউ আল্লাহ, কেউ জিহোবা বলে থাকে। তা যে এক—সে সম্বন্ধে আরও একটি উপমা দেওয়া যেতে পারে। যেমন—পিতা একটি বড় পরিবারের কর্তা—গৃহস্বামী; তাঁর ছেলের পক্ষে তিনি পিতা—তাঁর মা বাবার পক্ষে তিনি পুত্র, তাঁর স্ত্রীর পক্ষে তিনি স্বামী, আবার তাঁর বন্ধুর পক্ষে তিনি বন্ধু। যদি এই একটি মাত্র পরিবারের একটি মাত্র লোক বিভিন্ন লোকের পক্ষে বিভিন্ন নামে অভিহিত হতে পারেন—তবে বিরাট পৃথিবীর ২৮০ কোটি মানুষ বৃহত্তম পরিবারের গৃহস্বামীকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করবে তাতে আর বিচিত্র কি?

এই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে পর পর চার প্রকার সাধন-প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। সেই সাধন-চতুষ্টয় সম্বন্ধে বেদান্ত বলছেন :—

(১) প্রথম 'বিবেক' বা নিত্যানিত্য-বস্তু-বিচার চাই। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমতঃ নিত্য বস্তু এবং অনিত্য বস্তু বিচার করতে হবে। যা চিরদিন আছে ও থাকবে যার ক্ষয় নেই, লয় নেই,—তাকেই নিত্য বস্তু বলে; এবং যা আজ আছে, কাল নেই; অথবা যা কাল হবে, পূর্বে ছিল না এবং দুদিন পরেও থাকবে না—তাকে অনিত্য বস্তু বলে। যা নিত্যবস্তু তাই গ্রহণ করতে হবে। অনিত্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "সদসদ্‌বিচার" চাই; যা সৎ, নিত্য বা চিরস্থায়ী তাই গ্রহণ এবং যা অসৎ বা অনিত্য তা পরিহার বা পরিত্যাগ করতে হবে।

* ২৮. ৫.৫৬ তারিখে চট্টগ্রামে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

(২) দ্বিতীয় 'বৈরাগ্য': "ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগঃ।" কর্মফলভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে। কোন কাজ করেই তার ফল কামনা করতে পারবে না। ইহলোকের সুখ, কি পরলোকে প্রাপ্য স্বর্গাদি সুখ উভয়েতেই বীতরাগ হতে হবে।

(৩) তৃতীয় সাধন: "শমদমাদি ষট্‌-সম্পত্তি"—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান—এই ছয় প্রকার সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে। আমরা সাধারণ সংসারী মানব যারা—তারা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়ি—গোলাম হয়ে পড়ি। আমাদের মোটেই ধৈর্য থাকে না। ইন্দ্রিয় আমাদের যে দিকে চালায় আমরা সে দিকেই ছুটি। চোখের ইচ্ছা হল—চল আজ কি 'ছবি' হচ্ছে দেখব—অমনিই ছুটে যাই। কানের ইচ্ছা হচ্ছে সঙ্গীত শুনব—অমনিই শুনতে যাই। জিহ্বার ইচ্ছা হচ্ছে—অমনি মিষ্টি খাই। এভাবে ইন্দ্রিয় আমাদের যে দিকে চালায় আমরা অন্ধের মত সেই দিকে পরিচালিত হই। আমরা সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় ও মনের দাস হয়ে আছি। কিন্তু মহাপুরুষেরা ইন্দ্রিয়ের বা মনের দাস হন না।

বিচার করে দেখা যাক্—'আমরা মনের? না, মন আমাদের?' আমরা যদি মনের হই, তবে 'আমার মন, আমার মন' বলি কেন? শাস্ত্র বলেছেন 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ'। মহাজনেরা যে ভাবে চলেছেন সেটাই পথ। তাঁরা তো ইন্দ্রিয়ের দাস হন না। তাঁরা ইন্দ্রিয়কে দাস করে রাখেন। বহিরন্তরিন্দ্রিয় সংযমই দম ও শম, তার পর দুঃখ সহ্য করার নাম তিতিক্ষা, ভোগে অনিচ্ছা উপরতি, গুরু-বাক্যে বিশ্বাস শ্রদ্ধা, তারপর সমাধান—ইষ্টে চিত্তস্থাপন।

এই ষট্‌সম্পত্তি লাভ হলে শেষ বা চতুর্থ সাধন হচ্ছে 'মুমুক্ষুত্ব'। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কি চায়? শুধু মানুষ কেন—সমস্ত জীবজগৎ—সেই একটি—শুধু মাত্র একটী জিনিস চাচ্ছে—সেটি হ'ল মুক্তি বা শান্তি। কোথায় সেই শান্তি পাওয়া যাবে? সেই শান্তিময় যিনি—তাঁর থেকেই শান্তি আনন্দ নিতে হবে। পিপীলিকা এককণা চিনি পেল—তা পেয়ে মনে করল তার শান্তি হয়ে গেছে। কিন্তু সেটি ভোগ করা শেষ হতে না হতে আবার এককণা পাবার জন্য সে অশান্ত হয়ে ছুটাছুটি করে। আমরা শান্তির জন্য, আনন্দের জন্য ছুটাছুটি করছি, বহির্জগতের নানা স্থানে নাচে, গানে, সিনেমায়, থিয়েটারে যাই শান্তি পাবার আশায়, মনে হ'ল শান্তি পেয়ে গেছি। কিন্তু ক্ষণেক পরেই আবার অশান্ত হয়ে পড়ি। এ ভাবে আমরা কোথাও চিরশান্তি খুঁজে পাই না। কিন্তু যখন আমরা কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য জানতে পারব, তখন আমরা আর অসত্য বস্তুর জন্য ছুটাছুটি করব না। সত্য বস্তু লাভ করবার জন্য ছুটে যাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ—সংসার-সম্বন্ধের অনিত্যতা বুঝে দস্যু রত্নাকর যখন সত্যের সন্ধান পেলেন তখন তিনি ঋষি বাল্মীকি হয়ে রামায়ণের মহাকবিতে পরিণত হলেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, "The very condition of life is death, and the very condition of death is birth Death is inevitable." মৃত্যু অনিবার্য, জন্ম হলে মৃত্যু অবধারিত। কাজেই যে সত্য বস্তু লাভ হলে আমরা মৃত্যুর পারে যেতে পারি—যে বস্তু লাভ হলে আর কিছু লভ্য থাকে না, তা লাভ করাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। নইলে মানবজীবনের কোন মূল্য নেই, উদ্দেশ্য নেই। সকল ধর্মই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একই প্রকার বলে থাকেন। কোরান বলেন, "মিস্ত্রি যেমন একটি ঘর তৈরী করে তাতে অদৃশ্যভাবে এক কোণে তার নিজের নাম রেখে দেয়, সেরূপ আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে প্রতিটি মানুষের হাতে 'আল্লাহ' এই নাম রেখে দেন," কাজেই আমাদের প্রতিটি কাজের সময় চিন্তা করতে হবে—যাতে এই হাতে—যে হাতে আল্লাহর নাম লেখা

আছে তা দিয়ে যেন কোন প্রকার অন্যায় কার্য না করা হয়, অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ আমাদের ভালোর দিকে নিয়ে যায় আমরা যেন সে সমস্ত কাজই করি।

সকল প্রকার দানের মধ্যে জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ দান। অন্নবস্ত্র দানের দ্বারা মানুষের সাময়িক অভাব দূর হয়, স্থায়ী উপকার হয় না—আবার অভাব দেখা দেয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হলে পর মানবের আর কোন অভাব থাকে না—সে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং সেই আত্মজ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মানবের পক্ষেই সম্ভব। কারণ প্রত্যেকের মধ্যে সেই ব্রহ্ম সমভাবে বিরাজমান—সকলেই পূর্ণ। কেউ বড় বা কেউ ছোট নয়। কিন্তু মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আমরা তা দেখতে পাই না। যাঁদের মায়া কেটে গেছে তাঁরাই দেখতে পান, 'আমিই সেই পূর্ণ।' আত্মজ্ঞান লাভে বিঘ্ন বা বাধা অজ্ঞান।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বললে ব্যাপারটা সহজে বুঝা যাবে। একজন ধনী লোক চট্টগ্রাম থেকে দিল্লী যাবেন স্থির করেছেন। তাঁর সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা—এক হাজার টাকার ৫০ খানা নোট। স্থানীয় এক বাটপার সে খবর জানতে পারে। ঐ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করবার মানসে সেও একখানা টিকিট করে ধনী লোকের গাড়ীতে চলতে থাকে। চট্টগ্রাম থেকে দিল্লী যেতে মোটামুটি তিন রাত্রি লাগে, প্রথম রাত্রিতে ধনী লোকের নিদ্রা যাবার পূর্বে টাকা বের করে গুনে তাঁর বাক্সের মধ্যে রেখে শুয়ে পড়লেন। তিনি নিদ্রাভিভূত হলে তখন ঐ তস্কর উঠে তাঁর বাক্স খুলে দেখে সেখানে টাকা নেই। সে প্রথমবারে বিফলমনোরথ হয়ে দ্বিতীয় সুযোগ সন্ধানের অপেক্ষা করতে লাগল। ধনী ব্যক্তি অনুরূপভাবে তার সামনেই সকালবেলা এবং রাত্রিতে আবার টাকা বের করে গুনে বাক্সের মধ্যে রেখে দিলেন। কিন্তু তস্কর যেবারও ধনী ব্যক্তি নিদ্রাভিভূত হলে বাক্সটি খুলে টাকা খুঁজতে লাগল কিন্তু টাকার সন্ধান না পেয়ে চিন্তিত হল, এভাবে তাদের গন্তব্য স্থান সন্নিকট হওয়ায় ভ্রমণ অবসান হতে চলল। তখন তস্কর মহাজনকে বলল, "দেখুন আমি একজন তস্কর—আপনার টাকা আত্মসাৎ করার মানসে আপনার অনুসরণ করছি। আপনি প্রতিদিন সকাল ও রাত্রে আমার সম্মুখে টাকা বাক্সে রাখেন, অথচ আমি আপনার নিদ্রিত অবস্থায় বাক্স খুলে টাকার কোনরূপ সন্ধান পাই না? আচ্ছা, আপনি কি কোন যাদু জানেন?" তখন ব্যবসায়ী বললেন, "দেখ, আমি কোনরূপ যাদু জানি না। প্রতি রাত্রেই আমি টাকা গুনে তোমার সম্মুখেই বাক্সর মধ্যে রেখেছি সত্য, কিন্তু আমি শোবার পূর্বে যখন তুমি স্নানঘরে ঢুকে পড় তখন আমি তাড়াতাড়ি টাকাগুলো তোমার শয্যার নীচে রেখে দিই। আবার সকালে যখন তুমি স্নানঘরে যাও তখন আমি টাকাগুলো এনে বাক্সে রেখে দিই। তুমি টাকা যথাস্থানে খোঁজনি, কাজেই কি করে পাবে?"

আমরাও শান্তির জন্য অন্ধের মত বহির্জগতে খুব ছুটাছুটি করি। কিন্তু বহির্জগতে প্রকৃত শান্তি নেই। বহির্জগতে বৈষয়িক আনন্দের চেয়ে অন্তর্জগতে আত্মানন্দের শান্তি কোটি গুণ বেশী। উহা প্রত্যেকের অন্তরে আছে, অন্তর্জগতে খুঁজতে হবে—বহির্জগতে তা কি করে পাবে?

বর্তমান ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্য কতই না উন্মুখ হয়ে পড়েছে। কয়েক শত বৎসর পূর্বে গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশ, প্রতিপত্তি দ্বারা সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল, কিন্তু আজ সেই সব দেশের স্থান কোথায়? আজ তারা ধ্বস্ত বিধ্বস্ত।

এ জগতে ধন, দৌলত, ঐশ্বর্য, বিত্ত, সম্পত্তি; মান, যশ বা শক্তি যে যারই অধিকারী হউন না কেন আজ প্রত্যেকটি বস্তুর ঠিক ঠিক মর্যাদা

দেওয়া না হয় তবে কোনটিই থাকে না। নিজে বড় হবার জন্য যে যতই চেষ্টা করুক না কেন, ঝগড়া, বিবাদ এমন কি লড়াই বা তুমুল যুদ্ধ করুক না কেন, যদি শক্তির উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষা না করে তবে সে কখনও কৃতকার্য হইতে পারে না; উহা জলের বুদ্‌বুদের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হয়। ইহা কি ব্যষ্টি, কি সমষ্টি সকলের পক্ষেই সত্য। জগতের ইতিহাসে বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে এই পৃথিবীতে যার যেটি প্রাপ্য তাকে সেটি দিলে যেমন সত্যের সেবা বা মর্যাদা রক্ষা হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। এই পৃথিবীতে গুরুজনকে সম্মান না করে কেউ বড় হতে পারে না। পিতামাতার মর্যাদা রক্ষা না করে ছেলে বড় হতে পারে না, শিক্ষক বা আচার্যকে সম্মান না করে শিষ্যের শক্তি বিকশিত হতে পারে না।

এই জগতে প্রত্যেক বস্তুরই মর্যাদা আছে। যাঁরা সেই মর্যাদা রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকেন তাঁদের আশ্রয়েই সেই সকল বস্তু চিরকাল থেকে যায়। মর্যাদার হানি হলেই মা লক্ষ্মী ঘর থেকে চলে যান। ভারতে বেদ-বেদান্তের মর্যাদা যতদিন অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন ভারতবর্ষ সমগ্র জগৎ-সমক্ষে ধ্যান-জ্ঞানের দেশ বলে সুপরিচিত ছিল। অবশ্য যুগ যুগান্তরে মহাপুরুষ ও অবতার-পুরুষদের আবির্ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ হয় বটে, কিন্তু আবার যখনই মর্যাদার হানি হয়েছে তখনই জনের (জন সাধারণের) বেদান্ত বনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রধান শিষ্য বিশ্ববিশ্রুত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে সেই বনের বেদান্ত ঘরে ফিরেছে।

মানুষ নিজেকে চেনে না বলেই এত গোলমাল। নিজের আত্মা সম্বন্ধে কিছুই জানে না বলেই বাহিরে শান্তির জন্য ছুটাছুটি করে। বেদান্তের আত্মতত্ত্ব বুঝাবার একটি সুন্দর গল্পঃ "দশমস্ত্বমসি"। দশজন লোক মিলে একসাথে বেড়াতে যাচ্ছিল এক জায়গায়। পথে এসে তারা এক বিরাট নদী পেলে। তাই সাঁতার কেটে তারা নদী পার হ'ল, এক এক বারে ২।৩ জন করে করে। সকলে পার হবার পর একজন বললে, গুনে দেখি আমরা দশজন ঠিক আছি কিনা; গোনার সময় সে বরাবর নিজেকে বাদ দেয়; কাজেই একজন কম পড়ে যায়। তখন প্রত্যেকেই একবার করে গুনতে আরম্ভ করলে, এবং প্রত্যেকেই একই প্রকার ভুল করতে লাগল, বার বার নিজেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। শেষে তারা ভাবলে, আমাদের কেউ হয়তো জলে ডুবে গেছে, নয়তো কুমীরে টেনে নিয়ে গেছে। বাড়ীতে আমরা সব আত্মীয় স্বজনদের কি জবাব দেব?—এই ভেবে তারা কাঁদতে লাগল। ক্রন্দনের এক মহা রোল পড়ে গেল। এই সময় সেখান দিয়ে একজন বুদ্ধিমান পথিক যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের কান্না শুনে ও ব্যাপার বুঝে সকলের হয়ে নিজে গুনে দেখালেন—তারা দশজন ঠিকই আছে, তখন তাদের একজনকে দিয়ে আবার গোনালেন, সে 'নয়' গোনার পর তিনি বললেন, 'দশমস্ত্বমসি'। এইভাবে তাদের ভুল ভেঙে দিয়ে আত্মজ্ঞান দিলেন; কাজেই তিনি তাদের গুরু হলেন। সংসারেও আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে গুরুর প্রয়োজন। সদ্‌গুরুই বলে দেন, ধর্ম বাহিরে নয়—শান্তি বাহিরে নয়, জ্ঞান বাহিরে নয়;—একেবারে ভিতরে, অন্তরের মধ্যেই। Each soul is potentially divine, প্রত্যেক আত্মাই স্বভাবতঃ সত্য পূর্ণ ও পবিত্র, Divinity is its birth-right. শুধুমাত্র মালা জপলেই ধর্ম হয় না, শুধু নামাজ পড়লেই ধর্ম হয় না এবং গীর্জায় গেলেই ধর্ম হয় না। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন, তা হলেই আত্মোন্নতি হয়, তার পরিণামেই Self-fulfilment সিদ্ধি বা পরিপূর্ণতা লাভ হয়।

যত্র নরঃ তত্র নারায়ণঃ; যেখানে নর সেখানেই

নারায়ণ, যত্র নারী তত্র গৌরী; যেখানে নারী সেখানেই গৌরী।

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বিস্তার করে বলেছেন—'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। যেখানে জীব সেখানেই শিব অর্থাৎ ভগবানকে দেখতে হবে। শুধু মানুষে নয়, সকল প্রাণীতেই সমদৃষ্টি করতে হবে—আত্মদৃষ্টি করতে হবে। বেদান্তের শেষ সিদ্ধান্ত—কিছুতেই ভেদজ্ঞান রাখতে পারবে না, সব কিছুতেই সেই বিরাট আত্মা রয়েছেন, কাজেই ভেদবিভেদ থাকতে পারে না; থাকে শুধু প্রেম, যার উদয় হলে মানুষে মানুষে, Caste and Creed বা জাতি-ধর্মের প্রশ্ন থাকে না, মতবাদের প্রশ্ন থাকে না, পরিবর্তে এক মহান্ ঐক্য দেখা দেয়। আজ মানুষ শান্তি স্থাপনের জন্য ছুটাছুটি করছে; একমাত্র বেদান্তের এই মহান শিক্ষা গ্রহণ করলেই পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে বলেছিলেন তা আমরা আজ বুঝতে পারছি, "India is still alive to contribute her quota to the perfect civilization of the whole world." দেশে দেশে এই বেদান্তের আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে জগতের সভ্যতাকে পূর্ণ করবার জন্যই ভারত আজও বেঁচে আছে। বেদ বলেছেন 'মাতৃদেবো ভব', 'পিতৃদেবো ভব', 'আচার্যদেবো ভব'। পিতামাতাকে দেবদেবীবৎ পূজা করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সেটাকে আরও বাড়িয়ে বলেছেন, "দরিদ্রদেবো ভব মূর্খদেবো ভব।" এই শত শত দরিদ্র না খেয়ে মারা যাচ্ছে তাদের সেবা করতে হবে। তারা যেন দেবতার মান পায়। এই যে কোটি কোটি মূর্খ যারা অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে আছে তাদের সেবা কর দেবতাবোধে।

পল ডয়সন, ম্যাক্স মুলর প্রভৃতি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও মনীষীরা বেদান্ত সম্বন্ধে সর্বোচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন। বেদান্ত-দর্শনের চাইতে আর যে বড় দর্শন নেই—তাঁরা তা স্বীকার করেছেন।

বেদান্তের শিক্ষায় মনুষ্যত্বের চরম বিকাশে মানুষ ভাই ভাই হয়ে যায়; কোনরূপ ভেদভাব বিবাদ বিসংবাদ যুদ্ধ বিগ্রহ থাকে না—পৃথিবীতে এক মহান ঐক্যের, মহান ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়—পৃথিবী চির শান্তির পথ খুঁজে পায়; তা হ'লেই মানুষ একটা ভয়শূন্য আনন্দ অনুভব করতে পারে; সমস্ত মানব গোষ্ঠী সব রকমের ভেদ ভুলে গিয়ে পৃথিবীতেই সর্বদা স্বর্গীয় আনন্দ উপলব্ধি করতে পারে। সমগ্র মানবজাতি যা চায় তা শান্তি। বেদান্ত দ্বারা মানুষের এই শ্রেষ্ঠ বিকাশ লাভ সম্ভব। বেদান্ত মানবকে অতিমানবত্বলাভে সাহায্য করে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির সর্বতোমুখী উন্নতি এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধন করে বেদান্তভাব মানবসভ্যতাকে কতখানি আগিয়ে দিয়েছে, ও আরো কত আগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আজ তা বুঝবার সময় এসেছে।

বেদান্তের আলোক প্রত্যেক গৃহে লইয়া যাও, প্রত্যেক গৃহে বেদান্তের আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠিত হউক, প্রত্যেকের ভিতরে দিব্যভাব সুপ্ত রহিয়াছে—তাহাকে জাগ্রত কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রভাতী সমুদ্রতটে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সুদূরের নীলাকাশ জলধির কোন্ সে বিন্দুতে
অগণন মুহূর্তের ফাঁকে ফাঁকে আলিঙ্গন করে !
মৃত্যুতরঙ্গিনী-স্রোত মিশেছে কি অমৃত-সিন্ধুতে
নব সৃজনের তরে ?
হৃদয়-অম্বর যেন দুলিতেছে চিত্ত-পারাবারে,
উদয়-অস্তের রাগে—
এমনি প্রত্যহ। অন্তরের সিন্ধু যেন কারে ডাকে
নিখিল প্রান্তর হোতে আলো অন্ধকারে
দুঃখে সুখে বৈরাগ্য-নিঃশ্বাসে—
চির যাযাবর প্রাণে—খেলা কেন সিন্ধুতে আকাশে ?

ভয়ার্ত শিশুর মতো ক্রন্দন বিলাপ
শুনি কার বালুবেলা তটে ! ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ন দরিয়ায়
নিল যেথা শত শত শতাব্দীর সভ্যতা বিদায় !
পূষণের আবির্ভাব
উষার তোরণ-দ্বারে। ভাষা-হারা সতত বিদ্রোহ
তরঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে তবু আনে জীবনের মোহ।

অন্তহীন বারিধিরে আলিঙ্গন দিতে
অনন্ত আকাশ ব্যগ্র পৃথিবীর সান্ত সীমানাতে।
তরঙ্গ-ইঙ্গিতে আর আনন্দ-সঙ্গীতে
পরম আগ্রহ লয়ে মায়াজাল রচিতেছে প্রাতে
ঊর্মিদল। বায়ুস্রোতে বলাকারা চঞ্চল উদ্দাম।
একটি দৃষ্টির মতো ফেলে রেখে আপন হৃদয়
দূরের দুষ্প্রাপ্য তরে কি রহস্য করেছে সঞ্চয়
দুরন্ত জলধি ? —এই প্রশ্ন চিত্তে মোর জাগে অবিরাম।

কথামৃতের আলোয় অবতার-পুরুষ

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত

উপনিষদে অবতার পুরুষের কোনো উল্লেখ নাই। ঋষিরা ছিলেন তত্ত্বান্বেষী—জ্ঞানপথের পথিক। আর্যরা বীর ও শক্তিমান, প্রধানতঃ স্বীয় সাধনার শক্তিতেই তারা চেয়েছিলেন সত্যকে লাভ করতে। মৃত্যুর তোরণদ্বারে নচিকেতার বিজয়-অভিযান এই নির্ভীকতারই চরম পরিচয়। মুণ্ডকোপনিষদের ঋষি গান করছেন—

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥"

প্রণব ধনু, জীবাত্মাই বাণ; আর ব্রহ্ম সেই বাণের লক্ষ্য। লক্ষ্য ভেদ করতে হবে—প্রমাদহীন হয়ে। বাণের মত তন্ময়, অর্থাৎ লক্ষ্যের সাথে অভিন্ন হতে হবে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের ভগবান রসময়', মানুষের এই রসস্পৃহা চিরন্তন। সত্যকে ঋষিরা 'রসো বৈ সঃ' রূপেও উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু সেই আনন্দময়-তত্ত্বের মধ্যে মানুষ-ভগবানের কোনো স্থান ছিল না। প্রেমধর্মের বীজ উপনিষদে আছে, কিন্তু সে বীজ ভক্তিবাদে অবতারবাদে অঙ্কুরিত পল্লবিত হয়ে ওঠে নি।

অবতারবাদ—প্রাণধর্মের প্রকাশ। প্রাণের খেলার কোনো নিয়ম কিংবা কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নাই। ভক্ত কেন অবতারকে পূজা করেন, তা যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না। ভালবাসা বিচারের অপেক্ষা করে না—তার একটা নিজস্ব সত্তা আছে। সে স্ব-সম্পূর্ণ। ফরাসী দার্শনিক প্যাস্কালের মতে 'The heart has its own reasons of which reason does not know'—হৃদয়ের নিজেরই যুক্তি আছে, যা যুক্তি নিজেই জানে না।

কিন্তু প্রেমকে সত্য বলে গ্রহণ করলেই প্রাণের দেবতার অস্তিত্ব প্রতিফলিত হয় না। ন্যায়বাদীদের মতে অনন্তের সান্ত হওয়া সম্ভব নয়। অন্যপক্ষে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রমাণও যুক্তির মধ্যে নেই, আছে তার অস্তিত্বের অনুভূতির মধ্যে। প্রমাণ বলতেই ন্যায়ের বিচার বোঝায় না। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি—আছে বলেই সত্য, কার্যকারণ আছে বলে নয়। ক্রমবিবর্তনবাদীদের মতে (Emergent Evolution) অপ্রাণ থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে পশুর প্রবৃত্তিজাত বুদ্ধি, এবং প্রবৃত্তিজাত বুদ্ধি থেকে মানুষের বিচারশক্তি (conceptual reason) জন্মায়। এই কম থেকে বেশী হওয়ার মধ্যে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এ অযৌক্তিক, তবু এ সত্য। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার একটু রসিকতা করে বলেছেন—"Explanation is the interpretation of the more developed by the less developed"—অর্থাৎ 'ব্যাখ্যা করা', মানে একটা অল্পপরিণত ভাব দিয়ে একটা অধিক পরিণত ভাব বোঝানো।

ভগবানের আবির্ভাবের সব চেয়ে বড় প্রমাণ—এই অস্তিত্বের উপলব্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"দেখেছি বিচার করে একরকম জানা যায়, আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন, এর নাম অবতার—তিনি যদি তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দেন, তা হলে আর বিচার করতে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘসতে ঘসতে দপ্‌ করে আলো হয়। সেই রকম দপ্‌ করে যদি তিনি আলো জেলে দেন, তাহলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?" আবার বলছেন, "তিনি অবতার

হয়ে আসেন—এটি উপমা দিয়ে বোঝানো যায় না। অনুভব হওয়া চাই—প্রত্যক্ষ হওয়া চাই"। যুক্তি দিয়ে প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করা চলে না।

অবতার প্রমাণসিদ্ধ,—যুক্তিসিদ্ধ নন কিংবা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধও নন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে বুদ্ধি দ্বারা তাঁর একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। তাঁরই শ্রীমুখের কথা—"তাঁর অবতারকে দেখা হলে তাঁকে দেখা হলো। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে গঙ্গা দর্শন-স্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা—হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না"। পূর্ণ থেকে অংশকে পৃথক করা যায় না। অসীম অনন্ত ভাগবত-চেতনার সাথে একীভূত অবতারকে অসীম থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। এ যেন—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"।

এই সুখে-দুঃখে-ভরা মাটির বুকে ভগবানের আবির্ভাব এক বিস্ময়ের বস্তু। এ যেন নিরাকারের সাথে সাকারের প্রণয় মিলন, রূপের সাথে অরূপের রাখীবন্ধন। ভগবান বারংবার নামরূপের বন্ধনে ধরা দিলেও তিনি নামরূপহীন। একদিন কুরুক্ষেত্রে পার্থসারথি বন্ধু অর্জুনকে বলেছিলেন—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

—আমার জন্ম নাই, আমার জ্ঞান কখনও লুপ্ত হয় নাই। বিশ্বজগতের আমিই ঈশ্বর। সেই আমি নিজেরই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় করে মায়ায় যেন দেহ ধারণ করি।

সে মায়ার রূপ এবার ভগবান ফুটিয়েছেন কথামৃতে। "অবতারাদির 'আমি' পাতলা আমি। এ 'আমির' ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সব সময় দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে—পাঁচিলের দুইদিকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে পাঁচিলের ওধারে সব দেখা যায়।" সেই ফোকরটিই অবতার; সীমার মাঝে অসীম। ফাঁকটি সীমার গায়ে দেখা গেলেও এবং তার একটা আকার ফুটে উঠলেও সে নিজে শূন্য এবং অনন্তের মাঝে একাকার। কথামৃতের অবতারপুরুষ পরস্পর বিরোধী ভাবের এক অপূর্ব সমন্বয়। দার্শনিক হেগেলের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে, "Contradictions nestle in the very bosom of Eternity"—অনন্তের বুকে পরস্পর বিরোধী ভাব শান্ত সুখে জড়িয়ে রয়েছে।

"শক্তির লীলাতেই অবতার।" যে পরম শক্তির প্রকাশে এই বিশ্বসৃষ্টি—তারই ঘনীভূত রূপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ; অলৌকিক তপস্যাবলে বলীয়ান্ ও বিচিত্র অনুভূতির রঙে রঙ্গীন এই ভাগবত বিগ্রহ। সেই বিগ্রহের ভিতরেরই "সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে, এসে বললে আমি যুগে যুগে অবতার··· তারপর চুপ করে থেকে দেখি তখনও আপনি বলছে, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।" প্রশ্নোপনিষদে আছে—"প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত।" সেই পরমপুরুষের তপস্যায় সৃষ্টির বীণায় প্রথম রাগিণী বেজে উঠল, শ্রীমদ্‌ভাগবতেও পিতামহ ব্রহ্মা এই বিশ্ব-উন্মেষের প্রথম প্রভাতে নিজেরই অন্তরে শুনতে পেয়েছিলেন সেই শাশ্বত বাণী—"তপ, তপ, তপ"। সাধনার অর্থ প্রচ্ছন্ন আত্মশক্তির বিকাশ, প্রয়োগ কিংবা অভিব্যক্তি। ভগবানের সেই অভিব্যক্তিই এই জগৎ, এবং তাঁরই পূর্ণ বিকাশ অবতার পুরুষ। আবার ভগবানের সাধনার রূপ শক্তি-প্রকাশের বিগ্রহ। আদি পুরুষের প্রথম তপোমূর্তি আমরা দেখি নাই। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য পঞ্চবটীমূলে সত্য, শিব ও সুন্দরের যে আরাধনার রূপ এবার ফুটে উঠেছে তাকে অস্বীকার করব কোন প্রাণে? সে রূপ নিজেরই সম্বন্ধে ইঙ্গিতে বলছেন—"এক রকম তুবড়ি আছে যার ফুলকাটা আর ফুরায় না।"

বেদান্তের মতে ঈশ্বর সত্ত্বগুণপ্রধান। "ইয়ং

সমষ্টিকৃৎকূটোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা"। সত্ত্বগুণ আলোর মত প্রকাশশীল; তম'র কাজ অন্ধকারে ঢেকে রাখা, আর রজ'র কাজ বিক্ষেপ কিংবা আলোড়নের সৃষ্টি করা। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥"

—শুকনো কাঠ তম'র প্রতীক, কারণ তার ভিতরের আগুন সে রেখেছে চেপে। তারপর দেখা গেল ধোঁয়া, সে আলোড়ন রজোগুণের। শেষে জ্বলে উঠল আগুন—কাঠ পর্যন্ত হয়ে উঠল আলো। এই আলো সত্ত্বের, যা থেকে হয় ব্রহ্মদর্শন। জীব কাঠের মত তামসিক, তার কর্মচঞ্চলতা রাজসিক ধোঁয়া। অন্তরের ভাগবত সত্তাকে ফোটাতে পারে সত্ত্বের আলো, এই সত্ত্বগুণেরই পূর্ণ প্রকাশে অবতারলীলা। তাই কথামৃতের ভগবান নিজের ভিতরে দেখলেন "পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য"। যে ত্যাগ, পবিত্রতা, ভক্তি, জ্ঞান, বিবেক ও বৈরাগ্য দিব্যচেতনার শ্রেষ্ঠ উপাদান তারই মূর্তবিগ্রহ অবতার-পুরুষ।

এ জ্ঞান, এ ভক্তি সাধনলভ্য নয়; ভগবানের নিজস্ব সত্তা। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় তিনি "জ্ঞান ও ভক্তির জমাটবাঁধা মূর্তি········ সাধ্য-সাধনা করে নয়, এমনিই হয়েছে"। অবতারপুরুষ "বসানো শিব নয়, পাতালফোঁড়া শিব—স্বয়ম্ভুলিঙ্গ।" মানুষ সত্ত্বগুণের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে—'বসানো শিব' হতে পারে—কিন্তু অবতারত্ব অর্জন করতে পারে না। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা—

"শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু হে মোর প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।"

সে পরশ দক্ষিণেশ্বরের তাপস এবার রেখে গিয়েছেন প্রাণে প্রাণে। দার্শনিক ডীন্ ইঞ্জের মতে—ধর্মকে প্রচার করে শিক্ষা দেওয়া যায় না, তার ছোঁয়া লাগে প্রাণে। মানুষ-ভগবান ধর্মের সেই পরশমণি—যোগমায়ার প্রকাশ। এই মায়া অবতার-পুরুষের সহজাত শক্তি এবং এই শক্তির সাহায্যেই তিনি করেন লীলা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "যোগমায়ার এমনি মহিমা, তিনি ভেলকি লাগিয়ে দিতে পারেন। বৃন্দাবন-লীলায় তিনি ভেলকি লাগিয়েছিলেন। যোগমায়া যিনি আদ্যা-শক্তি, তাঁর একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। আমি ঐ শক্তি আরোপ করেছিলাম"। নীল যমুনার কূলে একদিন এই যোগমায়াই বাঁশীর সুর হয়ে ফুটে উঠেছিল। সে সুরে উতলা হয়েছিল গোপী, ছুটে চলেছিল শ্রীদাম, সুদাম। এই যোগমায়াকে আশ্রয় করেই—"যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ"—ভগবানের রাসলীলা। সেই মায়াতেই আজ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ছে কথামৃতের সুর।

যোগমায়ার সাহায্যে অবতারলীলা হলেও, লীলা একটা রামধনুর রঙের অলীক খেলা নয়। ঠাকুর বলছেন, "লীলাও সত্য"। অবতারের বিগ্রহ অনিত্য নয়। সিনেমায় যেমন করে মানুষের অভিনয় বাঁধা পড়ে, প্রকৃতি তার নিজের ক্যামেরায় তেমনি করে চিরকাল ধরে রাখে ভগবানের খেলার রূপ। চৈতন্যভাগবতে আছে—

"অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে
যার ভাগ্যে থাকহে সে দেখযে নিরন্তরে।"

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী—

"সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস।
সত্য মোর লীলাকর্ম, সত্য মোর স্থান।
*   *   *
যে না জানে মোর সঙ্গ সেই যায় নাশ।"

মানুষ-ভগবানের লীলা তত্ত্বজিজ্ঞাসা নয়; তার একটা বাস্তব প্রয়োজনের রূপ আছে। কথামৃতের ভগবান প্রয়োজনবাদী। তিনি বলেছেন, "গরুর শিংটা যদি ছোঁয় গরুকেই ছোঁওয়া হলো······ কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। বাঁট দিয়ে সেই দুধ আসে। ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন, তাঁর ভিতরের সার বস্তু

মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে” অবতার যেন গরুর বাঁট, যা দিয়ে গরুর দুধ পাওয়া যায়। ভগবৎপ্রেমের পিপাসা তৃপ্ত করাই যদি ধর্মের উদ্দেশ্য হয় তবে মানুষ-ভগবানই—সেই রস ও রসপাত্র।

* * *

এ কথা বোঝা কিছু কঠিন নয় যে এই মাটির বুকে দিব্য আবির্ভাবের কারণ আছে। কারণ ছাড়া কার্য হয় না। কিন্তু সেই হেতু নির্দেশ করার কোনো শক্তি কিংবা অধিকার মানুষের নেই। আমরা প্রত্যেকটি কর্মের পিছনে একটি অভিসন্ধি দেখতে চাই। ভগবানের লীলা অভিসন্ধিমূলক নয়। আমাদের চিন্তাপ্রণালীর সাথে ভগবানের ভাবধারার সামঞ্জস্য করা যায় না। তাঁর লীলা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—অবতারের জীবন ভাগবতভাবের স্বতঃপ্রকাশ। তাঁর কার্যের কারণ একমাত্র তিনিই জানেন এবং যুগে যুগে তিনিই বলেন।

কুরুক্ষেত্রে গীতামুখে ভগবান তাঁর দিব্য আবির্ভাবের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন সে আজ সর্বজনবিদিত। তিনি এসেছিলেন অধর্মের বিনাশ করতে, ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে ও সাধুদের পরিত্রাণ করতে। এই তিনটি কারণ ছাড়াও হয়তো তাঁর লীলার আরও অর্থ ছিল, কিন্তু তার সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ গীতায় নেই। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে এবার তিনি নিজেকে একটু বেশী প্রকাশ করেছেন আমাদেরই প্রতি অহেতুকী করুণায়। সেই করুণার আলোতেই মানুষ আজ তাঁকে চিনতে পেরেছে তার প্রাণের ঠাকুর বলে।

সেই প্রেমের ঠাকুর বলছেন, “ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পুরে না। প্রয়োজন মিটে না”। মানুষের প্রেম চায় প্রেমাস্পদের একটি বাস্তব রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, “ভক্তেরা অবতারকে চান—ভক্তি আস্বাদন করার জন্য”। প্রিয়তমের রূপ ও গুণ বাদ দিয়ে ভালবাসার রস অনুভব করা যায় না। আধারকে ছেড়ে আধেয়কে কল্পনা করা একপ্রকার অসম্ভব। সগুণ নিরাকারবাদীদের মতে নিছক ভাবময় ভগবানকে ভালবাসলেও অন্তরের রসপিপাসার শান্তি হতে পারে; এখানেও একটা আধার কল্পনা করতে হয়। কিন্তু প্রেম তত্ত্বানুরাগ নয়, বিরাটের জয়গানও নয়, হিতোপদেশও নয়। সমধর্মেই প্রেম সম্ভব। ভালবাসা হয় সমানে সমানে। প্রাণের আকুতিকে দার্শনিক বিচার করে অস্বীকার করা চলে না। তাইতো ভগবান কথামৃতে বলছেন, “তাঁকে হাতে ক’রে খাওয়াতে পারলে তবে তো মানুষ তাঁকে ভালবাসতে পারবে”। শ্রীশ্রীমা বলছেন, “হাওয়াকে কে কবে ভালবাসতে পেরেছে বাবা?”

মানুষের অন্তরে থাকে প্রেমের ক্ষুধা, আর তার কালো চোখে থাকে দেখবার পিপাসা। সেই স্থূল পিপাসা মেটাবার জন্য ভগবানের স্থূল রূপ। “যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্য। সে সূর্যকে দেখতে পারা যায়—চক্ষু ঝলসে যায় না—বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে আসে। তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ ক’রে তার কাছে আসেন।” ভালবাসা ঐশ্বর্য-প্রীতি নয়। কুরুক্ষেত্রে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন শুধু আনন্দ পান নি, ভয়ও পেয়েছিলেন।

“ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে
তদেব মে দর্শয় দেব রূপম্।”

“আমার মন ভয়ে ব্যথিত হয়েছে। ওগো তুমি আমাকে তোমার পূর্বরূপ দেখাও।” কোনো ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট রূপ দেখতে চাইলে তিনিও বলেছিলেন, “ওগো, ও রূপ দেখতে চাওয়া ভাল নয়, ওতে ভালবাসার ভাগ কম পড়ে যায়, ভয় হয়”।

কথামৃতের ভগবান আবার বলছেন—“মনুষ্য-লীলা কেন জান?······এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়?” ‘শ্রীম’ কোন পাশ্চাত্য মনীষীর মত উদ্ধৃত করলেন, “ঈশ্বরের বাণী মানুষের

ভিতর দিয়ে না এলে মানুষ তা বুঝতে পারে না"। শ্রীরামকৃষ্ণ এ কথার পূর্ণ সমর্থন করেন—"বাঃ এ ত বেশ কথা!" যুগে যুগে ভগবান আসেন আচার্য হয়ে, আর নিজেরই অন্তরের বাণী শোনান মানুষকে তাঁর নিজের ভাষায়। সে ভাষা দর্শনের ভাষা নয়। সে কথা ভাগবত সত্যের সহজ সরল সরাসরি প্রকাশ এবং বিচার-বিতর্কের বহু উর্ধ্বে।

অবতার-পুরুষ শুধু সাধনার মূর্ত বিগ্রহ নন, তিনি সাধনার ধন। চীনদেশের মহাপুরুষ লাউৎসের মতে সত্যের সাথে সত্যলাভের পথের বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। শ্রীভগবান্ একই সাথে সত্যপথ এবং পথের শেষ। তিনিই সাধনা, তিনিই সাধ্য। তিনিই উপাসনা, তিনিই উপাস্য। তিনিই উপায়, তিনিই উদ্দেশ্য। ঠাকুর বলছেন, 'তিনি যখন মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে আসেন তখন ধ্যানের খুব সুবিধা হয়। এ যেন কাঁচের লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে।' সেই ভাগবত চেতনার আলো লাভ করাই তপস্যার শেষ, আবার তাকেই উপায়রূপে গ্রহণ করা সাধনার আরম্ভ।

সে উপায় মানুষ শিখেছে তাঁরই আবির্ভাব ও সাধনার ফলে। মানুষ ভালবাসার জন্য অবতার-পুরুষকে চায় সত্য, কিন্তু তাঁকে ভালবাসার সম্পূর্ণ যোগ্যতা তার থাকে না। এ মাটির যে প্রেমের সাথে সে পরিচিত তার রূপ ভগবদ্ভক্তির সাথে মিলে না। তাই "প্রেম ভক্তি শেখাবার জন্য অবতার"। এই শিক্ষা দেবার পদ্ধতি কিন্তু একটু স্বতন্ত্র। যে বিরহ, ব্যাকুলতা, উন্মাদনা, দিব্যরসপ্রিয়তা, ভাব, মহাভাব ও প্রেম এবার দক্ষিণেশ্বরের তাপসের মধ্যে ফুটে উঠেছে—তারই আলোতে মানুষ চিনেছে তার সত্যকারের চলার পথ। তবু কিন্তু এ হোমানল জ্বালার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই। এ বৈদিক সকাম যজ্ঞ নয়। প্রেম দেখাবার কিংবা শেখাবার জন্য প্রেমের অবতারণা হাস্যকর। এ দিব্যানুরাগ অবতার-পুরুষের ভাগবতভাবের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, এবং তার ফল তাঁরই প্রকৃতির সাথে জড়িত। এ প্রেমরূপ তাঁর নিজস্ব সত্তা, এবং তার প্রভাবও তাঁর থেকে অবিচ্ছেদ্য। সূর্যের নিজস্ব প্রকৃতিই আলো দেওয়া; এ দানের মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য নেই। আলো দেওয়ার অভিসন্ধি নিয়ে সূর্য জ্বলে না, কিন্তু তবু সে অন্ধকার দূর করে।

প্রশ্নটি অন্যদিক থেকেও আলোচনা করা চলে। অবতার-পুরুষের ভালবাসা জীব ও ভগবানের প্রতি সমভাবে পড়ে, কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোনো ভেদবুদ্ধি নাই। জীবও ভগবানেরই রূপ। প্রেম আবার পাত্রাপাত্র বিচার করে না, তাই সে শক্তি-মান্। মায়ের স্নেহ কুসন্তানকেও মাতৃভক্ত করে। অবতার-পুরুষের মানবপ্রেমও অভক্ত অবিশ্বাসী মানুষকেও ভগবৎপ্রেমিক করে। তিনি মানুষকে ভালবেসে তাকে ভালবাসতে শেখান। কিন্তু এই ভালবাসার মধ্যেও কোনো উদ্দেশ্য নাই। এ প্রেম সম্পূর্ণ অহেতুকী—এ তাঁর নিজস্ব ধর্ম। মাতৃত্বের উপাদানই বাৎসল্যের রস, অপত্যস্নেহ। সে স্নেহকে বাদ দিয়ে মাকে কল্পনা করা যায় না, আর সন্তানের প্রতি তার প্রভাবও অস্বীকার করা চলে না। দরদী শ্রীরামকৃষ্ণের মরমের টানে আজ মানুষ তাঁকে চিনেছে নিজেরই প্রাণের ঠাকুর বলে; বুঝেছে—পূজার আলোর সাথে জড়িয়ে রয়েছে চরম প্রেম। দার্শনিক বিচারে ভগবানের প্রেমরূপ ও জ্ঞানরূপের যে সমন্বয় করা যায় নি, সেই সমন্বয়ই এবার রূপ ধরে ফুটে উঠেছে এই অপরূপ অবতার-পুরুষে।

এ কথা সত্য যে, তাঁর প্রেম মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর ভাগবত জীবনের দৃষ্টান্ত তাকে প্রেরণা দেয়। সেই ভালবাসার, সেই তপস্যার মধ্যেই সে সন্ধান পায় পরিপূর্ণ দিব্যজীবনের। অবতার-পুরুষের আবির্ভাব আধ্যাত্মিক সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ঠাকুর বলছেন,

'মহাভাব ঈশ্বরের ভাব···এতদূর তোমাদের দরকার নাই···আমার ভাব নজিরের জন্ত'। উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত অনেক বেশী কার্যকরী।

সে প্রেম জীবের পরম কল্যাণের নিদান, তার মুক্তির সোপান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'তিনি যখন মানুষ হয়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে; তখন—সমাধির পর ফেরেন—লোকের মঙ্গলের জন্ত।' 'অবতার, যিনি তারণ করেন'। তাঁকে দর্শন করা, তাঁকে স্পর্শ করা, তাঁকে প্রণাম করা মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বুকে হাত দিয়ে বলছেন, 'এর ভিতর যদি কিছু থাকে, তবে তার সেবা করলে অজ্ঞান অবিদ্যা একেবারে চলে যায়'। 'চৈতন্তদেব সন্ন্যাস নিলেন কেন? লোকে প্রণাম করবে বলে। এখানে যে একবার প্রণাম করবে সে উদ্ধার হয়ে যাবে।' অবতারপুরুষকে তিনি 'বাহাদুরী কাঠ' বা 'স্টীম বোটের' সাথে তুলনা করেছেন—'যে নিজেও পারে যায়, অপরকেও পারে নিয়ে যায়'।

তাঁর সাধনা ব্যক্তিগত নির্বাণলাভের জন্ত নয়, সমষ্টিগত মুক্তির জন্ত। তিনি চিরমুক্ত। অবতার-পুরুষের তপস্তা অন্তের মনে শুধু প্রেরণার সঞ্চার করে না, তাকে শক্তিও দান করে। সে হোমানলের আলো বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে আর মানুষের চলার পথের অন্ধকার দূর করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, 'একজন আগুন করলে দশজন পোয়ায়'।

অবতার-পুরুষের সাধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী মানুষ, আর মানুষের সঞ্চিত কর্মের ফলভোগী লীলাময় ভগবান। বাইবেলের মতে যীশুখ্রীষ্ট এসেছিলেন জীবের পাপ গ্রহণ করে তাকে মুক্তি দিতে—Vicarious atonement. মানুষের কল্যাণের জন্তই তিনি দিলেন তাঁর বুকের রক্ত, হলেন ক্রুশবিদ্ধ। এবার দক্ষিণেশ্বরের ভগবানও এসেছেন মানুষের পাপের বেদনা নিজে সহ্য ক'রে তাকে পাপমুক্ত করতে, তাকে চৈতন্ত দিতে। 'চৈতন্ত হউক', একথা সকলকে বললে—'কলিতে পাপ বেশী, সেই সব পাপ এসে পড়ে'। তবু তো মহাত্মারা তাঁর গলার ক্ষত দেখিয়ে বলে উঠলেন যে, এ বেদনা অন্তের অপরাধ গ্রহণ করে তাকে মুক্তি দেবার প্রত্যক্ষ ফল! চীনের মহাপুরুষ লাউৎসের কথা মনে পড়ে—'যিনি পৃথিবীর পাপ বহন করেন, তিনিই পৃথিবীর রাজা'।

এই বেদনাও তাঁর লীলাবিলাসের অঙ্গ। 'দেখলাম, যে কামাব সেই বলি—সেই হাড়িকাঠ হয়েছে'। অবশ্য সে সম্ভোগের মধ্যে শুধু দুঃখের রসই যে আছে তা নয়। তাঁর আবির্ভাবের মধ্যে প্রেমের আনন্দই প্রধান। তাঁরই শ্রীমুখের কথা—'লীলা বিলাসের জন্ত—মনুষ্যলীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন······সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করতে শ্রীরাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই আধার, আর নিজেই শ্রীমতীরূপে আধেয়—নিজের রস আস্বাদন করতে—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভাল-বেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে'। অবতার পুরুষ ভক্ত হয়ে আসেন—নিজেরই অন্তরে ভগবানকে ভালবেসে আনন্দ করতে। লীলা শেষ করবার আগে ঠাকুর নিজের সম্বন্ধে বলছেন—'এর মধ্যে দুটি আছে। একটি তিনি, আর একটি ভক্ত হয়ে আছে···দেখলাম তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয় মধ্যে যিনি আছেন এক ব্যক্তি। তবে একটি রেখা মাত্র আছে—ভক্তের আমি আছে—সম্ভোগের জন্ত।' রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর কাছে কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করেছিলেন—

"আপন মাধুর্য হরে আপনার মন,
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন।"

এই সম্ভোগের দুটি দিক আছে। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, 'একবার ভগবান হন ফুল, ভক্ত হন ভ্রমর; আবার কখনও ভগবানই হন

অলি, আর ভক্ত হয় ফুল।' শুধু ভগবানের ভিতরেই যে রস আছে তা নয়, ভক্তভাবেরও মাধুর্য আছে। মা যেমন বাৎসল্য রস উপভোগ করেন, সন্তানও তেমনি মাতৃস্নেহ আস্বাদন করে। তাই অবতার-পুরুষ একবার ভক্তরূপে নিজেরই ভাগবত রস সম্ভোগ করেন, আবার ভগবানরূপে ভক্তের হৃদয়-মধু পান করেন।

এ খেলা শুধু তাঁর নিজেকে নিযে নয়, তাঁর জগৎরূপের সাথেও চলেছে তাঁর একই অভিনয়। এই সৃষ্টির মধ্যে যে বিচিত্ররূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন তারও সাথে ফুটে উঠেছে এই রসের আদান-প্রদান। ভগবানের এই জগৎলীলা সম্ভোগের রূপই অবতার-পুরুষ। প্রকৃতির থালায় সহস্রোপচারে সাজানো নৈবেদ্য গ্রহণ করতে তিনি যুগে যুগে আসেন এই মাটির কোলে। প্রকৃতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই তাঁর হয আবির্ভাব।

'নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে আর বাড়ীর ডালভাত ভাল লাগে না।' কিন্তু এ নিমন্ত্রণ শুধু বাইরের প্রকৃতির নয়, সমস্ত প্রকৃতির মানব-শিশুর। সে আহ্বানে তিনি সাড়া দিযেছেন সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে। মানুষের তপস্যা, তার সাধনা, তার চোখের জল যে 'পাষাণ'-দেবতার পূজা নয়, তার প্রতীক্ষা নিরর্থক নয়,—এরই প্রমাণ অবতার-পুরুষের আবির্ভাব।

ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তের নৈবেদ্য গ্রহণ করতে আসেন, আব রেখে যান তারই জন্য একটি পূজার বিগ্রহ। সে মূর্তিব প্রতিষ্ঠা এবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন নিজের হাতে। নিজের অবতার-রূপেব গলায তিনি নিজে পরিযেছেন মালা, তাঁর পায়ে নিবেদন করেছেন ফুল, ছবিকে করেছেন পূজা, এবং বলেছেন—

'এব পর ঘর ঘর এর পূজা হবে।'

অন্তর্যামী

শ্রীমতী বিভা সরকার

ওগো অন্তর্যামী মোর,
হে বৈবাগী নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী,
ঘরভোলা বাঁশরীর সুরে—
করিছ উতলা শুধু
আড়ালে আড়াল রচি
রহি মোর দূর অন্তঃপুরে।
নিভৃত এ নিকেতনে
নিত্যদিন একান্তে নিরালা
কিসের চয়নে আনমনা ?
খুলি মন-বাতায়ন
ভৈরবীর শেষ গানে
কার লাগি করিছ বন্দনা ?
রহিব কি রবাহূত সেথা ?
ডাক মোরে স্থান দাও
তোমার মন্দিরে !
মানস-দেউল হতে
আমি শুধু বার বার
যাব ফিরে ফিরে ?
আপনারে নাহি চিনি
দুঃসহ এ জ্বালা
বেপথু ব্যথার ভরে
আমার নিরালা !
দ্বার খোল হে নিষ্ঠুর
খোল তব গুরু যবনিকা
অমৃত-আলোয় জ্বালো
স্বপ্নময় দূর নীহারিকা !

প্রাচীন ভারতের শ্রমিক

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

[অবসর-প্রাপ্ত লেবার অফিসার, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স]

প্রাচীন ভারতে শ্রমিকরাই সমাজের মেরুদণ্ড ছিল। ধর্ম ও অর্থশাস্ত্র প্রণেতা শ্রীমৎ শুক্রাচার্য, নারদ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিরা শ্রমিকদের সম্পর্কে অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠে সহজেই অনুমিত হয় যে, সেকালের শ্রমিকদের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক ছিল। প্রাচীন ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা অর্থাৎ পারিশ্রমিক, অবসর প্রভৃতি সম্বন্ধে দু-চারটি আবশ্যকীয় বিষয় আলোচনা করিব।

(১) পারিশ্রমিক

সেকালে রাজা তাঁহার নিজের ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য শ্রমিকদের সদা সন্তুষ্ট রাখিতেন—ইহাই আদর্শ ছিল। শুক্রাচার্য লিখিয়া গিয়াছেন যে, রাজা স্বয়ং শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা বিবেচনা করিয়া তাহাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিয়া দিবেন, এবং তাহা প্রদান করা কখনও বন্ধ থাকিবে না। নারদ বলিয়াছেন, কার্যের পূর্বে যে পারিশ্রমিক স্থির হইয়াছে—কার্যের পূর্বে, মধ্যে বা কার্য সমাপ্ত হইলে ভৃত্যকে তাহা দিতে হইবে, এবং যে নিয়োগকর্তা কার্যের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া বন্ধ করিবে, তাহাকে পারিশ্রমিকের পাঁচগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে! বৃহস্পতি বলিয়াছেন কার্য-সমাপ্তিতে, নির্ধারিত পারিশ্রমিক না দিলে, পারিশ্রমিক ও অর্থদণ্ড দুই দিতে হইবে। নিয়োগকারী ও শ্রমিকের পারিশ্রমিক লইয়া মত-দ্বৈধ হইলে রাজা স্বয়ং সাক্ষী লইয়া ও আবশ্যক হইলে নিয়োগকারীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া পারিশ্রমিক স্থির করিয়া দিবেন।

প্রাচীন ভারতে পারিশ্রমিকের হার বেশ উচ্চ ছিল। শ্রমিকরা সাধারণ ভাবে জীবনযাপনের ব্যয়নির্বাহের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইত। শুক্রাচার্য বলিয়াছেন, শুধু যে পারিশ্রমিক অর্থ হইতে দৈনন্দিন আবশ্যকীয় জিনিষ কিনিবার মূল্য হইবে তাহা নহে, শ্রমিকরা ও তাহাদের পরিবারবর্গ যাহাতে বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করিতে পারে এরূপ পারিশ্রমিক দিতে হইবে। সমাজের পক্ষে অল্প পারিশ্রমিক বিপজ্জনক, কারণ শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট থাকিলে সমাজের বন্ধু হওয়া দূরের কথা, ক্রমশঃ শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। শুক্রাচার্য পারিশ্রমিকের অর্থ তিন ভাবে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন :

(ক) সাধারণ পারিশ্রমিক অর্থে বুঝা যাইবে যে অপরিহার্য অন্নবস্ত্রের সচ্ছলতা উপভোগ করিবার উপযোগী অর্থ।

(খ) উত্তম পারিশ্রমিক অর্থে—প্রচুর খাদ্য ও বস্ত্র পাওয়ার জন্য ব্যয় সঙ্কুলানের উপযোগী অর্থ।

(গ) অল্প পারিশ্রমিক অর্থে একটি লোকের জীবন-ধারণের উপযোগী অর্থ।

পারিশ্রমিক কখনও সময়, কখনও কার্যবিশেষ বিবেচনা করিয়া নির্ধারিত হইত। শুক্রাচার্যের উক্তি ছাড়াও আমরা 'জাতকে' দেখিতে পাই যে পারিশ্রমিকের হার বেশ উচ্চ ছিল।

গৃহস্থের ভৃত্যরাও সে সময়ে ভিক্ষা দান করিত (Jataka III, Pages 445—446). ইহা হইতে বেশ অনুমান করা যায় যে তাহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল, নতুবা ভিক্ষা দান কখনও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

(২) শ্রমিকদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা

সে সময়ে শ্রমিকদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধার বিষয় উল্লিখিত দেখা যায়। চল্লিশ বৎসর রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে পারিশ্রমিক পাইবে—শ্রমিক কাজ না করিয়া পরে তাহার অর্ধেক পাইবে

এবং শ্রমিক জীবিত না থাকিলে তাহার বিধবা স্ত্রী বা পুত্র বা কন্যা তাহা পাইবে। সন্তোষজনক কাজ করিলে নিয়োগকর্তা প্রত্যেক বৎসর মাহিনার এক অষ্টমাংশ পুরস্কার দিবেন।

অসুস্থ হইলে শ্রমিককে অসুস্থতার অজুহাতে বিতাড়িত করা চলিত না। শয্যাশায়ী থাকিলে সে পুরা বেতনে অবসর পাইত। পনেরো দিনের অধিক অসুস্থ হইলে যতদিন না সে আরোগ্য লাভ করে—ততদিন পারিশ্রমিকের চারি ভাগের তিন ভাগ সে পাইত। সপ্তাহকাল অসুস্থ থাকিলে পারিশ্রমিকের কোন অংশ কর্তিত হইত না। যদি শ্রমিক অসুস্থতানিবন্ধন স্থায়িভাবে অকর্মণ্য হইয়া পড়িত তাহা হইলে, যে শ্রমিক পাঁচ বৎসর কাজ করিয়াছে, তাহাকে তিন মাসের পারিশ্রমিক ও যে ততোধিক কাজ করিয়াছে তাহাকে ছয় মাসের পারিশ্রমিক দিবার নির্দেশ ছিল।

(৩) অবসর

প্রত্যেক শ্রমিককে তাহার নিজের গৃহকার্য পরিদর্শন করিবার জন্য অবসর দিবার রীতি ছিল। স্থায়ী ভৃত্যকে দিনের বেলা এক যাম সময় ও রাত্রে তিন যাম সময় বিশ্রামের জন্য দিতে হইত—অস্থায়ী (অর্থাৎ এক দিবসের জন্য নিযুক্ত) শ্রমিককে আধ যাম সময় বিশ্রামের জন্য দেওয়া নির্দেশ ছিল।

(৪) পরিবার-সংক্রান্ত আয়-ব্যয়

কৌটিল্য লিখিয়া গিয়াছেন, যেখানে অধিক শ্রমিক বা কারিগর নিযুক্ত থাকিত, সে সকল স্থানে শ্রমিকদের জন্য একজন গোপ নিযুক্ত থাকিবে। একজন গোপ দশ কুড়ি বা চল্লিশ পরিবারের খবরাখবর করিত। তাহাদের জাতি, নাম, পেশা ও আয়ব্যয় নির্ধারণ করিত।

(৫) সংরক্ষণ-তহবিল (Provident Fund)

শ্রমিকদের সংরক্ষণ-তহবিল থাকিত। শুক্রাচার্য নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যে নিয়োগকর্তা কর্মকাল শেষ হইলে ভৃত্যদের সম্পূর্ণ টাকা দিয়া দিবেন, বা বৎসরে এক চতুর্থাংশ বা এক ষষ্ঠাংশ বা অর্ধেক বা দুই তিন বৎসরে সংরক্ষণ-তহবিলে সঞ্চিত সম্পূর্ণ টাকা দিবেন। শুক্রাচার্য বলিয়াছেন যে, নিয়োগকর্তা নিজের নিকট ভৃত্যের বেতনের এক চতুর্থাংশ বা এক ষষ্ঠাংশ জমা রাখিয়া দিবেন এবং তাহা উপর্যুক্তভাবে প্রদান করিবেন।

এক কালে সংরক্ষণ-তহবিলের সব টাকা দিবার কোন উল্লেখ বেশী পাওয়া যায় না। বোধ হয় এককালে শ্রমিক সমস্ত টাকা পাইলে কোনরূপ বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া অসুবিধায় পড়িবে বলিয়াই ক্রমে ক্রমে টাকা দিবার প্রথাই কৌটিল্য সমর্থন করিয়াছেন।

সকল সময়ে যে নগদ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হইত এমত নহে। 'জাতকে' অনেক ভাবে পারিশ্রমিক দিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি লাল পোষাকের জন্য কোন বালিকাকে কোন পরিবারে তিন বৎসর কাজ করিতে হইত এবং এক পত্নীলাভ করিবার জন্য কোন যুবককে কোন পরিবারে সাত বৎসর কাজ করিতে হইত।

অশোকের শিলা-লিপি (Rock Inscription No. XIII) হইতে শ্রমিকদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার আভাস পাওয়া যায়। শ্রমিকদের সঙ্গে সহাস্যে সুমিষ্ট কথা কহিবার এবং কাপড় ভোজ্য পানীয় ও অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট রাখিবার আদেশ দেওয়া আছে।

'শ্রমিক' শব্দের ব্যাপক অর্থে সে সময় গৃহভৃত্যকেও বুঝাইত। হিউয়েন সাঙ লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি যে সময়ে ভারতবর্ষ পর্যটন করেন সে সময়ে শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক নিযুক্তি (forced labour) দেখেন নাই তবে সাধারণের মঙ্গলের জন্য কোন কার্য হইলে শ্রমিকরা নিযুক্ত হইতে বাধ্য হইত এবং তাহাদের কাজের অনুপাতে তাহাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হইত।

ধর্ম ও অর্থ শাস্ত্র হইতে বেশ প্রতীত হয় যে প্রাচীন ভারতের শ্রমিকরা আধুনিক শ্রমিকদের অপেক্ষা অনেক সুখ সুবিধা উপভোগ করিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে।

অন্নে অধিকার

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

"মাহং রাজন্ অন্যকৃতেন ভোজম্—"
— গৃৎসমদ শৌনক।

ভিক্ষার মত নাই কোন মহাপাপ,
ভিক্ষাই অভিশাপ।
শিশু অক্ষম পঙ্গু যদি না হও,
ব্যাধিতে আধিতে শায়িত যদি না রও,
মূল্য না দিয়া আপন পরিশ্রমে
কাহারো অন্নে অধিকার তব হয় নাক' কোনক্রমে।
শ্রমজলপাত না করিয়া যাহা লবে,
ভিক্ষা কিংবা হরণ বলিয়া তাহাই গণ্য হবে,
ঋণভার হয়ে রবে।

পিতার অন্ন, পতিরও অন্ন শ্রমজলপাত বিনা,
যে করে গ্রহণ তারে দেবগণ করেন সতত ঘৃণা।
বিনা শ্রমে যদি কর পরান্ন ভক্ষণ কোন দিন,
জানিও তাহারে ঋণ।
আছে দাসদাসী, ধন রাশি রাশি, শ্রমে নেই প্রয়োজন
পেয়েছ পিতার সঞ্চিত বহু ধন,
তবু কর খাটি মাটির অন্নে অধিকার অর্জন।
পতির সোহাগে অলস বিলাসে জীবন যাপো যে সতী,
সোহাগ তা নয়, মহাপাপে তোমা মগ্ন করিছে পতি।

হে বরুণদেব তোমার চরণে আমার আকিঞ্চন—
ভুঞ্জিতে যেন না হয় পরের অর্জিত কোন ধন,
হইতে না হয় পরের গলগ্রহ,—
এই প্রার্থনা করি আমি অহরহঃ।

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ ও ধর্মবিশ্বাস

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী

প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. বি. এস্. হ্যালডেনের একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে পড়েছিলাম যে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষের পক্ষে কোন লোকোত্তর পরমপুরুষে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ জড়বিজ্ঞানের দাপটে ঈশ্বরের অস্তিত্বও যেন বিপন্ন হয়ে উঠছে। তাই আজ মানুষের ধর্ম—ঈশ্বরকে ছেড়ে অন্যত্র সন্ধান করতে ইংলণ্ডের মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল পরামর্শ দিয়েছেন। কুসংস্কারমুক্ত মানবমনের ধর্ম—মানুষের সেবা।

যদিও একদল দার্শনিক সর্বদাই বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাবার চেষ্টা করেছেন, তবুও ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ ক্রমশঃ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। অত্যাধুনিক আণবিক মারণাস্ত্রের যুগে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্তির কাছাকাছি এসে পৌছেছে। এখনও অধিকাংশ অশিক্ষিত নরনারী ধর্মপ্রাণ হলেও, তথাকথিত সংস্কারমুক্ত বিদগ্ধ মানুষের দরবারে ভগবানের আলোচনাও অবৈজ্ঞানিক অযৌক্তিক বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে।

বিজ্ঞানের পদ্ধতি: পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ। মোহমুক্ত মন নিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক বিষয় ও ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করে জড়-প্রাণ- ও মনোজগতের প্রমাণসিদ্ধ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানলাভই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। অবশ্য ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থের বিশ্লেষণ অপ্রত্যক্ষ অণুপরমাণুর খবর দিতে পারে; কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভুললে চলবে না। পরমাণু, জীবকোষ ইত্যাদির প্রকল্প ইন্দ্রিয়গম্য জগতেরই ব্যাখ্যার তাগিদে রচিত হয়। ঐন্দ্রিয়িক অভিজ্ঞতা ও তদনুযায়ী অনুমান নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় বলা হয়েছে। এরূপ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে অস্বীকার করার উপায় নেই; কারণ বৈজ্ঞানিক যথার্থ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ মানবজাতির মঙ্গল বা অমঙ্গলের নির্ধারক।

যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষবাদী প্রায়োগিক (empirical) বিজ্ঞানের বিরোধী—তিনিও বিজ্ঞানের সুবিধাটুকু গ্রহণ করতে নারাজ নন। রোগে সুচিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে, দূরভাষণের সাহায্যে নিজের জরুরী কাজ সমাধা করে, দ্রুতগামী ব্যোমযান, জলযান ব্যবহার করে, এক কথায় বিজ্ঞানের হাজার রকম সুবিধা ভোগ করে, ঘরে বসে বিজ্ঞানের নিন্দা করা অপরাধ। নিদ্রায় জাগরণে, আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে, স্থিতিতে ভ্রমণে, জীবনে মরণে বিজ্ঞানের সাহায্য না নিলে আধুনিক জীবন একেবারেই অচল। অবশ্য বিজ্ঞানের অভিশাপও দিকে দিকে প্রকট হয়ে উঠছে। আণবিক বজ্রের প্রচণ্ডতম বিদারণে নাগাসাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল—প্রশান্তমহাসাগরে উদজান মারণাস্ত্রের পরীক্ষা এশিয়াবাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলছে। কিন্তু এই ভীতি ও সন্ত্রাস বিজ্ঞানের অপব্যবহারজনিত। এর জন্য বিজ্ঞানকে দোষারোপ করা চলে না। বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ বা পরমাণু-বিদারণ মানবের কল্যাণে নিয়োজিত না হয়ে তার ধ্বংস সাধন যদি করেই, তবে তার দায়িত্ব বৈজ্ঞানিকের নয় — রাজনীতিকদের। তাই বিজ্ঞানের অপব্যবহারে বিজ্ঞানবিমুখ হওয়া মূর্খতার নামান্তর।

কিন্তু বিজ্ঞানের এই যে অপব্যবহার, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণের এই যে পরস্পর ভীতি-প্রদর্শন ও অবিশ্বাস তা কী মানবের কল্যাণবুদ্ধির অবনতি প্রদর্শন করে না? ধীরভাবে বিচার করে দেখতে হবে—জড়বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে

তাল রেখে মানুষের শুভবুদ্ধিও অগ্রসর হতে পারছে কি না। বিগত মহাযুদ্ধে, নানা সম্ভব ও অসম্ভব পরিবেশে, মানুষের সহজাত কল্যাণকামনা প্রচণ্ড আঘাত খেয়েছে—পরাধীন দেশের অসহায় মানুষ শক্তিমানের স্বার্থযূপে বলি প্রদত্ত হয়ে পাশবিকতার নিম্নতম স্তরে নেমে এসেছে; আর অশক্তকে কলুষিত করে শক্তিমদমত্ত জাতিগুলিও কলুষ-কালিমায় বিকট হয়ে উঠল। দেবতার লীলাভূমিতে দানবের তাণ্ডব সন্ত্রাসের বীজ বপন করে গেল, পরস্পর অবিশ্বাস আর সন্দেহ মানুষের শান্তিকে করল বিঘ্নিত। তাই আজ দিকে দিকে আণবিক অসুরের আস্ফালন। মানুষের মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন না হলে বৈজ্ঞানিক শক্তির অপব্যবহার হবেই। তাই কিছুদিনের জন্য বিজ্ঞানসাধনা থেকে অবসর নিয়ে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আজ তার প্রয়োজনীয়তা যতখানি ততখানি এর আগে ছিল কি না সন্দেহ।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানের সক্রিয় সহযোগিতা করেছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. জে. এয়ার ও আমেরিকা-প্রবাসী অধ্যাপক কারনাপ্ যৌক্তিক দৃষ্টিবাদের (logical empiricism) ঋত্বিক্। এঁদের বিশ্লেষণমুখী দর্শন ক্যাম্ব্রিজের অধ্যাপক জর্জ এডওয়ার্ড মূর ও লুড উইগ্ উইট্‌গেনষ্টাইনের ভাষা-বিশ্লেষণ-পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত। বিজ্ঞান করে পদার্থ বিশ্লেষণ, আর দার্শনিকের কাজ হচ্ছে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে ভাষায় ব্যক্ত হয় তার ব্যবচ্ছেদ। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের মতে, দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয় ভাষার অপব্যবহারে; দর্শন একপ্রকার মানসিক বিকার মাত্র। ভাষার বিশ্লেষণ করে তার যোগ্য ব্যবহার নির্দেশ করাই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা। দর্শনের ইতিহাস প্রমাণ করে যে দর্শন চিরকালই প্রধানতঃ অন্তরিন্দ্রিয় মনের জগতে বিচরণ করেছে; ইন্দ্রিয়গম্য বহি-র্জগতের তথ্য বিশ্লেষণে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেনি। সেই জগতের জ্ঞান দিয়েছে 'শ্রমিক' বিজ্ঞানী। সে বহু যত্নে বহু বিপদের মুখে পড়ে জগৎসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে প্রামাণিক সত্যে উপনীত হতে চেয়েছে। কিন্তু দার্শনিকের ছিল অভিজাত 'নীলরক্ত'—তিনি বিচরণ করেছেন ভাবের জগতে, ঈশ্বর ও আত্মার সমভিব্যাহারে। কিন্তু এসব অতীন্দ্রিয় বস্তুসম্বন্ধে প্রামাণিক জ্ঞান লাভ করা মানুষের অসাধ্য—যতই উচ্চবর্গের 'পদার্থ' এরা হোক না কেন। প্রাকৃতিক জগৎসম্বন্ধেই মানুষের সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গম্য জ্ঞান হতে পারে। এরূপ জ্ঞানেরই সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব। সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এইরূপ প্রাকৃতিক জ্ঞান। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির লৌকিক জ্ঞান সুসংবদ্ধ হয়ে বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। ভাব-জগৎ সম্বন্ধে কোন বাক্য বা বিচার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পদ্ধতির দ্বারা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না। তাই যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের মতে ঐ সম্বন্ধীয় বাক্য অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টিমাত্র। যে বাক্যের ইন্দ্রিয়গম্য প্রমাণ নেই বা থাকতে পারে না, তা শুধু অর্থহীন প্রলাপ।

ঈশ্বর দ্বিচক্ষু না সহস্রাক্ষ—এ সমস্যার মীমাংসা করা আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য অভিজ্ঞতার পক্ষে সম্ভব নয় বলে—এ সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। অধ্যাপক এয়ার তাই শুদ্ধমাত্র সাধারণ লৌকিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেই অর্থবান্ বলে মনে করেন। ঈশ্বর আছেন, কী নেই—তার প্রমাণ বা অপ্রমাণ অন্ততঃ লৌকিকভাবে কিছু নেই। "ঈশ্বর" শব্দটি একটি বিশেষ্য পদ। ঘট, পট ইত্যাদি অন্যান্য বিশেষ্য পদের অনুরূপ বস্তু প্রাকৃত জগতে ইন্দ্রিয়-সংবেদনে পাই বলে আমরা মনে করি যে "ঈশ্বর" নামধারী কোন পরমপুরুষ কোথাও বর্তমান। কিন্তু আমাদের ব্যবহৃত ভাষার সব বিশেষ্যপদই যে বস্তু-জগতে দ্রব্যাদি নির্দেশ করে এমন কোন কথা নেই। উইটগেনষ্টাইন এই "নাম—বস্তু"-রূপ ভাষার

আলেখ্যকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। সর্বত্র এই আলেখ্য ঠিক নয়। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা দৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে তাকে 'বস্তু' বললেও অতীন্দ্রিয় বস্তুকে 'অবস্তু' বলে থাকেন।

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দুর্বল ভিত্তির উপর স্থাপিত বিজ্ঞানের প্রকাণ্ড সৌধের স্তাবক উল্লিখিত দার্শনিকগণ ভুলে যান যে ইন্দ্রিয়গম্য অভিজ্ঞতাই একমাত্র অভিজ্ঞতা নয়। শিল্পীর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে, মানুষের বাঙ্ময় নীতিবোধে, প্রেমিকের মরমী অন্তর্লোকে যে দিব্যানুভূতি স্পন্দিত হয় তার খবর দেহসর্বস্ব ঐন্দ্রিয়িক অভিজ্ঞতাবাদী রাখেন না। সৌন্দর্যতত্ত্বের মাপকাঠিতে কাব্যরসামৃত আস্বাদন ঈশ্বরাস্বাদের পর্যায়ে। অপরূপ সৌন্দর্যের ধ্যানে নিমগ্ন হলে এক অখণ্ড, অদ্বয়, চিদ্‌ঘন, অব্যক্ত আনন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হয়—অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও "ইহা আমার, উহা তোমার" এইরূপ ভেদধর্মী চৈতন্যের বিলোপ হয়। এরূপ অনুভূতি যখন আমারও নয়, তোমারও নয়, তখন এ অনুভূতি এক অনন্ত সত্তার। এ রসানুভূতি একটি জাগতিক ঘটনা, একে অস্বীকার করি কী প্রকারে? ইন্দ্রিয়গম্য, ব্যবচ্ছিন্ন অনুভূতি নয় বলেই কী একে ত্যাগ করতে হবে? ভারতীয় দার্শনিকগণ লৌকিক জ্ঞান ছাড়া আরও এক রকম প্রাতিভ জ্ঞান স্বীকার করেছেন। অবশ্য জড়বিজ্ঞানের বন্ধু যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা ঐরূপ দিব্যানুভূতির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। শুধু তাঁরা বলতে চান যে ঐ সব অনুভূতির আলোকে যে অতীন্দ্রিয় পদার্থের নির্দেশ হয় তার বাস্তবতা স্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। ঐ সব পদার্থ গগনকুসুমবৎ অলীক। একমাত্র বাহ্যপ্রত্যক্ষ ও আন্তরপ্রত্যক্ষের মাধ্যমে অনুভূত পদার্থই বাস্তব; আর তার প্রমাণ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। তাই যদি কোন বাক্যে অতীন্দ্রিয় বিষয় উল্লিখিত হয় তবে, হয় সেই বাক্যের কোন কোন পদ সম্পূর্ণ অর্থহীন চিহ্নমাত্র, অথবা বিশ্লেষণের দ্বারা ঐ বাক্যকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে হবে যে তার থেকে অতীন্দ্রিয় পদার্থবাচক পদগুলি লুপ্ত হয়ে বাক্যটিকে অর্থবান করে তুলবে। যথা—আমি যদি বলি যে, "অমুক অধ্যাপক সরস্বতীর বরমাল্য লাভ করেছেন", তা হলে আমার উক্তিকে অর্থবান্ করতে হলে এর রূপান্তর করতে হবে এই ভাবে: "অমুক অধ্যাপক প্রকৃত বিদ্যার অধিকারী হয়েছেন"। এই উক্তি প্রমাণসিদ্ধ, ইন্দ্রিয়গম্য ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। কিন্তু যদি উল্লিখিত বাক্য কোন লোকোত্তর দেবীর ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করে তবে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। অধ্যাপক এয়ার এরূপ বাক্যবিশ্লেষণের পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন লোকোত্তর, চিন্ময়, অখণ্ড পরব্রহ্মের অস্তিত্ববাচক বাক্যগুলি সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়—অর্থহীন প্রলাপমাত্র; কারণ লোকোত্তর বিষয়ে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণও নেই, অপ্রমাণও নেই।

যদি বল যে ইন্দ্রিয়গম্য প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা থেকেই তো জগৎকারণ ঈশ্বরের অনুমান হয়, তবে "ঈশ্বর আছেন"-বাক্য আর "প্রকৃতির একরূপতা আছে"-বাক্য সমতুল হবে; কিন্তু কোন ভক্তই এরূপ সমতুলতা স্বীকার করবেন কী? অর্থে যদি বাক্য দুটি সমতুল হয় তবে অধ্যাপক এয়ার "ঈশ্বর আছেন" বাক্যটি অর্থবান্ মনে করতে পারেন। তাছাড়া ধর্মান্ধ ব্যক্তিও বলেন "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর"। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রমাণ অপ্রমাণের বিষয় নন—বিশ্বাসের বিষয়। তা হলে পরীক্ষিত সত্যের মতো ঈশ্বরের অস্তিত্ববাচক বাক্য বৈজ্ঞানিক বাক্য হতে পারে না। অধ্যাপক এয়ার বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের কোন বিরোধ স্বীকার করেন না; কারণ অর্থহীন বাক্যের সঙ্গে অর্থবান্ প্রমাণিত সত্যের কোন বিরোধ সম্ভব নয়। "ঈশ্বর চিররহস্যাবৃত"—এই যদি বিশ্বাসীর মত হয় তবে তো ঈশ্বরের সার্থক বর্ণনাই অসম্ভব। তা হলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিও ঈশ্বরের অস্তিত্ববাচক বাক্যকে অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টিমাত্র মনে করতে বাধ্য।

কিন্তু যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দর্শনের অভিলষিত ভাষার এই ব্যবচ্ছেদ স্বীকার করা যায় কী? যখন বলি যে ঈশ্বর বিশ্বাসের বিষয়—তখন নিশ্চয়ই একথা বলি না যে ঈশ্বর সম্বন্ধে বাক্যগুলি তাৎপর্যহীন। শুধু একথাই বলা হয় যে তিনি কোন লৌকিক প্রমাণগম্য নন। অধ্যাপক এয়ার ভক্তের উক্তিগুলির অর্থ করেছেন নিজের সুবিধামতো। তাছাড়া ঈশ্বরের অপার "রহস্য" তাঁর ষড়ৈশ্বর্য ও অপার মাধুর্যের প্রকাশক। তাঁর রহস্যাবৃত হবার অর্থ এই নয় যে তাঁর কোন আভাস, ইঙ্গিতও আমরা পাই না। শুধু এটুকুই বলা হয় যে তাঁর ঐশ্বর্যের ও মাধুর্যের কণিকামাত্রই মানববুদ্ধির গোচর হয়—অধিকাংশই আবরিত থাকে। এ কথা না হয় মেনে নিলাম যে, কোন অনুভূতি অতীন্দ্রিয় বস্তুকে অবলম্বন করলে তার যৌক্তিকতা মানা কঠিন। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, ইন্দ্রিয়গম্য অনুভূতিই কী তৎ-নির্দিষ্ট পদার্থের বাস্তবতা প্রমাণ করেছে? অদ্বৈত বেদান্তবাদী দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের অলীকতা প্রমাণে যুক্তি দেন "জগন্মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ—ঘটবৎ"। অর্থাৎ দৃশ্যত্ব ও মিথ্যাত্বের মধ্যে অনিবার্য ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ বর্তমান, যা কিছু দৃশ্য—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়—তাই অনিত্য বা মিথ্যা।

যদিও সাধারণ জীবনে যা দেখি, শুনি বা স্পর্শ করি তার বাস্তবতা অস্বীকার করা খুবই কঠিন, তবু ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষের বিষয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ নিশ্চয়ই বাস্তব নয়। এই ভ্রমপ্রত্যক্ষের যুক্তি আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতের বাস্তবতায় সন্দিহান করে তুলতে পারে। শঙ্কর ও তাঁর পরবর্তী আচার্যগণ প্রাকৃত জগতের অলীকতা স্থাপনে বহু যুক্তি প্রদর্শন করেছেন—তাদের বিশদ আলোচনা এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়।

বর্ণ-বোধরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি যে বর্ণকে নির্দেশ করে তার বাস্তবতার যুক্তি কী? যদি দিব্যানুভূতি নির্দিষ্ট অতীন্দ্রিয় পদার্থ খ-পুষ্পের মতোই অলীক, তবে রূপরসগন্ধের বাস্তবতাই বা বাদ যায় কেন? বর্ণ-বোধ বা শব্দ-বোধ একপ্রকার চেতনা—সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব, ব্যক্তিগত ব্যাপার। ঐ বোধের কারণরূপে বহির্বস্তু স্বীকারে কোন যুক্তি নেই; বহুকারণবাদ অনুসারে আমিই তো আমার শব্দস্পর্শ-বোধের কারণ হতে পারি। শুধুমাত্র মানসিক, একান্ত নিজস্ব, ইন্দ্রিয়ানুভূতিটুকু স্বীকার করলে যোগাচারী বিজ্ঞানবাদে পর্যবসান অবশ্যম্ভাবী। তা হলে প্রাকৃত বিজ্ঞানের বিজয়-কেতন ধূলিলুণ্ঠিত হবে। বিজ্ঞান কী বাস্তব জগতের সর্ববাদিসম্মত জ্ঞান দেয়? তা হলে বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী যুগে যুগে পরিবর্তিত হয় কেন? কোন এক বিশেষ দৃষ্টি-কোণ থেকে সত্যদর্শন করলে আমাদের জ্ঞান খণ্ডিত হতে বাধ্য; আর বিজ্ঞান এই খণ্ডিত জ্ঞানেরই সম্ভার।

প্রাকৃত জগতের অলীকত্ব প্রতিপাদনে শঙ্কর-মতাবলম্বিগণ যে শক্তিশালী যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন তা অবহেলা করা অযৌক্তিক। বিজ্ঞানের জ্ঞানই একমাত্র চরমজ্ঞান—একথার প্রমাণ অবশ্যই প্রয়োজন। বিজ্ঞানই সার্থক, আর মুষ্টিমেয় দিব্যানুভূতিসম্পন্ন মানুষের জ্ঞান নিরর্থক—এ কথার প্রমাণস্বরূপ যৌক্তিক দৃষ্টিবাদিগণ বলেন যে, সর্ব-সাধারণে বিজ্ঞানকেই অর্থবান্ মনে করে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কী ধর্মবোধ বা নীতিবোধকে অর্থহীন প্রলাপ মনে করে? তাদের কাছে এরা অর্থহীন তো নয়ই, বরং বহুক্ষেত্রেই সত্য বলে প্রতিভাত। আর যদি কতিপয় বিদগ্ধ মানুষের কথা ভাবি, তা হলেও দেখা যায় যে প্লেতো, আরিস্ততল্, হেগেল, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি সাধকও পণ্ডিতমণ্ডলী অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সত্যজ্ঞান দেবার ক্ষমতা স্বীকার করে গেছেন। এঁদের অবশ্য দৃষ্টিবাদীরা অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে সাহসী হবেন না।

ইন্দ্রিয়গম্য অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃত

বিজ্ঞানের এমন বহু সত্য আছে যার প্রামাণ্য সাধারণ ইন্দ্রিয়শক্তিতে স্থাপন করা যায় না। এক-বিন্দু অপরিষ্কার জলে যে লক্ষ লক্ষ বীজাণু বর্তমান, তা তো চর্মচক্ষে দেখি না। বিজ্ঞানী বলবেন যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাপকতর করলেই তাঁর কথা প্রমাণিত হবে। সেইরূপ দিব্যানুভূতির প্রামাণ্য স্থাপন কী একান্তই অসম্ভব? ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে কী আমরা কোন অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অনুরূপ কিছুর কথা ভাবতে পারি না? দিব্যানুভূতি প্রাকৃত অনুভূতির মতো অনায়াস-লভ্য না হতে পারে। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণ বলেন যে মোক্ষশাস্ত্র-প্রদর্শিত সুকঠিন সাধনমার্গে অগ্রসর হলে শুদ্ধমনে যে কোন মানুষেরই দিব্যদর্শন হতে পারে। আমরা যদি সেই নিষ্ঠা, যত্ন ও শ্রম করতে পরাঙ্মুখ হই তবে তা মুষ্টিমেয় মহামানবের মধ্যেই সীমায়িত থাকবে। কিন্তু ধর্মজীবনের সেই স্বর্ণমণ্ডিত অন্তর্বীক্ষণ যন্ত্র তো পড়েই আছে; তুলে নিয়ে ব্যবহার করলেই মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়—অখণ্ড, চিন্ময়, দিব্যানুভূতিতে মানবের হৃদয় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। সদ্গুরুর প্রদর্শিত পথে অচল নিষ্ঠায় থাকতে পারলে অতীন্দ্রিয় জগতে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন নয়—আর তাতে 'অমৃতের পুত্র' সকল মানবেরই অধিকার। এমন সদ্গুরুও আছেন যিনি মানুষকে দিব্যদৃষ্টি দান করে তার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে সমর্থ।

"আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?"—উৎসুক অথচ অবিশ্বাসী নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। "দেখেছি কী রে, তাঁর সঙ্গে থাকি, ঘর করি" —এলো অভ্রান্ত অবিশ্বাস্য উত্তর। "আমাকে দেখাতে পারেন?" "নিশ্চয়ই, দেখবি?" ঠাকুর নরেন্দ্রের সন্দেহ দূর করলেন—চিন্ময় মহাসমুদ্রের উত্তরোল কল্লোল তাঁকে শ্রবণ করালেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো সদ্গুরুর দর্শনলাভ দুর্লভ। তাহলেও মানুষের দিব্যানুভূতিলব্ধ পদার্থের প্রামাণ্য যাচাই করবার উপায় আছে। আর যদি জ্যোতির্ময় দিব্যানুভূতিকে বলি কুসংস্কার—তবে ইন্দ্রিয়গম্য অনুভূতিকেই বা কুসংস্কার বলতে আপত্তি কী? শাস্ত্র বা সদ্গুরু-প্রদর্শিত পথে সাধন না করেই যদি বলি যে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের কোন প্রমাণ নেই, তাহলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার না করেই 'জলবিন্দুতে বীজাণু নেই' বলার মতো অযৌক্তিক কথা হবে না কী? ভক্তের কোন প্রশ্ন নেই—যার সমাধান করতে হবে। সে চায় প্রাণের অনুভূতি। ধর্ম মানব জীবনেরই একটি অবস্থা।

তাই মনে হয় যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ অযৌক্তিক। দর্শনের কাজ শুধু প্রাকৃত বিজ্ঞানের দাস হয়ে থাকা নয়। পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয় বলেই কী ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা? মহাপুরুষগণ তো সর্বদাই সর্বত্র ঈশ্বরের স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করে গেছেন। তাঁরা কী প্রত্যেকেই ভণ্ড বা প্রতারক? নব্য দৃষ্টিবাদী দার্শনিকগণ বুদ্ধিচালনা করেছেন অনেক, ভাষা ও বাক্যের ব্যবচ্ছেদ করে তার কঙ্কাল বের করেছেন; কিন্তু দর্শনের প্রধান কাজ সৎ-বস্তুর সন্ধান থেকে বিরত থেকেছেন। ভাষাকেই সৎ বা সত্য বস্তু ধরে তার বিশ্লেষণ মূর্খতার নামান্তর মাত্র।

সম্প্রতি এই দার্শনিক মতবাদ ইউরোপে খণ্ডিত ও অনাদৃত হতে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু জড় বিজ্ঞানের এই অন্ধ-স্তুতিবাদী দর্শনের মধ্যে মানবের মূল্যবোধের প্রতি যে প্রচণ্ড উদাসীনতা বর্তমান তা মানুষকে ভুলপথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে, এখনও। মানুষের কল্যাণবোধ ও শুভবুদ্ধি অস্বীকৃত বলেই আজ পৃথিবীর এত সন্তাপ।

এই যন্ত্রদানবের যুগে মানুষের আত্মিক শক্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আত্মিক শক্তির প্রেরণা কী একান্তই অর্থহীন? জড়বিজ্ঞানই কী একমাত্র প্রামাণ্য?

যুগে যুগে মানুষ দেখেছে দানবের পরাজয়—

আর অসহায় মানবের কল্যাণকামনায় ভগবানের নররূপধারণ। যখন অধর্মের অভ্যুত্থান তখনই পড়ে মহামানবের পদধূলি—কখনও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধরথে, কখনও বোধিদ্রুমতলে, কখনও ক্রুশে বলিপ্রদত্ত হয়ে, শত অবহেলা ও লাঞ্ছনা সহ্য করে তাঁরা তমসাচ্ছন্ন মানবের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করে যান। আজ পরস্পর হিংসা ও অবিশ্বাসের ঘোর অন্ধকারে সেই রুদ্রের "অযুত আলোকে ঝলসিত" মূর্তির অপেক্ষায় রয়েছে সাধারণ মানুষ। যখনই মানুষের বিপদ গাঢ়তম হয়েছে তখনই ইতিহাস সবিস্ময়ে দেখেছে নরের মধ্যে নারায়ণের লীলা।

আজ দেখি শান্তিপ্রিয় সন্তানবৎসল ঈশ্বর দম্পতি চলেছেন উদজান বোমার পরীক্ষা বন্ধ করতে; মনুষ্যত্বের জন্য, কল্যাণের জন্য এই আত্মত্যাগের ভাব যে কতো মহান্ ও আত্মিক শক্তিতে সমুদ্ভাসিত তা কী যুক্তি দিয়ে বলে বোঝাবার? নররূপী নারায়ণের অপার লীলা দেখা আমাদের অনেক বাকী আছে। তাই আজ জড়ের শক্তিতে শক্তিমান্ জাতিদের সতর্ক হতে হবে। মানবের কল্যাণবোধ ও আত্মশক্তি তুচ্ছ করার মতো নয়। জড়বিজ্ঞানের জয়গাথাই মানুষের ইতিহাসের শেষ কথা নয়।

পরিচয়

শ্রীশান্তশীল দাশ

রেখে যাব এইটুকু মোর পরিচয়:
সুন্দরের দানে আমি করিনি সংশয়।

সে-দান এসেছে কভু অন্ধকার রাতে,
জ্বালাময় বেদনার বহ্নিকণা সাথে;
কখন এসেছে স্নিগ্ধ প্রভাতবেলায়,
সাজায়েছে এ ধরণী আলোর মালায়।

কখন উঠেছে ঝড়, বিক্ষুব্ধ চঞ্চল
করেছে হৃদয় মোর, নয়নের জল
ঝরেছে; কখন পথ বাধাবন্ধহীন
চলেছি নিশ্চিন্তচিত্তে। হয়নিকো ক্ষীণ
আমার অন্তর মাঝে সে প্রদীপ জ্বলে,
সে-দীপ ধরেছি নিত্য ও চরণতলে।

যা পেয়েছি সবই আমি করেছি গ্রহণ,
সংশয়ের কালো মেঘে ঢাকিনি ভুবন।

তুমি সাথী

—মোহম্মদ দাউদ

যত কিছু আশা ও আকাঙ্ক্ষা মোর
সকলই তোমারে ঘিরি।
ব্যথাতুর মন ল'য়ে বসে আছি
যুগ যুগ ধরে করি তব আরাধনা।
আমি জানি তুমি আছ, আছে তব সৃজিত ধরণী—
রবি-শশী, ফুল-ফল, লতা-পাতা মাটি
তাই আছে আজো। দিন যায় রাত আসে, বায়ু বয়
ভুলিয়াও কেহ কভু স্তব্ধ নাহি রয়।
ঋতু যায়, ঋতু আসে বর্ষ বর্ষ ধরে,
নদী নাহি ভোলে কভু পড়িতে সাগরে
অবহেলি আদেশ তোমার।
মানবের সুখ দুঃখ
ঘুরে ফিরে আসে চলে যায়। তোমারি বিভূতি
নীরন্ধ্র আঁধারে জ্বলে, বলে তব দ্যুতি।
লক্ষ্য স্থির রাখি এক—চলি ঠিক পথে,
থাকিবে না দুঃখ ভয় যদি থাক' সাথে
দেখাইতে পথ। পূরিবে আকাঙ্ক্ষা আশা
মিটে যাবে চিরতরে অতৃপ্ত পিপাসা।

সাধু শ্রীজ্ঞান-সম্বন্ধর্

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দক্ষিণ ভারতে বহু মহাপুরুষ, সাধু ও ভক্ত জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁদের পবিত্র জীবন ও দিব্য বাণী আজও হাজার হাজার আধ্যাত্মিক জ্ঞান-পিপাসুর জীবনপথে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। বহু লোক প্রত্যহ শ্রদ্ধাসহকারে এঁদের পবিত্র নাম স্মরণ করে, মন্দিরে মন্দিরে এঁদের অনেকের আবির্ভাব-উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় এবং এঁদের অলৌকিক জীবনকাহিনী বিভিন্ন ভাষায় সর্বত্র গীত হয়। সত্যই এদেশবাসীর মনের ওপর এঁদের প্রভাব অতুলনীয়।

এইসব সাধু ও ভক্তদের মধ্যে সাধারণতঃ দুইটি শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণী বিষ্ণুর ভক্ত—এঁদের বলা হয় 'আলোয়ার', সংখ্যা বারো। অপর শ্রেণী শিবভক্ত—এঁদের বলা হয় নয়নার, সংখ্যা তেষট্টি। তামিল ভাষায় এঁরা 'আরুবত্তমূন-ওযার' নামে খ্যাত। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত প্রধান বিষ্ণু-মন্দিরে দ্বাদশ জন আলোয়ারের মূল ও উৎসব-বিগ্রহ এবং সমস্ত প্রধান শিবমন্দিরে তেষট্টি জন নয়নারের মূল ও উৎসব-বিগ্রহ দৃষ্ট হয়। এমনকি কর্ণাটক প্রদেশের নঞ্জনগড প্রভৃতি স্থানেও শিব-মন্দিরে এঁদের বিগ্রহ আছে। পেরিয়া পুরাণে এই সব মহাপুরুষদের জীবনী বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। তামিল ভাষায় 'পেরিয়া পুরা'ণ' একখানি সর্বজনসমাদৃত মহাকাব্য। এছাড়া শিব-ভক্তবিলাস, অগস্ত্য-ভক্তবিলাস প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য ভাষায়ও এঁদের জীবনী ও বাণীর বিবরণ পাওয়া যায়।

এই তেষট্টি জন নয়নারের সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি; কেহই কল্পিত নহেন। এঁদের মধ্যে চারজন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন; 'সময় আচার্য' নামে এঁরা অভিহিত। এঁদের নাম আপ্পার্, সুন্দরর্, জ্ঞানসম্বন্ধর্ ও মাণিকভাসগর। তামিলে সম্মানিত ব্যক্তির শেষে সাধারণতঃ 'র্' যোগ করা হয়। এই চারজন মহান্ আচার্য শৈব-ধর্মের চারটি পন্থা, যথা—কার্য, ক্রিয়া, যোগ ও জ্ঞানের এক একটির প্রতিনিধিত্ব করেন। এই চারটি পন্থা আবার দাসমার্গ, সৎপুত্রমার্গ, সহমার্গ ও সন্মার্গ নামে পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞান-সম্বন্ধর্ ক্রিয়া বা সৎপুত্র-মার্গের আচার্য বলে পরিচিত। আপ্পার্ কার্য বা দাসমার্গের, সুন্দরর্ যোগ বা সহমার্গের এবং মাণিকভাসগর্ জ্ঞান বা সন্মার্গের আচার্য। ইতিহাস অনুযায়ী প্রথমে আপ্পার্ এবং তৎপরে জ্ঞানসম্বন্ধর্, সুন্দরর্ ও মাণিকভাসগর জন্মগ্রহণ করেন এবং সব শিব-মন্দিরেই ঐ ক্রমে ওঁদের মূর্তি স্থাপিত আছে। কেহ কেহ অবশ্য বলেন মাণিকভাসগরই সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন।

ঈশ্বরোদ্দেশ্যে এঁরা তামিল ভাষায় যে সব স্তবস্তুতি রচনা করেন—ভাবের গাম্ভীর্যে, ভাষার মাধুর্যে, ছন্দের সৌকর্যে সেগুলি অতুলনীয়। এঁদের রচনাবলী তামিল ভাষাকে অতীব সমৃদ্ধ করেছে। শিবের প্রতি তাঁদের ঐকান্তিকী ভক্তি, অপার শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভালবাসার কাহিনী ঐ সব রচনার মাধ্যমে সুপরিস্ফুট। প্রথম তিন জনের রচনাবলী 'তেবারম্' নামে এবং মাণিকভাসগরের রচনাবলী 'তিরুবাচগম্' নামে খ্যাত। অতীব শ্রদ্ধা সহকারে এখনও প্রত্যহ দাক্ষিণাত্যের বহু শিবমন্দিরে 'তেবারম্' গীত হয়ে থাকে। ৺রামেশ্বরের মন্দিরে ভোরে ভগবানকে জাগাবার সময় এবং রাত্রে শয়ন দেবার সময় প্রত্যহ 'তেবারমের' অংশবিশেষ গীত হ'তে শুনেছি।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আচার্যশ্রেষ্ঠ শ্রীজ্ঞান-সম্বন্ধরের পূতজীবনকাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা

করব। এঁর পুরা নাম "তিরুজ্ঞান সম্বন্ধমূর্তি স্বামী"। দাক্ষিণাত্যে সব ব্রাহ্মণদেরই এবং মহাপুরুষদেরও 'স্বামী' বলা হয়। 'তিরু' অর্থে 'শ্রী', অথবা 'দৈব' বা 'পবিত্র'। শিশুকালেই ইনি দৈবজ্ঞান লাভ করেন বা দৈবজ্ঞানের সংস্পর্শে আসেন সেজন্য এঁকে 'তিরুজ্ঞানসম্বন্ধর্' বলা হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁর বিখ্যাত রচনা 'সৌন্দর্যলহরী'র ৭৬তম শ্লোকে জগজ্জননী পার্বতীদেবীর স্তনপানে দ্রাবিড় শিশুর জ্ঞানলাভের কথা উল্লেখ করে জ্ঞানসম্বন্ধর্‌কেই স্মরণ করেছিলেন। শ্রীশঙ্কর তাঁর অমর লেখনীতে লিখেছেন :

তব স্তন্যং মন্যে ধরণিধরকন্যে হৃদয়তঃ,
পয়ঃপারাবারঃ পরিবহতি সারস্বত ইব।
দয়াবত্যা দত্তং দ্রবিড়শিশুরাস্বাদ্য তব যৎ
কবীনাং প্রৌঢ়ানামজনি কমনীয়ঃ কবয়িতা ॥

'হে গিরিসুতে। তোমার বক্ষ হইতে সারস্বত পয়ঃপ্রবাহের ন্যায় অর্থাৎ কৈলাসশিখরস্থিত সারস্বত নামক অগাধ অমৃতসিন্ধুর ন্যায় স্তন্য প্রবাহিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। কারণ দ্রাবিড়দেশীয় শিশুকে কৃপা করিয়া তুমি স্তন্য পান করাইয়াছিলে, সেই স্তন্যপান-প্রভাবেই বালক তৎক্ষণাৎ প্রৌঢ় কবিদিগের মধ্যে উত্তম কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিল।'

মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর (Tanjore) জিলায় শিয়ালি নামে এক ছোট পুরাতন সহর আছে। মাদ্রাজ হইতে উহার দূরত্ব প্রায় ১৬২ মাইল এবং উহা বিখ্যাত রেলওয়ে জংশন মায়াভরমের সন্নিকটে অবস্থিত। আমাদের পুরাণে কথিত আছে প্রত্যেক প্রলয়ের শেষে ধরাধাম জলে পরিপূর্ণ হয়। এমনই এক প্রলয়ের পর যখন সর্বত্র জল, তখন একমাত্র এই শিয়ালি শহরস্থিত শিব-মন্দিরটি তিন মাস্তুলযুক্ত ছোট জাহাজের (Barque) ন্যায় ভাসতে থাকে। সেজন্য এই সহর 'বার্ক টাউন' নামেও খ্যাত। এই সহরে শিবপাদহৃদয়ার্ নামে এক অতি ধার্মিক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। চার বেদে তাঁর ছিল অসাধারণ জ্ঞান। মন্দিরে শিবের আরাধনা ও সেবাপূজাতেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত। যৌবনে তিনি ভগবতী নাম্নী এক ভক্তিমতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। সে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কথা। তখনকার দিনে তামিলনাদে জৈন ও বৌদ্ধদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। চোলা এবং পাণ্ড্য রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ জৈন ধর্মে দীক্ষিত হন। মন্ত্র ও যাদুবিদ্যার প্রভাবে জৈন এবং বৌদ্ধরা বিশেষ করে জৈনরা—হাজার হাজার হিন্দুকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করে। অসংখ্য জৈনমন্দির নির্মিত হয় এবং হিন্দুরা ক্রমশঃ তাদের সনাতন দেবদেবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'তে থাকে। বলা বাহুল্য হিন্দুধর্মের অঙ্গ শৈবরাও শিব-আরাধনা পরিত্যাগ ক'রে জৈন তীর্থঙ্করের পূজা শুরু করেন। ভক্তপ্রবীর শিবপাদহৃদয়ার্ এতে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি চাইতেন তাঁর প্রাণের আরাধ্য দেবতা প্রিয়তম দেবাদিদেব মহাদেবকেই সকলে ভজনা করুক। নিরুপায় হয়ে তিনি শুরু করেন কঠোর সাধনা এবং প্রার্থনা করেন, 'হে ভগবান, তোমার কৃপায় আমার এমন একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করুক—যে এই সব জৈন ও বৌদ্ধদের তাড়িয়ে দিয়ে তোমার অমৃতময় উপদেশ জনসমাজে প্রচার করতে পারবে। ভক্তের ভক্তির আতিশয্যে দেবতার আসন টলে ওঠে এবং দর্শনদানে ভক্তকে কৃতার্থ ক'রে শিব বলেন, 'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে'। যথাসময়ে ভগবতী দেবী সর্বসুলক্ষণযুক্ত এক সুকুমার পুত্র প্রসব করেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে জ্ঞানসম্বন্ধর্ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষীরা নবজাতকের জন্মনক্ষত্রাদি পরীক্ষান্তে বলেন যে জাতকের আয়ু মাত্র আট বছর, তবে যদি সে ধর্মপ্রচার করে তবে আরও আট বছর আয়ু পাবে। সুতরাং মাত্র ষোল বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জীবিত কাল। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই দাক্ষিণাত্যের

তথা ভারতের শৈবজগতে যে আলোড়ন তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অতুলনীয়। এই দেবশিশু দু-বছর বয়স হতেই পরিষ্কার কথা বলতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি অতি সুন্দর ও ভক্তিভাবাত্মক কবিতা রচনা করেন এবং উহাই প্রথম 'তেবারম্'। উহাকেই তামিল ভাষায় শৈবশাস্ত্রের প্রারম্ভ বলা হয়ে থাকে। এক আশ্চর্য পরিস্থিতির মধ্যে তিনি শ্লোকটি রচনা করেন।

একদিন শিবপাদহৃদয়ার্ যখন শিয়ালির শিব-মন্দিরচত্বরের অভ্যন্তরস্থ পুকুরে স্নান করতে যাবেন, শিশু জ্ঞানসম্বন্ধ্ ধরে বসলেন তিনিও পিতার সঙ্গে যেতে চান। তাকে নিবৃত্ত করার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে সঙ্গে নিতে হ'ল। পুকুরের ঘাটে পুত্রকে বসিয়ে পিতা জলে নামলেন। পিতা জলে ডুব দিলে বালক ভীত হযে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ মন্দিরের চূড়ায় বালকের দৃষ্টি পড়ায় তার মনে কি ভাব এল এবং 'ও মা, ও বাবা' বলে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে শিশু আরও কাঁদতে আরম্ভ করল। পিতা স্নানে এবং সন্ধ্যা-আহ্নিকে ব্যস্ত। বালকের ক্রন্দনে শিব ও পার্বতী কৃপাবিষ্ট হয়ে ষাঁড়ে চড়ে বালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র বালকের হৃদয় আনন্দে ভরে গেল এবং তার দু-চোখ দিযে প্রেমাশ্রু পড়তে লাগল। বালককে ক্ষুধার্ত মনে ক'রে পার্বতীকে শিব বললেন, 'আহা, ছেলেটি বোধ হয় খিদেয় কাঁদছে, ওকে দুধ খাওয়াও।' পার্বতী এক সোনার বাটিতে নিজের বক্ষ থেকে দুধ বার ক'রে শিশুকে পান করানো মাত্র শিশুর হৃদয় পূর্ণ হযে গেল এক দিব্যভাবে—তার জ্ঞানের কপাট যেন খুলে গেল। স্নানান্তে পিতা এসে বালকের ঠোঁটে দুধের চিহ্ন দেখে রুষ্ট হ'য়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে তোকে দুধ খাইয়েছে বল্?' বালক তৎক্ষণাৎ মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিখ্যাত ছন্দে বলে উঠল, 'ঐ দেউলের দেবতা—যিনি চোরের মত এসে আমার সমস্ত হৃদয় চুরি করে নিয়ে গেলেন, বিষধর সর্প যাঁর কর্ণের ভূষণ, বৃষ যাঁর বাহন, মস্তকে যাঁর শোভা পাচ্ছে স্নিগ্ধ শশাঙ্ক, শ্মশানের ভস্মে যাঁর সর্ব শরীর লিপ্ত সেই ভগবানের আদেশে স্বয়ং ভগবতী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন।' মুগ্ধ বিস্ময়ে পিতা ভাবতে লাগলেন, 'এই ক্ষুদ্র শিশু কিরূপে এই সুন্দর ছন্দোবদ্ধ দেবতার মাহাত্ম্যবিষয়ক শ্লোক রচনা করল!' ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে আনন্দে তিনি এই বলে নৃত্য করতে লাগলেন, 'যাক ভগবান আমার কাতর প্রার্থনা শুনেছেন। আজ থেকে আমাদের ধর্ম নিরাপদ। জৈন ও বৌদ্ধরা আর আমাদের ধর্মের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।' বালক বয়সেই পুত্র দৈবজ্ঞানের সম্পর্কে এলেন বলে পিতা তার নাম রাখলেন, 'তিরুজ্ঞান-সম্বন্ধর্'। কিছুকাল পরে তিরুভলেক্কের মন্দিরে জ্ঞানসম্বন্ধর্ যখন হাতে তাল দিতে দিতে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করছিলেন, হঠাৎ ওপর থেকে এক জোড়া সোনার করতাল তাঁর সামনে পড়ল এবং তদবধি তিনি সেই করতাল-বাদ্যসহকারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে তীর্থ হ'তে তীর্থান্তরে গমন করেন। বিখ্যাত ভক্ত ও অসাধারণ পণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি অচিরেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক ভক্ত জ্ঞান-সম্বন্ধের ভক্তি ও রচনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে সমবেত হলেন। কথিত আছে জ্ঞানসম্বন্ধ চারবার তীর্থভ্রমণ করেন এবং মোট ২৭৫টি বিখ্যাত শিব-মন্দির দর্শন করেন। যখনই তিনি কোনও মন্দিরে গেছেন, তখনই সেই মন্দিরস্থ দেবতার উদ্দেশে সুন্দর স্তব রচনা করে তাঁর মহিমা কীর্তন করেছেন। ঐ স্তবগুলিই 'তেবারম্' নামে সুপ্রসিদ্ধ এবং তামিল ভাষায় উহা এক অমূল্য সম্পদ।

জ্ঞানসম্বন্ধের চরিত্রের এক প্রধান গুণ যে তিনি সঙ্গীদের খুব ভাল বাসতেন। তখনকার দিনের

অনেক বিশিষ্ট ভক্ত ও সাধক তাঁর অনুগামী হন। তন্মধ্যে 'তিরুনীলকান্ত পেরুমপানার' অন্যতম। তিনি একজন অতি সুপ্রসিদ্ধ বীণাবাদক ছিলেন। জ্ঞানসম্বন্ধের সম্মতিক্রমে তিনি তীর্থপর্যটনকালে তাঁর অনুগমন করেন এবং যখনই জ্ঞানসম্বন্ধ কোনও স্তেবারম্ রচনা করতেন, পানার তখনই তাঁর বিখ্যাত বীণা বাজিয়ে উহা গাইতেন। জ্ঞানসম্বন্ধের ভক্তিরসাত্মক ও গভীর ভাবোদ্দীপক অপূর্ব গীতিকাব্য রচনার কৌশল দেখে পানারের হৃদয় তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। পানারের আত্মীয় স্বজন কিন্তু বলতে লাগলেন যে বীণাসহযোগে পানার এত সুন্দরভাবে জ্ঞানসম্বন্ধের রচনা গেয়েছেন বলেই সেগুলির এত সমাদর। আত্মীয়স্বজনের নীচতা দেখে পানারের হৃদয় দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং জ্ঞানসম্বন্ধের নিকট তিনি প্রার্থনা করেন, তিনি এমন একটি শ্লোক রচনা করুন যা বীণা সহযোগে গাওয়া যায় না। ভক্তের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য জ্ঞানসম্বন্ধ তাই করলে পর পানার একটু শান্ত হন। কিন্তু যে বীণা তাঁর ঐরূপ মনঃকষ্টের কারণ তা তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হলেন। জ্ঞানসম্বন্ধ বীণাটি নিয়ে উহার সাহায্যে এমন একটি কঠিন স্তব গান করেন যা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। পরে আশীর্বাদান্তে তিনি বীণাটি পানারকে প্রত্যর্পণ করেন। কথিত আছে, ভক্তের ভক্তির আতিশয্যে দেবতা জাগ্রত হন। জ্ঞানসম্বন্ধের জীবনী আলোচনা করলেও দেখা যায় যে প্রত্যেকটি মন্দিরে তিনি হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি নিংড়ে যেন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করছেন এবং তাঁর বাঙ্ময়ী পূজাতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান যেন সেখানে জাগ্রত হয়ে উঠছেন। উপস্থিত অসংখ্য ভক্ত নরনারী সে সব মন্দিরে ভগবানের আবির্ভাব সাক্ষাৎ অনুভব করতেন।

পূর্বেই বলেছি জ্ঞানসম্বন্ধ চারবার তীর্থ পর্যটনে গিয়েছিলেন। প্রথমবার তাঁর পিতা কাঁধে করে শিয়ালির আশেপাশের মন্দিরে তাঁকে নিয়ে যান; দ্বিতীয়বার পবিত্র কাবেরী নদীর উত্তর তীরের মন্দিরসমূহ দর্শন করেন; তৃতীয়বার পাণ্ড্য রাজাদের এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরসমূহ দর্শন, চতুর্থবার তোণ্ডায় নাড়ুতে (নাড়ু অর্থে এলাকা) অর্থাৎ কাঞ্চীপুরম্ ও তৎসন্নিকটবর্তী তীর্থস্থানগুলি দর্শন করেন। শেষের তীর্থযাত্রা দুটি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

প্রথম যাত্রার শেষভাগে পিতার কাঁধে চড়ে যখন তিনি যাচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর মনে হল, যে পিতাকে কষ্ট দিয়ে এরূপভাবে যাওয়া উচিত নয়। যে চিন্তা সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন পিতার কাঁধ থেকে। কিন্তু বালকের অনভ্যস্ত কোমল পদদ্বয় শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন তিনি তিরুমারাণপাডির বিখ্যাত শিবমন্দিরের কাছাকাছি এসেছেন। ভক্তের কষ্ট ভগবানের হৃদয়কে আঘাত করল। সেই রাতেই গ্রামবাসী ও পুরোহিতদের ওপর আদেশ হ'ল, "মন্দিরে আমার যে মুক্তার পালকি ও ছাতি আছে উহা সত্বর জ্ঞানসম্বন্ধকে দাও।" আদেশ পাওয়া মাত্র সকলে পালকি ও ছাতি অশেষ শ্রদ্ধাসহকারে জ্ঞানসম্বন্ধের সম্মুখে রেখে ভগবানের আদেশ তাঁকে নিবেদন করল। তদবধি সেই পালকিতে চড়েই জ্ঞানসম্বন্ধ তীর্থপর্যটনে বেরুতেন।

জ্ঞানসম্বন্ধের জীবন অসংখ্য অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সে সব ঘটনার বর্ণনা করা ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তবুও কয়েকটি প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ না করলে তাঁর জীবনী যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যখনই তিনি কোনও বিপদ, পরীক্ষা বা সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখনই তাঁর প্রিয়তম ইষ্টদেব শিবের মহিমা-বিষয়ক অপূর্ব ভক্তিরসাত্মক স্তুতি স্বতই তাঁর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হ'ত এবং অলৌকিক ঘটনা ঘটত।

তাঁর ভ্রমণকালে মলোনাদ গ্রামের শিবমন্দিরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কোল্লিমালভন নামে—সেই গ্রামের এক ভক্তের একমাত্র কুমারী কন্যা দুরারোগ্য অবস্থ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যখন অন্তিম কালে উপস্থিত তখন অনন্তোপায় পিতা প্রিয় কন্যাকে মলোনাদের মন্দিরে এনে ভগবানের সম্মুখে শায়িত করে তার কৃপার জন্য প্রার্থনায় রত হন। এমন সময় খবর আসে যে ভক্তপরিবৃত হয়ে জ্ঞান সম্বন্ধর্ সেই দিকে আসছেন। কোল্লিমালভন কন্যার অবস্থা ভুলে গিয়ে জ্ঞানসম্বন্ধের সাদর অভ্যর্থনার জন্য তৎক্ষণাৎ গমন করেন এবং ফলে-ফুলে গ্রামটি সুশোভিত করেন, মঙ্গলঘট স্থাপনপূর্বক বাদ্যধ্বনি সহকারে বালক-সাধুকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে তাঁকে মন্দিরে নিয়ে যান। মুমূর্ষু কন্যাটিকে দেখে জ্ঞানসম্বন্ধের দয়া হ'ল। জিজ্ঞাসিত হয়ে কোল্লিমালভন বললেন, 'জাগতিক চিকিৎসক অক্ষমতা প্রকাশ করায় ত্রিলোকের চিকিৎসক ভগবানের দ্বারে মেয়েটিকে এনেছি।' জ্ঞানসম্বন্ধ তখনই এক স্তব রচনা করেন এবং কন্যাটির আরোগ্য লাভের জন্য ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান। আশ্চর্যের বিষয় মুহূর্তের মধ্যে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পিতার পাশে উঠে দাঁড়ায় এবং পিতাপুত্রী উভয়ে ভক্তিভরে জ্ঞানসম্বন্ধের পাদ-বন্দনা করেন।

মলোনাদ থেকে জ্ঞানসম্বন্ধ কাবেরী নদীর দক্ষিণ-তীরস্থ কোঙ্গু অঞ্চলে চেনকুনরুর, চোদ-মাণ্ডালা, তিরুভাডাতুরাই প্রভৃতি বিখ্যাত শৈব-তীর্থসমূহ দর্শন করেন। শেষোক্ত স্থান থেকে পূর্বপ্রতিশ্রুত যজ্ঞ সম্পাদন-মানসে জ্ঞানসম্বন্ধের পিতা পুত্রের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে শিয়ালি প্রত্যাগমন করেন। এ সব স্থানেও জ্ঞানসম্বন্ধ অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করেন। অতঃপর সিরুত্তোণ্ডার নামক বিখ্যাত শিবভক্ত সেদিকে আসছেন শুনে তিনি ছুটে যান তাঁকে দর্শন করতে। দুই ভক্তের সে মিলন এক অপূর্ব দৃশ্য! অশেষ প্রেমভরে একে অপরকে আলিঙ্গন করেন এবং সিরুত্তোণ্ডারের মহিমা বর্ণনা ক'রে জ্ঞানসম্বন্ধ স্তব রচনা করেন; তাঁর কণ্ঠে সর্বক্ষণই দেবী সরস্বতী যেন বিরাজ করতেন।

সিরুত্তোণ্ডারের ভক্তির অবধি ছিল না। তিনি ও তাঁর ভক্তিমতী স্ত্রী প্রত্যহ বহু শিবভক্তকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়ে তবে নিজেরা আহার্য গ্রহণ করতেন। একদিন কোনও শিব-ভক্তকে না পাওয়াতে ভক্তদম্পতি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, ভক্ত-সন্ধান-মানসে সিরুত্তোণ্ডার রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে এক শিবভক্ত এসে দরজায় করাঘাত করেন। সিরুত্তোণ্ডারের স্ত্রী দরজা খুলে তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বলেন, "পূজনীয় মহাশয়, ভেতরে আসুন। আমার স্বামী একটু বাইরে গেছেন। তিনি এসে আপনাকে দর্শন করে খুবই আনন্দিত হবেন।" ভক্তটি বলিলেন, "না মা, যে বাড়ীতে কোনও পুরুষলোক নেই আমি সে বাড়ীতে প্রবেশ করি না। ইহা করা উচিতও নয়। আমি উত্তরদেশবাসী। তোমার স্বামী না আসা পর্যন্ত আমি বাইরেই অপেক্ষা করব, বরং ইতিমধ্যে আমি পুকুরে স্নান করে আসি।"

কাউকে না পেয়ে হতাশহৃদয়ে সিরুত্তোণ্ডার ফিরে এসে যখন শুনলেন যে এক শিবভক্ত অযাচিত-ভাবে তাঁর বাড়ীতে এসেছেন তখন তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। স্নানান্তে ভক্ত ফিরে এলে সিরুত্তোণ্ডার জোড়হাতে বল্লেন, "প্রভু, আমার গৃহ পবিত্র করুন এবং এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন।" উত্তরে ভক্ত বললেন, "ভাই, তোমার ঘরে যেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি বোধ হয় আমাকে খাওয়াতে পারবে না। প্রতি ছয়মাস অন্তর আমাকে একবার মাংস খেতে হয়। কিন্তু তুমি কি ক'রে আমাকে মাংস খাওয়াবে?" "আপনি কিরূপ মাংস খান?"

ম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন সিরুতোণ্ডার। উত্তরে অতিথি বল্লেন, "আহা! সে মাংস তুমি আমায় দিতে পারবে না ভাই। নধর সুন্দরকান্তি সপ্তম-বর্ষীয় কোনও বালকের মাংস তোমরা উভয়ে রেঁধে দিলে তবেই আমি খেতে পারি।"

অতিথি অভুক্ত থাকবেন, একথা তখনকার দিনে সাধারণ গৃহস্থও ভাবতে পারতেন না; সিরুতোণ্ডারের ত কথাই নেই। পতিব্রতা সহধর্মিণীর সহিত পরামর্শ ক'রে তাঁরা নিজেদের একমাত্র সপ্তমবর্ষীয় প্রিয়দর্শন পুত্রকে কেটে তার মাংস রন্ধন ক'রে খাওয়ার জন্য অতিথিকে সাদর আহ্বান জানালেন। অতিথি আসনে বসে বললেন, "আমি ত একা খাই না, আর আমার খাওয়া না হ'লে তোমরাও ত খাবে না, কাজেই তোমাদের ছেলেকে ডাক, সে আমার সঙ্গে বসুক।" কি করবেন ভেবে সিরুতোণ্ডার হতবাক হয়ে রইলেন। ভক্ত কর্তৃক পুনরায় জিজ্ঞাসিত হয়ে কম্পিতকণ্ঠে সিরুতোণ্ডার বললেন, "প্রভু, আমার ত পুত্র আর নেই।" অতিথি বললেন, "সেজন্য কিছু ভেব না। তোমার যে পুত্র ছিল—তার নাম ধরেই ডাক।" অতিথিপরায়ণ ভক্তদম্পতি হৃত পুত্রের নাম ধরে ডাকামাত্র সে হাসতে হাসতে দৌড়ে তাঁদের কাছে এল। মাতাপিতা আনন্দাতিশয্যে হারানিধি পুত্রকে পেয়ে তাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন ক'রে অতিথির দিকে ফিরে দেখেন যে অতিথি অদৃশ্য। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে স্বয়ং শিবই তাঁদের ভক্তি পরীক্ষার জন্য অতিথিরূপে তাঁদের সম্মুখে এসেছিলেন।

এ হেন ভক্তের দর্শনে স্বতই জ্ঞানসম্বন্ধ অত্যন্ত পুলকিত হন এবং তাঁর সাথে কয়দিন মহানন্দে যাপন করেন। অতঃপর তিনি তিরুমারুকল, তিরুভানাই প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমন করেন। সিরুতোণ্ডার তাঁর অনুগামী হন এবং পথে পূর্বোল্লিখিত সাধু আপ্পার্ তাঁর সাথে যোগ দেন। ত্রিবেণী-সঙ্গমের ন্যায় এই অপূর্ব তিন ভক্তের দৈব মিলন দেখতে সহস্র সহস্র নরনারী মিলিত হন এবং সকলে সমবেতকণ্ঠে 'হর হর' ধ্বনি করতে থাকেন। সেই ধ্বনি শুনে সকলেই মনে করলেন যে জৈন ও বৌদ্ধদের অন্তিমকাল উপস্থিত। সত্যই হয়েছিলও তাই। (ক্রমশঃ)

স্বপ্ন ও জাগরণ*

শ্রীশিবদাস সুর

গ্রামবাসী চাষী এক, অনুভব-জ্ঞানী,
সকল বিষয়ে শান্ত, নহে অভিমানী;
ধার্মিক বলিয়া তারে সবে ভালবাসে,
নিরাপদে কাটে কাল সুখে চাষ-বাসে;
গৃহেতে গৃহিণী ছিল, পুত্র হারাধন,
পিতামাতা উভয়ের স্নেহের ভাজন।
দূর মাঠে একদিন চাষী চাষ করে,
হেনকালে হারাধনে বিসূচিকা ধরে;
বিপরীত খাতে বহে জীবনের ধারা,
ঘরে ফিরে দেখে বাপ, ছেলে গেছে মারা।
জীবনের বিয়োগান্ত নাট্য-অভিনয়,
দেখে শুনে মিথ্যা জেনে নির্বিকার রয়।

পতিরে কহিল পত্নী, পুত্র শোকাতুর,
'একবার কাঁদিলে না? নির্দয় নিঠুর;
পাষাণে গঠিত হিয়া, নাহি মায়া লেশ,
উদাসীন আচরণে বাড়ে মোর ক্লেশ।'
'কাঁদি না যে' কহে চাষী, 'শোন কি কারণ:
কাল রাত্তে দেখেছিনু মজার স্বপন;
সাত রাজপুত্র সহ হইয়াছি রাজা
রাত্রি শেষে কিছু নাই অভিনয়ে সাজা;
ভাবিয়া না পাই তাই স্বপ্ন হতে জাগি
একপুত্র তরে কাঁদি, কিম্বা সাত লাগি?'

* * *

বেদান্ত-বিচারে হয় তত্ত্ব-নিরূপণ
স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সম—মিথ্যা জাগরণ।

* শ্রীরামকৃষ্ণকথা-অবলম্বনে।

শ্রীম-স্মৃতি

শ্রীমহেন্দ্রকুমার চৌধুরী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমাদের দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই, কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গলাভ করিয়া যৎসামান্য কিছুকাল সেই সঙ্গসুখ লাভ করিয়াছিলাম; তাই তাঁহার চুম্বক স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষ এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সরকারি কার্যোপলক্ষ্যে কিছুকাল ৪৭নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে একটি মেসে বাস করি। চিরকালই সাধুসঙ্গ ভালবাসি। লোকমুখে জানিতে পারিলাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মহাশয় (পরমভাগবত শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সন্নিকটবর্তী ৫০নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে (Morton Institution-এ) বাস করেন। তথায় সন্ধ্যাকালে বহু ভক্তের সমাগম হয় ও নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও কীর্তনাদি হয়। ইহা শুনিযাই তাঁহার দর্শনের জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং কর্মস্থল হইতে আসিয়া কিছুকাল বিশ্রামের পর সন্ধ্যার অপেক্ষায় বাকি সময়টুকু উদ্বেগের সহিত কাটাইতাম।

প্রথম দিন গোধূলির সময় তাঁহার খোঁজ লইয়া নির্দিষ্ট ঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতেছি; হঠাৎ তিনি আসিয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং আমায় সেই ঘরেই বসিয়া ধ্যান করিতে বলিয়া কিছু সময়ের জন্ম উপরে ত্রিতলের ঘরে চলিয়া গেলেন। আমি অবাক হইয়া ভাবিতেছি, কি করিয়া তিনি আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন? কারণ তৎপূর্বক্ষণে ঐ স্থানে বসিয়া আমার ধ্যান করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।

যাহা হউক, তাঁহার সুদীর্ঘ বাহুযুগল এবং সুপক্ক এবং আবক্ষলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রুরাজি ও নয়নাভিরাম মূর্তি দর্শন করিয়াই প্রাণে অপার আনন্দের ঢেউ খেলিতে লাগিল। তাঁহার কথামতো কিছুক্ষণ ধ্যানের চেষ্টা করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ঐ স্কুল ঘরটির সু-উচ্চ আসনে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাকে ধ্যানের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মোটামুটি কয়েকটি বিষয় বলিয়া দিলেন। তখনও আর কোনও ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

ক্রমে ক্রমে যেমন রাত্রি বাড়িতে লাগিল ভক্তগণের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বাড়িতে আরম্ভ করিল। তখন সেই পূর্বোক্ত দ্বিতলের সামনের ঘর হইতে পূর্ব পার্শ্বের অন্য ঘরে সমাগত ভক্তগণের সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিয়া মাষ্টার মহাশয় নিজ আসনে উপবেশন করিলেন এবং যথারীতি 'পঞ্চবিংশতি গীতা' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ করিয়া আমাদিগকে শুনাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'কথামৃত' হইতে সেই পূর্বকালের ইতিবৃত্ত সবিস্তারে আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন।

এইভাবে কিছুকাল চলিল। প্রতিদিনই তাঁহার নিকট হইতে নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতাম। তাঁহার সুদীর্ঘ ও শুভ্র শ্মশ্রুরাজি ইতস্ততঃ দোলাইয়া গানের তালে তালে যে ভাবে মন প্রাণ মজাইয়া ভক্তহৃদয়ে সুধাবর্ষণ করিতেন তাহা যেন হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

দিন যায়, কথা থাকে। একদিন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মূল উৎস কোথায় জানিতে পারি; সেই সঙ্গে তাঁহার কথিত অন্যান্য কথাও যতটুকু মনে ছিল বাসায় ফিরিয়া সেই রাত্রেই লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

সেকালের সঙ্গিগণের সঙ্গে পরবর্তীকালে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। নানাজন নানাদিকে উন্নতি করিয়াছেন। কেহ সংসারী, কেহ বিরাগী হইয়াছেন; কেহ বা সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আবার কেহ কেহ ধরাধাম হইতে বিদায় লইয়াছেন।

'কথামৃত' রচনার মূল সম্বন্ধে সেদিন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছিলাম। পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, 'ছোটকালে যখন Class V কি Class VI এ পড়িতাম তখন হইতেই দৈনন্দিন কাজকর্মের দিনলিপি (Diary) লিখিতে আরম্ভ করি। পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনের পূর্ব পর্যন্ত যথানিয়মে উহা লিখিতেছিলাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দর্শনের পর হইতে ডায়েরিতে তাঁহার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) বাণীই প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং পূর্বেকার ডায়েরি নিজরূপ বদলাইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে রূপান্তরিত হইল।'

এইজন্য মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রকাশিত হইবে বলিয়াই যেন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে পূর্ব হইতেই নিজ ডায়েরি লিখিবার অভ্যাস করাইতেছিলেন।

এই ভাবেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রকাশিত হইয়া অগণিত দীনদুঃখী, পাপীতাপী, সাধুসজ্জনের প্রাণ জুড়াইবার ও মোক্ষপথের সোপান সৃষ্টি করিল।

তাঁহার শ্রীমুখ হইতে 'কথামৃতে'র ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার একদিনকার কথামৃত যতটুকু স্মৃতি-পথে ছিল নিয়ে তাহাও লিপিবদ্ধ করিলাম:

হয় সাধুসঙ্গে বাস করবে, নচেৎ সিংহের ন্যায় একা বাস করবে। নির্জনে ও গোপনে ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে।

অজ্ঞের সঙ্গে দু'একটি মিষ্টি কথা বলে কি হবে? সে সময়টি সাধন-ভজন ধ্যান-ধারণায় নিয়োগ করা উচিত।

শরীর তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ; —Body, Mind and Spirit. কারণ-শরীর সংসারের কোন ভোগ নেয় না, কেবল ঈশ্বরীয় ভাব আস্বাদন করে থাকে। ঈশ্বরীয় কথায়—অঙ্গে পুলক হয় এবং নেত্রে ধারা বয়। কারণ-শরীর ধ্যানসমাধিতে মহাকারণে লয় হয়।

চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, শিবলোক ইত্যাদি আছে বলে জানা যায় এবং তা আমরা মহর্লোক হতে জানতে পারি। মানুষের বুদ্ধি সামান্য, এইজন্য নিজের ধারণা হয় না বলে অস্বীকার করা উচিত নয়। তবে বলা উচিত—আছে বলে শুনা যায়, আমি অবিশ্বাস করি না।

ঠাকুরকে কেহ জন্মান্তর আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিতেন—আছে বলে জানা যায়, অবিশ্বাস করা উচিত নয়।

মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—ঈশ্বর লাভ করা। যে প্রকারে তাঁকে লাভ করা যায় তা করা উচিত। অত বাজে বিষয়ের হিসাব নিকাশ করে কি হবে? আম খাও পেট ভরবে, পাতা লতা গুণে ফল কি?

তাঁকে জানলেই তিনি সব জানিয়ে দিবেন। যদু মল্লিকের সহিত আলাপ করলে তিনিই জানিয়ে দিবেন তাঁর কত কোম্পানী কাগজ ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন, প্রথম পুস্তকাদি থেকে জ্ঞান লাভ করা, পরে তাঁকে জানা কিন্তু তাহা না করে প্রথমে তাঁকে জানা দরকার। প্রয়োজন হ'লে তিনিই সব জানিয়ে দেবেন।

সাধুসঙ্গ ঈশ্বর লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

এখন (ঠাকুরের সময় হইতে বর্তমান পর্যন্ত) যাঁরা জন্মগ্রহণ করছেন তাঁরা অনেক ভাগ্যবান্, কারণ তাঁরা একটা নির্দেশিত পথে চলতে পারবেন।

তিনি যুগে যুগে গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে এসে দুর্গম ও দুর্বোধ্য পথ সরল ও সহজ করে লোকের ঈশ্বর লাভের পথ সুগম করে দিয়ে যান।

যাদের এ জীবনে সুযোগ ঘটেনি তাঁদের আগামী জন্মে ঘটবে।

ঠাকুর বলে গিয়েছেন, তাঁর ধ্যান করলেই তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যাবে।

তাঁকে ডাকার চেয়ে তাঁর নির্দেশিত কাজ করা ভাল।—"Thou sayest O God, God, God, but why thou doest not do what I say unto you"—Bible.

গুরুর কৃপা হ'লে শিষ্য যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন ভাববার কোন প্রয়োজন নাই। এক বাজিওয়ালা দুই সহস্র দর্শককে সহস্র গ্রন্থি-বিশিষ্ট একখানা রজ্জু থেকে তার একটি গ্রন্থি খুলতে বলেছিলেন। কেহই তা পারল না। অবশেষে সে রজ্জুর এক প্রান্ত একটি লোককে ধরতে বলল এবং অপর প্রান্ত নিজে ধরে যখন ঘুরাল তখন সমস্ত গ্রন্থি খুলে গেল। গুরুর কৃপা হলেই শিষ্যের সর্ব প্রকারের বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়।

নির্জনে ধ্যান ধারণা করবে এবং কোন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করবে। পড়ার চেয়ে শোনা ভাল।

কাহারও ভাব নষ্ট করা উচিত নয়, বরং তার সেই ভাবে সাহায্য করা উচিত। কারণ সব পথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

সব পথে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় বলে একাধিক পথে চলা যায় না। ভক্তি বিশ্বাসের সহিত একপথে চলা উচিত। যেমন ছাদে উঠতে হ'লে দালানের সিঁড়ি, মই, বাঁশ ও দড়ি ইত্যাদির যে কোন একটি দ্বারা উঠা যায় এবং নামবার সময়ও যে কোন একটি উপায়ে অবলম্বন করে নামা যায়। সেই প্রকার একটি পথ অবলম্বন করে ঈশ্বর লাভ করবে।

দরিদ্র অবস্থায় যে সব সঙ্গী তারাই প্রকৃত সঙ্গী। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, এখন আমি মথুরায় রাজা; এখনকার সঙ্গী অপেক্ষা যখন আমি বৃন্দাবনে দরিদ্র অবস্থায় ছিলাম—তখনকার সঙ্গীরাই আমার প্রকৃত সঙ্গী, আপন জন।

কৃষ্ণের নিকট যাবার জন্য চেষ্টা করে যে সকল গোপিকা স্বামী প্রভৃতির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে নি—তারা গৃহের দ্বার বন্ধ করে সমাধি দ্বারা প্রাণ বিসর্জ্জন করে কৃষ্ণকে পেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের এতই ভালবাসা।

এই সঙ্গে তখন মাষ্টার মহাশয়ের নিকট তাঁহার প্রিয় যে কয়েকটি সংগীত প্রায়ই গীত হইত তাহা উল্লেখ করি। 'কে আসিলে হে মন্দিরে মম,' 'রঘুকুলরাজা রামচন্দ্র', 'এ হাটে বিকোয় না সুতো' 'আমার কি ফলের অভাব' প্রভৃতি সংগীতগুলি প্রসিদ্ধ। একটি গান সম্পূর্ণ লিখিয়া এই স্মৃতিকথা সমাপন করিলাম:

কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে
চন্দ্রমা তপন তারা তাঁহারি আলোকে ভায়
এ বিপুল সংসার, সুখে দুঃখে আঁধার
কেমনে রাখিবি ঢাকি তাঁহারে কুহেলিকায়?

চেনা ও অচেনা

শ্রীপুলকেন্দু সিংহ

জগতের যাহা কিছু পরম বিস্ময়,
তাহাদের সাথে মোর আছে পরিচয়।
চিনিনাক' আমি শুধু, জানিনাক' তারে,—
বিরাট পরিধিব্যাপী আপন আত্মারে।

'আমারে' চেনাতে শুধু করেছি সাধনা,
"আমি কে?" জানিতে আজো জাগেনি বাসনা।
ব্যর্থ হল অচেনারে চিনিবার ধ্যান;
অচেনার কাছে চেনা—চিরদিন ম্লান।

স্বামীজীর 'পত্রাবলী'

অধ্যাপক শ্রীপ্রণব ঘোষ

মানব-মনের দু'টি আয়না—চোখ আর চিঠি। আমাদের অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেমন সবচেয়ে বেশী ধরা দেয় চোখে, অন্তরের কথা তেমনি বেশী ধরা পড়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমে, অবশ্য সব লেখকের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য নয়। কোন কোন লেখকের চিঠিতে আর প্রবন্ধে বেশী ভেদ থাকে না—কারণ তাঁরা এ বিষয়ে বেশ সচেতন যে, এ চিঠি একদিন ছাপা হবে। আবার কোন কোন লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে যতই কল্পনাচারী হোন না কেন, চিঠির ক্ষেত্রে তাঁরা একান্ত প্রয়োজনবাদী, এই দুই ধরণের লেখককে বাদ দিয়ে সেই সব লেখকদের স্মরণ করি, যাঁরা আপন মনের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন চিঠিপত্রে অথচ লেখনীর গুণে সে সব চিঠি আপনিই সাহিত্য হয়ে উঠেছে, স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে এই দুর্লভ গুণের সমাবেশ দেখি, তাই বাংলা পত্র-সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর 'পত্রাবলী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যশৈলী ওজোগুণসম্পন্ন এবং একেবারে মুখের ভাষার মতই স্বচ্ছন্দে তার কৃতিত্ব। বলা বাহুল্য তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত গতিশীলতাই তাঁর গদ্যেও গতিবেগ সঞ্চার করেছে, চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে এই গতিসম্পন্ন ভাষা ইস্পাতের শাণিত উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছে, চিন্তার দিক থেকে বেদান্তের মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি, এবং জীবনের দিক থেকে কলকাতার কথ্য-ভাষার সঙ্গ—এ দুয়ে মিলে তাঁর চিঠিপত্রের ভাষাকে গড়ে তুলেছে, জগৎ ও জীবনের নানাদিকে তাঁর দৃষ্টি, তবু মূলতঃ তিনি সন্ন্যাসী—এ কথাটি তাঁর চিঠিতেও পরিস্ফুট, অথচ এ সন্ন্যাসের একটি মূল আদর্শ—'জগদ্ধিতায়'—আধুনিক কালে যার নাম বিশ্বপ্রেম, স্বদেশ, স্বজাতি—সেই সঙ্গে সর্ব মানবের প্রতি অপরিমেয় প্রেমের গভীর মন্দ্রধ্বনি তাঁর চিঠিপত্রে অনাহত সুরে বেজে চলেছে,—একটু কান পাতলেই শোনা যায়।

'উদ্বোধন'-প্রকাশিত স্বামীজীর পত্রাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড) পাঠকালে এই সব কথাই মনে জাগছিল। এ প্রবন্ধে অবশ্য কেবল বাংলায় লেখা চিঠিগুলির আলোচনা করব—বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ওদেরই, ইংরেজী থেকে অনুবাদ-করা চিঠিগুলির সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের পরোক্ষ যোগ, যদিও এই চিঠিগুলির অনুবাদে স্বামীজীর রচনাভঙ্গী যে ভাবে অনুসৃত ও অনুকৃত হয়েছে তা' বিস্ময়কর।

পৃথিবীর অনেক মহামানবের মতোই স্বামীজীর পত্রাবলী তাঁর জীবনের ও অনুভূতিলোকের অনেক গূঢ় সংবাদ বহন করে এনেছে, এই পত্রাবলী তাঁর জীবনী-রচনার অপরিহার্য উপাদান।

একদিকে অগাধ আত্মবিশ্বাস, আর একদিকে সুগভীর মানবপ্রীতি—এই দুই সম্পদে তাঁর চিঠি-পত্রের ভাষা সমুজ্জ্বল, চলতি ভাষায় সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে "পরিব্রাজক" এবং "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য"—বই দুটিতে স্বামীজী যে অনায়াসকৃতিত্ব লাভ করেছেন, পত্রাবলীতে সেই কৃতিত্ব আরও বেশী, তাঁর ব্যক্তি-জীবনের নানা মুহূর্তের রঙে রঙানো এই চিঠিগুলি আমাদের সুখদুঃখময় আন্তর-চেতনার সঙ্গে অনায়াসে যোগস্থাপন করে। যাঁদের উদ্দেশ্য করে এসব চিঠি তিনি লিখেছিলেন, আজ তাঁদের অপরিসীম সৌভাগ্যের কথা মনে হলে বিস্ময় জাগে, তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও আলাপের চেয়ে এই পত্রালাপগুলির মূল্যও যে কিছুমাত্র কম ছিল না—একথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই পত্রাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁর বৈদ্যুতী ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাই। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ

বিবেকানন্দকে পাওয়া যায়—তাঁর পত্রাবলীর পৃষ্ঠাতেই।

"তুমি আসিতে পারিবে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল; তোমাকে সমধিক ভালবাসি বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক, এ মায়াও আমি কাটাইবার চেষ্টা করিব।"[১]

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা এই পত্রাংশটুকু গুরুভ্রাতার প্রতি সন্ন্যাসীর কী অমেয় ভালবাসার বাণী বহন করে এনেছে, অথচ এ বন্ধনও সন্ন্যাসীকে কাটাতে হবে! ভগবান বুদ্ধের জীবনেও দেখি—ত্যাগ তো প্রেমেরই নামান্তর। ঐ চিঠিরই আর এক অংশে বুদ্ধপ্রসঙ্গে আছে—"যে ধর্ম উপনিষদে জাতি-বিশেষে নিবদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্মের যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁহার intellect এবং heart, যাহা জগতে আর হইল না।········ বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর,—আমি খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু ইতি করিবার শক্তি কাহারো নাই।"[২]

ঠিক তেমনি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও তাঁহার অনুভূতি: "······রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহৈতুকী দয়া, সে Intense sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধ জীবের জন্য —এ জগতে আর নাই।······তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনো আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনো বাসে নাই।"[৩] ব্যক্তিগত অনুভূতির মানদণ্ডে তিনি নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে—"Love is the gate to all the secrets of the universe" (প্রেমই বিশ্বরহস্যের প্রবেশদ্বার)।

নারদভক্তিসূত্রে আছে—"স ঈশ অনির্বচনীয়ঃ প্রেমস্বরূপঃ"। মহাকবি দান্তে অনুভব করেছিলেন—'Love that moves suns and stars' (যে মহা আকর্ষণ সূর্যনক্ষত্রকে চালাচ্ছে)। জীবন শতদলের মধুস্থলী এই অনির্বচনীয় প্রেমসত্তারই শুভ্র ও সুন্দরতম বিকাশ বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণের মতো মহা-মানবদের জীবনে। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে তাই এঁরাই মানবজাতির আদর্শ,—তাঁর মানস-আকাশের ধ্রুবজ্যোতি।

মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের মানদণ্ড হিসাবে তিনি ঐ অতুলনীয় সহানুভূতিকে বুঝতেন বলে 'জীবে দয়া'র জায়গায় 'জীবে প্রেম' তাঁর জীবনে নূতন পন্থা নির্দেশ করেছিল। আমেরিকা থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি লিখছেন—······"এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলোর পশুর মত জীবন যাপন করছে—তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু-পা দিয়ে দলেছে।

মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন্ কাম করে? তেমনি কতক-গুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ের নানা কথা, map camera, globe (ম্যাপ, ক্যামেরা, গ্লোব) সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা?"[৪]

১। পত্রাবলী (১ম খণ্ড) পৃষ্ঠা ৪২।
২। ঐ—পৃঃ ৪৩-৪৪
৩। ঐ—পৃঃ ৫১
৪। ঐ—পৃঃ ১৪৬

কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি এই সহানুভূতি কেবল চিন্তনীয় তত্ত্ব নয়। বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের জীবনে আমরা অনুভূতিকে কর্মে রূপান্তরিত করবার যে প্রবল প্রাণশক্তি দেখি তা উনিশ ও বিশ উভয় শতকের বাঙালীর পক্ষে জাতীয় আদর্শ। সেই প্রবল কর্মশক্তির উদ্দীপনা তাঁর পত্রাবলীতে বারংবার প্রকাশিত—"Life is ever expanding, contraction is death (জীবন হচ্ছে সম্প্রসারণ, আর সঙ্কোচনই মৃত্যু)। যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নেই, যে আপনি নরকে পর্য্যন্ত গিয়ে জীবের জন্ত কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ (অপরে হীনবুদ্ধি)।"[৫]

কাজ করতে গেলেই বাধা আসে। বিশেষ করে বাঙালী শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কাছে অন্যের নেতৃত্ব অসহনীয়। [৬] "ঐ jealousy (ঈর্ষা), ঐ absense of conjoined action (সম্মিলিত ভাবে কাজ করার শক্তির অভাব) গোলামের জাতের nature (স্বভাব), কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করা উচিত।" এই ঈর্ষার অনল রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সবাইকে দগ্ধ করেছে। আজ অবধি এই স্বভাবটি ছাড়তে না পেরেই আমরা নেতৃহীন হয়ে আছি।

কিন্তু বিবেকানন্দের সমালোচনা তো ভাঙনমুখী নয়, গড়নমুখী। তাই নবযুগের কর্মপন্থা নির্দেশ করে তিনি লিখেছেন—[৭] "পড়েছ 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব,' আমি বলি 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।"

৬। ঐ—পৃঃ ৩০৭-৮

৭। ঐ—পৃঃ ৩১১

সত্যিকার অধ্যাত্ম ধর্মচেতনা ভারতবর্ষের কয়জনের আছে তা সন্দেহের বিষয়—কিন্তু ধর্মের নাম করে সামাজিক নিপীড়নের বেলায় আধ্যাত্মিকতার দোহাই দেওয়াটা এদেশের রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। দেখে শুনে স্বামীজীর মন্তব্য—[৮] "ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ যোগমার্গ—সব পলায়ন। এখন কেবল আছেন ছুঁৎমার্গ। আমায় ছুঁয়োনা; আমায় ছুঁয়োনা। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ্! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়-কন্দরেও নাই, গোলকেও নাই, সবভূতেও নাই, এখন ভাতের হাঁড়িতে।" ব্যঙ্গরসের সঙ্গে বেদনার মিশ্রণে এখানে উচ্চাঙ্গের হিউমার সৃষ্ট হয়েছে।

এই ছুঁৎমার্গী সামাজিক আচার যে ধর্ম নয়, উপনিষদ্-প্রতিপাদিত সত্যই যে হিন্দুধর্মের আসল রূপ, একথাটি রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত বহু বেদান্ত-চর্চার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ বারবার শুনেছিল। ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে এই উপলব্ধি হিন্দুধর্মের ভিতরের কলহ এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পন্থাগত পার্থক্য দূর করে সবার অলক্ষ্যে এক মহান্ চিন্তাসূত্রের ঐক্যে ভারতীয় জাতি গঠনের কাজ করে চলেছিল। অথচ এ সত্যোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবপ্রীতির গভীর যোগাযোগ ছিল। তাই আধ্যাত্মিকতা উনিশ শতকের সেবামূলক কর্মশক্তিকে অনেকখানি উদ্বুদ্ধ করেছে। এই পটভূমিতে বিবেকানন্দের আর একটি পত্রাংশ স্মরণীয়—[৯] "আমি একমাত্র কর্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই।.........ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্যন্ত সমস্ত প্রাণী কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম, বাকি অধর্ম।"

৮। ঐ—পৃঃ ৩৪০

৯। ঐ—পৃঃ ৪৪৪

আর এই পরোপকারের জন্ম যে বিপুল প্রাণশক্তি চাই, তার জন্মে প্রয়োজন অনন্ত আত্মবিশ্বাস। বিবেকানন্দ তো সেই আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধারই অনন্ত বিগ্রহ। [১০] "যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। যে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীনহীন ভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা।.........যে সদা আপনাকে দুর্বল ভাবে সে কোনকালেও বলবান হবে না; যে আপনাকে সিংহ জানে সে 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'।" এই পাশমুক্ত কেশরীর নির্ভয় বিচরণের মহিমা বিবেকানন্দের ব্যক্তিসত্তার প্রতীক। আমাদের জাতীয় চরিত্রের নিবীর্যতাকে তিনি এই অভয়মন্ত্রে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন—তার ইংরেজী ও বাংলায় সর্বজাতীয় রচনার মধ্যেই বারংবার এই নির্ভীকতার উপর জোর দেওয়ার ভাব দেখতে পাই। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন: [১১] "... ...আসল কথা ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না। ওটি যে ছাড়বে না তার সঙ্গে আর আমার সম্পর্ক চলে কি?..... এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে... তবে মানুষ।..... কাপুরুষ—দয়ার আধার!!"

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-পরিমণ্ডলে দু'টি দেবতা—বস্তুতঃ একই দেবতার দুটি রূপ—আমরা দেখতে পাই। একজন 'উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর,' আর একজন 'মাতৃরূপা কালী'। শ্মশানচারী এই দুটি দেবতার মধ্যে তাঁর বৈরাগ্যপূত শাক্তচেতনার ঘনীভূত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় আমরা ত্যাগ ও ভোগের, সৃষ্টি ও প্রলয়ের সম্মিলিত প্রকাশ দেখি 'নটরাজ'-প্রতীকের মাধ্যমে। তাঁর 'নৃত্যের তালে তালে,' 'তপোভঙ্গ' প্রভৃতি গান ও কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'—'Kali the mother' প্রভৃতি কবিতায় আমরা শক্তিরূপিণী জগন্মাতার প্রকাশ দেখি। পত্রাবলীতে নানা জায়গায় জগন্মাতার নামোচ্চারণ করে আত্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ করবার প্রয়াস দেখি—[১২] "আমি মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দাস—আমাদের কি নাশ আছে, ভয় আছে? অহংকার যেন মনে না আসে, ভালবাসা যেন না যায় মন থেকে। তোমাদের কি নাশ আছে!—মাভৈঃ। জয় কালী! জয় কালী!"

এই সঙ্গে স্বামীজীর 'Kali the mother' কবিতাটির (সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের) অনুবাদ স্মরণীয়—

সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে—
কালনৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

মহাশক্তির উপাসক বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, জাতির মনে আবার শক্তি সঞ্চার করবার জন্মে প্রয়োজন নূতন ধরনের শিক্ষাপ্রণালী। [১৩] 'কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা, জবাব পাইলাম। শিক্ষা-বলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়-বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonists (আইরিশ উপনিবেশবাসী) আসিতেছে—ইংরেজ পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ; সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আর এক

১০। ঐ—পৃঃ ৪৪৫
১১। পত্রাবলী (২য়)—পৃঃ ৩৭১
১২। ঐ—পৃঃ ৩৭১
১৩। ঐ—পৃঃ ১২৪

দৃপ্ত—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে। তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে—ঐ Irish man (আইরিশ)-কে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল "প্যাট্ তোর আর আশা নাই; তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম" আজন্ম শুনিতে শুনিতে Pat (প্যাট) এর তাই বিশ্বাস হল। নিজেকে Pat (প্যাট) হিপ্‌নটাইজ করলে যে, সে অতি নীচ; তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—'প্যাট, তুইও মানুষ আমরাও মানুষ, মানুষেই ত সব করছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ!' Pat (প্যাট) ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই ত; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ইত্যাদি।"

আইরিশ লোকটির এই উদাহরণের মধ্য দিয়ে বেদান্তের শিক্ষাকে বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করবার কি আশ্চর্য উদাহরণ তিনি জীবন্ত ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন, পাশ্চাত্ত্যের এই রজোগুণাত্মক শক্তিকেই তিনি নিদ্রিত ভারতবাসীর সুপ্ত চেতনায় সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাছে রজোগুণের অর্থ—তৃপ্তিহীন সম্ভোগ নয়, 'পরহিতায়' সর্বস্ব সমর্পণের আনন্দ। সমগ্র স্বদেশী-যুগ জুড়ে বাঙ্গালী যুবকদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে এই রজোগুণের আহ্বানকেই আমরা সফল হতে দেখেছি।

তাঁর বহুবিস্তৃত জীবনানুভূতি এমনি করে প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। প্রথমেই কেউ সর্বস্ব ত্যাগ করে নিষ্কাম সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে না। প্রথমে ব্যক্তিগত ভালবাসা, তারপরে দেশগত প্রেম; বিশ্বানুভূতি তারও পরের কথা।

১৪ "একটিকে নিঃস্বার্থ ভালবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্টদেবতা-বিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট্ ব্রহ্মে প্রীতি হইতে পারে।

অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা আগে না থাকলে কি কাহারও ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাকলে কি কখনও আলোকের মানে হয়?

সকাম, সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম। তারপর আপনা আপনি বড় আসবে।"

ব্যক্তিপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমের এই প্রতিটি ধাপ উত্তীর্ণ হবার মূল্য মানুষকে দিতে হয়—কঠোর বেদনা, কঠিনতর সাধনার মধ্য দিয়ে। দুঃখের ভয়ে যে পিছিয়ে আসে তার "অমৃতত্ব—বৃথা আকিঞ্চন।" ১৫ "ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে একফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে—কে কবে বড় হয়েছে?—কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় পাও, কেন? কাঁদ। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ্ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ, জন্তু, গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়।" ১৬

"বাঙ্গালাভাষা" প্রবন্ধটিতে স্বামীজী লিখেছিলেন—"স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর,

১৪। ঐ—পৃঃ ৪৪২

১৫। ঐ—পৃঃ ৪৫৩

১৬। আসলে এ প্রবন্ধটিও স্বামীজীর লেখা চিঠির অংশ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী 'উদ্বোধন' পত্রের সম্পাদককে স্বামীজী যে চিঠি লেখেন এটি তারই মধ্যে আছে।

যেমন অন্নের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, যেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না।" ভাষার এ আদর্শ সবচেয়ে বেশি প্রমাণিত হয়েছে তাঁর পত্রাবলীতে। পত্রাবলীর রচনাভঙ্গীই স্বামীজীর মানসভঙ্গীর পরিচায়ক; সে মানস—ত্যাগে প্রেমে, বীর্যে, ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল, মানবাত্মার অনন্ত যাত্রাপথে শাশ্বত সত্যের চিরন্তন দিশারী।

যাত্রীর চিঠি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

ক্রুঙ্‌থেপ (ব্যাঙ্কক) শহরের সুরিওয়ঙ্‌স্ রোডে প্যান্-আমেরিকান এয়ার-ওয়েজের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। রাত প্রায় বারোটা। ৩০শে মার্চ, ১৯৫৭—শ্যামদেশে আমার চতুর্থ রাত্রি—বিদায় রাত্রি। শহর থেকে আঠারো মাইল দূরবর্তী এয়ার-পোর্টে নিয়ে যাবার জন্য প্যান-আমেরিকানের বাসের এখনও দেখা নেই, অথচ সওয়া এগারোটায় বাসটির ছাড়বার কথা! আধ ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই কিঞ্চিন্ন্যূন দুই লক্ষ বর্গ-মাইলের দেশটির সঙ্গে প্রায় দশগুণ বড় ভারতের যুগ-যুগ-ব্যাপী অতীত সংযোগ এবং জাতিগত সালক্ষণ্য-বৈলক্ষণ্যের কথা। ভারতবাসীর মতো থাই জাতিও ধর্মপ্রাণ, ধর্ম সম্বন্ধে তাদের উদারতাও লক্ষণীয়।[১] ধর্মে ত্যাগের আদর্শ সম্মানিত।[২] থাইরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী, ভারতবাসীর মতো। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং খাদ্যের দিক দিয়ে ভারতের সঙ্গে অনেক মিল আছে। থাই ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ এবং প্রচলিত কথা-কাহিনীর মধ্যে ভারতীয় পুরাণ ও কিংবদন্তীর প্রভাব আগেই উল্লেখ করেছি। ভারত থেকে বৈলক্ষণ্য—এদের জাতি-প্রথারাহিত্য এবং সামাজিক স্বাধীনতা। শ্যামদেশ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে এই দেশ এবং দেশবাসীর প্রতি একটি অস্পষ্ট মমতা যে বোধ করছিলাম সেটা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক ছিল না। তবে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল এদের ক্রমবর্ধমান পাশ্চাত্ত্য-সংযোগের কথা। বেশভূষা এবং চালচলনে পাশ্চাত্ত্যপ্রভাব বেশ শিকড় গেড়েই বসেছে, তবে জাতির নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ অদূর বা দূর ভবিষ্যতে ঐ প্রভাব থেকে কতটা আত্মরক্ষা করতে পারবে সেইটাই প্রশ্ন। ইংলণ্ড, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ এবং আমেরিকায় দলে দলে থাই ছাত্র নানা

১। থাইদেশে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ও মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠগণ নির্বিবাদে বাস করছে। কয়েকমাস আগে শ্যামদেশের বর্তমান রাজার সহোদর প্রিন্স্ চুলা (H. R. H. Prince Chula) লণ্ডনে একটি বেতারভাষণে বলেছিলেন,—"আমরা বৌদ্ধেরা খ্রীষ্টধর্মের 'মৌলিক পাপ' (Original Sin) এবং 'পরিত্রাতা-বাদে' বিশ্বাস করি না। আমরা ইহকাল বা পরকালে আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে আস্থা স্থাপন করি শুধু নিজেদের ভাল-মন্দ কাজের উপর। ব্যক্তিগত সৎ-ভাবের অতিরিক্ত—পর-জীবনের জন্যে খ্রীষ্টধর্মের 'পাপ-ক্ষমা' (Redemption) জাতীয় অপর কিছুর প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। তথাপি আমাদের বিশ্বাস যে, ধর্মের চরম উদ্দেশ্য যখন মানবাত্মার মঙ্গল, তখন সব ধর্মই মানুষকে ঐ একই লক্ষ্যে নিয়ে যায় এবং সব ধর্মকেই সম্মান করা উচিত। আমরা থাইদেশ-বাসীরা এই জন্যে অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতাসম্পন্ন।"

২। শ্যামদেশে স্থায়ী বৌদ্ধভিক্ষুর সংখ্যা প্রায় একলক্ষ। এতদ্ব্যতীত এই দেশের রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক গৃহস্থকে কিছু-কালের জন্য ভিক্ষুর জীবন যাপন করতে হয়—ঐ সব 'অস্থায়ী' ভিক্ষুর সংখ্যাও কম নয়।

বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্তে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে বর্তমানে প্রায় এক হাজার ছাত্র রয়েছে।"

প্যান্-আমেরিকানের মোটর বাস যখন এল তখন মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে ৩১শে মার্চ পড়ে গেছে। শহরের কয়েকটি হোটেল থেকে কয়েকজন যাত্রী তুলে গাড়ীটি এরোড্রোমে হাজির হ'ল প্লেন ছাড়বার মাত্র আধঘণ্টা আগে। অতএব কাষ্টম্‌স্ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক রীতিগুলো উর্ধ্বশ্বাসে শেষ করতে বেশ হাঁপ ধরে গিয়েছিল। কলকাতার একটি বিশিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে ব্যাঙ্কক এরোড্রোমে দেখা; সস্ত্রীক টোকিও চলেছেন। বাঙ্গালী বিদেশে বাঙ্গলা কথা বলবার লোক পেলে আনন্দিত হয়, অতএব তাঁদের সঙ্গে গল্প জমে উঠেছিল।

টোকিওর আগে হংকং এ প্লেন তিন ঘণ্টার জন্ত থামবে সকাল সাতটায় (কলকাতার ভোর সাড়ে চারটা)। রাত্রে ঘুম মন্দ হয় নি। ভোরে চোখ মেলে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ফরসা হয়েছে, উপরে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু নীচে ঘন মেঘের আস্তরণ। বহু হাজার ফুট নীচে সমুদ্র সেই মেঘের আবরণে ঢাকা।

সাতটা বাজলো, আটটা বাজলো, নয়টাও বাজে বাজে, কোথায় হংকং? অনন্ত মেঘের রাজ্যে প্লেন গোঁ গোঁ করে উড়েই চলেছে। হঠাৎ ক্যাপ্টেনের ঘোষণা:

"দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্তে হংকং-এ নামা সম্ভবপর হচ্ছে না, যাক্ আর একবার চেষ্টা করে দেখছি—যদি একান্তই না পারা যায় তাহলে ম্যানিলায় চলে যেতে হবে।"

দুই ঘণ্টা ধরে অতঃপর মেঘের সঙ্গে যুদ্ধ চললো। অবশেষে মনে হতে লাগলো মেঘ যেন হাল্কা হয়ে আসছে এবং আমাদের প্লেনটিও যেন বেগের সঙ্গে সোজা নীচে নামছে। অকস্মাৎ চোখে পড়লো দিগন্তপ্রসারিত সীমাহীন জল—দক্ষিণ চীন সাগর। এরই বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি—বেশ কাছেই জলের ঢেউও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দু'একটি পাহাড়ী দ্বীপ নজরে পড়লো। একটি দ্বীপে মানুষের বসতি রয়েছে। ঘরবাড়ী এবং অদূরে সাগরজলে জেলেদের অনেক নৌকাও দেখা গেল।

প্লেন হংকংএ নামলো বেলা ১১টায়,—৪ ঘণ্টা দেরীতে। শহর ঘুরে দেখার আর সময় ছিল না। এয়ার-পোর্টটি বেশ বড়। বহুলোকের আনাগোনা। এদের পোষাক এবং চেহারাতে বোঝা গেল চীনদেশে এসেছি। আমার গৈরিক কাপড়ের পরিচ্ছদ সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করছিল। এরোড্রোমের ভোজনালয়ে তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্ন আহার সেরে নিয়ে আবার বিমানপোতে নিজের সিটে এসে বসলাম। পোত উড়লো টোকিও অভিমুখে। পরিষ্কার আকাশ। বিকাল নাগাদ ক্যাপ্টেনের গলা মাইক্রোফোনে শোনা গেল—"আমরা টাইওয়ান দ্বীপকে (ফরমোসা) ডান দিকে রেখে চলছি।" সাম্প্রতিক ইতিহাসের বহু-বিসংবাদিত এই ভূখণ্ডের পাহাড় এবং অরণ্যানীকে আকাশ থেকে একবার দেখে নেওয়া গেল। এইবার বিমানপোত পূর্ব-চীন-সাগরের উপর দিয়ে উড়ছে। দ্বীপ-চতুষ্টয়গঠিত[৩] জাপানের দক্ষিণতম দ্বীপ কিয়ুশু (Kyushu)কে যখন অতিক্রম করলাম তখনও দিনের আলো রয়েছে। ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর যন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হল "কিয়ুশু।" কিয়ুশু দেখবার জন্তে প্লেনের প্রায় বিশ পঁচিশ জন যাত্রী নরনারী জানালার কাঁচ দিয়ে নীচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। জাপানের দ্বিতীয় দ্বীপ শিকোকু (Shikoku) অপর তিনটির তুলনায় ছোট। তৃতীয়

৩ চারটি প্রধান দ্বীপ ছাড়া ঐ গুলির কাছাকাছি আরও অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপও জাপান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, যথা,—সাসেবো (আণবিক বোমা-বিধ্বস্ত প্রসিদ্ধ নাগাসাকি শহর এই দ্বীপেই), শিমো, যাকু, টানেগা, ইত্যাদি। বড় দ্বীপগুলির আয়তন (বর্গমাইলে):

হোনশু—৮৭৫০০, কিয়ুশু—১৬২১৫,
হোকাইডো—২৯৯৫০, শিকোকু ৭২৫৫।

দ্বীপ হোনশু (Honshu) সব চেয়ে বড়। রাজধানী টোকিও এই দ্বীপেই। চতুর্থ দ্বীপ হোক্কাইডো (Hokkaido) হোনশুর উত্তরে।

টোকিও ইন্‌টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে প্লেন নামলো পাঁচটার জায়গায় সাড়ে সাতটায়। জাপানীদের সৌন্দর্যানুরাগের প্রথম পরিচয় এয়ারপোর্টেই পাওয়া গেল। কী পরিচ্ছন্ন পরিবেশ! দেওয়ালে, কার্নিশে কৃত্রিম চেরীফুলের বড় বড় স্তবক সাজানো। চেরীর মরশুম সামনে—তারই স্মারক হিসাবে এই ব্যবস্থা। চেরীফুল জাপানের গৃহ, উদ্যান, রাজপথের অন্যতম শোভাবিধায়ক। জাপানের সাহিত্য, সঙ্গীত, সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব, চিত্রকলা, অভিনয়—সর্বক্ষেত্রেই শত শত বৎসর ধরে চেরী তার প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। আশ্চর্য সুন্দর এই ফুল এবং সমস্ত গাছ-জোড়া তার অফুরন্ত প্রাণ-সমারোহ!

ইমিগ্রেশন, কারেন্সি কনট্রোল এবং কাস্টমস্-এর লেন দেন পর পর মিটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে প্যাসেঞ্জার লৌঞ্জ্-এ এলাম। এখানে যাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্যে বন্ধুবান্ধবরা অপেক্ষা করেন। বিরাট হল ঘর—অতি পরিপাটীভাবে সাজানো। একটি বাঙ্গালী বন্ধু তাঁর পরিচিত আরও দু'জন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে একটি ট্যাক্সিতে এয়ার-পোর্ট থেকে ১১ মাইল দূরবর্তী শহরে রওনা হলাম। দেখলাম এই এগারো মাইলও শহর-ছাড়া অন্য কিছু নয়।[৪] শিবাপার্ক হোটেলে আমার থাকবার ব্যবস্থা আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানী আগে থেকেই করে রেখেছিলেন।

পরদিন সকালে বাঙ্গালী বন্ধুটির সঙ্গে ট্রেনে কিয়োটো যাবার উদ্দেশ্যে টোকিও স্টেশনে উপস্থিত হলাম। টোকিও স্টেশন দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। শত শত যাত্রী আসছে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে, নীচে নামছে ক্ষিপ্র তাদের গতি, ব্যস্ত তাদের দৃষ্টি, কিন্তু প্রত্যেকেই আশ্চর্য শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলছে। যেন একটি সামরিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি! জাপানী পুরুষ মেয়ে—উভয়েরই রঙ খুব ফর্শা, দেহ বলিষ্ঠ, চালচলনে উদ্যম যেন উপচে পড়ছে, কিন্তু কথাবার্তায় (বিশেষতঃ বিদেশীদের সঙ্গে) আশ্চর্য মৃদুতা ও বিনয় পরিলক্ষিত। টোকিও স্টেশন হাওড়া স্টেশন থেকে যে অনেক বড়—এইটাই বিস্ময়ের কারণ নয়, বিস্ময়ের কারণ এই বিরাট স্টেশনের কর্ম-ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা এবং স্টেশনের প্রত্যেকটি কর্মীর নিরলস কর্মনিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধ। কলকাতার শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনের কথা মনে হয়ে অজ্ঞাতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আমাদের কিয়োটোগামী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছাড়লো। বন্ধু বললেন, এখানে ট্রেন ছাড়তে বা পৌঁছুতে এক মিনিট দেরী হলে তুমুল বিক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং কর্তৃপক্ষকে জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর কামরার পরিচ্ছন্নতা, বসবার আরাম এবং গঠন-সৌষ্ঠব দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। যাত্রীর ভিড় আছে, কিন্তু সেই ভিড় যাত্রাকে দুর্বিষহ করছে না, কামরাটিকে নোংরা করছে না। প্রত্যেকে জানে, এই গাড়ী আমাদের জাতীয় সম্পত্তি, একে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের। প্রত্যেকে জানে আমাদের সকলকেই চলতে হবে; কাজেই এমন কিছু আচরণ ক'রব না যাতে অপরের অসুবিধা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কামরার শৌচাগারের পরিচ্ছন্নতা দেখেও মুগ্ধ হলাম। ওখানেও একটি তাকের উপর একটি ভাসে ফুল সাজানো রয়েছে, চোখে পড়লো।

৪ বৃহত্তর টোকিওর পরিসর ৭৫০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৮৪ লক্ষ। আশপাশের অংশ বাদ দিলে শুধু টোকিও শহরের আয়তন ২২১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৫৪ লক্ষ। শুধু শহর হিসাব ধরলে টোকিও পৃথিবীর দ্বিতীয় বড় শহর।

জাপানের শহর ও গ্রাম দেখতে দেখতে চলেছি। গ্রামগুলি ছবির মতো। প্রত্যেকটি বাড়ী সুন্দর বাগান-ঘেরা। কোথাও একটু জমি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে বলে মনে হল না। শস্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাপানী হরফে লেখা সুচিত্রিত সাইনবোর্ড নজরে পড়লো। বন্ধু বললেন, রাজধানীর শিল্পবাণিজ্য-বিষয়ক পরিচিতি ওতে লেখা রয়েছে। মাঝে মাঝে কিছুদূরে বাম ধারে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, ডান ধারে পাহাড়। প্রকৃতিক দৃশ্য মনোরম। এখনও শীত চলেছে। জাপানী কৃষক—পুরুষ ও মেয়েরা গরম কাপড় পরে ক্ষেতে কাজ করছে। চেহারায় বেশভূষায় কারুরই দৈন্য নেই। গ্রামের রাস্তা দিয়ে মোটর সাইকেল চলছে। স্টেশনে স্টেশনে পরিষ্কার পোষাক-পরা ফিরিওয়ালা আসছে নানারকম ফল, খাবার ও পানীয় নিয়ে। খাবার জিনিস সুন্দর প্যাকেটে মোড়া। স্টেশনে আসবার আগে গার্ডের কামরা থেকে জাপানী ভাষায় মাইক্রোফোনে ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে—এবার অমুক স্টেশন আসছে, যাঁদের নামতে হবে—তাঁরা দয়া করে প্রস্তুত হোন্। সমস্ত কামরার ভিতরে দুই সারি বেঞ্চির মাঝখান দিয়ে একটি সোজা পথ গাড়ীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। যে কোন কামরা থেকে অন্য সব কামরায় যাওয়া যায়। এই পথ দিয়ে রেলওয়ে ভেণ্ডররা ফলের রস, সোডা লেমনেড, কফি প্রভৃতি বিক্রী করতে আসছে। অতি অমায়িক তাদের ব্যবহার, ভারি ভদ্র ও মিষ্টি তাদের কথা। এক ঘণ্টা পর পর একটি লোক এসে বুরুশ দিয়ে কামরাগুলির মেজে পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছে। কিয়োটোর পথে অনেকগুলি শিল্পকেন্দ্র চোখে পড়লো। বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত যন্ত্রে ছোট ছোট বহুবিধ শিল্পের প্রচলন জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিয়োটোয় যখন পৌছুলাম তখন সন্ধ্যা হতে বেশ দেরী আছে। স্টেশনের কাছে একটি হোটেলে আমাদের স্থান পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট ছিল। মুগ্ধ হলাম হোটেলের কর্মচারিবর্গ এবং চাকরদের প্রত্যেকের সৌজন্যে এবং আতিথেয়তায় এবং বলা বাহুল্য হোটেলের পরিচ্ছন্নতায়। সৌন্দর্যানুরাগ, পরিচ্ছন্নতা, পরিশ্রম, সৌজন্য এবং আতিথেয়তা—জাপানী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি জাপানে নামবার পর হতে জাপান ছাড়বার পূর্ব পর্যন্ত সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি।

হোটেলে একটু বিশ্রাম করে আমরা একটি ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কিয়োটোর দ্রষ্টব্য-স্থানগুলির কতক কতক আজই দেখে নিতে। কিয়োটো দশ শতাব্দী ধরে জাপানের রাজধানী ছিল (খ্রীঃ ৭৯৪ থেকে খ্রীঃ ১৮৬৮ পর্যন্ত)। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জাপানের সাংস্কৃতিক গৌরবের অন্যতম ধারকরূপে এই সহর দেশবিদেশের যাত্রী আকর্ষণ করে। হিগাশি হোঙ্গানজি মন্দির এখানকার বৃহত্তম বৌদ্ধমন্দির। আগাগোড়া কাঠের তৈরী বিরাট মন্দিরটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ কাষ্ঠসৌধ। বেদীর কারুকার্য এবং সজ্জাসৌষ্ঠব মনোমুগ্ধকর। বুদ্ধের মূর্তি কিন্তু মন্দিরের তুলনায় খুবই ছোট। প্রধান বেদীর দু-পাশে অপর দুটি বেদীতে প্রাচীন বৌদ্ধাচার্যদের মূর্তি। আরও কয়েকটি বৌদ্ধমন্দির কিয়োটোতে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল—কিয়োমিজুজি, কিঙ্কাকুজি, গিঙ্কাকুজি। এই মন্দিরত্রয় অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা নির্জন পরিবেশের মধ্যে নির্মিত। কিয়োটোর বৌদ্ধমন্দিরগুলির ভিতরকার গম্ভীর পবিত্র আব-হাওয়া অন্তরকে স্পর্শ করে। কয়েক জন ভক্তি-বিনম্র জাপানী নরনারীকে তথাগতের বেদীর সামনে চোখ বুজে বসে ধ্যান করতে দেখলাম। ভাল লাগলো। মনে হল ভারতবর্ষের কোন মন্দিরেই দেবদর্শন করতে এসেছি। কিয়োটোর দুটি প্রাচীন বৌদ্ধমঠও দেখলাম। শুনলাম ছোট ছোট মন্দির

ও মঠ কিয়োটোতে আরও অনেক আছে। সন্ধ্যার আলোকমালায় উজ্জ্বল কিয়োটোর প্রশস্ত সুন্দর রাজপথে দোকানের পর দোকান জাপানী শিল্পজাত বিচিত্র নানা দ্রব্যসম্ভারে ঝলমল করছিল।

পরের দিন সকালে জাপানের অন্যতম ধর্ম 'শিন্টো'-মতের কয়েকটি মন্দির দেখলাম। সব চেয়ে বড় মন্দিরটির নাম হিআন জিংগু। মন্দির, উৎসবপ্রাঙ্গণ, হ্রদ, বাগান প্রভৃতি নিয়ে একটি প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদ বিশেষ। এই তিনটি মন্দিরও খুব সুন্দর—য়াসাকা (বা গিওন) মন্দির, কিটানো মন্দির এবং ইনারি মন্দির। মন্দিরে কোন মূর্তি নজরে পড়লো না। শিন্টোধর্ম প্রধানতঃ প্রাকৃতিক শক্তি, পূর্বপুরুষ এবং পরলোকগত সম্রাটদের আত্মার উপাসনা। এঁদের স্মারকরূপে প্রস্তর-জাতীয় কিছু প্রতীক বেদীর উপর দেখলাম। সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতি সংরক্ষণই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। জাতীয় ঐক্যবোধের পরিপুষ্টির জন্যে মন্দিরগুলিতে নানা উৎসবাদির ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে করা হয়। শিন্টো মন্দির-গুলির থাম এবং কড়ি বরগা ঘোর লাল রঙের। প্রত্যেকটি মন্দিরে প্রশস্ত চত্বর এবং বহু রকমের ফুল এবং লতাপাতাযুক্ত সুন্দর বাগান রয়েছে। চেরীর সময়ে এই বাগানগুলি অপূর্ব শোভা ধারণ করে। শিন্টোমন্দিরে বৌদ্ধমন্দিরের আধ্যাত্মিক আব-হাওয়া অনুভব করলাম না।[৫] কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ, কারুকলা এবং অতি যত্নে রক্ষিত পুষ্পো-দ্যানের জন্যে মন্দিরগুলি চিত্তবিনোদন ও সামাজিক সম্মেলনের উপযুক্ত স্থান বটে।

এর পরে আমরা কিয়োটোর অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে রাজপ্রাসাদ, নিজো দুর্গ (Nijo Castle) এবং ক্যান্নন রেইজান (Kannon Reizan) বা একটি পাহাড়ের চূড়ায় নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বুদ্ধের প্রস্তর মূর্তি দেখে নিলাম। নিজো দুর্গটি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে নির্মিত। মোমোয়ামা যুগের স্থাপত্যের একটি চমৎকার নিদর্শন। দুর্গের মধ্যে নিনোমারু প্রাসাদ। এখানে অনেক প্রাচীন চিত্র দেখলাম। কিয়োটোর মারুয়ামা পার্কটি একটি চমৎকার বেড়াবার জায়গা। জাপানের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে জাপানী শিল্পপ্রতিভা সংযুক্ত হয়ে এই প্রমোদো-দ্যানটিকে অতুলনীয় আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত করেছে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর এই পার্কটি দেখে যায়। কিয়োটোর সব চেয়ে বড় আকর্ষণ এখানকার সাময়িক উৎসবগুলি। ১৫ই মে বসন্ত কালের উৎসব—আওই মাৎসুরি, ১৭ই জুলাই বর্ষার উৎসব—গিওন উৎসব, ২২শে অক্টোবর শরৎকালীন উৎসব—জিদাই মাৎসুরি। 'মিইআকো ওদোরি' হল চেরী নৃত্য। এই উৎসবগুলিতে পুষ্প-সজ্জা এবং জাপানী নরনারীর বর্ণাঢ্য পোষাক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

কিয়োটোয় জাপানের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি রক্ষণশীলতা এখনও সুস্পষ্ট। বর্তমান রাজধানী টোকিও-সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। টোকিওর রাজপথে প্রাচীন জাপানী পরিচ্ছদ-পরিহিত নরনারী খুব কম দেখতে পাওয়া যায়—কিয়োটোয় কিন্তু অনেক চোখে পড়ে। মেয়েদের প্রাচীন জাপানী পোষাকের একটি স্বকীয় চমৎ-কারিতা রয়েছে। টোকিওর আবহাওয়া প্রায় ষোল আনাই পাশ্চাত্যগন্ধী।

কিয়োটো থেকে ট্রেনে আমরা নারায় এলাম। নারা সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে জাপানের রাজধানী[৬] ছিল। ভাস্কর্য, সাহিত্য এবং শিল্পকলায় নারা

৫। সাম্প্রতিক কালে শিন্টোধর্মে সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিতে অনুস্যূত একটি সর্বব্যাপী শক্তির ধারণা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে। জীব ও জগতের নিয়ন্তা এক পরমেশ্বরের ধারণাও কিছু কিছু সমাদৃত হচ্ছে।

৬। ৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কাম্মু নারা থেকে রাজধানী কিয়োটোয় নিয়ে যান।

তখন তার গৌরবের শীর্ষদেশে উঠেছিল। এখনও বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে তোদাইজি মন্দিরে দাইবুৎসুর (বুদ্ধদেব) উপবিষ্ট ব্রোঞ্জের বৃহৎ মূর্তিটি সত্যই বিস্ময়কর। জাপানে এইটিই সবচেয়ে বড় বুদ্ধ মূর্তি। উচ্চতা—৫৩½ ফুট, মুখের মাপ ১৬ ফুট × ৯½ ফুট। এত বড় মূর্তি যে কাঠের মন্দিরে সমাসীন, তার বিশালতা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীতে এই মন্দিরটিই বৃহত্তম কাঠের বাড়ী। দাইবুৎসু হলেন বিরোচন বুদ্ধ। নারার একটি পাঁচতলা কাঠের প্যাগোডা এখানকার অন্যতম প্রাচীন কীর্তি। ৭১০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত প্যাগোডাটির নাম কোফুকুজি, উচ্চতা—১৬৫ ফুট। নারার শিণ্টো মন্দিরের মধ্যে কাসুগা মন্দির ভাস্কর্য, নির্মাণ-কৌশল এবং জাঁকজমকে অতুলনীয়। একটি গোটা পাহাড় জুড়ে এই মন্দির—প্রবেশ পথই প্রায় ½ মাইল। সারা পথের দুধারে হাজার হাজার পাথরের দীপ রয়েছে, বিশেষ বিশেষ পর্বে জ্বালা হয়। নারা পার্ক এবং মিউজিয়ম দেখেও খুব আনন্দ হল। নারার বাজারে এখানকার গৃহশিল্পজাত নানা রকমের জাপানী পাখা এবং পুতুল দেখে চোখ ঝলসে গেল। নারায় আমরা আরও অনেকগুলি ছোট বড় মন্দির দেখেছিলাম। সন্ধ্যার পর প্রাচীন সামন্ততন্ত্র ও পরবর্তী রাজনৈতিক জাগরণের সন্ধিক্ষণে জাপানের সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচয়-সূচক একটা চলচ্চিত্রও দেখবার সুযোগ হয়েছিল।

* * *

কামাকুরার ট্রেনের জন্যে নারা স্টেশনে রাত্রে বসে আছি। মে মাসেও প্রচণ্ড শীত। তৃতীয় শ্রেণীর ঘুমাবার বেঞ্চি (Sleeping accommodation) রিজার্ভ করা ছিল। গাড়ী এল। একটি রেলওয়ে কর্মচারী সযত্নে ঐ কামরায় নিয়ে গিয়ে আমাদের দুজনের বেঞ্চি দুটি দেখিয়ে দিলেন; এত সৌজন্য, যেন তাঁর নিজের বাড়ীতে বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত অতিথিকে সমাদর করে নিয়ে যাচ্ছেন! বেঞ্চিতে সুন্দর পরিষ্কার বিছানা পাতা রয়েছে, গায়ে দেবার কম্বলও। সমস্ত গাড়ীটিতে একশ'রও বেশী এইরূপ শয্যা। কয়েক জন রেলওয়ে কর্মচারী সারা রাত জেগে যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখছেন। সকালে তাঁরা বিছানাগুলি তুলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো করতে লাগলেন দেখলাম। বন্ধু বললেন, দ্বিতীয়বার ব্যবহার করবার আগে সব কাচা হবে।

কামাকুরা জাপানের অতি প্রাচীন শহর। কেঙ্কোজি এবং এঙ্গাকুজি—পুরাতন বৌদ্ধ মন্দির দুটি দেখে এখানকার 'দাইবুৎসু' (বৃহৎবুদ্ধ) দর্শন করতে গেলাম। একটি টিলার উপর ব্রোঞ্জে নির্মিত ভগবান বুদ্ধের বিরাট ধ্যানমূর্তি। কোন মন্দির নেই। সাত শত বৎসর ধরে রৌদ্র, বরফ ও ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে নিশ্চল ধ্যান-মূর্তিটি একই অবস্থায় বসে। জায়গাটির পরিবেশ খুব গম্ভীর; মূর্তির মুখের ভাবও অতি প্রশান্ত। কামাকুরার শিণ্টো মন্দিরও বিখ্যাত; নাম—হাচিমান গৃ। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত। সংলগ্ন উদ্যানও দেখবার মতো।

কামাকুরা দেখে আমরা মোটরে এনোশিমায় এলাম। সমুদ্রের কূলে একটি মনোরম দ্বীপ। দৃশ্য অতি সুন্দর। এখান থেকে জাপানের প্রসিদ্ধ তুষারাবৃত ফুজি পর্বত চমৎকার দেখা যায়। নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি—উচ্চতা ১২,৩৯৪ ফুট।

রাজধানী টোকিও ঘুরে দেখবার সময় পেয়েছিলাম প্রায় দুই দিন। রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে শহর ছড়িয়ে পড়েছে—পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ শহর। এখানকার অতি আধুনিক বিরাট অট্টালিকাসারি, প্রশস্ত রাজপথ, বড় বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স, বিশ্ববিদ্যালয়, আর্ট গ্যালারি, বড় বাজার—'গিঞ্জা', লোকনৃত্য 'কাবুকী'র প্রেক্ষাগৃহ—

'কাবুকিজা'—প্রত্যেকটিই নিজস্ব গৌরব ও মাদকতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে নির্মিত বৌদ্ধমন্দির হোঙ্গানজি টেম্পলও দেখলাম। টোকিও আধুনিক জাপানের কর্মোদ্যম, স্থাপত্য, যান্ত্রিক কৌশল এবং শিল্প ও বাণিজ্য-সমৃদ্ধির নিদর্শন। বড় বড় বইএর দোকানও দেখলাম। জাপানীরা খুব পড়ে। বিদেশের যাবতীয় সেরা বই জাপানী ভাষায় অনূদিত হতে বেশী সময় লাগে না। মাতৃভাষার উপর জাপানীদের অত্যন্ত অনুরাগ! সহজে এরা জাপানী ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতে চায় না।

জাপান থেকে বিদায় নেবার আগে এই ধারণাই মনে বসে গিয়েছিল যে পাশ্চাত্ত্য যান্ত্রিক সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা অবাধে গ্রহণ করলেও জাপানের প্রাণ পাশ্চাত্ত্যমুখী নয়। এশিয়ার ছাপ তার সহজে যাবার নয়, মুছে ফেলার পক্ষপাতীও সে নয়। তার ধর্ম, সমাজ এবং ভাষার ভারসাম্য এখনও নড়ে নি।

* * *

টোকিও থেকে বিমান-যাত্রা বরাবর প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে। এক রাত প্লেনে কাটিয়ে সকালে 'ওয়েক আইল্যাণ্ড' নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে দেড় ঘণ্টার জন্য নামা হয়েছিল। রাত্রে হনলুলু পৌঁছুলাম। এটি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা। ওয়েক এবং হনলুলুর মাঝামাঝি 'ইন্টার-ন্যাশনাল ডেট্‌লাইন' অতিক্রম করে এসেছি। একটা দিন সময়ের তহবিলে বেঁচেছে। ৪ঠা এপ্রিল রাত ৯টায় টোকিও থেকে যাত্রা করে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আকাশে উড়েও হনলুলুতে পৌঁছেছি ৪ঠা এপ্রিলেই রাত ৯টায়।

আমেরিকার পরিচয় হনলুলুতেই পাওয়া যায়, যদিও পুরোপুরি নয়। প্রাচ্যের বাতাস এখানেও অনেকটা বয়। ফিলিপাইন, জাপান, চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের নরনারীর বেশ আনাগোনা রয়েছে। স্বাস্থ্যকর বেড়াবার জায়গা—এখানকার সমুদ্র-স্নান মুসাফিরদের অন্যতম আকর্ষণ। হনলুলুর রাস্তায় নানা ধরণের পোষাক-পরা লোক দেখে বেশ মজা লাগছিল। এখানে পোষাকের কোন সামাজিক ছকবাঁধা নিয়ম নেই। এখানে কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির দেখলাম—খ্রীষ্টীয় গির্জার অনুকরণ পুরোপুরি। প্রাচ্যের ধর্ম-পরিবেশ জাপানেই ছেড়ে এসেছি! মিউজিয়ম এবং আর্ট গ্যালারিও দেখা হল। হনলুলুতে বেদান্তানুরাগী একটি গোষ্ঠী আছে। এঁদের কাছে একদিন সন্ধ্যায় কিছু বলতে হল। টোকিও থেকে পাশ্চাত্ত্য পোষাক পরে এসেছিলাম। স্থানীয় ভক্ত বন্ধু মিঃ ম্যারোজি বললেন, আপনি গেরুয়া কাপড় পরেই বলবেন। কেউ কিছু মনে করবে না, পছন্দ করবে। তাই করেছিলাম।

৬ই এপ্রিল রাত ১০টায় হনলুলু থেকে প্যান-আমেরিকানের স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো-গামী প্লেন ছাড়লো। আশা-প্রতীক্ষার স্পন্দন বুকে টের পেলাম—এবার তবে যাত্রা শেষ হতে চলেছে! অথবা যাত্রার আরম্ভ? আগের তিন রাত্রের চেয়ে আজ রাতে চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে অনেক বেশী স্বস্তি ও নিশ্চিন্ত বোধ করছিলাম। বেশ সকালেই ঘুম ভাঙলো। উপরে স্বচ্ছ অনন্ত আকাশ, নীচে স্বচ্ছ পারাবারহীন মহাসমুদ্র। ঘণ্টা দেড়েক পরে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর মাইকে শোনা গেল: আমরা সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে নামছি।

প্লেন নামলো। সিঁড়ি বেয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা দিলাম। প্রতীক্ষমাণ প্রিয় জনদের সাদর অভ্যর্থনায় অন্ততঃ তখনকার মতো ভুলে গেলাম ভারতবর্ষ থেকে সাড়ে দশ হাজার মাইল দূরে এসে পড়েছি।

(সমাপ্ত)

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ

[ফ্রান্সে বেদান্ত-প্রচারক]

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে পূর্বতন কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত ত্রিচুড়ের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে—স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যখন ভারতের আকাশ বাতাস বেদান্ত-নির্ঘোষে মুখরিত তখন—যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল পরবর্তীকালে বর্তমান যুগ-প্রয়োজনে সে যে বেদান্ত-প্রচার কার্যেই জীবন উৎসর্গ করিবে—ইহাই যেন বিধাতার অভীপ্সিত ছিল।

যথাসময়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া গোপাল (স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম) ১৯২০ খৃঃ বাইশ বৎসর বয়সে মায়লাপুরে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করিয়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষালাভ করেন। ১৯২৪ খৃঃ দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করিয়া নব যুগের জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়ী সাধনায় মগ্ন হন।

মাদ্রাজে থাকাকালে তিনি 'বেদান্ত-কেশরী' ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদন-কার্যে সহায়তা করিতেন, এবং কিছুকাল স্থানীয় কেন্দ্রের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ছিলেন।

অতঃপর মহীশূরে রামকৃষ্ণ-কেন্দ্র স্থাপনার কার্যে প্রেরিত হইয়া প্রাথমিক সংগঠন তাঁহাকেই করিতে হইয়াছে। ঐ আশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর কিছু দিনের জন্য তিনি বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ হন। এখান হইতেই ১৯৩৭ খৃঃ বেদান্ত-প্রচার কার্যের জন্য বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ফ্রান্সে প্রেরণ করেন।

ইহার পূর্বে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দেই জার্মানিতে বেদান্ত-প্রচারে নিযুক্ত স্বামী যতীশ্বরানন্দজী—ভারতকৃষ্টির অনুরাগী কয়েকজন ফরাসী মনীষী-কর্তৃক আহূত হইয়া প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় সরবোঁতে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সভার পরিচালনা করিতে ফ্রান্সে আসেন। পরে রামকৃষ্ণ-সংঘে সুপরিচিতা মিস ম্যাকলাউড ও কয়েকজন ফরাসী ভারতহিতৈষী বন্ধু বেলুড় মঠকে অনুরোধ করেন, তাঁহারা যেন ফ্রান্সে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত কবিবার জন্য একজন সন্ন্যাসী পাঠান।

এই সহৃদয় আহ্বানের উত্তরেই ১৯৩৭ খৃঃ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ তথায় প্রেরিত হন। ১লা আগষ্ট তিনি ফ্রান্সে পদার্পণ করিলে সতোঁ (Sauton) দম্পতি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহাদের জীবনও মিশনের কার্যে পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত হয়।

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ ভার্সাই-য়ে গীতা-সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়া তাঁহার কাজ আরম্ভ করেন, তিনি ইংরেজিতে বলিতেন, এবং উহা সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীতে অনূদিত হইত।

তারপর আসিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বাধ্য হইয়া স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে ফ্রান্সের দক্ষিণে পল্লী অঞ্চলে সরিয়া আসিতে হইল। তখন তাঁহাকে খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাইতে হয়। তাঁহাকে বন্দী-শিবিরে প্রেরণের ভয়ও দেখান হইয়াছিল। এত দুঃখ বিপদের মধ্যেও এই সময়টি ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠিতেছিল। কারণ এই সময়েই স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ ফ্রান্সের ভাষা বেশ আয়ত্ত করিবার সুযোগ পান, এবং তুলোঁ (Toulouse) ও মঁ-পেলি (Mont pellier) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে আসেন ও সেখানে বেদান্ত সম্বন্ধে যে বক্তৃতাবলী দেন, পরে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

যুদ্ধের শেষে প্যারিসে ফিরিয়া সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিতে থাকেন,

তন্মধ্যে বেদান্ত, বুদ্ধ, সেন্ট জন, মেষ্টার একহার্ট সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি জনচিত্তে গভীর রেখাপাত করে। সরবোঁতে ভারতীয় কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তিনি দুই বৎসর ধরিয়া 'তৈত্তিরীয়' এবং দুই বৎসর 'মাণ্ডূক্য' উপনিষদ্-বিষয়ে নিয়মিত অধ্যাপনা করেন।

ইতোমধ্যে বেদান্ত-চিন্তা-বিষয়ক তাঁহার প্রবন্ধ ও পুস্তক ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকে, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 'ধ্যান ও যোগবেদান্ত' 'বেদান্ত-দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধ' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধর্ম-সমন্বয়'।

১৯৪৬ খৃঃ অক্টোবরে তিনি কয়েক মাসের জন্ম একবার ভারতে আসেন; উত্তর ও দক্ষিণভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং বেলুড়মঠে কিছুদিন কাটাইয়া ১৯৪৭ খৃঃ প্রথমেই ফ্রান্সে ফিরিয়া যান।

১৯৪৮ খৃঃ মার্চ মাসে প্যারিস হইতে ২২ মাইল দূরে সীন-নদী-তীরে গ্রেজ-নামক স্থানে (Gretz, Seine-et-Marne) একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম কিছু জমি ও তন্মধ্যস্থ গৃহ তাঁহাকে প্রদত্ত হয়. সেখানে বারো জন অনুরাগী ছাত্র ও শিষ্য তাঁহার তত্ত্বাবধানে ত্যাগের ও সাধনার জীবন যাপনের ব্রত গ্রহণ করে, এতদ্ব্যতীত বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ লইতে আসিত, কেহ বা আসিত আশ্রমের শান্ত সংযত পরিবেশে নিজ নিজ জীবনের শান্তির সন্ধানে।

আশ্রমের এই সকল নিত্য নিয়মিত কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃতিমূলক কাজেরও গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছেন—যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা—মানুষ-গড়ার ধর্ম—রূপায়িত হইবে, যেখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নিজেদের এক পরিবারভুক্ত ভাবিয়া পরস্পরকে ভাই বলিয়া দেখিতে শিখিবে।

প্রবন্ধ, বক্তৃতা, ব্যক্তিগত উপদেশ প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি সর্বত্র সকলের খুব প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার সরল অমায়িক সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার, গভীর ধর্মপরায়ণ স্বভাব, জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়ে সুগঠিত চরিত্র তাঁহাকে যেন বিশেষভাবে তাঁহার জীবনব্রতের উপযুক্ত করিয়াছিল। দুর্বল শরীর ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া সারা জীবন তিনি অক্লান্তভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন।

১৯৫৩ খৃঃ গ্রেজের আশ্রম কেন্দ্রটি 'সেণ্টার বেদান্তিক রামকৃষ্ণ, প্যারিস' (Center Vedantique, Ramakrichna, Paris) নামে রেজেষ্ট্রি করার পর ফ্রান্সে বেদান্তকেন্দ্র একটি স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করিলে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের জীবনব্রত যেন সমাপ্ত হইল।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি কঠিন কর্মের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িলে বিশ্রাম লইতে বাধ্য হন, তখন তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্ম বেলুড় মঠ হইতে একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হন।

১৯৫৬ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারি শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ যে ভাষণ দেন তাহাই যেন তাঁহার জীবনের শেষ সঙ্গীত। তিনি বলেন : শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে 'শাশ্বত-নারী-প্রকৃতি'র স্বরূপটি হইল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ।

১৯৫৭ খৃঃ ২রা এপ্রিল রাত্রি ২টার পর বমির ভাব দেখা দেয় এবং সকাল হইতে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ক্ষীণ হইতে থাকে, বেলা ১-১৫ মিঃ সময় সজ্ঞানে গঙ্গাজল পান করিয়া শ্রীগুরু মহারাজের নাম শ্রবণ করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। লণ্ডনের বেদান্ত-কেন্দ্র হইতে স্বামী ঘনানন্দজী আসিলে চার দিন পরে প্যারিসে তাঁহার দেহ সৎকার করা হয়। কিছুদিন পূর্বে তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহের ভস্মাবশেষ যেন গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়।

সমালোচনা

Education and Reconstruction—লেখক ও প্রকাশক—লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, বিনয়পল্লী, পোঃ—শান্তি নিকেতন, বীরভূম। মূল্য—৸৹, পৃঃ সংখ্যা—৫৯

সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই শিক্ষাকে জীবন-কেন্দ্রিক করার চেষ্টা চলছে। ফলে শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণীর মান অনুসারে শিক্ষার বিষয়সমূহ ও কার্যসূচীতে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দেখা দিয়েছে। শিক্ষাদানের প্রণালী বা পদ্ধতিও এই নূতন চিন্তাধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই শিশু-শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করতে গিয়ে হাতের কাজকে ধরা হয়েছে শিক্ষার মাধ্যম।

শিক্ষাধারায় পরিবর্তনের ঢেউ ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতিতেও আঘাত দিয়েছে। এখানকার শিশুশিক্ষা আজ শিল্প-মাধ্যম। শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহাশয় সারা-জীবনই শিক্ষার কাজ নিয়ে কাটিয়েছেন। তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দেশ-বিদেশের শিক্ষাধারাকে নিয়ে। তাঁর কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধকে নিয়ে "Education and Reconstruction" পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে।

এতদিন যে পদ্ধতিতে শিক্ষা চলে এসেছে তা দেশে একটা সংস্কারের মত চেপে আছে। নূতন কিছু করতে গেলে সহজে কেউ গ্রহণ করতে চায় না। শিল্প-মাধ্যম শিক্ষা চালু করার জন্য—সরকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দেশের লোক যে সহজে এটা চায় না—তা যাঁরা এই কাজ করছেন তাঁরা বুঝতে পারেন। এ জন্য দরকার সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা। শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহাশয়ের পুস্তিকাটি প্রচার কার্যে সাহায্য করবে। নইতালিমের যে সব বাংলা পুস্তক আছে সেগুলি থেকে এর চিন্তা-প্রণালী একটু পৃথক।

লেখক দেখিয়েছেন—যন্ত্রের আবিষ্কার ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি। মানুষ বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য করেছে চিন্তা। সেই চিন্তাকে নিত্য নৈমিত্তিক কাজে ব্যবহারের জন্য মানুষ তৈরী করেছে যন্ত্র। হাত, পা, কান, চোখ সবই যন্ত্রের ব্যবহারে নিয়োজিত। শিক্ষা যদি সভ্যতার বাহন হয় তবে শিক্ষায়ও আজ যন্ত্রের প্রয়োজন, তাই শিক্ষা আজ কর্ম-মাধ্যম।

এইভাবে লেখক তাঁর চিন্তাকে মোট ছয়টি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করছেন। আশা করি পুস্তিকাটি সাধারণ পাঠ্য হিসাবেও সকলের আদর লাভ করবে।

—শ্রীপরমেশ্বর জানা

ভক্তের ভগবান্—শ্রীকালী মোহন শর্মা অধিকারী প্রণীত, প্রকাশক শ্রীঅসিত বঞ্জন শর্মা, ১, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬। পৃষ্ঠা—৩১৫; মূল্য—৪৲ টাকা।

ভক্তির সাধনা ঠিক ঠিক হইলেই 'ভক্তের ভগবান্' কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। গ্রন্থকার ভাবুক ও ভক্তিপথের সাধক। এই গ্রন্থে তিনি সরল ভাষায় শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা ভক্তি-তত্ত্বটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সাকার নিরাকার তত্ত্ব লইয়া গ্রন্থের আরম্ভ এবং নাম-মাহাত্ম্যে ইহার পরিসমাপ্তি। 'সৃষ্টিতত্ত্ব,' 'জন্ম-মৃত্যু-তত্ত্ব,' 'ভক্তি ও ভক্ত,' 'শ্রীশ্রীগুরু-তত্ত্ব' প্রভৃতি অধ্যায়ে ব্যাখ্যাপটুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্তি-সাধকগণের নিকট পুস্তকটি আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বরাহনগর : বার্ষিক উৎসব

গত ২৭শে এপ্রিল হইতে ১লা মে পর্যন্ত ৫ দিন ধরিয়া বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামীজীর জন্মোৎসব ও আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সকাল ৭ ঘটিকায় স্বামীজীর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচিত হইলে উপনিষদের মন্ত্র বৈদিক শান্তিপাঠ, ও ভজন সংগীতে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

বৈকালে শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তীর একটি ধ্রুপদ গানের পর স্বামী ওঁকারানন্দজী বলেন : আমরা অপর দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া আছি, তাহাদের আমরা অনুকরণ করি, কিন্তু ভারতের সংস্কৃতি বাদ দিয়া আমাদের কল্যাণ হইতে পারে না। আমাদের জাতীয় জীবন বাঁচাইতে হইলে গ্রহণ করিতে হইবে—স্বামীজীর ভাবানুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ। অতঃপর ধ্রুপদ গান ও খেয়াল গানের আসরে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশেষ গায়কগণ অংশ গ্রহণ করেন।

পরদিন ২৮শে এপ্রিল বৈকালে কালীকীর্তনের পর বক্তৃতা করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, শ্রীজনার্দন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরথীন রায়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-কীর্তন সকলকে আনন্দ দান করে। ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণ করেন প্রাক্তন স্পীকার শ্রীশৈল কুমার মুখোপাধ্যায়।

৩০শে এপ্রিল ছাত্রগণ "আত্মহত্যা" ও "নদের পাগল" নাটক অভিনয় করে। ১লা মে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ভজন সংগীত ও সাধুসেবা হয়। সন্ধ্যায় ইলেকট্রিক গীটার বাদনের পর রাত্রে প্রায় ৩৫০০ দর্শক 'রামপ্রসাদ' নাটক অভিনয় দর্শন করেন।

জয়রামবাটী : শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির

গত ২রা মে, ১৯শে বৈশাখ শুভ অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার পঞ্চত্রিংশ বাৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গল আরতি, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শ-উপচারে পূজা ও হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভজন উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রাতে ৮॥ ঘটিকায় পত্র পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত শ্রীশ্রীমায়ের একটি বৃহৎ প্রতিকৃতি লইয়া ব্যাণ্ড, ঢাক, ঢোল ও কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যসহ একটি শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। দ্বিপ্রহরে প্রায় দুই হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি সভায় স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, স্বামী আদিনাথানন্দ এবং শ্রীযুক্তা সত্যবতী রায়চৌধুরী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। এই উৎসবে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্ত যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন।

বহরমপুর : শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্ম-মহোৎসব

৬ই বৈশাখ শুক্রবার—জেলা শাসক মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয় "শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও শিক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন শ্রীচারু চন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ), স্বামী অন্নদানন্দ, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ এবং স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী। প্রায় ২০০০ শ্রোতা মুগ্ধ চিত্তে জীবনালোচনা শ্রবণ করেন। ৭ই বৈশাখ শনিবার শ্রীনগেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য এম-এল সি-মহাশয়ের সভাপতিত্বে জনসভা হয় (শ্রোতৃ-সংখ্যা ৫০০০)। ৮ই রবিবার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভজন সঙ্গীতে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। সন্ধ্যায় কীর্তন-কলানিধি শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের কীর্তন—রাত্রি ১২॥০টা অবধি চলিয়াছিল। প্রায় ৮০০০ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় : বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের উদ্যোগে 'সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়'

প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হইয়াছে। সংস্কৃত-ভাষা ভারতের জাতীয় আদর্শের বাহন, ইহার অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিয়াছে। *স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল বেলুড়ে একটি* সর্বাঙ্গ সুন্দর 'সংস্কৃত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ তাহা রূপায়িত হইতে চলিয়াছে। পরিকল্পনাটিকে আকাঙ্ক্ষিত রূপ দিবার জন্য আনুমানিক ৫৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সহৃদয় দেশবাসীর বদান্যতায় ও সরকারী সংযোগিতায় ইহা সার্থক পরিণতি লাভ করিবে। প্রাচীন নালন্দা, তক্ষশীলা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা প্রভৃতি মহাবিদ্যাবিহারের ছাঁচে এই বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হইবে বেলুড় মঠের সন্নিকটে। শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের পুণ্য-স্মৃতি বিজড়িত গঙ্গাতীরবর্তী বাগানটি এই উদ্দেশে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। পরিকল্পিত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি সন্নিবেশিত থাকিবে: (১) স্নাতকোত্তর বিদ্যার্থিবৃন্দের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় উচ্চতম (এম্-এ) উপাধি প্রাপ্তির উপযুক্ত পরিষৎ। (২) ভারতে ও ভারতের বাহিরের দেশ সমূহে সংস্কৃতের গবেষণাকেন্দ্র। (৩) প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও সংস্কৃত গ্রন্থাগার। (৪) ভারতীয় ও ইংরেজী ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ, গ্রন্থ প্রকাশন এবং প্রকাশিত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ। (৫) সংস্কৃত-ঐতিহ্যমূলক সংগ্রহশালা ও শিল্প প্রদর্শনাগার। (৬) "বৃহত্তর ভারত-ভবন"—যেখানে থাকিবে ভারত এবং সিংহল, তিব্বত, মধ্যএশিয়া, ব্রহ্ম, মালয়, সুমাত্রা, যাভা, বলি, কম্বোডিয়া, শ্যাম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা।

বিবিধ সংবাদ

লণ্ডনে ভারতীয় সঙ্গীতের সমাদর—এশীয় সঙ্গীত-চক্রের সভাপতি বিশ্ববিখ্যাত বেহালা বাদক য়েহুদী মেনুহিন লণ্ডনে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে ভারতীয় সেতারী রবিশঙ্করকে পরিচিত করাইতে গিয়া বলেন: 'ভারতীয় সঙ্গীত নিম্নতর ভাবাবেগ হইতে উচ্চতর ধ্যানের স্তরে মানুষের মনকে মুক্তি দিতে চায়। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত হইতে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতীয় সঙ্গীত সৃষ্টি করে শ্রোতা ও শিল্পীর প্রাণে আত্মসমর্পণের পরিবেশ।'

চার বৎসর পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীতের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে উহা তাঁহার জীবনের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন: 'ভারতীয় সঙ্গীত চায় ব্যক্তি-সাধনার ভিতর দিয়া ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে; আর পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত চায় বহুবিধ যন্ত্রের বিচিত্র সমাবেশ। ভারতীয় সঙ্গীত-সাধনা একটি সুরের এবং একটি শিল্পীর পবিত্রতা রক্ষায় সচেষ্ট, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সমবেত ঐকতানে বহুকে মিলাইবার প্রচেষ্টা। ভারতীয় সঙ্গীত এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। তাহার কোন ছাপানো স্বরলিপি নাই। শিল্পী অবিরত তাহার সুর সৃষ্টি করিতেছে; সূক্ষ্ম সুর ও তাল সম্বন্ধে তাহার চিত্ত সর্বদা সচেতন।' (P. T. I.)

অদ্বৈতানন্দ-মহারাজের জন্মোৎসব—গত ২২শে বৈশাখ ১৩৭৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ অদ্বৈতানন্দজীর জন্মস্থান দক্ষিণ জগদ্দল গ্রামে রামকৃষ্ণ অদ্বৈতানন্দ সংঘের পরিচালনায় তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্মানুষ্ঠানে রাজপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। সন্ধ্যায় কালীকীর্তনের পর ছায়াচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। প্রাতে নগর-সংকীর্তন ও ভজনের পর মধ্যাহ্নে প্রায় তিনশতাধিক গ্রামবাসী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব:—হেড়্যা, মেদিনীপুর। গত ২৭-২৮শে এপ্রিল, কল্যাচক বিবেকানন্দ মিলন-সংঘের উদ্যোগে—শোভাযাত্রা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা ও কথকতার মাধ্যমে বার্ষিক-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ভ্রমসংশোধন:

গত জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা পৃঃ ২৩৭: 'প্রশস্তি' কবিতার পঞ্চম পঙ্‌ক্তি পড়িবেন, 'মূর্ছিত সংগীত যেথা সুরহারা মূক নিঃস্বতার'।

উদ্বোধন

অনাহত আহ্বান

লোকানুন্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন্
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ন্ ।
গোপান্ সম্ভ্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জৃম্ভয়ন্
ওঙ্কারার্থমুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রম্)

দ্যুলোক ভূলোক অন্তরীক্ষলোকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া, ত্রিভুবনকে উন্মত্ত করিয়া ঋক্ সাম যজুঃ বেদত্রয়কে প্রকাশিত করিয়া—মৌন শ্রুতিকে মুখরিত করিয়া, তরুরাজিকে পুলকিত পল্লবিত করিয়া, কঠিন শিলাময় পর্বতকে বিগলিত করিয়া—নির্ঝর-ধারায় প্রবাহিত করিয়া, জীবজন্তুকে মুগ্ধ বিবশ করিয়া, ধেনু-বৎস-বৃষকুলকে আনন্দিত করিয়া, গোপ-গোপী-গণকে মিলনের পথে ত্বরান্বিত করিয়া, ধ্যানমগ্ন যোগী মুনিদিগের চিত্তকমল প্রস্ফুটিত করিয়া, সঙ্গীতের সপ্তসুরকে মূর্ছিত করিয়া, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াত্মক প্রণবের অর্থ প্রকটিত করিয়া চিরশিশু শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি—শ্রীভগবানের মোহন শব্দশক্তি চিরদিন সকলের হৃদয় মন জয় করিয়া স্বমহিমায় বিরাজমান।

এই অনাহত আহ্বান-ধ্বনি অপ্রতিহতভাবে বাজিয়া চলিয়াছে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া দেশকালকে অতিক্রম করিয়া। এ অরোধ্য আহ্বান-ধ্বনি স্থাবর-জঙ্গমকে ডাকিতেছে—গাছপালা পশুপাখী দেবতা মানব সকলকে ডাকিতেছে—জড়ীভূত মোহনিদ্রা সুখতন্দ্রা ভাঙিবার জন্য ডাকিতেছে—জ্ঞানময় প্রেমময় জাগ্রত জীবনের দিকে ডাকিতেছে। অজ্ঞাতসারে এই আহ্বানে সাড়া দিয়া সীমার সংকীর্ণতা হইতে মুক্তির আনন্দময় সঙ্গীতের স্রোতে জগৎসংসার স্বভাবতই ভাসিয়া চলিয়াছে।

কথাপ্রসঙ্গে

জীবন ও দর্শন

জীবনের জন্যই দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম—সব কিছু। জীবনকে বাদ দিয়া কোনটিরই কোন মূল্য নাই। জীবনের প্রয়োজনেই মানুষের সকল চেষ্টা, জীবনের প্রয়োজনেই বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে মানুষের মনেই জাগিয়াছে বিভিন্ন চিন্তা। যে সূক্ষ্ম যুক্তি-পরম্পরা শান্ত মনের গভীরতা হইতে উঠিয়া অনুভূত জগৎ ও জীবনের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে চাহিয়াছে—যাহার ফলে মানুষ 'মনুষ্য'-পদবাচ্য হইয়াছে—তাহাকেই আমরা বলিয়াছি 'দর্শন'; যে চিন্তাগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-জনিত—এবং বহিঃপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধানী—তাহাকে আমরা বলিয়াছি 'বিজ্ঞান'; আর যে অনুভূতি মানুষের মনের গোপন দুয়ার খুলিয়া দিয়া তাহার কাছে অতীন্দ্রিয় সত্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে তাহাকেই আমরা বলিয়া থাকি 'ধর্ম'। মনুষ্য-জীবনে ইহার কোনটিকেই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, ইহার যে কোন একটিকে বাদ দিলেই মনুষ্যজীবন হইবে অসম্পূর্ণ।

আজকাল প্রায়ই শোনা যায় একটি কথা—'বাস্তবতা'; সব কিছুকে 'বাস্তব' দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে হইবে, সকলকে 'বাস্তববাদী' হইতে হইবে! বিজ্ঞান বাস্তববাদী তাই ভাল; ধর্ম বাস্তববাদী নয়—অতএব মন্দ এবং পরিত্যাজ্য; দর্শনকে যদি টিকিয়া থাকিতে হয়—তবে তাহাকেও বাস্তববাদী হইতে হইবে। আধুনিকদের মতে—আদর্শবাদ, ভাববাদ প্রভৃতি অর্থহীন, মূল্যহীন।

যাঁহারা এই সব কথা বলেন—তাঁহারা অবশ্য আলোচনা করিবার জন্য বলেন না—কারণ আলোচনা করিতে গেলেই 'বাস্তববাদ' সম্বন্ধে তাঁহাদের যে একটি মনঃকল্পিত রূপ আছে তাহা বিশ্লেষণ করিতে হয়; তাহাতে তাঁহারা নারাজ,—কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলেই 'বাস্তববাদ' 'অবাস্তব' ভাববাদ বা মনন-মাত্রে পর্যবসিত হইয়া যায়। অতএব তাঁহারা তাঁহাদের সযত্ন-লালিত ভাবটি লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে চান। প্রকৃতপক্ষে 'বস্তু' কি, 'বাস্তব' কাহাকে বলে, 'বাস্তববাদ' বলিতে কি বুঝায়—ইহাদের বিপরীতই বা কি?—এ সব কিছুর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না করিয়াই তাঁহারা স্বকপোলকল্পিত একটি ভাবকেই পূজা করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করেন।

জ্ঞানের সাধনায় যেখানে কষ্ট আছে, পরিশ্রম আছে, সেখানে এই অজ্ঞান-ভাব—অন্ধকারে ভ্রমে আলস্যে নিশ্চিন্ত-ভাব নিশ্চয় সুখকর এবং অনেকেরই কাম্য। অজ্ঞতাই যেখানে সুখ-শান্তিদায়ক সেখানে জ্ঞানী হওয়া চেষ্টা মূর্খতা। তবে মানুষ চিরদিন এইভাবে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; তাহার অন্তরে জাগে অসন্তোষ; অজানাকে জানিবার, না-বোঝাকে বুঝিবার, নূতনকে ধরিবার আগ্রহে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে; হউক না তাহা যত অবাস্তব! আজিকার অবাস্তব আদর্শবাদী আগামীকাল বাস্তববাদিগণ-কর্তৃক অভিনন্দিত হইবে। বাস্তবতার দিগ্‌বলয় ক্রমবর্ধমান!

আজ যাহারা বিজ্ঞানকে বাস্তববাদী বলিয়া সমর্থন জানাইতেছে, গতকাল তাহারাই বৈজ্ঞানিককে স্বপ্নবিলাসী বলিয়াছে; এবং আজও এমন বৈজ্ঞানিক আছেন—যাঁহারা ঐ বাস্তববাদীদের ধারও ধারেন না, তাঁহাদের কারবার ভাব-জগতে; বিশ্বজগৎ তাঁহাদের চক্ষে পাটীগণিতের পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স নয়, বীজগণিতের সমীকরণ মাত্র (equation).

অতএব দর্শনকে বাস্তববাদী হইতেই হইবে—নতুবা দর্শনের কোন মূল্য থাকে না—এ কথা আর যাহাই হউক দার্শনিক নয়; বৈজ্ঞানিককে অবৈজ্ঞানিক হইতে বলিয়া, ধার্মিককে অধার্মিকে

পরিণত করিয়া বাস্তববাদী হইতে বলা নিতান্তই অবাস্তব প্রস্তাব!

জীবন একটি অনস্বীকার্য অখণ্ড সত্য, অতএব জীবনকে অস্বীকার করিয়া দর্শন, ধর্ম কেন,—কোনও 'বাদ'ই দাঁড়াইতে পারে না, যাঁহারা বলেন, পারে,—সবিনয়ে তাঁহাদের বলিতে হয় তাঁহারা যে বিষয়ে কথা বলিতেছেন—তাহার অর্থ তাঁহারা জানেন না। অখণ্ড জীবনকে তাঁহারা দেখেন খণ্ডদৃষ্টিতে। সূর্যের আলোক ত্রিকোণ-কাঁচ-সহায়ে বিচ্ছুরিত হইলে সাতটি রঙ অবশ্যই চোখকে আকৃষ্ট করে, বাস্তববাদী বলিবেন, চক্ষুর দৃষ্টিসীমার মধ্যেই আলোকতরঙ্গ শেষ, ঐটুকুই আলো। কিন্তু সূক্ষ্ম বিজ্ঞানে ধরা পড়ে অবলোহিত তরঙ্গ (infra-red rays) এবং অতি-বেগনী রশ্মি (ultra-violet rays)—দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় তরঙ্গ লইয়াই সূর্যালোকের সমগ্র বর্ণালী (spectrum); জীবন সম্বন্ধেও এইরূপ।

কতটুকু আর জন্মমৃত্যুর সীমার মধ্যে, জাগ্রৎ-কালের পঞ্চেন্দ্রিয়ের জালে ধরা পড়ে? বিরাট স্বপ্নজগৎ—প্রতিদিনের সূক্ষ্ম অনুভূতি বহিরিন্দ্রিয়ের বাহিরে বলিয়াই কি অবাস্তব? জাগ্রৎ-স্বপ্নের অতীত আর একটি সত্তা—যেখানে সব কিছু শান্ত উপরত, যেখানে অজ্ঞানের মাঝেই আনন্দ-তত্ত্ব আভাসে সাক্ষি-স্বরূপে অনুভূত, তাহাও কি জীবনের বহির্ভূত? 'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কোন জ্ঞান ছিল না, কিন্তু খুব আনন্দবোধ ছিল'—ইহা কি জীবনেরই অনুভূতি নয়?

দর্শনকে জীবনধর্মী হইতে বলিয়া যাহারা শুধু মাত্র ইন্দ্রিয়নির্ভর বাস্তববাদী হইতে বলে তাহারা 'দর্শন' বা 'জীবন' দুটি কথার একটিরও অর্থ সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত নয়। সত্য কথা বলিতে কি, কোন কিছু বুঝিতে গেলে শব্দের অর্থজ্ঞানই প্রথম প্রয়োজন! কিন্তু আধুনিক বাস্তববাদীদের এত পরিশ্রম করিবার শক্তির অভাব, সময়েরও অভাব! তাহারা চায় একটি সহজ সুলভ দার্শনিক মতবাদ—যাহা তাহাদের ভাল লাগিবে, যাহা তাহাদের সুখ-সম্ভোগের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করিবে না! এইরূপ দর্শন বা ধর্মই তাহাদের নিকট বাস্তববাদী, জীবনধর্মী! ধর্ম বা দর্শন জীবনধর্মী বটে, এক হিসাবে নিশ্চয় বাস্তববাদী, যথার্থই বাস্তববাদী; তবে এত সুলভভাবে নয়।

ত্যাগ, তপস্যা, তিতিক্ষা?—এগুলি আত্ম-প্রবঞ্চনা, জীবনধর্মী নয়! শঙ্করের মায়াবাদ যথার্থ সত্য নির্ণয়ে আলোকপাত করে কি না, ইহা দেখিবার ধৈর্য তাঁহাদের নাই।—'মায়াবাদ? জগৎকে মিথ্যা বলে? ভোগ করিতে মানা করে? অতএব ঐ বাদ মিথ্যাবাদ!' একটু দেখিবার অবসর হইল না, বুঝিবার ইচ্ছা হইল না—বেদান্ত-দর্শনে কাহাকে 'মায়া' বলা হইয়াছে, 'জগৎ মিথ্যা' বাক্যটির অর্থ কি? কেন, কিভাবে মানব মনে এই চিন্তার ধারা উঠিল! আধুনিক মানুষের ভোগচঞ্চল কর্মব্যস্ততা তাহাকে সত্যানুভূতি হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, তাহার স্বরূপগত অধিকার শান্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতেছে। সুখ মনে করিয়া মানুষ দুঃখকে জড়াইয়া ধরিতেছে। যে জিনিস যাহা নয় তাহাকে তাই মনে করাই মায়া; 'অ-তস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ'—আচার্য শংকরের মতে ইহাই মায়ার সংজ্ঞা! বর্তমানকালে স্বামী বিবেকানন্দ মায়ার আর একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন: 'Maya is a statement of fact.'—মায়া ঘটনাবলীর বিবরণ মাত্র। জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান, কিন্তু যথার্থ সত্য নয়। সত্যেরও দার্শনিক সংজ্ঞা: 'ত্রিকালাবাধিতত্বং সত্যম্'; অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে যাহা ছিল, আছে এবং থাকিবে, কখনও কোন কালেও যাহা বাধিত হয় না, যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব নাকচ হয় না—তাহাই সত্য! এবং যাহা কিছু পূর্বে ছিল না, এখন আছে বলিয়া মনে হয়, পরে থাকিবে না—তাহা অবশ্যই

ঘটনা (phenomenon, fact), কিন্তু সত্য (Truth) নয়। সমুদ্র ছিল, আছে ও থাকিবে; কিন্তু তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে, ভাসিতেছে, লয় পাইতেছে। তরঙ্গ দৃশ্য, ঘটনা; কিন্তু সত্য নয়; তরঙ্গ মায়া, মিথ্যা; সমুদ্রই সত্য! 'সূর্য পূর্বদিকে উঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়'—ইহা দৃশ্য, ঘটনা; কিন্তু সত্য নয়; কারণ সূর্য উঠেও না, ডুবেও না; তাহার উদয়াস্ত প্রতীয়মান, মায়া, মিথ্যা! মানবের মন জগৎকে একরূপে বুঝে এবং অপরের সহিত ব্যবহারে তাহাকে সেইরূপ বুঝায়,—ইহাই ব্যবহারিক সত্য, যথার্থ সত্য নাও হইতে পারে। রজ্জু-সর্প, মরু-মরীচিকা, আকাশের তল-নীলিমা প্রভৃতি কত দৃষ্টান্ত দ্বারা অদ্বৈত-বেদান্তের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ 'প্রতীতি মিথ্যা, এবং অধিষ্ঠানই সত্য' এই কথা মানুষের বুদ্ধিতে আরূঢ় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা যথেষ্টই জানিতেন বিষয়টি অতি কঠিন, গূঢ় এবং গম্ভীর! পরিশেষে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আত্মা জন্মায় না, মরেও না; জন্ম মৃত্যু ঘটনা; কিন্তু মায়া বা মিথ্যা! আত্মা অমৃত জীবনস্বরূপ, এক অখণ্ড সত্তা, অবাধিত অস্তিত্ব যাহার অপর নাম 'সৎ-স্বরূপ' (Universal Eternal Existence Absolute).—যাহার অনুভূতি হইলে হৃদয়ের সকল গ্রন্থি খুলিয়া যায়, সকল ভ্রম-সন্দেহ চিরতরে দূর হইয়া যায়—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'। সৎ বা সত্যকে জানাই জ্ঞানস্বরূপত্ব লাভ, এবং জ্ঞানলাভ হইলেই অজ্ঞান-অন্ধকারজনিত ভয়-দুঃখ বিদূরিত হইয়া অভয় আনন্দ বা শান্তিলাভ হয়, ইহাই মানব জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য!

এই চরম অনুভূতির কথা বেদান্ত-দর্শনের গ্রন্থে গ্রন্থে আচার্যদের কণ্ঠে কণ্ঠে যুগ যুগ ধরিয়া ধ্বনিত হইয়াছে, এবং হইতে থাকিবে। কিভাবে জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা অজ্ঞানে আবৃত হন—কিভাবে আত্মায় জন্ম-মরণাদি কল্পনা অনুভূত হয়, কিভাবে অখণ্ড-সত্তা ব্রহ্মে খণ্ড বিখণ্ড জগদ্বৈচিত্র্য প্রতীয়মান হয়, তাহা বুঝাইবার জন্যই মায়াবাদ উপস্থাপিত। মায়া বেদান্ত-দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়; মায়াবাদ ব্যাখ্যা মাত্র; প্রতিপাদ্য বিষয় আত্মতত্ত্ব! 'এক কি করিয়া বহু হইল'—ইহারই ব্যাখ্যায় বেদান্ত-দর্শন বলিয়াছে: এক একই আছে বহু হয় নাই, মায়ায় বহু প্রতীয়মান! ইহাই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার অনির্বচনীয় শক্তি! তোমার মনের শক্তি থাকে, তুমি বহুর অন্তরালে একতে অনুভব কর, তরঙ্গ না দেখিয়া সমুদ্র দেখ, জীব জগৎ না দেখিয়া ব্রহ্ম অনুভব কর! সূর্যের উদয়াস্ত অস্বীকার করিতে না পারিলেও অনুভব কর—সূর্য 'নোদেতি নাস্তমেতি'। জীবের জন্ম মরণ ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিদ্বারা অনুভব কর—আত্মা 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ' —তবেই তুমি শোক দুঃখ অতিক্রম করিয়া মৃত্যুময় সংসারেই অমৃত জীবনের আস্বাদ পাইবে!

প্রতীয়মানের অন্তরালে যথার্থ সত্যকে ধরিবার চেষ্টা, ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা মানুষের সর্ব দেশে সর্ব কালেই আছে, তবে ইহা অতি অল্প সংখ্যক উন্নত মনের পক্ষেই ধারণা করা সম্ভব। সংখ্যাধিক্য দ্বারা সত্য নির্ণীত হয় না। বিভিন্ন দেশে কালে মানুষ অনুভব করিয়াছে—এই জগতে একটা আলোছায়ার খেলা এবং মায়ার লীলা চলিয়াছে। কখনও কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে 'Things are not what they seem' (যাহা প্রতিভাত হয় তাহাই সত্য নয়); কখন দার্শনিক দৃষ্টিতে সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছে—'Reality behind appearance'—পরিবর্তনশীল নানা বর্ণময় চলচ্চিত্র-প্রবাহের পিছনে স্থির শুভ্র পটভূমিকার মতো। বর্তমানে বিজ্ঞানও জগৎ-রহস্যের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হইয়া যেখানে আসিয়া উপস্থিত তাহা কি দর্শনের এই দৃষ্টি হইতে খুব বেশী দূরে? ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কথা বলিতেছি না, তাত্ত্বিক বিজ্ঞান আজ দর্শনের পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে; ডালটনের

অবিভাজ্য দুর্ভেদ্য অ্যাটমের আজ কি স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত—তাহা অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় 'things are not what they seem'—দেখিয়া যাহা মনে হইতেছে তাহাই পদার্থের স্বরূপ নয়।

কঠিন তরল গ্যাসীয় পদার্থের অণু—সব আজ মহাশূন্যে ঘূর্ণমান অনির্দেশ্য তড়িৎ-কণা, যাহা সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে! ফলমাত্র অনুভূত, 'সংঘাত'ই প্রত্যক্ষ! কেন কিভাবে?—জানিনা, বুঝিনা, কিন্তু ইহাই ঘটনা! বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে অনিশ্চয়তাবাদ এক নূতন ভাব; বুঝা যায় Appearance and Realityর ভাবধারা বা মায়াবাদের অনুরূপ ব্যাখ্যাশৈলীর প্রয়োজনীয়তা আজ বৈজ্ঞানিকের মনেও অনুভূত হইতেছে।

সত্যকে জানিবার জন্য যদি এই পরিচিত জগৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়জ ধারণা পরিত্যাগ করিতে হয়, জ্ঞানের সাধনায় বৈচিত্র্যের পিছনে ঐক্যকে ধরিবার জন্য পূর্বের যত কিছু প্রিয় মতবাদ যদি বিসর্জন দিতে হয়, সত্যানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের যুক্তিপরায়ণ মন—তাহাতে পিছপাও নয়। জীবনকে বুঝিবার জন্য দার্শনিক জীবন দিতে প্রস্তুত। বাস্তববাদীর চীৎকার বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে পৌঁছায় না; তথাকথিত জীবনবাদীর সমালোচনায় দার্শনিক চিরবধির!

এক দিকে সাধারণ মানুষ আজ স্থূল বাস্তববাদী, আবার আর একদিকে মানব-মনীষা সূক্ষ্মতম চিন্তার ও যুক্তির পথে অগ্রসর! প্রত্যেকটি ধর্ম ও দর্শন কেন উদ্ভূত হইয়াছিল, কি তাহারা বলিতে চায়, নিরপেক্ষ মন লইয়া তুলনামূলক বিচার করিলে তবেই আমরা মানবের চিন্তাধারার একটি সমগ্র রূপ ধরিতে পারিব; বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মানুষকে আত্মীয় বলিয়া অনুভব করিতে পারিব।

*　*　*

শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত দার্শনিক কংগ্রেসে বিশ্ববৌদ্ধ সংঘের সভাপতি ডক্টর মালালসেকেরার সভাপতির অভিভাষণের আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড লিখিয়াছেন: 'Earthly existence is no longer believed to be an illusion, mere 'maya', but the medium through which the divine reality becomes realisable by the finite human beings. Vedanta has been turned upside down in the modern age. (Hindusthan Standard 19th June 1957, Editorial).

"পার্থিব অস্তিত্বকে এখন আর কেহ 'মায়া' বলিয়া বিশ্বাস করে না·····খুশিমত বর্তমানকালে বেদান্তকে উল্টাইয়া ফেলা হইয়াছে!" প্রশ্ন ওঠে ইহা কি সত্যানুসন্ধিৎসুর শান্ত দৃষ্টি? না কর্মচঞ্চল বাস্তববাদীর সিদ্ধান্ত? এই প্রসঙ্গে ঐ পত্রিকাতেই শ্রীবালগোবিন্দ পরমপন্থী কর্তৃক উদ্ধৃত সমারসেট ম'মের 'মায়া' সম্বন্ধে অপূর্ব ব্যঞ্জনা দূরাগত প্রত্যুত্তরের মতোই ভাসিয়া আসে: 'It is a mistake to think that Indians look upon the world as an illusion, they don't, all they claim is that it is not real in the sense as the 'Absolute'. Maya is only a speculation devised by ardent thinkers to explain how the infinite could produce the finite! (Razor's Edge—Somerset Maughm)—ভারতবাসীরা জগৎকে ভ্রান্তি-ছায়া বলিয়া মনে করে, ইহা বলা ভুল; তাহারা তা করে না, তাহারা এইটুকু দাবি করে—নিরপেক্ষ ব্রহ্ম যে অর্থে সত্য, জগৎ সে অর্থে সত্য নয়। অসীম কি করিয়া সীমা সৃষ্টি করিল তাহা বুঝাইবার জন্যই মায়া গভীর চিন্তাপ্রসূত ব্যাখ্যা।

*　*　*

জীবন ও জগৎকে বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্যই দর্শন; প্রকৃত সত্য বস্তুর সন্ধানই জ্ঞানের সাধনা—দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম সকলই তাহার অন্তর্গত! এই সন্ধানের সাধনায় মিলিয়াছে এক অখণ্ড অবাধিত অনন্ত সত্তা—যাহা সকল খণ্ড খণ্ড পরিবর্তনের এক অপরিবর্তনীয় অধিষ্ঠানরূপে চিরবিরাজমান। তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম; তাহাই বস্তু—আর সব প্রতীতিমাত্র, অতএব অবস্তু।

আবাসিক বিদ্যায়তন

এ বৎসর বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের পরীক্ষার ফল জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতরভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রশংসামূলক সমালোচনার পর বিধান সভাতেও বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল—বহু ছাত্রের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার কারণ।

সাধারণ গতানুগতিক শিক্ষা দ্বারা জীবন ও চরিত্র গঠিত হয় না, তাহা আজ সকলেই বুঝিতেছেন। ধর্মভিত্তিক শান্ত-পরিবেশে আদর্শ-নিষ্ঠ শিক্ষকের সান্নিধ্যে ছাত্রদের মনে যে একাগ্রতা জন্মে ও প্রেরণা জাগে তাহাতেই তাহাদের জীবন ও চরিত্র গড়িয়া উঠে। ছাত্রদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগাইতে ত্যাগী ও সেবা-ভাবাপন্ন শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন। জাগ্রত মন অভিরুচি অনুযায়ী জীবনের পথ বাছিয়া লইয়া অগ্রসর হইবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আবাসিক বিদ্যায়তনের আশ্রমিক পরিবেশের মধ্যে দিনের পর দিন নিয়মিত কর্মসূচীর মাধ্যমে বালকদের মনে একটি উন্নততর জীবনের ছবি অঙ্কিত হইয়া যায়, এবং তাহাদের সকল কর্মে একটি শান্ত ছন্দ সঞ্চারিত হয়। ত্যাগ ও সেবাপরায়ণ আশ্রমিকদের বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গী (elderly companions) মনে করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে তাঁহাদের সহিত মেলামেশা করিলে ছাত্রেরা অবশ্যই লাভবান্ হইয়া থাকে—তাঁহাদের সাধারণ সহায়তায়, এবং ব্যক্তিগত সাহচর্যে ও অভিজ্ঞতায়।

যাহাদের মনের গঠন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এরূপ পরিবেশ বিশেষ উপকারে আসে না; এখানে তাহারা নিজেদের 'বন্দী' বলিয়া অনুভব করে। এরূপ প্রতিষ্ঠানে জীবনযাপনের জন্য শ্রদ্ধার ভাব একান্ত প্রয়োজন; কোন শ্রদ্ধাহীন ছাত্রের উপস্থিতি তাহার নিজের, অন্যান্য ছাত্রের ও প্রতিষ্ঠানের—সকলেরই ক্ষতি করে। অভিভাবকদের অনেকে মনে করেন আবাসিক বিদ্যায়তন সংশোধনী শিক্ষালয়; কিন্তু তা নয়। সেখানকার কর্মপদ্ধতি পৃথক। আবাসিক বিদ্যালয়ে যে কোন ছাত্রকে ভরতি করা চলে না। ছাত্রের পূর্ব পরীক্ষার ফলই একমাত্র বা প্রধান বিচার্য নয়, তাহার রুচি মনোভাব স্বাস্থ্য এবং সাংসারিক পরিবেশও বিবেচ্য।

আবাসিক বিদ্যায়তনের সহিত তুলনীয় সযত্ন-বর্ধিত উদ্যান। যদি ভাল ফুল ফুটাইতে হয় তবে নির্বাচিত চারা রোপণ করিতে হইবে, বাহিরের অত্যাচার হইতে গাছগুলিতে বাঁচাইবার জন্য বেড়া দিতে হইবে, সর্বোপরি প্রয়োজন উদ্যানের তত্ত্বাবধায়কের সযত্ন ও সদা-সতর্ক দৃষ্টি।

কাহারও কাহারও মতে আবাসিক বিদ্যায়তনের ছাত্রদের প্রকৃতিগত একটি অভাব আছে, এ সম্বন্ধে অভিভাবক এবং পরিচালকগণ সম্যক্ অবহিত হইলে তাঁহারা অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশার দরুন সাধারণ ছাত্রদের যে পরিমাণ মানসিক প্রতিষেধ-শক্তি (mental immunity) এবং অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিবার বুদ্ধি ও ক্ষমতা থাকে—রুদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে আবাসিক ছাত্রদের ভিতর ঐ সকল গুণ সেই পরিমাণে বিকশিত হইবার সুযোগ পায় না। ইহা আংশিক সত্যমাত্র, উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে আবাসিক ছাত্রদের বিপথগামী অথবা জীবনে অসহায় অবস্থায় বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা বেশী হইলেও—একথা অবশ্য স্বীকার্য, প্রথমাবস্থায় চারা গাছ যদি বেড়া দেওয়া থাকে—পরে কাণ্ড শক্ত হইয়া গেলে তাহাতে হাতীও বাঁধা চলে, কালবৈশাখীর ঝড় ঝাপটাও সেই গাছ মাথা পাতিয়া সহ্য করে।

আবাসিক বিদ্যায়তনের শিক্ষকদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—ছাত্রেরা যেন জীবন-সংগ্রামের উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠে। ছাত্র ও শিক্ষক—উভয়কেই সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—আজ যাহারা ছাত্র—কাল তাহারা ঘাতপ্রতিঘাতময় রাষ্ট্রের নাগরিক—সুখদুঃখময় সমাজের কর্মী।

বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম?

স্বামী বিবেকানন্দ

বেদান্তই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম ; তবে ইহা কখনও লোকপ্রিয় হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। অতএব 'বেদান্ত কি ভবিষ্যতের ধর্ম হইতে চলিয়াছে?'—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

প্রথমেই বলি বেদান্ত কি নয়; পরে বলিব, বেদান্ত কি। নৈর্ব্যক্তিক ভাবের উপর জোর দিলেও বেদান্ত কোন কিছুর বিরোধী নয়—যদিও বেদান্ত কাহারও সহিত কোনও আপোষ করে না, বা নিজস্ব মৌলিক সত্য ত্যাগ করে না।

প্রত্যেক ধর্মেই কতকগুলি জিনিস একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম একখানি গ্রন্থ। অদ্ভুত তাহার শক্তি! গ্রন্থখানি যাহাই হউক না কেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের সংহতি। গ্রন্থ নাই—এমন কোন ধর্ম আজ বাঁচিয়া নাই। যুক্তিবাদের বড় বড় কথা সত্ত্বেও মানুষ গ্রন্থ আঁকড়াইয়া রহিয়াছে।

ধর্মের দ্বিতীয় প্রয়োজন একটি ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। সেই ব্যক্তি হয় জগতের ঈশ্বররূপে বা মহান্ আচার্যরূপে উপাসিত হইয়া থাকেন। মানুষ একজন মানুষকে পূজা করিবেই। তাহার চাই—একজন অবতার, প্রেরিত পুরুষ বা মহান্ নেতা। সকল ধর্মেই ইহা লক্ষণীয়।

ধর্মের তৃতীয় প্রয়োজন—নিজেকে শক্ত ও নিরাপদ করিবার জন্ত এমন এক বিশ্বাস যে সেই ধর্মই একমাত্র সত্য, নতুবা ইহা জনসমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

উদারতা শুষ্ক বলিয়া মরিয়া যায়; ইহা মানুষের মনে ধর্মোন্মত্ততা জাগাইতে পারে না; সকলের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াইতে পারে না। তাই উদার ধর্মের বারংবার পতন ঘটিয়াছে; মাত্র কয়েক জনের উপরই ইহার প্রভাব। কারণ নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। উদারতা আমাদের নিঃস্বার্থ হইতে বলে, আমরা তাহা চাই না—কারণ তাহাতে সাক্ষাৎভাবে কোন লাভ নাই; স্বার্থদ্বারাই আমাদের বেশী লাভ। যতক্ষণ আমাদের কিছু নাই, ততক্ষণই আমরা উদার। অর্থ ও শক্তি সঞ্চিত হইলেই আমরা রক্ষণশীল। দরিদ্রই গণতান্ত্রিক, সেই আবার ধনী হইলে অভিজাত হয়। ধর্ম-জগতেও মনুষ্য-স্বভাব একই ভাবে কাজ করে।

প্রচলিত প্রসারশীল সকল ধর্মই দারুণভাবে অন্ধমতবাদে উন্মত্ত। যে সম্প্রদায় অপর সকল সম্প্রদায়কে যত ঘৃণা করিতে পারিবে তাহার সাফল্য তত বেশী, ততই অধিকতর লোক তাহার কুক্ষিগত হইবে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে ভ্রমণ করিয়া, বহুজাতির মানুষের সঙ্গে বাস করিয়া, প্রচলিত অবস্থা দেখিয়া আমার সিদ্ধান্ত—বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অনেক কথা সত্ত্বেও বর্তমান অবস্থাই চলিতে থাকিবে।

বেদান্ত এই সকল শিক্ষার একটিতেও বিশ্বাস করে না। প্রথমতঃ ইহা কোনও পুস্তকে বিশ্বাস করে না। প্রবর্তকের পক্ষে ইহা খুবই কঠিন। অন্তান্ত পুস্তকের উপর একখানি পুস্তকের প্রামাণ্য বা কর্তৃত্ব বেদান্ত মানে না। বেদান্ত জোরের সহিত অস্বীকার করে যে একখানি পুস্তকেই ঈশ্বর, আত্মা ও পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল সত্য আবদ্ধ থাকিবে। উপনিষদ্‌ই বারংবার বলিতেছে, শুধু

পড়িয়া শুনিয়া কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ একজন বিশেষ ব্যক্তিকে (শ্রেষ্ঠ) ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা—বেদান্ত-মতে আরও কঠিন। বেদান্ত বলিতে উপনিষদ্ই বুঝায়; একমাত্র উপনিষদ্ই কোন ব্যক্তি বিশেষে আসক্ত নয়।

আরও কঠিন ব্যাপার ঈশ্বরকে লইয়া। বেদান্তের ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক্ এক জগতে সিংহাসনে সমাসীন সম্রাট্ নয়! অনেকে আছে, তাহাদের ঐরূপ একজন ঈশ্বর চাই, যাহাকে তাহারা ভয় করিবে, যাহাকে তাহারা সন্তুষ্ট করিবে। তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য তাহাদের একজন রাজা চাই, স্বর্গেও তাহাদের সকলের উপর শাসন করিবার জন্য রাজা চাই। গণতান্ত্রিক দেশে রাজা প্রত্যেক প্রজার অন্তরে।……বেদান্ত-ধর্মেও তাই ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতরে। বেদান্ত বলে জীব ব্রহ্মই। এই জন্য বেদান্ত খুব কঠিন। বেদান্ত ঈশ্বর-সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা আদৌ শিক্ষা দেয় না। মেঘের ওপারে অবস্থিত স্বেচ্ছাচারী, শূন্য হইতে খুশিমত সৃষ্টি-কারী, মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাদায়ক এক ঈশ্বরের পরিবর্তে বেদান্ত শিক্ষা দেয়—ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্যামী, ঈশ্বর সর্বরূপে—সর্বভূতে।

স্বর্গস্থ ঈশ্বরের ধারণা কি রকম? নিছক জড়বাদ। বেদান্তের ধারণা—ঈশ্বরের অনন্ত ভাব আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রূপায়িত।……মেঘের উপরে ঈশ্বর বসিয়া আছেন! কি অধর্মের কথা। ইহাই জড়বাদ, জঘন্য জড়বাদ! শিশুরা যখন এই প্রকার ভাবে, তখন ইহা ঠিক হইতে পারে; কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা যখন এই প্রকার শিক্ষা দেয়, তখন ইহা দারুণ বিরক্তিকর। এই ধারণা জড় হইতে, দেহভাব হইতে, ইন্দ্রিয়ভাব হইতে উদ্ভূত। ইহা কি ধর্ম? ইহা আফ্রিকার 'মাম্বো জাম্বো' ধর্ম হইতে উন্নত নয়! ঈশ্বর আত্মা; তিনি সত্যস্বরূপে উপাস্য। আত্মা কি শুধু স্বর্গেই থাকে? আত্মা কি? আমরাই আত্মা, আমরা ইহা অনুভব করি না কেন? দেহবোধ হইতেই বিভেদ-ভাব; দেহভাব ভুলিলেই সর্বত্র আত্মভাব অনুভূত হয়।

* * * * *

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শেখানো হইয়াছে জগৎপ্রভু, অবতার, পরিত্রাতা ও প্রেরিত পুরুষগণকে পূজা করিতে হইবে; শেখানো হইয়াছে তাহারা নিজেরা অসহায় হতভাগ্য জীব, মুক্তির জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে। এইরূপ বিশ্বাসে নিশ্চয় অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে পারে। তথাপি সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় এই প্রকার বিশ্বাস ধর্মের শিশুশিক্ষামাত্র (Kindergarten of religion), এইগুলি মানুষকে অতি অল্পই সাহায্য করিয়াছে বা কিছুই করে নাই। মানুষ এখনও অধঃপাতের গহ্বরে মোহাবিষ্ট হইয়াই পড়িয়া রহিয়াছে। অবশ্য কয়েকজন শক্তিশালী মানুষ এই মায়ার ভ্রম অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন!

সময় আসিতেছে—যখন মহান্ মানবগণ জাগিয়া উঠিবেন; এবং ধর্মের এই শিশুশিক্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা আত্মা দ্বারা আত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।

'আনন্দ-ধাম'*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

ভক্ত সাধকের গানে আছে—

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব শোভন ভব-জলধির পারে জ্যোতির্ময়।
শোকতাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে।

সংসারে জর্জরিত শোক-তাপিত মানুষের জন্যে এই আহ্বান,—ওরে শোকক্লিষ্ট জীব, সংসারের মিথ্যা আসক্তির বন্ধন এড়িয়ে ছুটে আয়,—সংসারে সে আনন্দ নেই; সংসারের ওপারে আছে আনন্দ-ধাম, সেখানে আছে অনাবিল আনন্দ, শাশ্বত শান্তি। সংসারী জীব জড়িয়ে আছে নানা দুঃখ ও আসক্তির বন্ধনে, আসল আনন্দের এতটুকু ছিটে-ফোঁটা পেযেই জীব ভুলে আছে, ভুলে গেছে আত্মস্বরূপ। যার সংসারের বাঁধন যত ছিঁড়েছে, সেই তত এগিযে যাচ্ছে আনন্দের দিকে।

এই আনন্দ লাভ হয় কিসে? কেমন ক'রে? সাধনা করতে হবে—ধর্মকে করতে হবে আস্বাদন। শাস্ত্রপাঠ, বেদপাঠ, পাণ্ডিত্য—অনুভূতি বিনা সবই বৃথা; অনুভূতি চাই, নইলে কিছুই হবে না।

'অনুভূতিং বিনা মূঢ়া যথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিত-শাখাগ্র-ফলাস্বাদন-মোদবৎ॥'

—মূঢ় লোকেরা ধর্মকে কি ভাবে আস্বাদন করে? বৃক্ষে ধরে আছে ফল, তার ছায়া জলে পড়ে, তীর থেকে তাই দেখে যেমন ফলকে অনুভব করা, আস্বাদন করা;—মূঢ় লোকেরাও তেমনি তীরেই বসে আছে, জলে ছায়া দেখেই যেন ধর্মকে অনুভব করছে, অন্তরে সত্যের প্রকাশ হয় নি, অনুভূতি হয় নি। শাস্ত্রেও বলেছে—বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায় না, অনুভূতি করতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন ভেতরে প্রবেশ; ঠাকুর তাই বলেছেন 'ডুব দাও', আর বলতেন, 'এগিয়ে পড়'। ডুব কোথায় দিতে হবে? ভেতরে। এগিয়ে কোথায় যেতে হবে? ভেতরে। শুধু বেদপাঠ আর পাণ্ডিত্য যেন রস-জ্বাল-দেওয়া কাঠের হাতার মতো—রসে ডুবে আছে কিন্তু নিজে নিজে কিছু আস্বাদন করতে পারছে না।

'অধীত্য চতুরো বেদান্ ধর্মশাস্ত্রাণ্যশেষতঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্বী পাকরসং যথা॥'

ঠাকুরের জীবনের দিকে দেখতে হয়। লেখাপড়া তো বিশেষ কিছুই জানতেন না, চালকলা-বাঁধা বিদ্যে শিখলেন না, সকলে ব'লত পাগল বামুন। কিন্তু তাঁর কাছে কারা আসতেন? কত বৈজ্ঞানিক, কত বড় পণ্ডিত, কত আচার্য এসে তাঁর কাছে বসে থাকতেন। কিসের জন্যে? শাস্ত্রে যা পড়েছেন, যা এতদিন শুনেছেন তা প্রত্যক্ষ করবার জন্যে। ঠাকুরের অনুভূতির ফল শোনবার জন্যে। ঠাকুর সেই আনন্দধামে পৌঁছেছিলেন, তাই সেখান থেকে নিযে এসেছেন যে আনন্দ ও শান্তি—তাই দু'হাতে বিলিয়ে দিয়েছেন সকলকে।

ঠাকুর সাধনার সব স্তর অতিক্রম করে-ছিলেন—ভাবসমাধি, নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত; তাঁর সেই সব অনুভূতির জ্ঞান দিয়ে গেলেন স্বামীজীকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এসে আমাদের ধর্মের মূলে যে কঠোর আঘাত দিয়েছিল, তাতে সমস্ত দেশে ও সমাজে এনেছিল অবিশ্বাস ও

* করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে—১৯.৪.৫৭ তারিখে পূজ্যপাদ মহারাজ-প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীমতী সুধা সেন-কর্তৃক সংকলিত।

সংশয়—ধর্মের প্রতি। নরেন্দ্র কত সাধক, কত আচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে বলতে পারলেন না যে তিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন।

কিন্তু ঠাকুর তাঁকে কি বললেন? 'তোকে যেমন দেখছি, তোর সঙ্গে যেমন কথা বলছি, তেমনি ক'রেই তো তাঁকে পেয়েছি আমি। তোকেও দেখাতে পারি, তুই যদি দেখতে চাস।'

ঠাকুর স্পর্শ ক'রে নরেন্দ্রকে নিয়ে গেলেন সংসারের বাইরে, মন উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বে উঠতে লাগল, উচ্চতম ভূমিতে গিয়ে লীন হবার উপক্রম। নরেন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন না, চীৎকার ক'রে উঠলেন—ওগো, এ তুমি আমার কি করলে? আমার যে মা বাবা আছেন। আবার স্পর্শ করেই ঠাকুর তাঁর মন নীচে নামিয়ে আনলেন। অবতার-পুরুষেরা স্পর্শমাত্রেই ঈশ্বরানুভূতি করিয়ে দিতে পারেন; কিন্তু প্রস্তুত হ'তে হবে সাধককে, নিজে অনুভূতি লাভ করতে হবে। স্বামীজীকেও তাই প্রতীক্ষা করতে হ'ল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের নীতি-অনুযায়ী ছিলেন মূর্তিপূজার বিরোধী; কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠাকুর মূর্তিপূজাতে তাঁর বিশ্বাস এনে দিলেন।

জীবনে শুভ মুহূর্তের উদয় হ'ল, সহায় হ'ল দৈব ও পুরুষকার। পিতার মৃত্যুর পরে সংসারের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট অবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন ভবতারিণীর মন্দিরে—'যা চাইবি তাই পাবি মায়ের কাছে, যা, তুই নিজে চেয়ে নিয়ে আয়।' নরেন্দ্র মায়ের কাছে গেলেন। কী দেখলেন? ভবতারিণীর পাথরের মূর্তি নয়, স্বয়ং মা প্রত্যক্ষ হলেন মূর্তির মধ্যে। ইন্দ্রের ঐশ্বর্য তুচ্ছ হয়ে গেল, নরেন্দ্রনাথ মায়ের কাছে চাইলেন—বিবেক বৈরাগ্য। বার বার তিনবার—সংসার-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনায় ব্যর্থ হলেন নরেন্দ্রনাথ, ফিরে এলেন বৈরাগ্য-বিবেকবান্ বিবেকানন্দ। প্রসন্নহাস্যে ঠাকুরের মুখ মধুর হ'য়ে উঠল। আপনার উপার্জিত সাধনার ধনসম্পদ্ সমর্পণ করলেন শিষ্যকে। গুরু তো প্রত্যক্ষ ভগবান। শিষ্য যখন শরণাগত হয় তখন গুরু সব দিয়ে দেন শিষ্যকে। অর্জুন এত বড় বীর, কত তাঁর অহঙ্কার—স্বয়ং ভগবান তাঁর সারথি। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে কোথায় গেল সে অহঙ্কার! যখন শিষ্য হয়ে গুরু ব'লে কৃষ্ণের শরণ নিলেন তখনই অর্জুনকে আশ্রয় দিলেন ভগবান, জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন, দেখালেন বিশ্বরূপ।

স্বামীজীও মানতেন না গুরুবাদ, মানতেন না অবতারবাদ। ছয় বৎসর ঠাকুরের কাছে কাছে রইলেন, কত কিছু প্রত্যক্ষ করলেন, তবুও মনে সংশয়। কে ইনি? মহাপুরুষ, সিদ্ধ পুরুষ, না অবতার? এ বিষয়ে কোথায় তাঁর নিজস্ব উক্তি? ঠাকুরের মহাসমাধি লাভের আর মোটে তিন চার দিন বাকী, ঠাকুর ডাকলেন নরেন্দ্রকে—"এত দেখলি তবু অবিশ্বাস? যেই রাম, যেই কৃষ্ণ—সেই এবার রামকৃষ্ণ। কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" 'ছদ্মবেশে এসেছেন রাজা, জানাজানি হলেই চলে যাবেন'—এ কথাও বলেছিলেন আর একদিন ঠাকুর।

সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে ঠাকুর বলেছিলেন তাঁর কাঞ্চন-ত্যাগের সাধনার কথা: 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—যখন অনুভূত হ'ল তখন টাকা জলে ফেলে দিলুম। বঙ্কিম বলে উঠলেন—সে কি মশায়, টাকা ফেলে দিলেন? চারটে পয়সা থাকলে যে গরীবের উপকার হয়।

ঠাকুর চুপ ক'রে রইলেন একটু; পরে বললেন—"পরোপকার, পরোপকার? কে কার উপকার করে? হরিময় এ সংসার, হরির উপকার? ছি, ছি, উপকার নয় সেবা, জীবের সেবা শিবজ্ঞানে।"

গীতায় বলেছেন ভগবান—সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে আছি আমি, একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই আমাকে লাভ করা যায়। চৈতন্য-চরিতামৃতেও আছে—

'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবন'। জীবে দয়া মানে সেবা, উপকার নয়। আর বৈষ্ণবের সেবা অর্থ কি? বিষ্ণুরই সেবা। যিনি সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তিনিই তো বিষ্ণু। তাই মহাপ্রভুও ব'লে গেছেন, জীব-মাত্রেরই বিষ্ণু-বোধে সেবা করবে, তাই হবে 'বৈষ্ণব-সেবন'।

স্বামীজীকে এই সেবার ব্রতে উদ্বুদ্ধ ক'রে ছিলেন ঠাকুর। তাই তো স্বামীজী বললেন :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বামীজী মুখেই শুধু এ কথা বলে যান নি, তিনি জগৎময় ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর সেই উপলব্ধির অভিজ্ঞতা যখন পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষিত সভ্য জগতে পরিবেশন করলেন তখন জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল। ঠাকুরের সমন্বয়বাদ প্রতিষ্ঠিত হ'ল স্বামীজীর মাধ্যমে। ঠাকুর সর্ব ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; তাঁর ব্রহ্মদর্শন হয়েছিল সর্বভূতে—'যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে'। স্বামীজীও গুরুর কৃপায় সেই সত্য, সেই অনুভূতি লাভ করলেন; তাই তাঁর বাণীর এত শক্তি। যুগে যুগে জগতে অবতার-পুরুষেরা আসেন, শক্তি সঞ্চার ক'রে যান শিষ্যের মধ্যে, ভক্তের মধ্যে—আর সেই শক্তি কাজ ক'রে যায় দীর্ঘকাল।

চিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় দাঁড়িয়ে অপরিচিত সন্ন্যাসী উদাত্তকণ্ঠে যখন ঘোষণা করলেন—Man does not travel from error to truth, but from truth to truth, from lower to higher truth,—বললেন, 'মূর্তিপূজা মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয় প্রতীকোপাসনা—এ শুধু নিম্ন সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে যাওয়ার সোপান'—তখন সেখানকার শিক্ষিত সভ্য সমাজে দেখা দিল বিস্ময়, স্তব্ধ মুগ্ধ হয়ে রইল জনতা, সত্যের উজ্জ্বল আলোকে মিথ্যা দম্ভ ও পাণ্ডিত্যের অভিমান ভেঙে গেল।

সর্ব ধর্মেই সত্য আছে, সর্ব ভূতে ব্রহ্ম আছেন। বিশ্বাস কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর, জীবনে আচরণ কর ধর্মকে, তবেই সত্যকে জানবে, অনুভূতি লাভ হবে। ডুব দাও, এগিয়ে চলো। সংসারে বাস কর পাঁকাল মাছের মতো, দাসীর মতো। ঠাকুর আছেন, ভয় কি? তিনিই তো রয়েছেন জগতে ব্যাপ্ত হয়ে, 'সূত্রে মণিগণা ইব', সূত্রের মতো সকলকে ধ'রে রয়েছেন তিনিই তো। তাঁর থেকেই জগৎ এসেছে, তাঁতেই রয়েছে, আবার তাঁতেই ফিরে যাবে।

স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে, ফিরে পেতে হবে শাশ্বত আনন্দকে—এ আনন্দ তো সংসারে নেই, বাইরে নেই; আছে অন্তরে, ভেতরে। সেই আনন্দের কণামাত্র লাভ হ'লে জগৎ ভুল হ'য়ে যাবে, অন্তর ভরে উঠবে। এই আনন্দ লাভ করেছিলেন ব'লেই তুলসীদাস বলেছেন: আমি এই জগতে এসেছিলাম কাঁদতে কাঁদতে, কিন্তু লোকে হেসেছিল; —আর আমি যখন চলে যাব তখন জগৎ কাঁদবে, আর আমি হাসতে হাসতে চলে যাব। ভক্তেরা হাসতে হাসতেই যান, তাঁরা যে আনন্দধামের সন্ধান পেয়েছেন।

'ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম'—সংসারক্লিষ্ট শোক-তাপিত জীব, চলো চলো। দুঃখ শোক দূর হয়ে যাবে, লাভ হবে আনন্দ ও প্রেম।

যে ওলা-মিছরির স্বাদ পায়, সে কি আর চিটে গুড় খেতে চায়?……
ব্রহ্মানন্দ যে পায়, সে কি আর বিষয়ানন্দে মাতে?

—শ্রীরামকৃষ্ণ

শঙ্কর-মতে জগতের মিথ্যাত্ব

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

প্রখ্যাত অদ্বৈতবেদান্তবাদী শঙ্করাচার্যের অতুলনীয় দার্শনিক মতবাদের মূল কথা হ'ল এই যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মিথ্যা—মায়ামাত্র। কিন্তু এস্থলে 'মিথ্যা' এই শব্দটি এক বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, সাধারণ অর্থে নয়। সেজন্য, 'মিথ্যা' শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে না পারলে শঙ্করের মায়াবাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হ'তে পারে।

প্রথমতঃ, 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ 'অলীক' বা 'অসৎ' নয়। যে বস্তু কেহ কোন দিন মুহূর্তমাত্রও সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করেনি, তা' হ'ল সম্পূর্ণরূপেই অলীক, অসৎ বা তুচ্ছ; যেহেতু তার বাহ্য, আন্তরিক, জাগতিক, মানসিক, বস্তুগত্যা, প্রত্যক্ষগত্যা—কোনরূপ অস্তিত্বই নেই। যেমন: আকাশকুসুম বা শশ-বিষাণ। কেহ কোন কালে মুহূর্তের জন্যও আকাশস্থ কুসুম বা শশশিরস্থ শৃঙ্গ প্রত্যক্ষমাত্র করেনি। সেজন্য, এরূপ কুসুম বা শৃঙ্গ আদ্যোপান্ত, ওতপ্রোতভাবে, শাশ্বতকাল, সম্পূর্ণরূপে অলীক, অসৎ বা তুচ্ছ—সর্বলোকের নিকট, সর্বপ্রকারে, সর্বদিক থেকে, সর্বকালে অস্তিত্ববিহীন।

কিন্তু 'মিথ্যা' বস্তু তা নয়; কারণ, সেই বস্তুই 'মিথ্যা' যা প্রথমে কিয়ৎকাল সত্যরূপে প্রতিভাত, প্রত্যক্ষীভূত বা দৃষ্ট হয়। যেমন, রজ্জু-সর্প—ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প—মিথ্যা; যেহেতু, প্রথমে ভ্রমকারী সর্পকে কিছুক্ষণ সত্যবস্তুরূপেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেন, অর্থাৎ, যতক্ষণ তিনি ভ্রমে পতিত হয়ে থাকেন, ততক্ষণই সর্প তাঁর নিকট সত্যরূপেই প্রতীয়মান হয়। পরে অবশ্য সত্যজ্ঞানোদয়ে, তাঁর সেই ভ্রম দূর হ'লে তিনি আর সর্প প্রত্যক্ষ করেন না, এবং সঙ্গে সঙ্গে—অর্থাৎ ভ্রান্ত-সর্প-প্রত্যক্ষের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই—দৃষ্ট সর্পটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও ভ্রমকারীর নিকট, তাঁর অন্তরে, প্রত্যক্ষে, চিন্তা ও কল্পনায় সর্পটির অস্তিত্ব ছিল সত্যবস্তুরূপেই। সেই দিক্ থেকে আকাশ-কুসুম বা শশ-বিষাণের ন্যায় এই সর্প সম্পূর্ণ অস্তিত্ব-বিহীন নয়। বাহ্য বাস্তব জগতে তার শাশ্বত বা দীর্ঘকালস্থায়ী অস্তিত্ব না থাকলেও মানসিক বা কাল্পনিক জগতে তার অল্পক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। এরূপে 'মিথ্যা' বস্তু 'অসৎ' বস্তুর ন্যায় সর্বলোকের নিকট, সর্বপ্রকারে সর্বদিক্ থেকে, সর্বকালে অস্তিত্ববিহীন নয়—কিন্তু এক বা ততোধিক ব্যক্তির নিকট, প্রত্যক্ষ প্রকারে, মানসিক দিক্ থেকে—ভ্রমকালে অস্তিত্ববিশিষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ, 'মিথ্যা' বস্তুও দু' প্রকারের: রজ্জু-সর্প—ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প—পূর্বোক্ত প্রকারে মিথ্যা; পুনরায়, ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমকালে দৃষ্ট জগৎও মিথ্যা। কিন্তু, তা সত্ত্বেও সর্প ও জগৎ একই স্তরগত নয়; জগৎ উচ্চস্তরীয়।

সেজন্য—অদ্বৈতবাদিগণ ত্রিবিধ সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন: পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। এই মতবাদের নাম "সত্তা-ত্রৈবিধ্যবাদ।" মাধবাচার্য তাঁর "সর্বদর্শন-সংগ্রহে" এই মতবাদের সারার্থ সংগ্রহ ক'রে বলছেন:—

"তদুক্তং পঞ্চপাদিকা-বিবরণে: ত্রিবিধং সত্ত্বম্। পরমার্থসত্ত্বং ব্রহ্মণঃ। অর্থক্রিয়াসামর্থ্যং সত্ত্বং মায়োপাধিকমাকাশাদেঃ। অবিদ্যোপাধিকং সত্ত্বং রজতাদেরিতি। অন্যত্রাপ্যুক্তম্—

কালত্রয়ে জ্ঞাতৃকালে প্রতীতিসময়ে তথা।
বাধাভাবাৎ পদার্থানাং সত্ত্বত্রৈবিধ্যমিষ্যতে॥

তাত্ত্বিকং ব্রহ্মণঃ সত্ত্বং ব্যোমাদের্ব্যবহারিকম্।
রূপ্যাদেরর্থজাতস্য প্রাতিভাসিকমিষ্যতে॥
লৌকিকেন প্রমাণেন যদ্ বাধ্যং লৌকিকেঽবধৌ।
তৎ প্রতিভাসিকং সত্ত্বং বাধ্যং সত্যেব মাতরি॥
বৈদিকেন প্রমাণেন যদ্ বাধ্যং বৈদিকেঽবধৌ।
তদ্ ব্যবহারিকং সত্ত্বং বাধ্যং মাত্রা সহৈব তৎ॥"

(পৃঃ ৪৪৬, ভাণ্ডারকার সং)

অর্থাৎ, ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যের টীকাকার পদ্মপাদাচার্য তাঁর টীকা "পঞ্চপাদিকা-বিবরণে" বলেছেন যে, সত্তা ত্রিবিধ :—পারমার্থিক, যথা—ব্রহ্ম; ব্যবহারিক, যথা—জগৎ; প্রাতিভাসিক, যথা—রজ্জু-সর্প—ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প প্রভৃতি।

প্রথমতঃ, পারমার্থিক সত্তা হ'ল সেই বস্তু যা কালত্রয়েও—কস্মিন্ কালেও—বাধিত হয় না, বা অসৎরূপে প্রমাণিত হয় না। সেজন্য পারমার্থিক সত্তা শাশ্বতকাল সত্য। বলাই বাহুল্য যে—চিরসত্য চিরপূর্ণ ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্তা।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহারিক সত্তা হ'ল সেই বস্তু—যা পূর্বে সত্যরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান-উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে যায়; যথা, জগৎ।

তৃতীয়তঃ, প্রাতিভাসিক সত্তাও হ'ল সেই বস্তু—যা পূর্বে সত্যরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে যায়; যথা, রজ্জু-সর্প—ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু।

এরূপে—ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তার সাধারণ লক্ষণ একই। কিন্তু, তা সত্ত্বেও উভয়ে সম্পূর্ণ এক নয়।

প্রথমতঃ ব্যবহারিক সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তার ন্যায় বাধিত হয়ে গেলেও তদপেক্ষা বহু দীর্ঘকাল-স্থায়ী। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম অল্প সময়ের মধ্যে রজ্জু-জ্ঞানোদয়ের দ্বারা বাধিত হয়ে অপসারিত হ'য়ে যায়; যেহেতু, যে যে কারণ বা দোষের জন্য সেই ভ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়; যেমন : চক্ষুর দোষ, দূরবর্তিত্ব, উপযুক্ত আলোকের অভাব-প্রমুখ বাহ্য কারণ; উপযুক্ত মনোযোগ বা অবধারণের অভাব, সাদৃশ্য জ্ঞান, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা-প্রমুখ মানসিক ধারণা বা কারণ। যথা, কোনো বিষয়ে গভীর আকাঙ্ক্ষা বা আশঙ্কার বশবর্তী হ'য়ে, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সেই সেই বস্তু অবিদ্যমানেও যেন তাদের প্রত্যক্ষ করি। অন্ধকার রাত্রিতে আমরা শ্মশানে অপ-দেবতার আশঙ্কা করি ব'লেই সেই স্থানের বৃক্ষাদিকেও অপদেবতারূপে দর্শন করি, যা আমরা অন্য স্থানে করি না। সেজন্য, যদি ভ্রমকারী নিকটে এসে, আলোকের সাহায্যে, মনোযোগ সহকারে সেই বৃহৎ শীর্ণ বস্তুটাকে পরীক্ষা করেন তা হ'লে তিনি তৎক্ষণাৎ বা অচিরেই তাকে রজ্জুরূপেই প্রত্যক্ষ ক'রে সর্পভ্রমমুক্ত হন। একই ভাবে—প্রতিদিন প্রভাতে স্বপ্নভ্রমেরও স্বতই নিরাস হয়, অনায়াসে। কিন্তু ব্রহ্মকে জগৎ-রূপে ভ্রম করলে যে জগৎ-প্রত্যক্ষের উদ্ভব হয়, তা এরূপ অল্পকাল-স্থায়ী নয়, অতি দীর্ঘকালস্থায়ী, জন্মজন্মান্তরব্যাপী—ব্রহ্মজ্ঞানোদয় ও মুক্তির পূর্বে আর তার বিলয় বা অবসান নেই। বহু বদ্ধজীব অসংখ্য জন্ম-জন্মান্তরেও এই জগদ্ভ্রমের হাত থেকে পরিত্রাণ পায় না, জগৎকেই পারমার্থিক সত্যরূপে গ্রহণ করে, বারংবার সংসারে প্রত্যাবর্তন করে ও অশেষ দুঃখভাগী হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যা উপরে বলা হয়েছে, স্বপ্ন-ভ্রম ও সর্প-ভ্রম প্রভৃতির নিরসন সহজসাধ্য। প্রতিদিন স্বপ্নকালে নানাবিধ বস্তু, ঘটনা প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হ'লেও প্রত্যূষে জাগ্রৎ প্রত্যক্ষের দ্বারাই সে সকল স্বতই বাধিত হয়ে যায় প্রত্যহ। একই-ভাবে, সর্প-ভ্রমাদির নিরাকরণও কঠিন নয়। কিন্তু জগদ্ভ্রমের বিনাশ অতি কঠিন ব্যাপার। বহু প্রচেষ্টা, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি বহু কঠোর সাধনাভ্যাস প্রয়োজন হয় সেজন্য। এই কারণে, উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হয়েছে যে, প্রাতিভাসিক